নিবেদিতা লোকমাতা

দ্বিতীয় খণ্ড

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৪

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

ISBN 81-7066-031-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৫০·০০

ভূমিকা

স্বামীজী ইংলণ্ডের এক শিক্ষয়িত্রী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান ক'রে চিঠি পাঠিয়েছিলেন; তাতে লেখেন, "তোমার মধ্যে আছে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি।" অভ্রান্ত দৃষ্টি! নিবেদিতা সত্যই আলোড়ন সৃষ্টি না ক'রে পারতেন না—যত অন্তরালে থেকে কাজ করার চেষ্টা করুন না কেন। যখন তিনি শান্ত তখনও তা জলস্তম্ভিত মেঘের স্তব্ধতা; যখন স্থির তখন উত্থিত তরঙ্গের ভেঙে-পড়ার পূর্বক্ষণের স্থিরতা। তাঁর ছিল ধাবিত হওয়ার পূর্বে অগ্নিশিখার নিবাত সমাহিতি। নিবেদিতাকে তো জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান জ্বলন্ত তলোয়ার বলেই চিহ্নিত করেছিলেন এক মানবতাবাদী সংগ্রামী পাশ্চাত্ত্য লেখক।

ভারতীয় জীবনের নানা পর্যায়ে নিবেদিতা যেসব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আলোড়নই বর্তমান খণ্ড ও পরবর্তী খণ্ডের বিষয়বস্তু।

নিবেদিতার ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, তা সর্বাত্মক দেশাত্মবোধের উদ্বোধনী সাধনা। নিবেদিতা এই দেশাত্মবোধের নাম দিয়েছিলেন 'জাতীয়তা'—যার অন্তর্ভুক্ত, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি—সবকিছু। এক কথায় নিবেদিতার দৃষ্টিতে জাতীয়তা মানে জাতীয় রেনেসাঁস। দেশীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনাসম্পন্ন ভারতবর্ষ গঠনের যে-প্রেরণা নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, তাকে প্রায় এক দশকের কার্যকালে ক্রিয়াশীল বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে কর্মসাফল্য অপেক্ষা তাঁর মনন-নেতৃত্ব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শেষোক্ত বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকার জন্য তাঁকে আমি জাতীয়তা-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বলেছি।

জাতীয়তা-দর্শন প্রণয়নে নিবেদিতার দানের প্রসঙ্গটি পর্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর বাইরে নিবেদিতা সম্পর্কে যে-অল্পকিছু আলোচনা হয়েছে, তার বড় অংশ আবার নিয়োজিত বিপ্লব আন্দোলনে নিবেদিতার অংশগ্রহণের প্রকৃতি বিচারে। অর্থাৎ গুপ্ত বিপ্লবে নিবেদিতার ভূমিকার মাপের দ্বারাই নির্ধারিত হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার মাপ—এমনই মনোভাব। খুবই সংকীর্ণ দৃষ্টি সন্দেহ নেই। বর্তমান খণ্ড ও পরবর্তী খণ্ডে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগের ব্যাপারে যথাসম্ভব তথ্য দিয়েছি। কিন্তু একইসঙ্গে সচেতন থেকেছি—নিবেদিতার মহিমা কেবল ঐ সংযোগের উপরই নির্ভরশীল নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে তাঁর দানের জন্য ভারতীয় ইতিহাসে তাঁর মর্যাদার স্থান থাকা উচিত। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে, গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্ররোচনাদান অপেক্ষা বেশি মূল্যবান মনে হয়েছে জনভিত্তিক ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তা সৃষ্টিতে তাঁর অসামান্য দানের বিষয়টি। তাঁর বিরাট মনীষা ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এইক্ষেত্রে কোন আশ্চর্য সৃষ্টি সম্ভব করেছে, তার বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, বিশেষত এইজন্য যে, ইদানীং কিছু লেখক ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভাব ও মননগত সংকীর্ণতার নিন্দায় মুখর হচ্ছেন। দেশ, জাতি ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন এঁরা—এঁদের সংগৃহীত মতাদর্শের বহির্বর্তী যে-কোনো বিষয়কে অবাধে সংকীর্ণ বলে নিন্দা করতে অভ্যস্ত। এরই অন্যপ্রান্তে রয়েছে নিবেদিতার গভীর ও ব্যাপক মনস্বিতার দ্বারা নির্মিত জাতীয়তা-দর্শন, যা ভাব-বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেশ ও সমাজ গঠনে যোগ্য সহায়তা করতে সমর্থ।

জাতীয় আন্দোলন সংক্রান্ত নিবেদিতার কার্যকাল ১৯০২-এর শেষভাগ থেকে ১৯১১-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই পর্বে লক্ষণীয়ঃ জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের ভাবধারার বিস্তার, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লব আন্দোলন, শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবানদের মৌলিক দান। এক কথায়, বাংলার এক অতি গৌরবময় যুগ। এই পর্বের প্রান্তে বিচ্ছিন্ন বঙ্গের পুনর্যোজনা, ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর, জাতীয় জীবনে বাংলার প্রাধান্য হ্রাসের সূচনা। নিবেদিতা বাংলার গৌরবযুগের অন্তর্গত চরিত্র, যার সৃষ্টিতে তাঁর অংশ ছিল। তাঁর সেই ভূমিকার প্রকৃতি নির্ধারণ করার প্রয়োজনে আমি তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যুক্ত সমকালীন অনেক চরিত্র ও ঘটনার বিবরণ উপস্থিত করেছি। তার থেকে স্বদেশী আন্দোলনকালে বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির কিছু ইতিহাসচিত্র পাওয়া যাবে।

বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ সহায়ক হয়েছে নিবেদিতার কয়েকশো 'অপ্রকাশিত' পত্র (যাদের এখন 'লেটারস্ অব সিস্টার নিবেদিতা' নামে দুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশ করেছি)। এইসব পত্রের মধ্যে সমকালীন জাতীয় জীবনের প্রচুর মূল্যবান সংবাদ আছে ; এমন-সব ইঙ্গিত সেখানে আছে যার সূত্রে ব্যাপকতর সন্ধানকাজ চালানো সম্ভব। সে কাজ কিছুটা করেছি। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চিঠি থেকে পাওয়া তথ্য ও সূত্রের সাহায্যে নিবেদিতার অন্তর্জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বর্ণিত আছে। সেইসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় তাঁর সাহায্যের কথাও। পত্রগুলি আবার রাজনৈতিক ঘটনার নেপথ্যলোকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ ক'রে দিয়েছে। রোমাঞ্চকর সেই দর্শন, যার মধ্যে একদিকে মহৎপ্রাণের আত্মোৎসর্গের পরমাশ্চর্য রূপ, অন্যদিকে মানুষের সর্ববিধ অধিকার অপহারক সাম্রাজ্যবাদীদের নখদ্রংষ্ট্রার হিংস্র আকার। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইংরাজ প্রশাসকদের মধ্যে লোলুপ দুর্নীতির অবাধ প্রসারের কাহিনী যেমন আছে, তেমনি পেয়েছি ইংরাজ সমাজেরই এক ক্ষুদ্র অংশের উদার মানবিকতা, অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি, ভারতবাসীর অপহৃত অধিকার প্রত্যর্পণের জন্য উৎকণ্ঠিত উদ্যমের বিবরণ। নিবেদিতার পত্রগুলি স্বদেশী যুগের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অমূল্য দলিল।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে এমন-কিছু সিদ্ধান্ত করতে প্রণোদিত হয়েছি যা সাধারণভাবে স্বীকৃত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন। তাদের কয়েকটি হল : নিবেদিতা এদেশে জাতীয়তা-দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ; বাংলার সক্রিয় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের প্রথম পর্ব হল নিবেদিতা-ওকাকুরা পর্ব ; ১৯০২-০৪ পর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে নিবেদিতা-যুগ ; ভারতের সেরা 'রিভিউ' মডার্ন রিভিউ-এর ব্যাপারে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতার কাছে সর্বাধিক ঋণী, ইত্যাদি। এইসকল সিদ্ধান্ত যৌক্তিক কিনা ঐতিহাসিকরা বিচার ক'রে দেখতে পারেন।

পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও অন্য নথি-পত্র থেকে সংগৃহীত অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি ও কার্টুন গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর ফলে গ্রন্থমূল্য বেড়েছে। আলোচ্য যুগকে একালের মন ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করার ব্যাপারে ছবিগুলিকে সহায়ক বলে পাঠকগণ মনে করবেন, এমন ধারণা পোষণ করি। কার্টুনগুলি মডারেট পত্রিকা থেকে প্রধানত সংগৃহীত। তাই সেগুলি থেকে চরমপন্থীদের (নিবেদিতা যার অন্তর্ভুক্ত) বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলবে।

বর্তমান খণ্ড ও পরবর্তী খণ্ডের অনেকখানি অংশ দেশ পত্রিকায় ৩ জুলাই ১৯৮২ থেকে ১৬ এপ্রিল ১৯৮৩ পর্যন্ত সময়ে 'নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন নামে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। লেখাটি কিছু নাড়া দিয়েছিল। লেখকের বক্তব্যের সমর্থনে ও প্রতিবাদে দেশ পত্রিকায় বেশকিছু চিঠিপত্র বেরিয়েছে। দেশ পত্রিকার ২৫ জুন ১৯৮৩ সংখ্যায় সে সবের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছি। সেখানে যা বলেছি এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। তবে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করছি, ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাত ঐতিহাসিক এই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন। মেকলে প্রভৃতি ইংরোজ প্রশাসকদের বিষয়ে তিনি নিবেদিতার বক্তব্যের সমর্থন করেননি। তাঁর পত্রের সূত্রে আমি নিবেদিতার এই বিষয়ক মত শুধু নয়, ভারতীয় মহলে অন্যত্র-প্রকাশিত মতও উপস্থিত করার সুযোগ পেয়েছি। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত পত্র লিখেও আমার সম্বন্ধে প্রীতি ও মনোযোগ প্রকাশ করেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমি যে-ধরনের ইতিহাস উদ্ধারের কাজে হাত দিয়েছি তাতে অনেক প্রচলিত ধারণার উপরে আঘাত লাগতে পারে, লেগেছেও। তাতে অনেকে ক্ষুব্ধ। কেবল চিঠিপত্রে নয়, পুস্তিকা প্রকাশ করেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। যদি এমন না ঘটত তাহলেই আশ্চর্য হতাম। তবে যদি কেউ আমার লেখা থেকে বেদনা পেয়ে থাকেন, তাতে আমি আন্তরিক দুঃখিত। তাঁদের কাছে সবিনয়ে জানাই, সত্য সন্ধানই আমার উদ্দেশ্য, অপরকে আঘাত করা নয়।

•

দেশ পত্রিকায় পূর্বোক্ত রচনা প্রকাশকালে অনেক বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি সবিস্ময়ে আমাকে বলেছিলেন—কি আশ্চর্য, নিবেদিতা এতকিছু করেছেন, আমরা তো জানতামই না। তাঁদের এই বিস্ময় বর্তমান লেখকের কাছে পুরস্কার। সেইসঙ্গে বেদনার বিষয়। হায়, শিক্ষিত-সাধারণের কী অবহেলা সেই অতুলনীয় মহীয়সীর সম্বন্ধে। ঐতিহাসিকদের কী ঔদাসীন্য—জাতীয় সৌধের অন্যতম,স্থপতির বিষয়ে!!

প্রথম খণ্ড প্রকাশের প্রায় কুড়ি বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড বেরুল। যাঁরা প্রথম খণ্ড পড়ে পরবর্তী খণ্ডের জন্য আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের প্রত্যাশা যথাকালে পূরণ করতে না পারার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

অথচ মনের মধ্যে পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশের তাগিদ যথেষ্টই ছিল। বলা চলে, সেজন্য এমনকি মানসিক যন্ত্রণাও বোধ করেছি। যে 'ভারতীয় কৃতজ্ঞতা'-র কথা বলতে ভগিনী নিবেদিতা উচ্ছ্বসিত হতেন, দেখা যাচ্ছে, তার উৎস ভারতবর্ষে উপরমহলে অন্তত এখন শুষ্ক। নিবেদিতা এই দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণাদাত্রী; এই দেশের কল্যাণে নিজের অসামান্য প্রতিভার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন; কিন্তু স্বাধীনতার পরে দেশের মানুষ তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তিনিই প্লেগ-মহামারীর সময়ে প্রথম বে-সরকারীভাবে কলকাতার বস্তী পরিষ্কারের কঠিন ও বিপজ্জনক কাজে নেমে পড়েছিলেন নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে—কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন সে ইতিহাস আবর্জনায় বিসর্জন দিয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করেছিলেন রাজনীতিতে যোগ দেবার জন্য। সংগ্রামী ঐতিহ্যের বড় ভক্ত কিছু ব্যক্তি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক নিবেদিতার বিচ্ছেদ নিয়ে অতীব রুষ্ট—অথচ স্বাধীনতাসংগ্রামী নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষায় রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখালেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ব্যাপারে তাঁরা অসাধারণ বাক্‌সংযমী। (বিচিত্র হল, নিবেদিতা যাঁর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন সেই রামকৃষ্ণ মিশনই নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষায় সত্যকার কিছু করেছেন)।

এই পরিস্থিতিতে কর্তব্যশৈথিল্যের গ্লানি আমি নিজে বোধ করেছি, যেহেতু জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা বিষয়ে রচনা প্রকাশে আরও তৎপর হইনি। তবে এই কাজের জন্য দীর্ঘ সন্ধানের প্রয়োজন হয়েছিল; প্রাপ্ত তথ্যকে যথাযথ বিন্যস্ত করতেও সময় লেগেছে। যদি এর দ্বারা জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার কাজের গুরুত্ব কিছুটা প্রতিপন্ন হয়েছে বলে পাঠকগণ মনে করেন, তাহলে শ্রম সার্থকজ্ঞান করব।

দেশ পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি এই লেখার অনেক অংশ দেশ-এ প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছিলেন বলেই নিবেদিতার জাতীয়তামূলক কার্যকলাপের বিবরণ বৃহত্তর জনগোচর হবার সুযোগ পেয়েছে। এর মূলে নিবেদিতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। সেইসঙ্গে স্বীকার্য, বর্তমান লেখকের প্রতি তিনি যথেষ্টই স্নেহশীল। দেশ পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশকালে শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হর্ষ দত্ত নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

তথ্যসংগ্রহকালে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে রক্ষিত নিবেদিতা-সংগ্রহ ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। ঐ বিদ্যালয়ের পূজনীয়া সন্ন্যাসিনীরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন। নিবেদিতা-গবেষণায় পূর্বসূরী প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার স্নেহপূর্ণ আগ্রহ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। পূজনীয়া প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার সস্নেহ প্রশ্রয় জীবনের সম্পদ।

অনেক গ্রন্থাগারেই কাজ করতে হয়েছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরে যখন স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করছিলাম, তখনি নিবেদিতা বিষয়েও সন্ধানাদি করেছি। যে অজস্র ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য তখন পেয়েছি, এখানে তাদের নামোল্লেখ করা সম্ভব নয়। আলোচ্য বিষয়ে কাছাকাছি যেসব গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : বেলুড় মঠ গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক) গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া) গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এবং জাতীয় গ্রন্থাগার। এইসকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সানন্দ সহযোগিতা আমার কাছে স্মরণীয়।

স্বামী বলরামানন্দের মধ্যবর্তিতায় ওকাকুরার জীবনীকার ইয়াসুকো হোরিওকা নিবেদিতার দ্বারা সংশোধিত ওকাকুরার একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছেন। স্বামী চেতনানন্দের মধ্যবর্তিতায় সিস্টার সুরধুনী আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছেন মিসেস ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার প্রায় একশো চিঠির ফটোচিত্র। মেরী লুইজ্ বার্ক (গার্গী) নিবেদিতার কিছু চিঠি পাঠিয়েছেন। এঁদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও বাড়িতে আমার সঙ্গে কাজ করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী মায়া বসু। সাহায্য পেয়েছি, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ বসু, ডঃ স্বপন বসু, ডঃ শিশির করের কাছ থেকে। শ্রীচিন্মোহন সেহানবিশের সৌজন্যে এবং শ্রীরণজিৎ সাহার মধ্যবর্তিতায় শ্রীঅরণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে স্বদেশী যুগের নেতাদের লেখা কয়েকটি পত্রের প্রতিলিপি পেয়েছি। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু, নিবেদিতা ব্রতী সংঘের পরিচালিকা, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে লেখিকা অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন। আর স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের প্রীতিপূর্ণ সহায়তার পরিমাপ করা আমার সাধ্যে নেই। এক কথায় তা অসামান্য। এইসঙ্গে শ্রীবিমলকুমার ঘোষের সাহায্যের কথাও যথেষ্ট বলা সম্ভব নয়। যথার্থই সর্ববিষয়ে তিনি আমার গবেষণা-সহায়ক। এই খণ্ডের নির্দেশিকা তিনিই প্রস্তুত করেছেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির রসে নিমগ্ন পিতৃপ্রতিম শ্রীপাঁচুগোপাল রায়ের স্নেহ ও আশীর্বাদ আমার গবেষণার পাথেয়।

এই বইয়ে যে-বহুসংখ্যক ছবি আছে তাদের অনেকগুলি পত্রপত্রিকা থেকে তুলে দিয়েছেন—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীনিত্যানন্দ ভকত, শ্রীসুনীল মণ্ডল এবং শ্রীঅরুণ ঘোষ। শেষোক্তজন কেবল ছবি তোলায় নয়, ছবিগুলিকে যথাযথ বিন্যস্ত করা-সহ অন্য নানা কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন। শ্রীমান্ সুদীপ বসু ও শ্রীমান্ শঙ্খ বসুর বইটি সম্বন্ধে আগ্রহের কথা স্মরণ করি।

গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীবাদল বসু যদিও ধন্যবাদপ্রাপ্তিতে অনাগ্রহী, তবু তাঁর পক্ষে অস্বস্তিদায়ক ধন্যবাদ

জানাচ্ছি, কারণ গত দশ বছর ধরে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত না হওয়ায় গঞ্জনা পাঠকদের কাছ থেকে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, যদিও বিলম্বের দোষ আমারই। এই সংস্থার শ্রীশঙ্কর বসু-মল্লিক ও শ্রীরঞ্জন সরকারের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এইসূত্রে শ্রীচিত্তরঞ্জন দে-কেও ধন্যবাদ জানাই।

নিবেদিতার গোপন রাজনৈতিক কার্যাবলীর সংবাদ রাখতেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি নিবেদিতাকে অন্তরালের বজ্র বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্তরালে থেকে কাজ করাতেই নিবেদিতার মহিমা। আর ঐতিহাসিকদের গরিমা, সেই অন্তরালের ইতিহাস উন্মোচনে। আমি ঐতিহাসিক নই। কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। এখন ঐতিহাসিকরা নিবেদিতার ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নে অগ্রসর হবেন, এই প্রত্যাশা পোষণ করতে চাই।

অন্যে যেখানে পশ্চাদ্‌পদ সেখানে অগ্রসর কবিরা—কারণ তাঁদের কলমে আলো জ্বলে। এবং তাঁরা চিরজীবনের নাড়িতে করস্পর্শ করতে পারেন। নিবেদিতাকে তাঁরা ঠিকই চিনেছেন। নিবেদিতার মূর্তির সামনে বিকীর্ণ কবিচিত্তের দু'একটি আলোকরেখা এই :

'অয়ি দেবী, অয়ি মাতা, অয়ি দীপ্তা অগ্নি-স্বরূপিণী,
শঙ্কর-তপস্যা-শুদ্ধা মহাভৈরবীর সুর।' (বনফুল)

'বিপ্লবের অগ্নি জ্বালি তুমি বজ্র সুকঠিনমনা।' (সজনীকান্ত)

'তুমি এক বিপুল বিস্ময়।' (সুশীল রায়)

'দেবতাদিশারি-দীপান্বিতা।' (দিলীপকুমার রায়)

'সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সর্বময়ী তাপসী দুহিতা।' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

'চক্ষে তব উথলিছে বিদ্রোহী ও কবির কল্পনা।' (স্বামী নিরাময়ানন্দ)

'সূর্যের মত যেন কোনো রক্তজবা।' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য)

'এসেছ আত্মার বধূ ভারতের পূর্ণসত্তা নিয়ে।' (উমা দেবী)

'বিদেশের শ্বেতশুভ্রা মোমবাতি এক।' (আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত)

'অগ্নিগিরি-গর্ভজাত প্রচণ্ড বিস্ময়।' (কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

'যন্ত্রণার স্বাদ ভুলে অমর সঙ্গীত গায়, কে সে?' (শুদ্ধসত্ত্ব বসু)

'মেরুজ্যোতি শুদ্ধকায় মূর্তি নিবেদিতা।' (আনন্দ বাগচী)

'হে ভগিনী, তুমিই সেদিন চিনিয়েছ এদেশ আমায়।' (শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়)

'উন্মোচিত ধ্যানের চূড়ায় শান্ত শিব সতী।' (শঙ্খ ঘোষ)

'তোমার আননে কৌম কুমুদিনী উমা।' (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

'নিবেদিতা, তুমি নিজেই ধর্ম।' (দুর্গাদাস সরকার)

'ভালবাসা যখন আকাশের মতো হয়ে যায়।' (নচিকেতা ভরদ্বাজ)

'একা নিবেদিতা এক মহা ইতিহাস।' (গোপাল ভৌমিক)

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বস্তুতথ্যের অন্তর্গত ভাবসত্তা অনবদ্যভাবে রেখায়িত হয়েছে বিমলচন্দ্র ঘোষের একটি কবিতায়। বর্তমান গ্রন্থভূমিকার সর্বশেষ বক্তব্য ঐ কবিতার কয়েক ছত্রের দ্বারা উপস্থিত করছি :

'তোমার দৃষ্টিতে মাগো দেখেছি অমেয় সৃষ্টিশিখা,
হে রুদ্রাণী, মূর্তিমতী ভারতের চৈতন্য-ঝঙ্কার।
লোকমুক্তিস্বপ্নে আত্ম-সমাহিতা বিপ্লবী নায়িকা,
তোমার পাশ্চাত্ত্যরক্তে কী বিস্ময়, প্রণব-ওঙ্কার।'

১ বি, ওলাবিবিতলা লেন
হাওড়া-৪

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১ জানুয়ারি, ১৯৮৭

সূচীপত্র

ভূমিকা

চিত্রসূচী

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
এমপ্রেস্ পত্রিকায় (অক্টোবর ১৯০৫) বঙ্গবিভাগ মানচিত্র।
কার্জন কার্টুন। (হিন্দী পাঞ্চ, জুলাই ১৯০৫)।
লর্ড কার্জন, লেডি কার্জন। (এমপ্রেস, মার্চ ১৯০৩)।
ঢাকার নবাব সলিমুল্লা।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জনের কনভোকেশন বক্তৃতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভার সংবাদ। (ইণ্ডিয়া, ১৭-৩-১৯০৫)।
জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলারের কার্টুন। (হিন্দী পাঞ্চ, ১৪-৬-১৯০৮)।
মান্দ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯০৫) বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রসহ বন্দেমাতরম্ অনুবাদ।
নিবেদিতার 'ডায়ন্যামিক রিলিজন' বক্তৃতার রিপোর্ট স্টেটসম্যানে (২৭-২-১৯০৪)।
জনবুল-কার্টুন, রিভিউ অব রিভিউজ-এ (অগস্ট ১৯০৮)।
বঙ্গভঙ্গ স্মরণ দিবসে (১০ অক্টোবর ১৯০৬) বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতারত সুরেন্দ্রনাথ। (এমপ্রেস্ নভেম্বর ১৯০৬)।
ভারতীয় আন্দোলন সংক্রান্ত কার্টুন। (রিভিউ অব রিভিউজ, জুলাই ১৯০৭)।

১৯২ পৃষ্ঠার পরে ১৬ পৃষ্ঠার তৃতীয় গুচ্ছ
বঙ্গভঙ্গ দিবসে কলকাতায় বক্তৃতারত অরবিন্দ। (রিভিউ অব রিভিউজ, ডিসেম্বর ১৯০৯)।
বিপ্লবী অবস্থায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।
স্যার অ্যানড্রু হেণ্ডারসন লেইথ ফ্রেজার।
ডগলাস হোলিনস্‌হেড কেনেডি।
সেণ্ট জেমস্ চার্চ।
বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত কেনেডির গাড়ি।
পুলিশ পাহারায় ক্ষুদিরাম বসু।
আদালতে ক্ষুদিরাম।
মানিকতলা বাগানবাড়ি।
আলিপুর কোর্ট, বন্দীদের ও পুলিশ অফিসারদের আগমন। (চারটি চিত্র)।
আদালতে বন্দীদের আগমন। আদালতে পুলিশগণ। (চারটি চিত্র)
পুলিশ পাহারায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত। (এমপ্রেস, সেপ্টেম্বর ১৯০৮)।
পুলিশ পাহারায় কানাইলাল।
আশুতোষ বিশ্বাস।
নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই।
দিল্লী-দরবারে কার্জনের কার্টুন।
রিভিউ অব রিভিউজ-এ (অক্টোবর ১৯০৯)
বিপিন পালের স্বরাজ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বোমার নিদান' প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।
নিবেদিতাকে লেখা উইলিয়ম স্টেডের চিঠি (৮-১২-১৯০২)।
ঐ (১-১-১৯০৩)।
রিভিউ অব রিভিউজ-এ (মে ১৯০৬) নিবেদিতার স্বদেশী আন্দোলন প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ।
ফেডারেশন-হলে ভিত্তিস্থাপনের সময় আনন্দমোহন বসুর সচিত্র বক্তৃতা-সংবাদ। (ইণ্ডিয়ান রিভিউ, অক্টোবর ১৯০৫)।
তিলক—কার্টুন।(হিন্দী পাঞ্চ, জানুয়ারি ১৯০৮)।
তিলক—কার্টুন।(ঐ, ডিসেম্বর ১৯০৭)।
সুরাট কংগ্রেস-ভঙ্গের কার্টুন। (ঐ, ৫ জানুয়ারি ১৯০৮)।
সুরাট কংগ্রেস-ভঙ্গের কার্টুন। (ঐ)
অরবিন্দ—কার্টুন।(ঐ)
অরবিন্দ, ফিরোজ শা মেটা—কার্টুন।(ঐ, অগস্ট ১৯০৯)।

বয়কটের পক্ষে প্রচাররত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও অম্বিকাচরণ মজুমদার। (ঐ, ১৮-৮-১৯০৭)।
কার্জন—কার্টুন।(মরাঠি পাঞ্চ)।

২৫৬ পৃষ্ঠার পরে ১৬ পৃষ্ঠার চতুর্থ গুচ্ছ।
স্বামী বিবেকানন্দ।
নিবেদিতার 'নোটস্ অব সাম্ ওয়াণ্ডারিংস্ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।
নিবেদিতাকে লেখা পরমেশ্বরলালের পত্র (২১-১০-১৯০৪)। দুই পৃষ্ঠা।
রমেশচন্দ্র দত্ত—কার্টুন।(হিন্দী পাঞ্চ)।
রমেশচন্দ্র দত্তর 'ইকনমিক হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি।
নিবেদিতাকে লেখা রমেশচন্দ্রের পত্র (১৫-১০-১৯০৯)। দুই পৃষ্ঠা।
আনন্দমোহন বসুর প্রয়াণ। (হিন্দী পাঞ্চ, ২৩-৮-১৯০৬)।
১৯০৬ সালে গৃহীত কলকাতা কংগ্রেসে জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রুপ ফটো।
অম্বিকাচরণ মজুমদারের কার্টুন। (হিন্দী পাঞ্চ ২১ জুলাই, ১৯০৭)।
মডারেটগণ কর্তৃক বয়কট-প্রত্যাখ্যানের কার্টুন। (ঐ, ১০-১-১৯০৭)।
রাসবিহারী ঘোষ—কার্টুন। (ঐ, ২৬-৪-১৯০৮)।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
লাজপত রায় কার্টুন (ঐ, ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮)।
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কার্টুন।
গান্ধী—কার্টুন। (ঐ, ২-২-১৯০৮)।

নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন

(প্রথম পর্ব)





শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী (১৯৩৬) উপলক্ষে প্রস্তুত স্মারক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের ছবি।
(স্বামী অনন্যানন্দের সৌজন্যে)

প্রথম পর্ব

নিবেদিতার রাজনৈতিক চিন্তা ও চেষ্টার পশ্চাদপট

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় 'নবজাগরণে' নিবেদিতার ভূমিকা

॥ ১ ॥ ভারতীয় জাগরণকে 'রেনেসাঁস' করে তোলার ব্যাপারে নিবেদিতার প্রয়াস

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের পরে ভগিনী নিবেদিতার ১২ বৎসরব্যাপী কার্যাবলীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমাদের স্বীকার করতে হবে—ভারতীয় জাগরণের চরিত্র অনুধাবনে, এবং সেই জাগরণকে সর্বমুখী করার ব্যাপারে (অর্থাৎ জাগরণকে রেনেসাঁস করে তোলার ব্যাপারে) নিবেদিতার তুল্য চেষ্টা অন্য কারো মধ্যে দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। কথাটা বিস্ময়কর হলেও প্রমাণসিদ্ধ। এখানে স্মরণীয় ব্যতিক্রম স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ততার জন্য চিন্তাকে সর্বথা কার্যে পরিণত করতে পারেন নি, যার দায়ভার তিনি বহুলাংশে নিবেদিতার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন।১ পরবর্তীকালে নিবেদিতা তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলিকে তাঁর মারফত স্বামীজীর রচনা বলেই মনে করেছেন।

ভারতীয় নবচেতনার তাৎপর্য বুঝে তাকে কর্মমুখী করার মতো মানসিক সম্পন্নতা যে নিবেদিতার ছিল, তা সমকালের মনীষীদের দৃষ্টি এড়ায়নি, বিশেষতঃ তাঁর পাশ্চাত্ত্য-বন্ধুরা এ-বিষয়ে অধিক অবহিত ছিলেন, কারণ তাঁরা কিছুটা নির্লিপ্তভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপট দেখতে পারতেন। জাতীয় আলোড়নের অন্তর্গত ভারতীয়দের পক্ষে এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার করা কিছু কঠিন ছিল।

নিবেদিতা উপযুক্তভাবে পূর্বোক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, যেহেতু তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় শিক্ষার সম্মিলন ঘটেছিল। এই দুই শিক্ষাকে ধারণ করার মতো মনস্বিতা তাঁর ছিল, এবং তাকে কার্যকর করার মতো চারিত্রশক্তির অধিকারীও তিনি ছিলেন।

নিবেদিতার মনীষার প্রসঙ্গে এইটুকু বলে নেওয়া যায়—আমরা তাঁর বিষয়ে যে-সব স্মৃতিকথা পেয়েছি তাদের কোনো একটিতেও তাঁর আশ্চর্য মনস্বিতার অনুল্লেখ আছে কিনা সন্দেহ। এ-বিষয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ মন্তব্য যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে প্যাট্রিক গেডেস পর্যন্ত বিরাট মনীষীরা আছেন।

লাহোর ট্রিবিউন পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক এবং লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন : "[১৮৯৮ সালে কাশ্মীরে] বিবেকানন্দ আমাকে ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে অনেককিছু

---

১ বিবেকানন্দের নানামুখী চিন্তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" (১ম—৫ম খণ্ড) গ্রন্থে। বিবেকানন্দের চিন্তার বিচিত্র প্রসারের বিষয়ে একটি আকর্ষক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রোমাঁ রোলাঁর আলাপের পরে রোলাঁ ৯ জুলাই, ১৯২৭, তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন : "বিবেকানন্দকে ডাঃ বসু ভালবাসতেন, বিবেকানন্দও ভালবাসতেন বসুকে। শুনে আনন্দ পেলাম, ডাঃ বসুর মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা দেখতে পাচ্ছেন মনে করে একসময় বিবেকানন্দ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এবং তাঁকে [বসুকে] সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন —তিনি যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি নিয়ে কেবল বিজ্ঞানেই জাতীয়তাবাদ দেখান।" [রম্যাঁ রলাঁ "ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী" ; (২১৩) ; অনুবাদক : অবন্তীকুমার সান্যাল]

বলেছিলেন—যথা, ভগিনী নিবেদিতার ব্যাপক শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞানের পরিধির কথা।২" রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত "ভগিনী নিবেদিতা" প্রবন্ধে নিবেদিতার "সর্বতোমুখী প্রতিভা", "অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা," "প্রতিভার জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি"-র কথা বলেছেন। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় লেখা হয়: "বিরল তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিরলতর মনস্বিতার শক্তি।...বিরাট তাঁর বৌদ্ধিক শক্তি, অতীব প্রভাবশালী; নিজ অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণায় এবং অফুরন্ত কর্মক্ষমতায় তা পূর্ণ্যাগি। চিন্তাকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অদ্ভুত লেগে থাকার ক্ষমতা।...জ্যোতির্ময় চিন্তার প্রকাশই ছিল তাঁর বাসনা ও আদর্শ।...তাঁর আধ্যাত্মিক ভাব-দর্শনের মতোই ছিল তাঁর...মনীষার অন্তর্ভেদী শক্তি।"৩ অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল ঘোষ বলেছেন: "উচ্চ মনীষাসম্পন্ন এই নারী, এঁর বিপুল পড়াশোনা ও সুস্পষ্ট মনো-গঠন।"৪ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঙ্গলী কাগজ লেখে: "উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন তিনি; ...তাঁর প্রবন্ধাবলী ব্যাপকভাবে পঠিত ও গভীরভাবে সমাদৃত।"৫ লখনৌ অ্যাডভোকেট পত্রিকার মতে: "ভগিনী নিবেদিতা অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন নারী।...তিনি বহু রচনা রেখে গেছেন যেগুলি ভারতের জন্য তাঁর কর্মের কীর্তিস্তম্ভরূপে স্বীকৃত হবে।"৬ 'ইয়ং বেহার' পত্রিকা লেখে: "তিনি ছিলেন প্রদীপ্ত-প্রতিভা বিবেকী আত্মা। ভারতকে তিনি জেনে-ছিলেন, ভারতের প্রয়োজনকে বুঝেছিলেন, ভারতের প্রগতিতে সাহায্য ক'রে গেছেন।"৭ ইংরাজ সাংবাদিক ফ্রেজার ব্লেয়ার—নিবেদিতার "অনুভূতির অভ্রান্ত তীক্ষ্ণতা এবং মনস্বি-তার দৃঢ় আয়ত্তীকরণ-ক্ষমতার" কথা বলেছেন।৮ এলাহাবাদের বিখ্যাত লীডার পত্রিকায় লেখা হয়: "ভগিনী নিবেদিতা অসামান্য সংস্কৃতি এবং সংবেদনশীল কল্পনার অধিকারী ছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের কাছে হিন্দুদের রীতি-নীতি, চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শের ব্যাখ্যা তিনি সাফল্যের সঙ্গে করেছেন নিজ ভাষায় [অর্থাৎ ইংরাজিতে], যে-ভাষায় তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল।...'দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ' নামক গ্রন্থের চিত্তহারী রচনা কাকে না চমকিত করে!"৯

নিবেদিতার মনস্বিতার অজস্র পরিচয় আমরা ক্রমে লাভ করব। তাঁর গ্রন্থ-সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লিখিত হবে।

॥ ২ ॥ নিবেদিতার 'ভারতীয়তা'

স্বামীজীর সান্নিধ্যে থাকাকালে নিবেদিতা ভারতবর্ষকে কোন্‌রূপে দেখেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। স্বামীজী ও তাঁর দলবলের

---

২ ট্রিবিউন, ২৯ অক্টোবর, ১৯১১।
৩ প্রবুদ্ধ ভারত, নভেম্বর, ১৯১১।
৪ অমৃতবাজার, ২৫ অক্টোবর, ১৯১১।
৫ বেঙ্গলী, ১৪ই অক্টোবর, ১৯১১।
৬ লখনৌ অ্যাডভোকেট; প্রবুদ্ধ ভারতে উদ্ধৃত, নভেম্বর, ১৯১১।
৭ ইয়ং বেহার; প্রবুদ্ধ ভারতে উদ্ধৃত, নভেম্বর, ১৯১১।
৮ ঐ।
৯ লীডার, ১৫ অক্টোবর, ১৯১১।

সঙ্গে ভারতভ্রমণকালে নিবেদিতা দেখেছিলেন ভারতের বিরাট রূপকে—তার বহুবিচিত্র সুপ্রাচীন অতীত, শোচনীয় বর্তমান অবস্থা, পতনের মধ্যেও মহান উত্তরাধিকার। এই দেখা ও জানার গৌরবে তাঁর মন পূর্ণ ছিল। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি বলেছিলেন: "ভূপেন, তুমি কি মনে করো, যে-কোনো ইউরোপীয় বা আমেরিকান ভ্রমণকারী ভারতীয় জীবনধারাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিবেকানন্দকে পাবে—আমি যা পেয়েছি।"১০

নিবেদিতা কি পরিমাণে ভারতীয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, সে সম্বন্ধে অজস্র সাক্ষ্যের মধ্যে এখানে কেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কথা উপস্থিত করতে পারি:

"নিবেদিতা তাঁর প্রতিটি কার্য, প্রতিটি চিন্তা, জীবনের প্রত্যেক আবেগের অন্তর্বর্তী ক'রে নিয়েছিলেন ভারতের আশা ও আদর্শকে।...মনে হত যেন প্রাচীনকালের কোনো ঋষির মুক্ত আত্মা এ'র [পাশ্চাত্য] দেহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে, যার ফল: পাশ্চাত্য জীবনীশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইনি পুরাতন ভালবাসার চেনা জায়গাটিতে ফিরে এসে এখানকার জনগণের সেবা করতে পারেন। ভারতের স্বপ্ন নিবেদিতার স্বপ্ন; ভারতের চিন্তা নিবেদিতায় প্রকাশিত। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় জীবনে যা-কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ তাদেরই বিচ্ছুরিত চেতনার জগতে তিনি দিবানিশি কাটিয়েছেন।"

পুনশ্চ: "তাঁর রচনাবলীর প্রতিটি ছত্রে ভারতীয় মনকে গ্রহণ ও ধারণ করার কী-না অপূর্ব ক্ষমতা।...ভারতের প্রতি প্রেম তাঁকে দিয়েছিল ভারত-বিষয়ে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি। এই অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিমানসের কল্পনা ও অনুভূতির উদার বিস্তার।"১১

ভারতীয় জাগরণের সূচক হিসাবে নিবেদিতা সঙ্গতভাবেই ধর্মজাগরণকে গ্রহণ করেছিলেন, যার নেতা স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার মধ্যে ভারত ও বিশ্ব কি পেয়েছে, সে-প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন: "হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজ ভাবসমূহের সংকলন ও সংহতি; পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মধারণার, যা সত্যে ভীত নয়। দুই বস্তুই এখানে [বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায়] মিলবে।" বিবেকানন্দ হিন্দুদের দিয়েছিলেন—"হিন্দু-বিশ্বাসের মহাসনদ", এবং বিশ্ববাসীকে দেন—"মুক্তির মহাসনদ।" বিবেকানন্দের কাছে "কেউই বিদেশী বা বিজাতি নয়। তাঁর কাছে শুধু ছিল—মানবতা ও সত্য।" "শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম [বিবেকানন্দের মতে] একই সত্যকে প্রকাশের তিনটি বিভিন্ন প্রণালী।" এহেন বিশাল সর্বাত্মক প্রতিভা, দূরপ্রসারী দৃষ্টি, সেইসঙ্গে হৃদয়ের মহৎ উদারতার জন্য বিবেকানন্দ হয়ে উঠেছিলেন, "কেবল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থল নন, অতীত ও বর্তমানেরও মিলনভূমি।" বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন, "অতঃপর আর ঐহিক ও পারমার্থিকে প্রভেদ নয়। এখন শ্রমের অর্থ প্রার্থনা; জয়ের অর্থ ত্যাগ; এখন এই জীবনই ধর্ম।"১২

---

১০ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, "স্বামী বিবেকানন্দ: পেট্রিয়ট-প্রফেট" (১৯৫৪), ১১৭। গ্রন্থটি অতঃপর 'পেট্রিয়ট-প্রফেট' বলে উল্লিখিত হবে।

১১ বেঙ্গলী, ২৪ মার্চ, ১৯১২।

১২ 'দি কমপ্লিট ওয়ার্কস্ অব সিস্টার নিবেদিতা' (১৯৬৭), প্রথম খণ্ড, ৯। এগুলি অতঃপর 'নিবেদিতা রচনাবলী' নামে উল্লিখিত হবে।

॥ ৩ ॥ নিবেদিতা : শিক্ষাতাত্ত্বিক ও শিক্ষাব্রতী, শিল্পতাত্ত্বিক, বিজ্ঞান-সহায়ক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, বাগ্মী, রাজনৈতিক, ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা

প্রথম পরিচয়ের কালে স্বামীজী নিবেদিতাকে উচ্চাঙ্গের শিক্ষাতাত্ত্বিক এবং শিক্ষাব্রতী হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর এই পরিচয় সম্বন্ধে এস কে র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন, "নিবেদিতা ফ্রবেলের শিক্ষানীতির ঘনিষ্ঠ অনুশীলনকারী। তাঁর শিক্ষকদের একজন ছিলেন পেস্তা-লাৎস্কির শিক্ষাতত্ত্বের সর্বাধিক মৌলিক এক ইংরাজ অনুগামী।" নিবেদিতা উক্ত শিক্ষা-নীতিকে কিভাবে নিজে স্কুল স্থাপন ক'রে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন, তার কথাও র‍্যাটক্লিফ বলেছেন।১৩

বিবেকানন্দের বিবেচনায় "নারী ও জনগণের" উন্নতির উপরই ভারতের উন্নতি নির্ভরশীল ; এবং শিক্ষার দ্বারা সেই উন্নতিসাধন সম্ভবপর। নিবেদিতাকে তাই স্বামীজী ভারতে নারীশিক্ষার কাজে আহ্বান করেছিলেন। স্বামীজীর জীবনকালেই নিবেদিতা ভারতে নারীশিক্ষার কাজ আরম্ভ করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে অন্য অনেক কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য নিবেদিতা যদিও বিষয়টিতে পুরো মনোযোগ দিতে পারেননি, তথাপি তা কখনই তাঁর চিন্তা ও চেষ্টা থেকে বিচ্যুত হয়নি। শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে তিনি যা লিখেছেন, তা নিঃসন্দেহে দিগ্‌দর্শক। তাঁর শিক্ষাচিন্তার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লেখা হয় : "অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা যে-জিনিসটি ভগিনী নিবেদিতার একেবারে প্রাণের জিনিস, সেটি নিঃসন্দেহে ভারতীয়গণের শিক্ষা।...আমাদের বিশ্বাস, গোখলে প্রমুখের প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক মানুষ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক মানুষই শিক্ষার রূপ কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে অবহিত। নিবেদিতা আমাদের নিখুঁত শিক্ষার বিষয়ে মূল্যবান ধারণা দান করেছেন।"১৪

নিবেদিতা কিভাবে শিক্ষাচিন্তার পূর্ণতায় পৌঁছেছিলেন, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বেঙ্গলী লিখেছিল : "পাশ্চাত্ত্যে তাঁর জন্ম, ভারতে কর্মজীবন ও মৃত্যু—ইনি পৃথিবীকে দুই দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন : ভারতের সুন্দর-সুকুমার নারী-আদর্শের সঙ্গে তিনি যুক্ত করে-ছিলেন ইউরোপীয় ঐতিহ্যপ্রাপ্ত সুদৃঢ় মনস্বিতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা।"১৫

শিক্ষাপ্রসারের ব্যাপারে নিবেদিতা নিছক কর্তব্যবোধে চালিত ছিলেন না, সে ছিল তাঁর ব্যাকুল আবেগের তাড়না। নিবেদিতার এই বিষয়ক যন্ত্রণাময় আকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে, ডঃ যদুনাথ সরকার লিখেছেন : "নিবেদিতা বলতেন, শিক্ষা! আ-হা! সেই হল ভারতের সমস্যা। কিভাবে ভারতকে খাঁটি শিক্ষা, জাতীয় ধারায় শিক্ষা দিতে হবে ; কিভাবে তোমাদের পুরো মানুষ ক'রে তুলতে হবে, ভারতবর্ষের খাঁটি সন্তান ক'রে তুলতে হবে—

---

১৩ এস কে র‍্যাটক্লিফ, মডার্ন রিভিউ, ডিসেম্বর, ১৯১১।

১৪ নিবেদিতার শিক্ষাবিষয়ক কিছু লেখা সংগ্রহ করে তাঁর মৃত্যুর পরে "হিন্টস্ অন এডুকেশন" নামে একটি ছোট বই বেরোয়। বইটির উপরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় অগস্ট ১৯১৫ সংখ্যায় যে-সমালোচনা করা হয়, উপরে তারই অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।

১৫ বেঙ্গলী, ২৪ মার্চ, ১৯১২।

ইউরোপের ব্যাঙ্গে নকল নয়—সেই হল সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হবে যতখানি মস্তিষ্কের, সেই পরিমাণে হৃদয়ের এবং সত্তার। তা হবে জীবন্ত যোগসূত্র—তোমাদের সঙ্গে অতীতের এবং আধুনিক পৃথিবীর।''১৬ [পরের খণ্ডে এ-বিষয়ে আলোচনা থাকবে।]

নিবেদিতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে সহায়তা। এদেশে শিল্প-আন্দোলনে প্রথম পর্বে তাঁর দান কারো অপেক্ষা কম নয়, বরং বলা যায়, নির্দিষ্ট একটা সময়ে অন্য যে-কারো অপেক্ষা বেশি। [এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরের খণ্ডে করব।]

নিবেদিতাকে যাঁরা নিছক ধর্মান্দোলনে যুক্ত দেখেন, বড় জোর অতিরিক্ত হিসাবে জাতীয় আন্দোলনে উৎসাহী মনুষ্যমধ্যে গণ্য করেন, তাঁরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুলে যান—জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানসাধনার পিছনে অন্য যে-কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা এই নারীর দান অধিক। জগদীশচন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে ভারতীয় বিজ্ঞান-আন্দোলন শুরু হয়েছে, এই বিশ্বাসে নিবেদিতা তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। সে ইতিহাস দীর্ঘ; কয়েক শত পৃষ্ঠা ধরে তার কিছু অংশমাত্র আমি উপস্থিত করেছি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।

বিস্ময়কর তবু সত্য—ঐকালে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতারূপে নিবেদিতার প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্ব। দুই উপায়ে তিনি এই ব্যাখ্যাকার্য করেছেন—প্রথমতঃ অগণিত সভায় অনবদ্য বাগ্মিতাযোগে, দ্বিতীয়তঃ পত্রপত্রিকায় অজস্র ক্ষুদ্র, নাতিক্ষুদ্র, এবং দীর্ঘ প্রবন্ধ-যোগে। সেইসকল রচনা তাঁর জীবনকালে, পরেও, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

নিবেদিতার বাগ্মিতা-প্রসঙ্গটি বিশেষ আলোচিত নয়। সে-বিষয়ে কিছু উল্লেখ এখানে করতে পারি।

কলকাতায় আসার অল্প পরে, ১১ মার্চ, ১৮৯৮, নিবেদিতা স্টার থিয়েটারে বক্তৃতা করেন। তা শুনে স্বামীজী খুশি হয়ে রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন: ''মিস নোবলকে পাওয়া একটা মস্ত লাভ। আমার নিশ্চিত ধারণা, শীঘ্রই সে বক্তা হিসাবে মিসেস বেশান্তকে ছাড়িয়ে যাবে।'' ভারত ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বিবেকানন্দ অকারণে একথা লিখতে পারেন না। কিন্তু দেখা যাবে, এই সময়ে ও পরবর্তীকালে ভারতের নানা সংবাদপত্র তাঁর বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করলেও মিসেস বেশান্তের পরেই তাঁর স্থাননির্দেশ করেছে। এর একটা কারণ হতে পারে, নিবেদিতা তাঁর বক্তা-জীবনকে ক্রমে ত্যাগ করেছিলেন। ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে গুরুতর অসুস্থতা তাঁর শারীরিক শক্তি হ্রাস করেছিল, এবং তিনি মনে করেছিলেন, বক্তৃতা অপেক্ষা লেখার কাজে শক্তিব্যয় করলে তিনি অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। কিন্তু বক্তৃতামঞ্চ থেকে তাঁর সরে আসার মূল কারণ হল: জনপ্রিয় বক্তা হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল; বক্তৃতাকালে তিনি যে উচ্চ সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তাজগৎকে উদ্ঘাটন করতেন, সেই স্তরে ওঠা সাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই চিন্তাপ্রবাহ

---

১৬ মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর, ১৯১১। যদুনাথ সরকারের লেখাটি 'এক্স-ওয়াই-জেড্', এই ছদ্মনামে বেরিয়েছিল।

বিস্তারের ব্যাপারে তিনি গোড়া থেকেই বেশান্ত প্রমুখকে 'ছাপিয়ে' গিয়েছিলেন। এস কে র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার বক্তা-জীবন দীর্ঘায়িত না হওয়ার জন্য দুঃখ করেছেন। তিনি মনে করেছেন, "জনসভায় বক্তৃতা ছিল তাঁর বাণীর বিস্তারের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী উপায়।" তিনি এবং ফ্রেজার ব্রেয়ার নিবেদিতার কয়েকটি চমকপ্রদ বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন। তথাপি র‍্যাটক্লিফই আবার নিবেদিতা কেন প্রচলিত অর্থে সর্বসাধারণের উপযোগী বক্তা হতে পারেন না, তাও জানিয়েছেন: "মঞ্চে নিবেদিতা ক্রমান্বয়ে ভাবস্তরের পরিবর্তন ঘটাতেন। অত্যন্ত কঠিন বক্তব্যের প্রকাশে সদাই উৎকণ্ঠিত, দর্শন ও সমাজদর্শনাত্মক শব্দাবলীর প্রয়োগরত, ঘনাপিনদ্ধ বাচনভঙ্গিতে আবদ্ধ তিনি—মাঝে মাঝে শ্রোতাদের বোধসীমার বহু ঊর্ধ্বে উঠে পড়তেন।"১৭

তথাপি উল্লেখযোগ্য, নিবেদিতা বক্তৃতামঞ্চ থেকেও প্রভাব বিস্তার করেছেন। নিবেদিতা সাধারণ অর্থে নেতা নন, তিনি প্রধানাংশে নেতাগণের নেতা। তাঁর বক্তৃতা থেকে চিন্তা ও প্রেরণা লাভ করবার মতো শ্রোতা অবশ্যই ছিল। আমরা দেখি, তিনি ভারত, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অজস্র বক্তৃতা করেছেন। তাদের একটা দীর্ঘ কিন্তু অসম্পূর্ণ তালিকা আছে তাঁর রচনাবলীতে (পাঁচ খণ্ড)।

ভারতসংস্কৃতির ব্যাখ্যাতারূপে নিবেদিতার ভূমিকার বিষয়ে ব্যাপক স্বীকৃতি সমকালে যথেষ্টই দেখা গিয়েছিল। বালগঙ্গাধর তিলক-প্রবর্তিত মরাঠা কাগজ যদি বলে:

"সিস্টার নিবেদিতার 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ'-এ হিন্দুজীবনের তাৎপর্যের যে-রূপ দেখা গেছে, তার অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ, অধিক স্বচ্ছ রূপ এখনো পর্যন্ত কোনো পাশ্চাত্ত্যদেশীয়ের লেখনীতে প্রকাশিত হয়নি।"১৮

অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল ঘোষ যদি বলেন:

"এই লোকান্তরিত মহিলা [নিবেদিতা] পাশ্চাত্ত্যজাতির নিকটে বুদ্ধিদীপ্ত অনতিক্রম্য ভঙ্গিতে হিন্দুদের রীতিনীতির পক্ষ সমর্থন করেছেন—সে ঋণ হিন্দুরা কদাপি পরিশোধ করতে পারবে না।"১৯ "ভারত সম্বন্ধে তিনি একাধিক বই লিখেছেন, যেগুলি উচ্চ আদর্শ ও চিন্তার রত্নমাণিক্যে পূর্ণ। সেগুলি তাঁকে অমর করে রাখবে।"১৯ক

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বলেন:

"আমি তাঁর কিছু রচনা পড়েছি। তা পড়েছি আনন্দ ও সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে। প্রতিটি ছত্রে ভারতীয় মনকে অনুধাবন করবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা সেখানে।"২০

বিপিনচন্দ্র পাল যদি বলেন:

"ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ গ্রন্থে আমাদের বর্তমান জীবন ও চিন্তার কোনো-কোনো দিক সম্বন্ধে যে-ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন তা ভারত সম্বন্ধে আমার জানা সকল ইংরাজি গ্রন্থের অপেক্ষা নির্ভুল।" ['দি সোল্ অব ইণ্ডিয়া।']

---

১৭ এস কে র‍্যাটক্লিফ, মডার্ন রিভিউ, ডিসেম্বর, ১৯১১।

১৮ মরাঠা, ১৫ অক্টোবর, ১৯১১।

১৯ অমৃতবাজার, ২৫ অক্টোবর, ১৯১১।

১৯ক অমৃতবাজার, ১৪ অক্টোবর, ১৯১১।

২০ বেঙ্গলী, ২৪ মার্চ, ১৯১২।

ইউরোপীয়দের পক্ষে ফ্রেজার রেয়ার যদি স্বীকার করেন :

"'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ'—প্রাচ্যের অনুশীলন ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য-লেখকের পক্ষে এতাবৎ অধিকৃত সর্বোচ্চ শিখর।"২১

—তাহলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, নিবেদিতা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে নিঃসংশয় আধিপত্যে বিরাজিত ছিলেন। এর পরে আমরা ধরে নেব, দেশনেতা ও মনীষী-লেখক লাজপত রায় নিবেদিতার এই বিশেষ ভূমিকাটির বিষয়ে যেসব সমর্থক মন্তব্য করেছিলেন তা ছিল দেশের বিদগ্ধ মানুষদের সাধারণ অভিমত। লাজপত রায় নিবেদিতার 'ফুটফলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি' বইয়ের দীর্ঘ আলোচনা করেন। তার মধ্যে বলেন :

"এই মূল্যবান বইয়ের প্রতিটি লাইনে নিবেদিতাকে পাঠক দর্শন করেন। এই গ্রন্থে তাঁর সত্য, সুন্দর এবং সুমহান চরিত্রের বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটেছে। এ হল তেমন এক রচনা যার মধ্যে সম্মিলিত হয়েছে ভারতপ্রেম এবং নিখুঁত চিন্তা ও বিচার। আর রচনা-রীতির কথা কি বলব—ভারতবিষয়ে বিদেশী লেখকদের মধ্যে আর কে আছেন যিনি এর চেয়ে সুন্দরতর ভাষায় লিখেছেন? মহৎ আকারের বাক্যরাজিতে গ্রথিত সুমহৎ চিন্তারাজি—এই গ্রন্থে।"

লাজপত রায় রচনাশেষে বলেছিলেন : "একথা কি আমাকে লিখে জানাতে হবে যে, আমি সর্বাধিক জীবন্ত, প্রাণদায়ী, সতেজ, আলোকবর্ষী এবং চিত্তাকর্ষক যেসব বই পড়েছি, তাদের অন্যতম এই বই?"২২

এখানেও শেষ করা যায় না। মাদ্রাজের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১১ সংখ্যায় এম শ্রীনিবাস আয়ার নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভার বিষয়ে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে তিনি বলেন : "মনস্বিতার দিক দিয়ে লোকান্তরিতা নিবেদিতা অতিকায় ছাঁচে ঢালা। তাঁর রচনা ও গ্রন্থ পড়লে একথা অনুভব না করে উপায় নেই যে, অসামান্যভাবে মৌলিক, ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী এক মনের সম্মুখীন আমরা হয়েছি।" এর পরে শ্রীনিবাস আয়ার যেকথা বলেছেন তা অবশ্যস্বীকৃত তথ্য : "কিন্তু তাঁর অপূর্ব চিৎপ্রকর্ষ তাঁর মহিমার সামান্য অংশ। তাঁর বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞান, এমনকি তাঁর সর্বাতিক্রমী সাহিত্যপ্রতিভা, কিংবা তাঁর রচনাসমূহে পরিব্যাপ্ত সমৃদ্ধ কল্পনার প্রভা, যা সেগুলিকে বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণী শক্তি দিয়েছে—না, সেসকলও তাঁর মহিমাভিত্তি নয়। তাহলে কী সে জিনিস যা তাঁর রচনাকে গভীরভাবে শিহরিত করত—কোথায় আছে তাদের প্রেরণার উৎস? সে প্রেরণা আছে—অবশ্যই আছে—তাদের আত্মা-অংশে।" লেখক আরও বলেছেন : "আমরা একেবারেই অত্যুক্তির দোষে দুষ্ট হব না যদি বলি, ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় জীবন ও চিন্তার ব্যাখ্যাক্ষেত্রে সর্বাধিক খাঁটি ও সর্বাধিক পরিশীলিত পাশ্চাত্ত্য লেখক।" এইক্ষেত্রে নিবেদিতার "অসাধারণ সুযোগ" ছিল—"তিনি এমন এক আচার্যের শিষ্যা যিনি, অনেকের ধারণায়, ভারতীয় জাগরণের দেহ এবং প্রাণ-রূপ।" এইসঙ্গে ছিল [লেখক বলেছেন], নিবেদিতার অতুলনীয় অন্তর্দৃষ্টি, ভারত-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও প্রেম এবং বিরল রচনাশক্তি। এর দ্বারা তিনি হয়ে উঠেছিলেন

২১ বেঙ্গলী, ২৪ মার্চ, ১৯১২।

২২ মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ১৯১৫।

"ভারতীয় জনগণের নিকটে অগ্রণী দেশপ্রেমিক, অগ্রণী বাণীবাহী।" নির্দ্বিধায় লেখক বলেছেন : "সাম্প্রতিককালে এ'র তুল্য আর কেউ আমাদের মধ্যে নেই যিনি জাতীয় সংহতি এবং জাতীয় ন্যায়বিধানে অধিক কাজ করেছেন।...বাস্তবিকই তিনি, যে-কথা তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে, তাই ছিলেন : 'জাতির বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আবির্ভূত বিরাট মানসিক ও নৈতিক শক্তি।' তাঁর জীবন এবং কীর্তি ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃত, তা ভারতের বিজয়ী আত্মঘোষণা।"

"ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের অগ্রনেতা" বলে কথিত ডঃ যদুনাথ সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : "নিবেদিতা ভারতীয় জীবন ও চিন্তার চূড়ান্ত ব্যাখ্যাতা।"২৩ যদুনাথ নিবেদিতার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। ইতিহাস রচনার কালে তিনি নিবেদিতার এই নির্দেশ-বাক্যকে শিরোধার্য করেছিলেন : "কদাপি বিদেশীর কাছে পতাকা নামাবে না। জীবনের যে-অংশেই কাজ করো না কেন, সেখানে অগ্রণী হবার চেষ্টা করবে ; বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাছে মাথা না নামাতে, বিদেশী নমুনার নকলনবিশি না করতে, চেষ্টা করবে।"২৪ সবিশেষ তথ্যনিষ্ঠ ঐ ঐতিহাসিক, যাঁর তথ্য-সতর্কতা প্রবাদবাক্যের মতো—তিনি অপরপক্ষে নিবেদিতার মধ্যে "ঐতিহাসিক সত্য বিষয়ে অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টিমূলক বোধশক্তি" দেখে মুগ্ধ না হয়ে প্যারেন নি। এমনকি এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিদিত ক্ষমতার চেয়ে অধিক ক্ষমতা নিবেদিতার মধ্যে দেখেছেন, যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছিলেন। যদুনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"নিবেদিতা—স্যার জে সি বোস এবং ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় অবস্থান করেছিলেন। [অক্টোবর ১৯০৪]। ভারতীয় শাস্ত্র, শিল্প, লোকগাথা ও সংস্কৃতি-বিষয়ে তাঁর অন্তর্ভেদী ব্যাখ্যার শক্তিতে চমকিত হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার এই ক্ষমতার সবিশেষ প্রশংসা করেন। কবির নিজস্ব সুন্দর প্রকাশক্ষমতা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তিনি বলেছিলেন, নিবেদিতা বস্তুর অন্তর্দেশে সরাসরি পৌঁছে যাবার ক্ষমতা ধরেন এবং তাদের চমৎকারভাবে উদ্ঘাটনও করেন।"২৫

প্রত্নতত্ত্বে নিবেদিতার ছিল অপরিসীম আগ্রহ, তাকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চাইতেন। প্রত্নতত্ত্বে তাঁর এই আকর্ষণের মূলে ছিল জাতীয় ইতিহাসকে পুনর্গঠিত করার এবং বস্তুভিত্তিতে জাতীয় আত্মমর্যাদাসৃষ্টির অভিপ্রায়। নিবেদিতার এই মনোভাবের বিষয়ে যদুনাথ সরকার অনেকবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একেবারে জীবনপ্রান্তে পৌঁছেও তিনি বলেছেন : "নিজ সামর্থ্যে বিশ্বাস থেকেই বেরিয়ে আসে জাতির মূল শক্তি—আর ঐ বিশ্বাস পূর্বপুরুষদের গুণগৌরব সম্বন্ধে প্রত্যয় থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয়, কারণ সেখান থেকে মেলে এই আশ্বাস—অতীতে সে যা করতে পেরেছে, ভবিষ্যতেও সে তা করতে সমর্থ। এই কারণেই নিবেদিতা প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা করতেন ও আমাদের তা করতে প্রণোদিত করতেন। সে গৌরবের বস্তু কেবল অধ্যাত্মসংস্কৃতিতে আবদ্ধ নয়—তা একই সঙ্গে চারু ও কারুশিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য।"২৬

---

২৩ মডার্ন রিভিউ, মে, ১৯১০।

২৪ মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর, ১৯১১।

২৫ যদুনাথ সরকার, 'রেমিনিসেনসেস অব সিস্টার নিবেদিতা'; প্রবুদ্ধ ভারত; জুলাই, ১৯৪৩।

২৬ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার বুলেটিন, নভেম্বর, ১৯৫২।

নিবেদিতার অভিপ্রায় না বুঝে যাঁরা তাঁর ইতিহাস-পুনরুদ্ধারের চেষ্টাকে রক্ষণশীলতা বলে লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যদুনাথ সরকার দৃঢ় প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেন নি। একাধিকবার সেকাজ তিনি করেছেন। ১৯১১ সালেই লিখেছিলেন: "যাঁরা বলেন তিনি প্রতিটি হিন্দু কুসংস্কারের অন্ধ সমর্থক ছিলেন, আমাদের দেশের বর্তমান সমাজব্যবস্থার ধ্বজাধারী ছিলেন, তাঁরা ভগিনী নিবেদিতাকে চেনেন না।"২৭ পরবর্তীকালেও ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে অনুরূপ অজ্ঞতার চর্চা দেখে যদুনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় এক রচনায় (বেদান্ত কেশরীর নভেম্বর, ১৯২৭ সংখ্যায় উৎকলিত) তিনি—১৯০২ সালে বাঁকিপুরে (পাটনা) হিন্দু স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে নিবেদিতা কিভাবে নিছক অতীতবিলাসীদের "অপ্রিয় কিন্তু অতীব প্রয়োজনীয় সত্য" শুনিয়েছিলেন—তার বিবরণ দিয়েছেন। নিবেদিতা ওখানে তরুণদের দর্শনচর্চা অপেক্ষা বিজ্ঞানচর্চায় অধিক নিয়োজিত হতে প্ররোচিত করেছিলেন। "আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ঐতিহাসিক গবেষণায় মনপ্রাণ অর্পণ ক'রে অগ্রসর হও—" নিবেদিতা তরুণদের বলেন। যদুনাথ আরও বলেছেন: "নিবেদিতা ভারতের অতীত বা বর্তমানের অন্ধ স্তাবক ছিলেন না।...হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের কাছ থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন—আধুনিক যুগপ্রয়োজনকে কদাপি ভোলেন নি। গুপ্ত রহস্যের সন্ধানী তিনি ছিলেন না, এবং যে-কোনো অতীত ব্যাপারের পক্ষে ওকালতি করেন নি। বিবেকানন্দ আমাদের কাছে প্রচার করেছেন: আধুনিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সঙ্গে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার কোনো বিরোধ নেই—নিবেদিতা প্রখরভাবে সেই সত্য গ্রহণ করেছিলেন।" যদুনাথ তাঁর মন্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট তথ্যযোজনা করেছেন। তার একটি হল, বুদ্ধগয়ার মোহন্ত যখন ১৯০৪ সালে জ্ঞানবিস্তারের জন্য কয়েকটি অধ্যাপক পদসৃষ্টিতে অর্থদান করতে চান, তখন "নিবেদিতা তাঁকে সংস্কৃত বা দর্শনশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন অপেক্ষা উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে তাগিদ দেন। সংস্কৃতশিক্ষা বা দর্শনশিক্ষার সুযোগের অভাব দেশে নেই।"২৮

[নিবেদিতা একগুঁয়ে অতীতপ্রীতির সমর্থক ছিলেন না। আনন্দ কুমারস্বামীর জেদী অতীতপ্রীতি বিষয়ে নিবেদিতার কঠোর মন্তব্য আমরা পরবর্তী খণ্ডে উপস্থিত করব।]

কেবল যদুনাথ সরকার নন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও এক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন: "একথা যেন মনে না করা হয়, নিবেদিতা প্রচলিত অর্থে রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন।" নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতা, সমুদ্রযাত্রা, নিষিদ্ধ আহার প্রভৃতি ব্যাপারে নিবেদিতার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ ক'রে রামানন্দ নিজ কথার সমর্থন করেছিলেন।২৯ স্যার রাসবিহারী ঘোষ বলেছেন: "নিঃসন্দেহে তিনি আদর্শবাদী কিন্তু অলস স্বপ্নবিলাসী নন। নিবেদিতার মতে, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে নাগরিক আদর্শসমন্বিত একজন ঝাড়ুদার, একজন আত্মপর ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক ভালো নাগরিক।"৩০ এফ আর আলেকজাণ্ডার জানিয়েছেন: "ভগিনী নিবেদিতার দাবি—প্রগতির পথরোধ

২৭ মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর, ১৯১১।

২৮ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার বুলেটিন, নভেম্বর, ১৯৫২।

২৯ মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর, ১৯১১।

৩০ প্রবুদ্ধ ভারত, মে, ১৯১২।

করেছে বা করতে পারে এমন জরাগ্রস্ত সকল রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে...পৃথিবীর আস্তাকুঁড়ে বিসর্জন দিতে হবে।"৩১

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা কিছু পরেই বিস্তারিতভাবে করব। সেখানে দেখাবার চেষ্টা করব—প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অপেক্ষা (প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন নি তা নয়) ঐ আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তাভিত্তি নির্মাণের কাজকে তিনি কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি। ভারতীয় জাতীয়তার যে-কল্পনা তিনি করেছিলেন, তা কেবল হিন্দুর নয়—হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানসহ সকল ভারতবাসীর। ভারতীয় মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের কথা আমরা যথাস্থানে জানাবো। এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নানামুখিতা, নবভারত গঠনে তাঁর ক্রিয়াশীল মনন-নেতৃত্বের দিকটির প্রতিই অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেবল ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব নয়, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ভারতীয় মহলে তো নিশ্চয়ই ইউরোপীয় মহলে পর্যন্ত স্বীকৃত ছিল।

সেকালের এক প্রধান সোসিওলজিস্ট প্যাট্রিক গেডেস নিবেদিতার মরণোত্তর গ্রন্থ "স্টাডিজ ফ্রম্ অ্যান ইস্টার্ন হোম"-এর পরিশিষ্টে সংযোজিত একটি রচনায়, এবং "ইউরোপিয়ান পেপারস্" নামক গ্রন্থভুক্ত মন্তব্যে, ভারতীয় সমাজতত্ত্বে নিবেদিতার গভীর জ্ঞানের কথা বলেছেন। (গেডেস-প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে)। এফ আর আলেকজাণ্ডার লিখেছেন: "পাশ্চাত্যের অগ্রণী সোসিওলজিস্টরা নিবেদিতাকে নিজেদের সমতুল্য বলে স্বীকার করতেন। পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের মতোই নিবেদিতা জাতিগঠন বিষয়ে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর রচনা দেখিয়ে দেয়—বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠীগুলি সমগ্র জাতিদেহে কিভাবে সমন্বিত হবে, তিনি তারই দ্রষ্টা।"৩২

নিবেদিতার বন্ধু এস কে র‍্যাটক্লিফ স্বয়ং সোসিওলজিস্ট; বেশ কিছুদিন ইংলণ্ডের সোসিওলজিক্যাল রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক; সমাজবিজ্ঞানমূলক বিষয়ে ইংলণ্ড আমেরিকায় সুপরিচিত বক্তা—তিনি ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত 'ফার্স্ট ইউনিভার্সাল রেসেস্ কংগ্রেস'-এর অন্যতম কর্মকর্তা হিসাবে নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—"ভারতীয় নারীর বর্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে। নিবেদিতা ঐ বিষয়ে সুলিখিত একটি রচনা পাঠান যা নানা মহলে প্রশংসিত হয়। যেমন ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া পত্রিকা লেখে: "এই রচনাটি 'আন্তঃজাতি সমস্যা' শিরোনামার অধীনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থ সৃষ্টি, অধিকন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, সবচেয়ে সাবলীল স্বচ্ছন্দ রচনা।"

ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার অগস্ট ১৯১১ সংখ্যায় মিস অ্যানী স্মিথ "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি ইউনিভার্সাল রেসেস্ কংগ্রেস" নামক প্রবন্ধে লেখেন: "সিস্টার নিবেদিতার লেখাটি অত্যন্ত মূল্যবান সৃষ্টি। এটি দেখিয়ে দেয়—নাগরিক ও পারিবারিক আদর্শ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নারীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আরও দেখা যায়, এক স্থানের নারী অন্য স্থানের নারীদের কাছ থেকে কিভাবে কিছু না কিছু গ্রহণ করছে।"৩৩

---

৩১ মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি, ১৯১২।

৩২ মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি, ১৯১২।

৩৩ নিবেদিতা উক্ত কংগ্রেসে উপস্থিত হতে পারেন নি, কিন্তু অ্যানী বেশান্ত উপস্থিত

নিবেদিতার চিঠিতে ও রচনায় সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানীদের ভূরিভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্যাতনামা পজিটিভিস্ট ও সোসিওলজিস্ট এস এইচ সুইনি লণ্ডনের 'পজিটিভিস্ট রিভিউ' পত্রিকার নিবেদিতার দেহান্তের পরে লেখেন (ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় জানুয়ারি ১৯১২ সংখ্যায় উদ্ধৃত) : "নিবেদিতা অতীতের গুপ্ত রহস্যবাদী ছিলেন না। সমগ্র মানবজাতিকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান গ্রহণ করতে হবে, এই ছিল তাঁর ধারণা। কোমত্ এবং লা প্লে-র অনুশীলন তিনি করেছিলেন, সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে ভারতীয় সমস্যার বিচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।...ভারতের কাছে যেমন তিনি প্রেরণার উৎস হয়েছেন, তেমনি তিনি পাশ্চাত্ত্যের কাছে ভারতের ব্যাখ্যাতা। তাঁর গ্রন্থ 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ'-এর মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় গৃহসংসারের সৌন্দর্যদর্শনের শিক্ষা, তৎসহ...ভারতীয় নারী-মর্যাদাদর্শনের শিক্ষা, আমাদের দিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে ভারতীয় দুর্ভিক্ষের উপরে রচিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাঁর শক্তি, স্বচ্ছন্দ রচনাক্ষমতা এবং অন্তর্দৃষ্টির চমৎকার নমুনা মেলে।"

নিবেদিতার 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধারক স্তম্ভ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের লেখকগণ গ্রন্থটির সে মর্যাদা স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্ত্য সমাদরের কিছু উল্লেখ পরে করব, ভারতীয় মহলও যে তাঁর সমাজবিজ্ঞানগত রচনাদির মূল্য সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত ছিলেন তা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় দেখা যায়। রামানন্দ লিখেছেন : "সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির ব্যাপারে তিনি শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট চিন্তাবিৎ।...তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করে লিখতে হবে।"৩৪ মরাঠা পত্রিকায় লেখা হয় : "আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের উপরে প্রভূত আলোকসম্পাত করে তিনি বহু উপকার করেছেন।"৩৫ প্রবুদ্ধ ভারতেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয় : "নিবেদিতার 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' এই দেশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যদেশের ধারণার বহুলাংশে পুনর্গঠন করেছে। এই বইটি নিঃসন্দেহে

ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিবেদিতার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন, তার দ্বারা নিবেদিতা ও অন্যান্যের মনে কৌতুক ও বিরক্তির সৃষ্টি করেন। এসকল বিষয়ে অল্পবিস্তর উল্লেখ নিবেদিতার চিঠিতে ও সমকালীন পত্রপত্রিকায় মেলে। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে প্রবন্ধ পড়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিখ্যাত দার্শনিক-পণ্ডিত, নিবেদিতার বন্ধু ও গুণগ্রাহী, তবু ওঁর উদ্দিষ্ট বিষয়টিতে ওঁর অধিকার সম্বন্ধে নিবেদিতা সন্দিহান ছিলেন। র‍্যাটক্লিফকে তিনি ১৪ অগস্ট ১৯১০ লিখেছিলেন : "আমি দেখে একটু দুঃখবোধ করছি যে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে 'রেস্, ট্রাইব অ্যাণ্ড নেশন' বিষয়টি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়দের কাছে সমাজবিজ্ঞান এতই অপরিচিত বিষয় যে, আমার আশঙ্কা হয়, ঐ তিনটি বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় সুদূরপরাহত হয়ে দাঁড়াবে।" অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে নিবেদিতা অতঃপর বলেছিলেন : "হিন্দুরা 'রেস্' কাকে বলে জানে ; মুসলমানেরা জানে 'ট্রাইব'। কিন্তু আধুনিক ইউরোপই কেবল, তার মধ্যে বিশেষ-ভাবে ফরাসিরা, পরবর্তী মাপে আইরিশ কিংবা পোলরা, পৃথিবীকে 'নেশন' সম্বন্ধে ধারণা দান করতে সমর্থ।"

৩৪ মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর, ১৯১১।

৩৫ মরাঠা, ১৫ অক্টোবর, ১৯১১।

ভবিষ্যতের ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যগ্রন্থ বিবেচিত হবে।"৩৬

॥ ৪ ॥ আলাপ-আলোচনায় ব্যাপক চেতনাসৃষ্টির প্রয়াস : অন্যের গ্রন্থরচনায় সাহায্য

কেবল লেখায় নয়, সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনাতেও নিবেদিতা অজস্র সময় ব্যয় করে সমাগত মানুষদের মধ্যে ব্যাপক চিন্তা ও চেতনাসৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকতেন। তার কিছু বিবরণ এই প্রকার :

"তাঁর বাড়ি চমৎকার এক মিলনক্ষেত্র।...আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আর কোথাও এত সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ছিল না। এখানে [গভর্নর জেনারেলের] কাউন্সিলের সদস্যগণের, সেইসঙ্গে কলকাতা ও বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের নেতৃগণের সাক্ষাৎ মেলে যাঁদের নাম ও কার্যের সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রচারিত ; ভারতীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বক্তা, সাংবাদিক, ছাত্র, প্রায়শঃ রামকৃষ্ণ-সংঘের কোনো পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, মাঝে-মধ্যে ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিত, এবং অবিরত দূর প্রদেশ-সমূহের ধর্মনেতা বা জননেতা হাজির। কিছুসময় এক অননুকরণীয় বাঙালী সম্পাদক [অমৃতবাজারের মতিলাল ঘোষ] খুবই আসা-যাওয়া করতেন। ধারালো উক্তি, কাষ্ঠহাসি, মর্মভেদী বিদ্রূপে ভরা ঐ মানুষটিকে বিচিত্র আনন্দের সঙ্গে স্মরণ হয়।...মনে পড়ে, সম্ভবতঃ ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে মিঃ উইলিয়ম জেনিংস ও তাঁর পত্নীকে...হাজির করেছিলাম বাগবাজারে [নিবেদিতার বাড়িতে] বিশেষরকম আনন্দপূর্ণ এক প্রাতরাশের আসরে।"৩৭

নিবেদিতার আসরে যাঁরা আসতেন, তাঁদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়ে আর এক সাংবাদিক-লেখক বলেছেন : "তাঁর কথোপকথন ভাবসমৃদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, বিচারকের উক্তির মতো সুস্পষ্ট—তা শিল্প, সাহিত্য, এমনকি বিজ্ঞান বিষয়ে নূতন আলোকসম্পাত করত ; ভারতীয় জাতীয়তার সম্পর্কে তাঁর বলিষ্ঠ ও আগ্নেয় অভিলাষকে উদ্‌ঘাটিত করে দিত।"৩৮

নিবেদিতার দিনচিত্রের আর একটি বিবরণ :

"একেবারে প্রভাতকাল থেকে উত্তীর্ণ-সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে দেখা যেত তিনি কঠোর পরিশ্রমে নিমগ্ন—হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম, শিল্প, দর্শনের উপরে...যদি তা জাতীয় চৈতন্যসৃষ্টির প্রয়োজনে লাগে।...তাঁর কথা শুনতে-শুনতে মনে হত—ঐসব মুখের কথাই তো সাহিত্য।...দেখা যেত, তাঁর আলোকময় মানসিক শক্তির দ্বারা শ্রোতা এমন-এক জগতে উত্তোলিত হয়েছে যেখানে আদর্শে ও বাস্তবতায় কোনো পার্থক্য নেই. যেখানে চিন্তাই হল শক্তির উৎস। তাঁর মনস্বিতার অন্তর্ভেদী শক্তি বস্তুতঃপক্ষে তাঁর অধ্যাত্মদর্শনের সমতুল্য ব্যাপার।"৩৯

৩৬ প্রবুদ্ধ ভারত, নভেম্বর, ১৯১১।
৩৭ মডার্ন রিভিউ, ডিসেম্বর, ১৯১১।
৩৮ এম্পায়ার ; অমৃতবাজারে উদ্ধৃত, ২৬ অক্টোবর, ১৯১১।
৩৯ প্রবুদ্ধ ভারত, নভেম্বর, ১৯১১।

লখনৌ অ্যাডভোকেটে লেখা হয়েছিল : "কলকাতা বোসপাড়া লেনে তাঁর বাসস্থান ছিল ভারতের উন্নয়নে ব্রতী মানুষদের আকর্ষণকেন্দ্র।"৪০

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন।"৪১ যাঁরা সেই দান নিতে আসতেন তাঁদের মধ্যে কেবল সেকালের যশস্বী ব্যক্তিরাই নন, উদীয়মান লেখক এবং তরুণ রাজনৈতিক কর্মীরাও ছিলেন। "সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী লেখকের পর লেখককে তিনি সাহায্য করে গেছেন ; সাহায্য করেছেন বিজ্ঞান, শিল্প বা অন্য বিষয়ের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের।"৪২ কেবল জগদীশচন্দ্র কিংবা ওকাকুরা কিংবা হ্যাভেলের গ্রন্থরচনায় সাহায্য করাই নয়, তরুণতর যদুনাথ সরকার, কিংবা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরাও সে সাহায্য পেয়েছেন। লিজেল রেমঁ ও জ্যা এবুর'র সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিনয় সরকার বলেছিলেন : "নিবেদিতা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে সাহায্য করেন। রাধাকুমুদের বই 'ইণ্ডিয়ান শিপিং'—ভারতে এ-জাতীয় প্রথম বই। নিবেদিতা তার পুরো পাণ্ডুলিপি পরিমার্জিত করে দেন।"৪৩ একই কথা জানিয়েছেন রাধাকুমুদের পিসতুতো ভাই, বিখ্যাত শিল্পবেত্তা অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও সি গাঙ্গুলি)। তিনি লিখেছেন : "ভগিনী নিবেদিতার দ্বারা রাধাকুমুদ নানাদিকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভারত-ইতিহাসের অজানা সব অধ্যায় আবিষ্কার, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের জন্য কর্মপ্রেরণা—সবই নিবেদিতার প্রভাবের ফল।"৪৪ বিনয় সরকার অপরের উপর নিবেদিতার প্রভাবের কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের লেখায় নিবেদিতার সাহায্যের কথা বলেন নি, যে-বিষয়ে সংবাদ অর্ধেন্দ্রকুমার দিয়েছেন।৪৫ রাধাকুমুদকে লেখা নিবেদিতার ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬, চিঠি থেকে দেখা যায়, তিনি কিভাবে রাধাকুমুদকে গবেষণার ব্যাপারে নির্দেশাদি দিতেন। এই চিঠিটিকে আগ্রহী তরুণ গবেষকদের কাছে লেখা নিবেদিতার অভ্যস্ত পত্রের একটি নমুনা বলা যায়। গবেষকরা কিভাবে সর্বদাই সত্যবদ্ধ থাকবেন সে-বিষয়ে নিবেদিতা বলেছেন : "স্মরণ রেখো, সত্য সর্বতোভাবে উন্মোচিত হতে পারে কেবল বুদ্ধিযোগে নয়, হৃদয়যোগেও, এবং প্রতিজ্ঞাযোগে।" "প্রতিটি সত্যকে যাচাই করবে, প্রতিটি ভাবকে পরীক্ষা করে নেবে।" সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে নিবেদিতার নির্দেশ : "ব্যক্তিগত, সমাজগত বা মতবাদগত বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে না।" অন্ধ অতীতপ্রীতি, সেইসঙ্গে পূর্বপুরুষদের সবজান্তা বলে ধরে নেবার মনোভাব থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। কেন মানুষ অতীতকে সম্মান করবে, তার মর্ম তিনি এইভাবে উপস্থিত করেছিলেন : "অতীতের দ্বারা অনুধাবন করো

৪০ প্রবুদ্ধ ভারত, নভেম্বর, ১৯১১।

৪১ রবীন্দ্রনাথ, 'ভগিনী নিবেদিতা', "পরিচয়।"।

৪২ প্রবুদ্ধ ভারত, নভেম্বর, ১৯১১।

৪৩ রেমঁ-সংগ্রহ (বর্তমান লেখকের কাছে রক্ষিত)।

৪৪ অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা', ৩৩।

৪৫ অর্ধেন্দ্রকুমার লিখেছেন : "নিবেদিতা বিনয় সরকারকে সামাজিক ইতিহাস রচনায় পরিচালিত করেছিলেন। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কেও তিনি প্রাচীন ভারতের নৌবহর ও নৌবাণিজ্য বিষয়ে সন্ধানাদি করায় অনুপ্রাণিত করেন।" [ভগিনী নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১ম খণ্ড]

বর্তমানকে—ভবিষ্যৎকে জয় করবার জন্য।" নিবেদিতার মতে, আধুনিক ভাবচেতনাকে আত্মসাৎ করতে হলে ভারতের প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞান, বিশ্ববোধযুক্ত ভারতীয় ইতিহাস, অর্থাৎ সামগ্রিক ভৌগোলিক বোধ। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপস্থাপিত তথ্য ও সিদ্ধান্তকে অভ্রান্তবোধে অনুসরণ করতে নিষেধ করেও, তিনি তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। রাধাকুমুদের বিশেষ চর্চার দুটি বস্তু—ইতিহাস ও অর্থনীতি—এই দুইক্ষেত্রে কোন্-কোন্ বই পড়তে হবে তার উল্লেখ করার পরে, নিবেদিতা পরিষ্কার লিখেছিলেন : "ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখার কালেও...আমাদের প্রথম প্রয়োজন সোসিওলজিতে বিশেষজ্ঞতা।" সোসিওলজিতে জড়িত আছে ইতিহাস ও অর্থনীতি, ঐ দুটি বিষয়ে রাধাকুমুদের কিছু অধিকার ছিল, তাই নিবেদিতা তাঁকে সমাজবিজ্ঞানচর্চায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন—এইসূত্রে "আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের রাজা প্রিন্স ক্রপটকিন"-এর বই পড়তে তাগিদ দেন। ইউরোপে কোমত্ থেকে কিভাবে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে, তার প্রসঙ্গ তিনি তুলেছিলেন। সমস্ত চিঠিটির মধ্যে নিবেদিতা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান চাই ; অখণ্ড মনোনিবেশ ছাড়া জ্ঞানচর্চা হয় না ; ভারতবর্ষের মূলগত সত্যকে জানতে হবে, গ্রহণ করতে হবে আদর্শকে, সর্বোপরি মনে রাখতে হবে—যে-ভারতবাসী কয়েক হাজার বছর আগে বিরাট সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল, সেই ভারতবাসীই এখনো বর্তমান। দু'হাজার বছরের প্রাচীন সাঁচীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখার কালে নিবেদিতার মুগ্ধতা লক্ষ্য করে জনৈক মিশর-প্রত্যাবৃত্ত মহিলা তাঁকে চার হাজার বছরের প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা তাঁকে বলেন : "দু'হাজার বছর নিয়ে আমার ব্যস্ততা নয়। সাঁচীও প্রস্তরস্তূপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সাঁচী তৈরী করেছে যে-শক্তি, তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে এখনো বর্তমান।"

এই পত্রটি উপস্থিত করতে গিয়ে রাধাকুমুদ বহু মানুষের উপরে নিবেদিতার "প্রভাব ও প্রেরণার" কথা বলেছিলেন। "নিবেদিতার জীবনকাহিনী," রাধাকুমুদের মতে, "তাঁর বরণ করা মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য বৎসরের পর বৎসর দেহ-মন নিংড়ানো পরিশ্রমের কাহিনী।" "সমুচ্চ আদর্শের রূপায়ণে নিয়োজিত সেই জীবনে যে-ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, তা যে-কোনো যুগে বা দেশে বিরল ব্যাপার।" রাধাকুমুদ মনে করেছেন, তাঁকে লেখা এই পত্রটি—"মহীয়সী ভগিনীর জীবন ও কার্যাবলীকে সমাচ্ছন্ন ক'রে বিরাজমান ছিল যে-সৎ-চেতনা—তারই আংশিক প্রকাশ।"৪৬

কেবল রাধাকুমুদ কেন, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন আমেরিকায় পলাতক জীবন যাপন করছেন, তখন তাঁর পড়াশোনার সিলেবাস নিবেদিতাই তৈরী করে দিয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ স্বয়ং তা জানিয়েছেন।৪৭ অনুরূপ কাজ নিবেদিতা অনেক যুবকের জন্যই করেছেন। জনৈক গোবিন্দ পাই তাঁর এক মালাবারি বন্ধুকে লেখা নিবেদিতার একটি পত্র মডার্ন রিভিউ পত্রিকার এপ্রিল, ১৯১২ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। গোবিন্দ পাইয়ের কাছে "ভগিনী নিবেদিতা সেই মহাপ্রাণ মানুষ যিনি বহুসংখ্যক সত্যসন্ধানীর চলার পথে আলোকবর্ষণ করেছেন।" নিবেদিতা, উল্লিখিত পত্রটিতে বলেছিলেন : "ভারতবর্ষ এখন সেই যুগে

৪৬ মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি, ১৯১২।
৪৭ 'পেট্রিয়ট-প্রফেট', ১২০। এ-বিষয়ে আরও তথ্য পরে দেব।

প্রবেশ করছে যখন তার আদর্শ হবে 'পারস্পরিক সাহায্য : আত্ম-সংগঠন : সহযোগ।'" জ্ঞান ও কর্মসাধনার কতকগুলি পথে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে, সে-বিষয়ে তিনি নানা নির্দেশ দেন। তার মধ্যে সমবায়, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, শিল্পায়ন, দেশভাষায় আধুনিক জ্ঞানদান, শারীরশিক্ষা ইত্যাদি ছিল। 'সমবায়' বলতে নিবেদিতা নিছক সমবায়-সমিতি গঠন বোঝেন নি। তিনি বলেছিলেন, তোমরা সওদাগরী অফিসের কেরানি, সরকারী কর্মচারী, রেল কর্মচারী, করদাতা, কৃষক ইত্যাদিকে নিয়ে ইউনিয়ন তৈরী ক'রে সকলকে সমবেত কর্মে উৎসাহিত করো। "অশিক্ষিত, বিচ্ছিন্ন একটি মানুষের উপর অবিচার করা সহজ কিন্তু সচেতন সংহত দশ হাজার মানুষের উপর অবিচার করা কঠিন।" এসব ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি যেসব বই পড়তে বলেছিলেন, তার মধ্যে ক্রপটকিনের 'মিউচুয়াল এইড' ছাড়াও ছিল 'আইরিশ এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন সোসাইটি পেপারস', বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর দেশগুলির কো-অপারেটিভ সংস্থার ইতিহাস, মোট্‌লের 'রাইজ অব দি ডাচ রিপাবলিক' ইত্যাদি। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন : সমবায় সমিতি যেন শেষ পর্যন্ত দান-খয়রাতি সমিতির চেহারা না ধরে। "নির্দিষ্ট ব্যাপারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য সমবেত" হওয়াই তাঁর মতে সমবায়ের উদ্দেশ্য। "সর্বোপরি, নিজেরা চিন্তা ক'রে পথ বার করো, নিজের চিন্তাকে কার্যে পরিণত করো, এবং অতীতের ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নাও।" ।

নিবেদিতা আরও বলেছিলেন, কেউ রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ হতে চাইলে তার পক্ষে অর্থনৈতিক ইতিহাস জানা অত্যাবশ্যক। ভারতের ক্ষেত্রে রমেশ দত্ত, ডিগবি, নওরোজি, পি সি রায়, রানাডে, গোখলে প্রভৃতির বইয়ের কথা তিনি বলেন। ভারতের ইতিহাসচর্চার ব্যাপারে তিনি ভূগোলচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। তারপর মানবসমাজের গঠনের বিষয় জানার জন্য স্পেনসার, টেলার, ক্লড্, লুবক ইত্যাদির বই ; প্রাচীন সাম্রাজ্যসমূহের ইতিহাস ; প্রাচীন ভারত-বিষয়ে তিলক, ফার্গুসন, কানিংহাম প্রভৃতির বই ; ম্যাকক্রিণ্ড্‌লের সংকলনসমূহ, আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের রিপোর্টসমূহও পড়তে বলেন। সেইসঙ্গে প্রয়োজন অবিরাম পরিভ্রমণ। দেশীয় ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারের কঠিন কিন্তু অত্যন্ত দরকারী বিষয়টির প্রসঙ্গে বলেন : এই ব্যাপারে চাই সহযোগিতা, চাই "সমগ্র দেশের হাজার-হাজার সেরা গ্রাজুয়েটের সাহসী ত্যাগব্রত।" "প্রতিটি মানুষকে তার অবসর থেকে কেবল কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে।" তা করলে দেশের অসীম উপকার হবে। "কোনো কিছুকে কাজে পরিণত করার চেষ্টার চেয়ে জরুরী আর কিছু নেই ; তার থেকে বেশি আলোক আর কিছুতে মিলবে না।"

নিবেদিতা শেষকালে বলেছিলেন, ফ্রেডরিক হ্যারিসনের লেখা যা-কিছু পাবে, পড়ে ফেলবে। তাতে মনোগঠনের সহায়তা হবে।৪৮

চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্বোধনকালে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার বিবরণীতেও দেখা যায়—তিনি প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কাব্য, উপন্যাস, নানা শ্রেণীর বিজ্ঞান, সোসিওলজি,

---

৪৮ মডার্ন রিভিউ, এপ্রিল, ১৯১২।

গোবিন্দ পাই অবশ্যই নিবেদিতার দ্বারা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ যুবক ছিলেন। আমরা দেখি, ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় যে ১৯১১ সংখ্যায় তিনি ইকবালের 'হিন্দুস্থান হামারা' কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করেছেন।

শিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্য, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে কোন্ ধরনের বই পড়া উচিত, তার তালিকা পেশ করেছিলেন, ব্যাখ্যাত্মক কারণসহ।৪৯

অপরের সাংস্কৃতিক রচনাবলীতে সাহায্যের কথা নিবেদিতা নিজেই একবার এক পত্রে (৮.৯.১৯০৯) বলেছিলেন : "কথা বলার সময় পর্যন্ত নেই এত ব্যস্ত। অর্ধডজন লোককে বই লিখতে সাহায্য করছি, আর এক অর্ধডজনকে পেপার লিখতে। সেইসঙ্গে স্কুল চালানো।" এঁদের অন্যতম দীনেশচন্দ্র সেন, যাঁর "হিস্টরি অব বেঙ্গলী লিটারেচর" বইয়ের সম্পাদনায় নিবেদিতার প্রভূত সাহায্য ছিল। দীনেশচন্দ্র তাঁর "ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য" গ্রন্থে সেকথা বিশেষভাবে লিখেছেন। লক্ষণীয় এই, ঐ সাহায্যের কথা তিনি লিখতে পেরেছিলেন নিবেদিতার দেহত্যাগের পরেই, কেননা নিবেদিতার দৃঢ় নিষেধ ছিল, তাঁর সাহায্যের কথা যেন গ্রন্থমধ্যে বলা না হয়। [নিবেদিতা অবশ্য ব্যক্তিগত পত্রে এই সাহায্যের কথা একাধিকবার লিখেছেন।]

নিবেদিতা কিভাবে অপরের লেখায় সাহায্য করতেন দীনেশচন্দ্রের লেখা থেকে তার একটা চমৎকার রেখাচিত্র পাওয়া যায়। দীনেশ সেনের 'নরমপন্থী' রাজনৈতিক ধারণার সম্বন্ধে 'চরমপন্থী' নিবেদিতার কোনো ধৈর্য ছিল না কিন্তু দীনেশ তাঁর কাছে 'গ্রেট', কারণ তিনি এদেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস-সন্ধানকে জীবনব্রত করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের ইংরাজি সংশোধনের জন্য নিবেদিতার কাছে যান, নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ রাজি হন, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, "ইংরাজির সংশোধন পুস্তকে অল্পই হইয়াছে—বেশির ভাগ ভাবসংশোধন।" দীনেশচন্দ্র দেখেছিলেন, "কবিতা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল।" দীনেশচন্দ্র স্বয়ং এদেশের লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত—ঐ সকল বিষয়েও নিবেদিতার অদ্ভুত জ্ঞান ও তাৎপর্য বুঝবার ক্ষমতা তাঁকে অভিভূত করেছিল। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অর্থ নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রায়ই তপ্ত বাক্য-বিনিময় হত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসহায় দীনেশ সেন দেখেছেন, "হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কথা, অথচ তাঁহারই কথা মানিয়া লইতে হইবে।" দীনেশচন্দ্র ঐ "দায়ে" পড়েছিলেন। নিবেদিতা অপরের জন্য কী করতেন, তার একটা ক্ষুদ্র নমুনা দীনেশচন্দ্রের কথাতে পেয়ে যাই :

"কোনো একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে পারিতেন না যে, উহা পরের। সেটি সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়া খাটিতেন—এই ভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্যে দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। কোনোদিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনি ও আমি ২/৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছি মাত্র। এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্ম-পর ভাবরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে একান্ত বিরোধী, কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশি দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে-আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণরূপে পাইয়াছিলাম।"

দীনেশচন্দ্র সেনকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে নিবেদিতা হয়ত তাঁর গুরুর মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সাহায্য করছেন বলে ভেবেছিলেন। বাংলা ভাষা যথেষ্ট জানতেন না বলে

---

৪৯ ইণ্ডিয়ান মিরার। লেখাটি মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

তাঁর দুঃখ ছিল। কিন্তু যেটুকু জানতেন তার দ্বারাই রামপ্রসাদ সেনের গান, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের অংশ, কিংবা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহের পরিচয় আছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা পত্রে (১০.৯.১৯১০)। "আমার কী-যে ইচ্ছা হয়, আপনি চাকরি ও অন্যান্য কাজকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে [নিবেদিতা লিখেছিলেন] বাংলায় বিজ্ঞান রচনার বিরাট কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করবেন। আমি শুনেছি, ঐ ক্ষেত্রে আপনার সৃষ্টি আপনার মাতৃভাষায় স্থায়ী দান রেখে যাবে। কী-যে প্রয়োজন ব্যাপারটির কি বলব—ওটি সম্পন্ন করা কত না উচিত।"

এইখানে এইটুকু বললেই চলবে, নিবেদিতার আত্মগোপনেচ্ছা তাঁর সাহায্যকারী ভূমিকার পুরো ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব করে তুলেছে—তার দ্বারা তিনি বহু ঋণী ব্যক্তির মৌলিকতার দাবিকে সুরক্ষিত করে গেছেন॥ অবশ্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ের স্বীকারোক্তিও আমরা পাই না তা নয়। অমৃতবাজারে (১১.১১.১৯১১) এস অমরবাণেশ্বর লিখেছিলেন : "তাঁর জীবন...সেইসকল মানুষের কৃতজ্ঞ স্মৃতিতে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছে যে-মানুষগুলির কাছে তাঁর বাক্য সান্ত্বনা ও আলোকের অফুরন্ত উৎস। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আর কখনো কোনো মানুষের জীবন তাঁর মতো সুদীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে অপরের সেবা ও সাহায্যে নিয়োজিত থাকেনি।"

॥ ৫ ॥ তরুণদের উপর বিপুল প্রভাব

তরুণদের উপর নিবেদিতার অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে এইসব তরুণেরা অনেকে রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে উঠেছেন। এঁদের একজন, আমেরিকা-প্রবাসী বিপ্লবী তারকনাথ দাস তাঁর "জাপান অ্যান্ড এশিয়া" বইটি নিবেদিতার নামে উৎসর্গ করেছেন।৫০ অন্য একজন, বিহারের রাজনৈতিক পরমেশ্বরলালের এই বিষয়ক সাক্ষ্য আমরা পরে উপস্থিত করব। ডন সোসাইটির তরুণেরা অনেকেই তাঁর প্রভাবে এসেছিলেন [প্রসঙ্গটি পরে বিশদভাবে আলোচিত হবে]। এইরকম হয়েছিল বিবেকানন্দ সোসাইটিগুলির ক্ষেত্রেও। কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটি তো তাঁরই অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি। এইসব সোসাইটি থেকে রাজনৈতিক কর্মী সংগৃহীত হত; আবার রাজনীতিতে আগ্রহী নয়, এমন যুবকদের মনোগঠন ও চরিত্রগঠনের চেষ্টাও করা হত। তরুণদের সর্বায়ত আধুনিক মনোগঠনের জন্য তিনি কী-ধরনের নির্দেশাদি দিতেন তার কিছু পরিচয় পাই তাঁর "সাজেশনস্ ফর দি ইণ্ডিয়ান বিবেকানন্দ সোসাইটিজ্" রচনার মধ্যে। "ভারতের সর্বদিকে, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতের গ্রাম ও নগরে অজস্র বিবেকানন্দ সোসাইটি" নিবেদিতা দেখেছিলেন, যেগুলি "প্রধানতঃ ছাত্রদের দ্বারা তৈরী।" এইসকল ভারতীয় ছাত্রদের বাস্তব অবস্থার কথা মনে রেখেই তিনি তাঁদের জন্য কর্মনীতি নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। লোককল্যাণকর কর্মকথা বলার পরে তিনি পড়াশোনার কথা তোলেন। বিবেকানন্দ সোসাইটির ছাত্ররা অবশ্যই বিবেকানন্দের বই পড়বে কিন্তু তারা কি কেবল ঐসব বই মুখস্থ ক'রে যাবে? তার কুফল যথেষ্ট—ঐরকম করলে, বইগুলির পিছনে

৫০ প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা, 'সিস্টার নিবেদিতা', ২৫০।

যে-মানুষটি আছেন তিনি ঢাকা পড়ে যাবেন। "অথচ ঐ মানুষটিকেই জানা তাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।" দ্বিতীয়তঃ আরও মারাত্মক বিপদ এই ঘটবে—স্বামীজীর বই হয়ে দাঁড়াবে "নতুন বন্ধন," "যে-বিবেকানন্দ অপরপক্ষে ছিলেন স্বাধীনতার অবতার। তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানের অর্থ—মুক্তির অভিজ্ঞতা লাভ। তিনি বন্ধনের অপনোদক—তাছাড়া আর কি!" স্বামীজী কিভাবে গোটা ভারতকে দর্শন করে ভারতীয় জাতীয়তাকে প্রকাশ করেছিলেন, সে-বিষয়ে আলোচনার পরে, নিবেদিতা বলেন: ছাত্ররা যেন তীর্থযাত্রীর মতো ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে—যেহেতু স্থান ও মানুষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাইই। নিবেদিতা আরও বলেন, কেবল ভারতের ইতিহাস নয়, পৃথিবীর ইতিহাস পড়ে নিতে হবে—'স্টোরিজ অব নেশনস্' সিরিজ থেকে। তিনি সোসিওলজি পড়তে বলেন—স্পেনসারের 'স্টাডি অব সোসিওলজি' এবং পূর্বে-উল্লিখিত লুবক প্রভৃতির গ্রন্থ। এইসব ও অনুরূপ কিছু বই যদি ছাত্রদের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন হয় তাহলে ড্রেপার-এর 'কনফ্লিকট্ অব দি রিলিজিয়নস্ অ্যান্ড সায়েণ্টিফিক স্পিরিটস', ফ্রেডরিক হ্যারিসন-এর 'মিনিং অব হিস্টরি', কনগ্রেভ্-এর 'ইণ্টারন্যাশান্যাল পলিসি,' মহাভারতের শান্তিপর্ব যেন অতি অবশ্য পড়া হয়। বিরাট মানুষদের জীবনী অধ্যয়নের কথাও তিনি বলেন—সর্বদেশীয় উল্লেখযোগ্য ও অধ্যয়নযোগ্য কিছু চরিত্রের নামও তিনি করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, ১৮২০-৬০ সময়ের ইতালির ইতিহাস, ১৮৬৭ সালের আগে-পরে জাপানের ইতিহাস, ফরাসি বিপ্লব, কিংবা পারস্য-গ্রীসের সংগ্রাম কাহিনী পড়ার কথা। নিবেদিতার মতে—জ্ঞানের এই বিশ্বপরিক্রমা করলে তবে বিবেকানন্দের রচনার অর্থ অধিক বোধগম্য হবে—"যে-বিবেকানন্দ আমাদের গভীরতম জিজ্ঞাসায় প্রণোদিত করেছেন, যাঁর মধ্যে সেইসকল জিজ্ঞাসার জ্যোতির্ময় উত্তর আছে।"৫১

রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রামী নিবেদিতা—চিত্তমুক্তিকে আদি-মধ্য-অন্ত্য শর্ত করেছিলেন, এটাই লক্ষণীয়। নিবেদিতার চরিত্রের এই দিকটি লক্ষ্য করলে নবজাগরণে তাঁর ভূমিকার রূপ স্পষ্টতর হবে। নিবেদিতার আবার নিষ্কর্মা মননচর্চায় তরুণদের আবদ্ধ রাখতেও চাইতেন না, তিনি তাদের কর্মের পথে ঠেলে দিতেন, এবং সে কর্ম বহুলাংশে রাজনৈতিক। তাঁর পরিধিভুক্ত তরুণেরা রাজনীতিতে জড়িত থাকায় তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের বিবরণ স্বাভাবিক কারণেই সংগৃহীত হয়নি—(আর স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন সংবাদ সংগ্রহ করা কিছুটা সম্ভব ছিল, তখন দুঃখের বিষয় এদেশে নিবেদিতা গবেষণা শুরু হয়নি ভালোভাবে; তথাপি আমরা মূল্যবান কিছু সংবাদ যে পাইনি তা নয়; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, তিরুমলাচার্য প্রভৃতির বিবরণ আমরা পরে লক্ষ্য করব)—সুতরাং এখানে নির্ভর করতে হবে সমকালীন তথ্যাভিজ্ঞদের সাক্ষ্যের উপরে—এবং স্বার্থহীন তাঁদের উক্তি। নিবেদিতার ইংরাজ বন্ধুদের নিকট থেকেই এ-বিষয়ে অধিক সংবাদ পেয়েছি (ভারতীয় ব্যাপারে এঁরা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক ছিলেন বলে)।

এস কে র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন:

"ছাত্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এবং ছাত্রদের উপর তাঁর প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—অনেকের কাছে তা অসামান্য ব্যাপার। এখানে আমি ও-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কিন্তু আমার ধারণা, এটি স্বীকৃত হবে যে, গত দশ বৎসরে [১৯০২-

৫১ নিবেদিতা রচনাবলী ৪র্থ, ৮০-৮৮।

১৯১১] বাঙালী ছাত্রদের চরিত্র ও আচরণে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে।...ভারতে তরুণদের নব জীবনবোধ, নূতন শিক্ষা এবং নব সম্ভাবনার চেতনা দেবার ক্ষেত্রে অনেক শক্তিই সক্রিয়। কিন্তু সিস্টার নিবেদিতাকে যাঁরা জানতেন...তাঁরা কেউই বোধহয় এ-কথায় সন্দেহবোধ করবেন না যে, তরুণ বাঙালীদের মধ্যে এখন সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধে অধিকতর সৌন্দর্য ও শক্তিতে পূর্ণ যে-চেতনা জেগেছে তা অপরিমেয় পরিমাণে নিবেদিতার ব্যক্তিগত প্রভাব এবং লিখিত রচনাসমূহের প্রাণাবেগ ও শক্তির দান।"৫২

ফ্রেজার রেয়ারের বক্তব্য :

"জাতীয় আন্দোলনের উপর তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে চেষ্টা করেও যথেষ্ট বলা যাবে না।... তরুণ বাংলার উপরে তাঁর প্রভাব, অনেকে যতখানি মনে করেন তার থেকেও বেশি।"৫৩

বিখ্যাত সাংবাদিক লেখক এইচ ডবলিউ নেভিনসন ১৯০৭-৮ সালে ভারতভ্রমণ ক'রে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখেন—"দি নিউ স্পিরিট ইন ইণ্ডিয়া" (যে-গ্রন্থটি এই পর্বের ঐতিহাসিকদের পক্ষে অপরিহার্য)। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন :

"তাঁর চতুর্দিকে সমবেত ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের চিন্তাশীল ও সক্রিয় অংশের উপর তাঁর প্রভাব অসাধারণ।"৫৪

নেভিনসন অবশ্য কেবল তরুণ দেশপ্রেমিকদের কথা বলেন নি, সর্বশ্রেণীর দেশ-প্রেমিকদের কথা বলেছিলেন—যা বলেছিলেন মনস্বী রাজনৈতিক নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলেও :

"তাঁর চতুর্দিকে সমবেত মানুষদের ভাব ও চিন্তার উপর তিনি সুগভীর ও সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অকুণ্ঠে জানাই, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ যাঁরা —পৃথিবীকে যাঁরা দিয়েছেন শ্রম ও জীবন—ভগিনী নিবেদিতা তাঁদেরই একজন।"৫৫

প্রবীণ স্যার রাসবিহারী ঘোষ (জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছেন) তরুণদের উপর নিবেদিতার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে চরম কথাটি বলেছেন :

"আমাদের ভগিনী যদি ভারতের মোহমায়ায় পড়ে থাকেন তাহলে আমরাও তাঁর মোহমায়ায় পড়েছিলাম। তাঁর কুহকময় ব্যক্তিত্ব আমাদের সহস্র-সহস্র তরুণকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। যদি আমাদের শুষ্ক পঞ্জরে শিহরণ জেগে থাকে, তাহলে তার কারণ—ভগিনী নিবেদিতা তার মধ্যে জীবনের শ্বাস বইয়ে দিয়েছিলেন। যদি আমাদের তরুণেরা নূতনতর, উচ্চতর, মহত্তর জীবনের জন্য অগ্নিময় বাসনায় উন্মুখ হয়, তাহলে তার

---

৫২ মডার্ন রিভিউ, ডিসেম্বর, ১৯১১।

১৯১৫ অগস্ট মাসে নিবেদিতার মরণোত্তর পুস্তক 'রিলিজন অ্যাণ্ড ধর্ম'-এর ভূমিকাতে র‍্যাটক্লিফ একই কথা লিখেছিলেন :

"ভারতীয় জীবনের সূচনাপর্ব থেকেই সিস্টার নিবেদিতা ছাত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে, বিশেষতঃ তাঁর কর্মভূমি বাংলার ছাত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। প্রতিটি গোষ্ঠীর ডাকেই তিনি সাড়া দিতেন যদি তিনি বুঝতেন যে, তাদের মধ্যে যথার্থ জিজ্ঞাসুরা আছে। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর প্রভাব দ্রুত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।"

৫৩ অমৃতবাজার, ২৬ অক্টোবর, ১৯১১।

৫৪ 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম', (অ্যাপেনডিক্স)।

৫৫ বেঙ্গলী, ২৪ মার্চ, ১৯১২।

মূলে এই নারীর কৃতিত্ব কম নয়।...যদি আমরা বর্তমানে জাতীয় জীবনের অংকুরোদ্গম লক্ষ্য করি, তাহলে তা বহুলাংশে ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষার ফল।"৫৬

॥ ৬ ॥ নিবেদিতার মূল্যায়নে ঐতিহাসিকদের অসামর্থ্য : সমকালীন সাক্ষ্যের বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বিচিত্র ঔদাসীন্য

ভরসা করি, ইতিমধ্যে যেসব তথ্য দিয়েছি তার দ্বারা কিছুটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্যার রাসবিহারী উপরে উদ্ধৃত অংশে নিছক বাগ্মিতার ঝোঁকে ছিলেন না। খুবই বিস্ময়ের কথা, দুঃখের কথাও বটে, জাতীয় আন্দোলনের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ নিবেদিতার ভূমিকাসন্ধানে গবেষণার মনোভাবকে পরিহার করেছেন। এমনকি বলা যায়, সহজে প্রাপ্তব্য তথ্য সম্বন্ধেও উপযুক্ত সচেতনতা তাঁরা দেখান নি। এইসব লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। তথ্যসংগ্রহের জন্য এ'রা গোয়েন্দা-রিপোর্টের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন এবং মিথ্যা-সৃষ্টিতে বদ্দেশ্যা-পটু বলে রাজনৈতিক মহলে একদা-ধিক্কৃত গোয়েন্দা-বিবরণীকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেন—যতক্ষণ না সেই সংবাদ তাঁদের প্রিয় মত বা ব্যক্তির স্বার্থবিরোধী হয়ে ওঠে। এ'দের কারো-কারো কাছে গোয়েন্দা-দপ্তরে নিবেদিতার বিষয়ে সংবাদ না থাকা নিবেদিতার রাজনৈতিক কীর্তি-লঘুতার অকাট্য প্রমাণ—যদিও এ'রা ভুলে যান, গোয়েন্দাকে এড়ানোও বৈপ্লবিক কৌশলের মধ্যে পড়ে, নিবেদিতা যাতে পারদর্শী ছিলেন। নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে দেখি, তিনি গোপনে কাজ করতে পারতেন, গ্রেপ্তার এড়াবার বুদ্ধি তাঁর ছিল ; তাঁর কাছে, বক্তৃতাযোগে জনগণকে কিছু সময় মাতাবার কাজ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল না নেতৃগণের এবং সক্রিয় কর্মিগণের কাছে সঠিক পথের নির্দেশ দান করা।

এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকরা আবার, অধিকতর বিস্ময়ের কথা, স্বদেশী আন্দোলনের দোষ ধরেছেন এই বলে—তা অত্যন্ত সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত হয়েছিল, জাতীয় জীবনের সৃষ্টিশীল দিকগুলিকে যথেষ্ট স্পর্শ করেনি। এদেশের জাতীয় জাগরণকে ইউরোপীয় মাপকাটিতে মাপতে গিয়ে, রেনেসাঁসের পুরো মাপ না পেয়ে, তাঁরা নৈরাশ্যবোধ করেছেন। এ'দের সাধু নৈরাশ্যের প্রতি যথোচিত নমস্কারী দেবার পরে আমরা প্রশ্ন করতে পারি—এ'রাই কেন আবার নিজেদের প্রসারিত দৃষ্টিকে সংকুচিত করলেন নিবেদিতার ব্যাপক দানের হিসাব সম্বন্ধে উদাসীন থেকে? এমনও দেখেছি, স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসলেখক নিবেদিতার জীবনী বা গ্রন্থাবলী পড়েছেন, এমন সংবাদ তাঁর পঠিত বা ব্যবহৃত গ্রন্থ-তালিকায় নেই। ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের এই ঔদাসীন্য সত্যই ঐতিহাসিক! এখনো জীবিত থাকলে এই যুগের রবীন্দ্রনাথ বা অরবিন্দ বা সুরেন্দ্রনাথ বা গোখলে তেমনই ভাবতে পারতেন!!!

সত্য ইতিহাস সত্যই কোনোদিন লেখা হয়েছে বা হওয়া সম্ভব কিনা, এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দেবার দুশ্চেষ্টা না ক'রে, পুনশ্চ সমকালীন সাক্ষ্যের সন্ধান করতে পারি। নিবেদিতার কালে উদীয়মান, পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিশেষজ্ঞ পূর্বোক্ত অর্ধেন্দ্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের (ও সি গাঙ্গুলি) কথা স্মরণ করা যাক :

৫৬ বেঙ্গলী, ২৪ মার্চ, ১৯১২।

"নিবেদিতার রচনার দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হয়নি—বাংলার এমন কোনো আধুনিক প্রয়াসের কথা বলা কঠিন হবে—তা সে সাহিত্য, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব বা প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা, যাই হোক না কেন?"৫৭

এই ধরনের স্বীকৃতি আরও আছে। ডন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক বিনয় সরকারের উক্তি এখানে স্মরণ করতে পারি :

"নিবেদিতা মানবতাবাদী, সর্বক্ষেত্রে কর্মী—দেশাত্মবোধক কার্য, শিক্ষা, রাজনীতি, জাতীয়তা, গ্রামশিল্প, ইতিহাস, নৈতিক সংস্কার, সমাজকল্যাণ, নারী-উন্নয়ন, এবং কিসে নয়! বাংলার গৌরবময় বিপ্লবের কালে (১৯০৫-১০) তরুণ বাংলার কাছে নিবেদিতার নাম যাদুমন্ত্রের তুল্য। কলকাতায় ঐকালে প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছোটবড় যে-কোনো মানুষের তিনি সহযোগী। বিবেকানন্দ আর কিছু না ক'রে যদি কেবল নিবেদিতাকে এনে ভারতীয় কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিতেন, তাহলেও তাঁর কর্মজীবন সফল ও যুগসৃষ্টিকারী, একথা বলা যেত। নিবেদিতা ভারতের জন্য বিবেকানন্দের অলৌকিক আবিষ্কার। নিবেদিতা ভারতীয় জনগণের জন্য মহাসম্পদ।"৫৮

ডেট্রইটের সাংবাদিক-লেখক এফ আর আলেকজাণ্ডার, ভারতে অবস্থান করে বিবেকানন্দের ইংরাজি জীবনী রচনা করেছিলেন এবং ভারতীয় পরিস্থিতি বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন—ভারতের নবজাগরণে নিবেদিতার ভূমিকার তিনি চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। ভারতের নবজাগরণে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর একাধিক লেখা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বেরিয়েছে। "ভারতীয় জগতের পুনর্নির্মাণে ভগিনী নিবেদিতা বিরাট স্থপতি-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ; [আলেকজাণ্ডার লিখেছেন]...তাঁর মনে পুনর্গঠনের সমগ্র কার্যাবলীর ছক দৃঢ় ও বৃহৎ রেখায় আঁকা ছিল।" "নিবেদিতার মন জটিল কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক"—একথা বলার পরে আলেকজাণ্ডার লিখেছেন : "তাঁর চিন্তা জাতীয় জাগরণের প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল, তার অনেকগুলিরই তিনি ছিলেন প্রেরণার কারণ ও উৎসমুখ।"৫৯ অন্যত্র বলেছেন : "আধুনিক ভারতের মনোগঠনের ক্ষেত্রে আর কোনো ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না যাঁর মধ্যে সমস্যার চরিত্রকে অনুধাবনের এইপ্রকার সামর্থ্য এবং কর্মের দ্বারা তার দূরীকরণের এইপ্রকার অফুরন্ত প্রাণশক্তি বর্তমান ছিল।"৬০

প্রসঙ্গশেষে উপস্থিত করছি একটি বিস্ময়োৎক্ষিপ্ত প্রশ্ন—তার উত্তর কী হবে পাঠকরাই যথেষ্ট জানেন :

"তাঁকে বর্ণনার সূত্রপাত কিভাবে করা যাবে? নারী—বন্ধু—প্রেরণাপাগল? শিল্পের—সাহিত্যের—জীবনের মধ্যে সৌন্দর্যের ব্যাকুল পূজারী? ধর্মীয় রহস্যবাদী? কিংবা অগ্নিবজ্রবাহী ব্রতধারী রাজনৈতিক? বাগ্মী—যাঁর কণ্ঠের তারে বাজত শঙ্খস্বর? কিংবা লেখিকা—ইংরাজি ভাষায় নূতন-নূতন মহৎ বাক্যরাজি সৃষ্টি ক'রে যিনি অভিভূত করতে সমর্থ ছিলেন? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবব্যাখ্যাতা—না কি পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের

---

৫৭ মডার্ন রিভিউ, মার্চ, ১৯১৫।
৫৮ প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর, ১৯৪৬।
৫৯ মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি, ১৯১২
৬০ মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর, ১৯১১।

সকল কিছুর পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রামী? আধুনিক নারী-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ দিকগুলির সতেজ সমর্থনকারী কিংবা নিজেই আদর্শ নারীত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অকলঙ্ক গরীয়সী প্রতিমা?"৬১

৬১ অমৃতবাজার, ২৬ অক্টোবর, ১৯১১। (ফ্রেজার ব্রেয়ারের রচনার উদ্ধৃতি)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য

॥ ১ ॥ ঐতিহাসিকগণ কী বলেছেন? তাঁদের সংকুচিত স্বীকৃতি কিংবা অহেতুক অস্বীকৃতি

জাতীয় আন্দোলনে, বিশেষতঃ তার বৈপ্লবিক অংশে নিবেদিতার ভূমিকার প্রসঙ্গটিই সর্বাধিক বিতর্কের বিষয়। আমরা এক্ষেত্রে যেমন কতকগুলি সহজ বিশ্বাসের সমর্থন দেখি, যা নিবেদিতার এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অবিতর্কে মেনে নিয়েছে, তেমনি অপরপক্ষে ত্রস্ত চমকের সঙ্গে লক্ষ্য করি, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মনে নিবেদিতার সম্বন্ধে যেটুকু আগ্রহ ছিল তার বড় অংশ ব্যয়িত হয়েছে তাঁর গুরুত্ব স্বীকারে নয়—গুরুত্বদানে ইচ্ছুক লেখকদের বক্তব্য খণ্ডনে!! নিবেদিতার দুর্ভাগ্য, এক্ষেত্রে তিনি 'সুবিবেচক' ঐতিহাসিকদের কাছ থেকেও সুবিচার পাননি। সুবিবেচক ঐতিহাসিক বলতে আমরা তাঁদের বুঝি যাঁরা বাংলার স্বদেশী আন্দোলন এবং ভারতের উনিশ শতকীয় ব্যাপারাদির মধ্যে গৌরবজনক বস্তুর সন্ধান পেলে তাকে বিশ্বাস করেছেন; যেমন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনিশীথরঞ্জন রায়, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, ডঃ নিমাইসাধন বসু প্রমুখেরা। অন্যদিকে আছেন কিছু ইতিহাস-লেখক যাঁরা ঐসব আন্দোলন বা জাগরণাদি নিতান্ত হিন্দু-ব্যাপার সুতরাং তুচ্ছ—এই থিয়োরীর পক্ষে তথ্যসংগ্রহে উৎসাহ দেখিয়েছেন।

অমলেশ ত্রিপাঠীর ['দি একস্ট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ, ১৮৯০-১৯১০'] অথবা নিমাইসাধন বসুর ['ইন্ডিয়ান অ্যাওকেনিং অ্যান্ড বেঙ্গল'] এ-ব্যাপারে মনোযোগের ঈষৎ অভাব আমাদের কিছু বিস্মিত করে। এঁরা যে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে থিয়োরীকে সত্য বিবেচনা না ক'রে তথ্যযোগে সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ নিজেদের লেখায় দিয়েছেন। সঙ্গতভাবেই এঁরা বিবেকানন্দের ভূমিকার বিষয়ে অল্পবিস্তর মনোযোগী। কিন্তু এঁদের লেখায় নিবেদিতার বিষয়ে উল্লেখের পরিমাণ বেশি নয়। নিমাইসাধন বিবেকানন্দ-সূত্রে নিবেদিতার নাম করেছেন। সেইসঙ্গে বলেছেন—অরবিন্দের 'ভবানী মন্দিরে'র উপরে নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' বইয়ের প্রভাব ছিল, অনুশীলন সমিতি ইত্যাদি বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে নিবেদিতার যোগ ছিল। ত্রিপাঠীও বিপ্লবীদের শক্তিবাদে এবং অরবিন্দের চিন্তায় 'কালী দি মাদার' বইয়ের প্রভাবের কথা বলেছেন, দু'একবার তথ্যপঞ্জীর মধ্যে নিবেদিতার কথা জানিয়েছেন, যাদের একটিতে তিনি প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার গ্রন্থ-অনুসরণে কয়েক লাইনে নিবেদিতার কার্যাবলীর পরিচয় দিয়েছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের নিবেদিতা-প্রসঙ্গ একটু বিস্তারিত হলেও তাতে উপযুক্ত মূল্যায়ন নেই। তিনি 'হিস্টরি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ বসু নিবেদিতার কাছে নির্দেশাদি পেয়েছেন একথা জানাবার পরে যোগ করেছেন—নিবেদিতা অনুশীলন সমিতির প্রথম বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম সদস্য

ছিলেন, ওকাকুরার বৈপ্লবিক প্রয়াসের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, তিনি বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক সাহিত্য উপহার দিয়েছিলেন, তবে স্বদেশী ডাকাতিতে তাঁর সমর্থন ছিল না। এইসব তথ্য অল্পবিস্তর পরিচিত।

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে এই কথাগুলিও যোগ করেছেন: "নিবেদিতা বিপ্লবীদের সাধারণ উপদেশদান বা প্রেরণাদানের অতিরিক্ত বৈপ্লবিক কার্যাবলীতে ঠিক কোন্ অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলা শক্ত।" ডঃ মজুমদার অবশ্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিবেদিতার দানের কথা স্বীকার করেছেন: "তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনসাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও লেখা তরুণ বঙ্গের কাছে বিরাট প্রেরণার কারণ হয়েছিল।"১ ডঃ মজুমদার এতবড় একটা কথা বললেন কিন্তু হায়, স্বদেশী আন্দোলনে সাহিত্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যান্যদের দানের তথ্যযুক্ত আলোচনা করলেও যিনি 'বিরাট প্রেরণার' কারণ তাঁর দানের সম্বন্ধে কোনো তথ্যই দিলেন না!!

ডঃ সুমিত সরকারের গ্রন্থে ("দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল") বিষয়-অনুযায়ী নিবেদিতার ভূমিকার যথোচিত মূল্যায়ন থাকা উচিত ছিল, কিন্তু দেখি, তিনি অগত্যা যেটুকু বলতে বাধ্য হয়েছেন, তারই মধ্যে সচেষ্ট ছিলেন—কিভাবে নিবেদিতা বিষয়ে অন্যান্যদের দাবি খন্ডন করা যায়। (তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ৪৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিপ্লব-আন্দোলনে অরবিন্দের "বস্তুতঃপক্ষে সহযোগী নেত্রী"-রূপে নিবেদিতাকে দাঁড় করাবার জন্য লিজেল রেম-প্রচারিত "লেজেন্ড"—যা "গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী কর্তৃক অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচারিত এবং বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত" ["মিলিটানট্ ন্যাশন্যালিজম্ ইন ইন্ডিয়া ১৮৯৭-১৯১৮" (১৯৬৬) গ্রন্থে]—সেই অসহ্য অনুচিত উদ্যমের বিরুদ্ধে সুমিত সরকার অরবিন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন [না, অরবিন্দ এক্ষেত্রে সবকথা ঠিক বলেন নি]—সেইসঙ্গে তিনি "হোম-পোলিটিক্যাল ফাইলে নিবেদিতার কার্যতঃ অনুল্লেখের" মতো অকাট্য প্রমাণ নিজের বক্তব্যের পক্ষে সোল্লাসে উপস্থিত না ক'রে পারেন নি। অবশ্য আমরা জানি, উল্লেখ না থাকাটার অনেক কারণ সম্ভবপর। আরো জানি যে, নিবেদিতার মৃত্যুর পরে চার্লস টেগার্ট নিবেদিতা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে তৎপর হয়েছিলেন। সুমিত সরকার ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তিও এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তিনি বিবেকানন্দের ভূমিকার উল্লেখেও উৎসাহহীন, এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, "এমন-কি বিবেকানন্দের প্রভাবও পরবর্তী লেখকদের দ্বারা সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত হয়েছে।" এক্ষেত্রে তিনি তথ্যসন্ধানের সামান্য প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেন নি, অথচ ঢালাও বিরোধী মন্তব্য করতে ছাড়েন নি। দেখা যায়, বিবেকানন্দের প্রভাব বিষয়ে অজস্র তথ্য সম্বন্ধে তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনবহিত থেকেছেন।

নিবেদিতার ভূমিকার মূল্যপ্রমাণে যাঁরা শ্রমসাধ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণাও, বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়টি যথাসম্ভব উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। সুস্পষ্ট প্রমাণ না পেলে কোনো কিছু বিশ্বাস করব না—এই জাতীয় আপসহীন সত্যপ্রীতিতে তাঁরা চালিত ছিলেন, এই রকমই আমি বিশ্বাস করতে চাই (আমি এই দুইজন নিবেদিতা-জীবনীকারের কাছে নানাভাবে

১ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'হিস্টরি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট' (১ম), ৩৫৮-৫৯, ৩৬৩-৬৪। অতঃপর 'মজুমদার' বলে উল্লিখিত হবে।

স্বাণী), তবু মনে হয়, বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ অস্বীকারে তাঁরা একটু বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। সেইপ্রকার বা ততোধিক উৎসাহ এ-ব্যাপারে দেখিয়েছেন হরিদাস মুখোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারই নিবেদিতার ভূমিকার বিষয়ে উপযুক্ত মর্যাদাদানে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের পুরো দুটি অধ্যায়ে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার উপরে আলোচনা আছে। তিনি "রিপোর্ট অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" থেকে ১৯০৫ বেনারস কংগ্রেসে নিবেদিতার বক্তৃতা উদ্ধৃত ক'রে, উক্ত কংগ্রেসে নিবেদিতার ভূমিকা-গুরুত্বের কথা জানিয়েছেন। নিবেদিতার "কালী দি মাদার" বইয়ের বৈপ্লবিক চরিত্র, অরবিন্দের উপর বইটির প্রভাব, ইত্যাদি কথা বলার পরে জোরের সঙ্গে বলেছেন—যাঁরা প্রমাণ করতে চান, নিবেদিতার সংগে "সশস্ত্র জাতীয়তার" সম্পর্ক ছিল না, তাঁদের সে চেষ্টা "ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।"

এইপ্রসঙ্গে পুরাতন ঐতিহাসিকদের মধ্যে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর কথা স্মরণ করতেই হয়। ইনি নিবেদিতাকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন—নিজে স্বদেশী আন্দোলন-কালের মানুষ। এঁর "স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী," "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ"—দুই বিখ্যাত বই—যাদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষাংশ ও বিশ শতকের প্রথমাংশে বাংলা ও ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সজীব বিবরণ পাওয়া যায়। অরবিন্দ-বিষয়ক পূর্বোক্ত গ্রন্থে, তৎসহ "ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে তিনি নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রচুর আলোকপাত করেছেন। লিজেল রেম'র গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যের উপরে তিনি প্রধানতঃ নির্ভর করেছেন ; তাঁর লেখায় সন-তারিখের কিছু ভ্রান্তি আছে ; তথাপি স্বীকার্য—তিনি তাঁর চিত্রবৎ রচনায় যুগটিকে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যে, পাঠকেরা সে সম্বন্ধে যথার্থ আগ্রহ বোধ করেন, যে-প্রেরণা তাঁরা অন্য গ্রন্থ থেকে পান কিনা সন্দেহ।

॥ ২ ॥ নিবেদিতার মূল্যায়নে ঐতিহাসিকদের অসুবিধার নানা কারণ : লিজেল রেম'-র নিবেদিতা-গবেষণা : মিস ম্যাকলাউডের সহায়তা

অবে ঐতিহাসিকদের অসুবিধার দিকটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। নিবেদিতার ছবি অন্তরালে সরে যাবার নানা কারণের মধ্যে এই কারণগুলিও আছে : (১) নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা যথাকালে করা যায় নি ; (২) তা যদি করা হতও তথাপি তাঁর সম্বন্ধে সকল খবর পাওয়া সম্ভব ছিল না, যেহেতু তিনি অন্তরালে থেকেই কাজ করতে চেয়েছেন, নিজ কাজের প্রচার পছন্দ করতেন না ; (৩) নিবেদিতার রাজনৈতিক কাজের এক বিশেষ অংশের, মানে বৈপ্লবিক অংশের, কাগজে বিবরণ নেই ; তিনি তাঁর পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার জন্য কিভাবে এমন ক্ষেত্রে ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে কাজ করতে হয় তা জানতেন, শেষ পর্যন্ত তিনি ধরাও পড়েন নি (ধরা পড়লে এবং কাগজে মামলার বিবরণ বেরুলে অবিলম্বে নেতা!) ; (৪) নিবেদিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়, ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, যার

ফলে পরবর্তী বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের কালে বাংলাদেশ আর তার মূল কেন্দ্র থাকেনি; এবং স্বদেশী আন্দোলন ও তার সঙ্গে যুক্ত নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহুলাংশে দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে পড়ে; রাজনৈতিক নেতৃত্ব অতঃপর মহাত্মা গান্ধীর করায়ত্ত হওয়াও আকর্ষণকেন্দ্র পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হয়েছিল; (৫) নিবেদিতা যে-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে বৃহৎ স্থান পেতে পারতেন—সেই রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা সম্পর্কে বিস্ময়কর উদারতা দেখিয়ে তাঁদের গ্রন্থাদিতে নিবেদিতাকে বিস্তারিত স্থান দিলেও, (এবং তার দ্বারাই নিবেদিতা বহুলাংশে জনচিত্তে জীবিত থেকেছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বহীন সমালোচকদের অকর্মণ্য বাক্যাড়ম্বরে নয়), সহজবোধ্য কারণে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাকে উদ্‌ঘাটিত করতে চায়নি, কারণ এই প্রতিষ্ঠানের আইনে রাজনীতিচর্চা নিষিদ্ধ এবং নিবেদিতা রাজনীতিতে নিমগ্ন হবার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, লিজেল রেম'ই নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের আলোচনায় প্রথম তরঙ্গাঘাত করেন। নিবেদিতার চিঠি ও বিভিন্ন স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করে তিনি নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন, কিন্তু যেহেতু সেগুলির উপযুক্ত তথ্যসূত্র জানান নি, এবং নিবেদিতার চিঠিগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহেই থেকে গিয়েছিল, তাই তাঁর বক্তব্য নানা মহলের সন্দেহে বিদ্ধ হয়েছে। তাঁকে অনেকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এবং তিনি বাঙালী বা ভারতবাসী নন, এমনকি ইংরাজও নন, তাই প্রতিবাদগুলির সমস্ত অংশ সম্বন্ধে অবহিত থাকতে পারেন নি। যেটুকু জেনেছিলেন তাদের সম্বন্ধে উত্তর দেবার আগ্রহও বোধ করেন নি, কারণ নিবেদিতা-গবেষণা শেষ করে তিনি অন্যতর চিন্তা-পর্বে প্রবেশ করেছিলেন। তবে তাঁর সংগ্রহের নিবেদিতা-পত্রগুলি ও অন্যান্য তথ্য বর্তমান লেখককে দেবার কালে, জিজ্ঞাসিত হয়ে, ঐসব সমালোচনার কিছু-কিছু উত্তর ব্যক্তিগত পত্রে দিয়েছিলেন।

লিজেল রেম' এইসূত্রে বিভিন্ন সময়ে আমাকে যেসব চিঠি লেখেন, তাদের থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উপস্থিত করছি। পত্রগুলির বক্তব্য অবিতর্কে গৃহীত হবে এমন মনে করি না। তবে যিনি নিবেদিতার জীবনীর উপর প্রথম ব্যাপক গবেষণা করেছেন এবং নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের গহন অংশের উপর প্রথম তীব্র আলোকসম্পাত করেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা উচিত। লিজেল রেম' লিখেছেন:

"আমি ১৯৩৪ সালে স্বামী যতীশ্বরানন্দের মধ্যবর্তিতায় মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে পরিচিত হই। স্বামী যতীশ্বরানন্দ শুনেছিলেন—জ্যা এর্‌র' এবং আমি স্বামী বিবেকানন্দের চারটি যোগগ্রন্থ ফরাসিতে অনুবাদ করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত মিস ম্যাকলাউড কয়েকবার জেনিভায় এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমরা প্রথম জ্ঞানযোগের অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম।

"মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যাবলীর বিষয়ে অনেক কাহিনী শুনেছিলাম।

"মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ভাষায় কথা বলতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসজীবনের জন্য যে-কাজ করতে পারেন নি, ভারতবর্ষে সেই কাজ সম্পাদনের জন্য নিবেদিতাকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। নিবেদিতা আইরিশ, বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে লালিত, বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনকে তিনি জানতেন। প্রিন্স ১৮৯৪ সাল থেকে

ইংলণ্ডে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। নিবেদিতা নিজে গুপ্ত সংস্থার সদস্য ছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে গুপ্ত সংস্থার কাজ করার দক্ষতার সম্বন্ধে নিবেদিতা অবহিত ছিলেন।

"১৯৩৭ সালে আমি মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে ইংলণ্ডে তাঁর স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভনের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জ্যা এব্রু'ও সঙ্গে ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড ডেস্ক খুলে চার ড্রয়ার ভর্তি নিবেদিতার চিঠি আমাদের দেখালেন। তাদের মধ্যে কতকগুলি দারুণ আগ্নেয়—বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যোগের সংবাদ সেগুলিতে ছিল। মিস ম্যাকলাউড সেগুলিকে নষ্ট ক'রে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন: 'নিবেদিতা এইসব কাজ স্বামীজীর নির্দেশে গ্রহণ করেছিলেন—ভারতে নিবেদিতার সঙ্গে অন্যান্যদের এই বিষয়ক যোগাযোগ স্বয়ং স্বামীজীই করে দিয়েছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে নিজের রাজনৈতিক কর্ম সমাধা করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন, কারণ জানতেন যে, নিবেদিতা ঐ কাজ করতে সমর্থ। লণ্ডনে যে-সব বস্তীতে নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র ছিল, সেসব জায়গায় স্বামীজী নিবেদিতার সঙ্গে গিয়েছিলেন। (শেষোক্ত সংবাদ মিসেস উইলসন ও মিঃ স্টার্ডি'র সূত্রে প্রাপ্ত)।

"আমাদের কাছে নিবেদিতার বাল্য ও যৌবনের কথা, পরিবারের কথা, বিস্তারিত বলবার জন্য নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিস ম্যাকলাউড। মিসেস উইলসন সাউথ আফ্রিকায় থাকতেন, ঘটনাক্রমে তখন তিনি ইংলণ্ডে এসেছিলেন। আমি শুনেছিলাম—মিসেস উইলসনের কাছে নিবেদিতার ডায়েরির কপি আছে যাতে ভারতে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যাবলীর খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে। অন্য একটি কপি আছে বসু-পরিবারের কাছে। তৃতীয় কপিটি পুলিশ তাঁর বাড়ি তল্লাশ করার আগে (সম্ভবতঃ আলিপুর বোমার মামলার কালে) নষ্ট করে ফেলা হয়। আমি কিন্তু কখনই নিবেদিতার ডায়েরি হাতে পাইনি। জানি না এখনো তাদের অস্তিত্ব আছে কিনা?

"মিস ম্যাকলাউড, এস কে র‍্যাটক্লিফ ও তাঁর পত্নীকেও আমাদের কাছে হাজির করিয়েছিলেন। আমরা র‍্যাটক্লিফদের সান্নিধ্যে কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। ও'রা গণেন মহারাজ, বারীন্দ্র ঘোষ, ঠাকুর পরিবারের প্রবীণ লোকজন, মডার্ণ রিভিউ-এর প্রবীণ মালিক [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়], বিনয় সরকার, বিবেকানন্দের ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেন। আমি ১৯৩৮ সালে এই সকল ব্যক্তির সঙ্গেই কলকাতায় সাক্ষাৎ করেছিলাম। প্রত্যেকেই অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটান। বারীন্দ্র ঘোষ তখনও গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতে পারি নি। তাঁর কাছ থেকে চিরকুট-বিবরণী পেয়েছি। গণেন মহারাজের মারফত চিরকুটগুলি এসেছিল। গণেন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫২ সালে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এইকালে বারীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি নিবেদিতার কথা বলতে বিশেষ ভালবাসতেন। তাঁর কাছ থেকেই আমি শুনেছিলাম—নিবেদিতা কিভাবে বিভিন্ন সমিতির ছেলেদের মধ্যে কাজ করতেন—প্রচণ্ড জেদের সঙ্গে ছেলেদের কাছে কাজ দাবি করতেন।

"ফরাসিতে আমার বই [নিবেদিতা-জীবনী] প্রকাশিত হলে তার প্রতি পৃষ্ঠা মিস ম্যাকলাউড এবং র‍্যাটক্লিফরা খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউড বলেছিলেন, 'আরও অনেক কিছু বলা যেত—বিশেষতঃ ওকাকুরা যখন ভারতে রাজনৈতিক কার্যাবলীতে লিপ্ত

ছিলেন, এবং নিবেদিতা যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও সাদারল্যাণ্ডে ভ্রমণ করে, বিদেশে রাজদ্রোহকর কাগজপত্র ছাপিয়ে, ভারতে তাদের বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে মিস ম্যাকলাউড তাঁকে দিয়ে কয়েকস্থানে সভা করিয়েছিলেন। তাছাড়া নিবেদিতা রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায়, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ছাপা বৈপ্লবিক কাগজপত্র ভারতে প্রেরণে, ব্যাপৃত ছিলেন। একাজে তিনি ভারতবর্ষ থেকে পলায়িত এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কিছু লোকের সাহায্য পেয়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে তিনি অর্থসাহায্য পেয়েছেন। (এ সংবাদ মিস ম্যাকলাউড দিয়েছেন)। একটি ব্যাপারে মিস ম্যাকলাউড প্রতারিত হন। ঐসব তরুণদের কেউ-কেউ, যারা সব সাহায্যই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল, যাতে তারা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে—যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসাপত্র করার কাজে লেগে পড়েছিল, পাশ্চাত্যের ভোগ-সুখে ডুব দিয়েছিল—আর ভারতে ফেরেনি।

"র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার বিদ্যালয়টিকে সংবাদ চলাচলের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করেছিলেন। সেখানে সিস্টার ক্রিস্টিন শিক্ষকের কাজ করছিলেন। মিস ম্যাকলাউড প্রচুর অর্থ পাঠাতেন।

"মিস ম্যাকলাউড বৈপ্লবিক কাজের জন্য নিবেদিতাকে অনেক অর্থ দিয়েছেন—এ-ব্যাপারে ওকাকুরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত। এইকালে মিস ম্যাকলাউড যে কয়েকবার জাপান গেছেন—তা অকারণে নয়।

"নিবেদিতার বিভিন্ন কাজের জন্য কিছু 'চেলা' ছিল—তারা কিন্তু পরস্পরকে চিনত না। সেই কারণেই স্বামী শঙ্করানন্দ বলতে পেরেছেন : 'নিবেদিতা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।' অপরপক্ষে গণেন মহারাজ বলেছেন : 'বারীন নিবেদিতার কাজ করতেন।'

"১৯৩৮ সালে বিবেকানন্দের ভাই [ভূপেন্দ্রনাথ] খোলাখুলি কথা বলেছেন। নিবেদিতার কাছ থেকেই তিনি সাহায্য পেয়েছেন। আমি জেনেছি যে, তিনি তখন যা বলেছিলেন, তার থেকে পরে সরে গেছেন।

"ল্যানস্‌ডাউন রোডের মিঃ রায়, (ডাঃ বি সি রায়ের ভাই) আমার বিশেষ বন্ধু—স্বামী বিবেকানন্দকে জানতেন এমন দুজন লোকের কাছে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন—ওঁরা স্বামী বিবেকানন্দের 'দেশপ্রেমগত কার্যাবলীতে' অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে ও'দের মৃত্যু হয়েছে।

"১৯৪৮-৪৯ সালে যখন আমি ১৯০২-১৯১১ পর্বের পুরাতন সাংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি দিনের পর দিন উল্টেছি—তখন সেগুলিতে নিবেদিতার লেখা বহু সম্পাদকীয় দেখেছি। সেগুলি স্বাক্ষরিত নয়—স্টাইল অনুযায়ী সেগুলিকে নিবেদিতার বলে মনে করেছি। নিবেদিতার কালে কার্যরত বাগবাজারের কিছু প্রাচীন ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেসব দিন ছিল বিপদ ও আতঙ্কের। নিবেদিতার বাড়ি থেকে লেখাগুলি ছাপবার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। নিবেদিতা বহু বিষয়ে খবর রাখতেন।

"১৯৩৮ সালে জ্যা এবর'র সঙ্গে বিনয় সরকারের সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, স্বদেশী যুগে বাড়িতে সাবান তৈরী হত, আর সেগুলি বিক্রির জন্য নিবেদিতা বাড়িতে-বাড়িতে ঘুরতেন—উদ্দেশ্য লোকজনের সঙ্গে কথা বলা। ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা স্বদেশী-বক্তৃতা করেছেন, ছেলেদের সক্রিয় কর্মে প্রণোদিত করেছেন।

"১৯৩৮ সালে আমি জেনিভায় বন্দেমাতরম অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে ছদ্মনামা

কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতা ওখানে গিয়েছিলেন। জেনিভা থেকে তাঁর লেখা একটি চিঠি আছে। ১৯৪৭ সালে অফিসটি বন্ধ হয়ে যায়।

"এস কে র‍্যাটক্লিফ এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসূত্র। র‍্যাটক্লিফের মৃত্যুর পরে আমি একতাড়া চিঠি পাই—নিবেদিতার সেই চিঠিগুলি নূতন। আমার বই শেষ হবার পরে সেগুলি পেয়েছি।"

"মিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, 'এগুলি একেবারে আগুনে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা। স্বামীজী অনেক কিছুই করেছিলেন। চন্দননগরের মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালান হয়েছে। আমি সেগুলি কিনেছি। অস্ত্রসহ একটি নৌকা ধরা পড়ে, কিন্তু তার সূত্রে কাউকে ধরা যায়নি।'

"আমরা মিস ম্যাকলাউডকে ঐসব চিঠি নষ্ট করতে দেখেছি। তিনি বললেন, এসব অতীত ইতিহাস। সে যাইহোক, একদিন ভারত স্বাধীন হবে—স্বামীজী খুশি হবেন।

"এস কে র‍্যাটক্লিফ অন্য এক সময় (জেনিভায়) আমাদের কাছে এসেছিলেন। সে সময়ে আমরা প্রধানতঃ নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিষয়েই আলোচনা করেছিলাম। র‍্যাটক্লিফ সবকিছুই জানতেন। তিনি বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে সকালে চায়ের আসরে সদস্য ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিক সেখানে যেতেন। বিভিন্ন জায়গায় নিজের চেলাদের স্থাপন ক'রে নিবেদিতা সংবাদ সংগ্রহ করতেন, সেজন্য কি ঘটছে না ঘটছে সবকিছুর সম্বন্ধেই অবহিত ছিলেন।

"নিবেদিতার বিষয়ে বলার জন্য গণেন মহারাজ বহু সময় আমার সঙ্গে কাটিয়েছেন। জ্যা এবুর' ও আমাকে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ নীলরতন সরকারের কাছে নিয়ে গেছেন।

"নিবেদিতা পি সি রায়ের কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজে 'দুর্দান্ত ও সম্ভাব্য বিপ্লবী ছেলেদের' পাঠাতেন বলে যে ঘটনার কথা আমি বলেছি—তার উৎস রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনি নিবেদিতাকে খুব ভালভাবে জানতেন। কেবল রামানন্দ নন—গণেন মহারাজও সেকথা আমাকে বলেছেন। অনুমতি না চেয়ে তলে-তলে সংগঠন করার বুদ্ধি নিবেদিতার যথেষ্টই ছিল। বিদেশী শাসনকালে সেরা কাজের জায়গা হল সরকারী জায়গাগুলি, কেননা সেখানে সন্দেহ পড়ে না। ইংলন্ডের আইরিশ বিপ্লবীদের মধ্যে এই রীতি সুপ্রচলিত।

"আমার আগ্রহ সবচেয়ে উদ্রিক্ত করেছিল একটি জিনিস—যেসব দলে নিবেদিতা কাজ করেছেন তাঁরা সকলেই নিবেদিতার বিষয়ে আংশিক আগ্রহ দেখিয়েছেন—যথা বেলুড় মঠ, শ্রীঅরবিন্দের পুরাতন সহকর্মিগণ, জগদীশচন্দ্র বসুর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, বিনয় সরকার ইত্যাদি। এ'দের দাবি—এ'দের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতেই কেবল নিবেদিতার সত্যকার আগ্রহ ছিল। আমার আয়ত্তে নিবেদিতার মূল যেসব চিঠি ছিল, তাদের তথ্য প্রতিটি গোষ্ঠীই [অংশতঃ] অস্বীকার করেছিলেন। আমার অদ্ভুত অবস্থা তখন—নিজেদের বক্তব্য সম্বন্ধে একেবারে সুনিশ্চিত ঐসব ব্যক্তিদের কথা খণ্ডন করার সাহস তখন আমার নেই!! অনুভব করেছিলাম—ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে নিবেদিতার স্থান নির্ণীত হবার জন্য কালপরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।"

॥ ৩ ॥ রেম'-র বক্তব্যের সমর্থক কিছু নজির

লিজেল রেম'র এই সকল কথার সত্যতা অবিলম্বে বা বিলম্বে সর্বতোভাবে স্বীকৃত

হবে, এমন মনে করি না, বিশেষতঃ তিনি যাঁদের সাক্ষ্যের উল্লেখ করেছেন তাঁরা যখন বর্তমানে লোকান্তরিত। তবে ঐসকল ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কিছু-কিছু নোট রেম্‌-সংগ্রহে আছে। নিবেদিতার চিঠিপত্রেও অল্পবিস্তর সমর্থক প্রমাণ আছে। সেসব কী, তা ক্রমেই এই রচনায় উদ্‌ঘাটিত হবে। তবে আপাততঃ একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করা যায়। নিবেদিতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানাগারকে বোমা তৈরীর কাজে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেছিলেন—রেম্‌'র এই বক্তব্যে আপত্তি করা হয়েছে। ও ধরনের কাজ নাকি আচার্য রায়ের বিজ্ঞানাগারে হতেই পারে না। নিবেদিতার সংস্রবের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু আচার্য রায়ের বিজ্ঞানাগার যে, বোমা তৈরীর ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে, একথা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : "বিখ্যাত রাসায়নিক এবং যথার্থ বাঙালী দেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিভাবে বোমা-তন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন তা এক বিপ্লবীর স্মৃতিকথায় বর্ণিত আছে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে তাঁর গোপন সাক্ষাৎ হয়েছিল,...এবং তিনি নিজের কয়েকজন বিশ্বস্ত ছাত্রের সাহায্যে বিস্ফোরক প্রস্তুতির ভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।"২

॥ ৪ ॥ নিবেদিতার রাজনীতি বিষয়ে র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতা-পত্রাবলীর গুরুত্ব

যাইহোক লিজেল রেম্‌'র বক্তব্যের উপর আক্রমণ এবং তার উপযুক্ত উত্তর না মেলার ফলে, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতো কিছু বিশ্বাসী লেখক ছাড়া সতর্ক লেখকদের কাছে নিবেদিতার বৈপ্লবিক ভূমিকা সন্দেহজনক অবস্থা দাঁড়াল ; ফলে নিবেদিতা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ফুটনোট-ভুক্ত হলেন বা তাও হলেন না, কারণ—ঐতিহাসিকরা অবলম্বন-রূপে রীতিমতো শক্ত জিনিস চান—আর নিবেদিতার বিষয়ে তখন একটিমাত্র অবশ্যস্বীকার্য সংবাদই আছে, তা হল—তিনি জাতীয়তা প্রচার ক'রে রাজনৈতিক কর্মীদের মনোলোকে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। আমরা অবশ্যই জানি, অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের কাছে ও-পদার্থ বায়বীয় অ-পদার্থ ছাড়া কিছু নয়!!

তবু যদি ঐতিহাসিকরা একটু মনোযোগী হয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন, অন্ততঃ তাঁরা স্যার রাসবিহারী ঘোষ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, শ্রীঅরবিন্দ, লালা লাজপত রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সমকালীন তথ্যাভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তি থেকে সূত্র গ্রহণ ক'রে সন্ধানকাজ চালাতেন, তাহলে সত্য ইতিহাস কিছুটা উদ্ধার করতে পারতেন, যা অল্পবিস্তর ক'রে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সৎ ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমরা মনে করি, নিবেদিতা সম্বন্ধে যেসব সংবাদ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে তাদের সংকলনের দ্বারাই তাঁর ঐতিহাসিক আকার কিছুটা পরিষ্কার করে নেওয়া সম্ভব। তার সঙ্গে আমরা যোগ করছি তাঁর পত্রাবলীর সংবাদ—যা ঐতিহাসিকদের পক্ষে মহাভোজ্য

---

২ Dr R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, (henceforth—"Majumdar") Vol. II (1963), 474.

নলিনীকান্ত গুপ্ত 'স্মৃতির পাতা' (১ম) গ্রন্থে লিখেছেন, নিবেদিতাকে ধরে জগদীশ বসুর ল্যাবরেটারিতে বোমার গবেষণা করার ইচ্ছা তাঁদের ছিল।

হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এখানে, যাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ উপাদান, তাই পাচ্ছি। নানা পত্রে নিবেদিতা অনেকবার বলেছেন, চিঠিতে সবকিছু খুলে বলা নিরাপদ নয়, তাই সে চেষ্টা করবেন না। অনেক সময়ে তিনি গূঢ় ভঙ্গি ও ভাষায় কথা বলেছেন, যার সকল কিছুর মর্মোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মারাত্মক বৈপ্লবিক নির্দেশাদি বুদ্ধিমান কেউ চিঠিতে লেখেও না। নিবেদিতার সকল চিঠি আমরা পেয়েছি এমনও নয়। পূর্বে উদ্ধৃত রেম-র সাক্ষ্য অনুযায়ী, মিস ম্যাকলাউড—স্বামীজী ও নিবেদিতার ঘোর রাজনৈতিক পত্রাবলী সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ নষ্ট করেছিলেন (বস্তুতঃপক্ষে অনেক পত্র আমরা খণ্ডিত আকারে পেয়েছি)। নিবেদিতার বোন বলেছেন—প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার রাজনৈতিক বিষয়ে পত্রালাপ হত৩—সেসব চিঠির একটিও আমরা পাইনি। ভারতের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে নিবেদিতার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত—কিন্তু গোখলেকে লেখা কিছু চিঠি বাদ দিলে (মডারেট গোখলেকে লেখা চিঠিতে মারাত্মক বস্তু কম থাকার কথা, তাও মনে রাখতে হবে) আমরা কিছুই পাইনি। অরবিন্দকে লেখা নিবেদিতার চিঠির অস্তিত্ব আছে কি? কিংবা তিলককে লেখা চিঠি?

এক্ষেত্রে বিরাট সম্পদ—এস কে র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার পত্রাবলী—যা বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অমূল্য উপাদান। যে-ইতিহাস লেখা হয়নি, লিখিত হবার সম্ভাবনাও কার্যতঃ ছিল না—তারই কিছু অংশ আশ্চর্যজনকভাবে এই চিঠিগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলি অনেক সময়ে সাধারণ পোস্টে যায় নি, এজেন্ট মারফত গেছে। অরবিন্দ প্রভৃতির উল্লেখ কেবল এইসব চিঠিতেই পেয়েছি। লিজেল রেম বলেছেন, আগেই দেখেছি, নিবেদিতা-জীবনী লেখার সময়ে এইসব চিঠির উপাদান সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন নি, এদের কিছু বিষয়বস্তু কেবল র‍্যাটক্লিফের মুখে শুনেছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপে শ্রীমতী রেম আমাকে জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে র‍্যাটক্লিফ চিঠিগুলি তাড়া বেঁধে তার উপর লিখে রাখেন—"ফর্ লিজেল।" র‍্যাটক্লিফের মৃত্যুর পরে সেগুলি শ্রীমতী রেম-র কাছে পাঠানো হয়, এবং তিনি আরও পরে শ্রীমৎ আনির্বাণের মারফত আমার কাছে সেগুলি পাঠিয়ে দেন।

॥ ৫ ॥ নিবেদিতার রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ নানা মন্তব্য : নিবেদিতার চরমপন্থা সম্বন্ধে সংস্কারবাদীদের তিক্ত মন্তব্য : একালীন কিছু ঐতিহাসিকের বিস্ময়কর একদেশদর্শিতা

ভারতের স্বাধীনতার আগে, চরমপন্থী রাজনীতির সঙ্গে কারো সংযোগের সংবাদ দেওয়া উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে যেমন, তেমনি বক্তার পক্ষেও নিরাপদ ছিল না। এ-বিষয়ে আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন শ্রীঅরবিন্দ। স্বাধীনতার আগে তিনি আদালতে বা অন্যত্র নিজের বৈপ্লবিক সম্পর্ক স্বীকার করেন নি; এমন-কি তাঁর মতো বিপ্লবী মক্কেলকে বাঁচাবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের মতো আইনজীবীকে তিনি আদালতে

৩ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম, পৃ. ৪২৩।

পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলবার নৈতিক অধিকার গীতা-অনুযায়ী দান করেছিলেন।৪ স্বাধীনতার আগে, চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী যখন অরবিন্দের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা উদ্বোধন পত্রিকায় লিখছিলেন, তখন গিরিজাশঙ্কর "বিশ্বস্তসূত্রে" শোনেন: "[শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন] 'আমার রাজনৈতিক জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশগুলিকে ('dark period') কেহ লেখে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। যদি কেহ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস উদ্ধার করে, সে আমার মুখের হাসি কাড়িয়া লইবে।' ('He will snatch away smile from my face.')।"৫ গিরিজাশঙ্করের আগেই কিন্তু উক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের উপরে তীব্র এবং কিছুটা বিষাক্ত আলোকপাত করেছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। সেখানে অরবিন্দ অবশ্য স্ব-নামে নন, 'ক'-বাবু নামেই পরিচায়িত। আলোচ্য প্রসঙ্গে অন্য যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায়ই অরবিন্দের প্রত্যক্ষ বিপ্লব-পরিচালনার ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছেন। অপরপক্ষে সে সংবাদ ফাঁস ক'রে প্রাণ দিয়েছিলেন নরেন্দ্র গোঁসাই। স্বাধীনতার পরে কিন্তু উল্টো ছবি। আমরা দেখি যে, পূর্বে নিশ্চুপ অরবিন্দ কিছুটা মুখ খুলে নিজের ভূমিকার উপরে অল্পাধিক আলোকপাত করেছেন।৬

সুতরাং বোধগম্য, স্বাধীনতার জন্য প্রচণ্ড বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সময়ে নিবেদিতার

---

৪ গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন:

"১৯০৮ খৃঃ অরবিন্দের বোমার মামলায় মিঃ নর্টন বলিয়াছিলেন যে, ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দ বারীন্দ্রের মনে বিপ্লবাত্মক গুপ্তসমিতির বীজ বপন করিয়া বারীনকে দিয়া গুপ্তসমিতির কাজ বাংলাদেশে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। মিঃ নর্টন ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন।...কিন্তু হইলে কি হয়, মিঃ সি আর দাশ তাঁহার অপূর্ব কৌশলপূর্ণ জবাবে এই সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।...মিঃ দাশ অরবিন্দকে ফাঁসিকাঠ হইতে বাঁচাইবার জন্যই অরবিন্দের গুপ্তসমিতির প্রথম পর্বের সত্য ইতিহাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই, মক্কেলের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এবং অরবিন্দের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের এই কার্য অরবিন্দ বহু বৎসর পরে সমর্থন করিয়াছেন। অরবিন্দ বলেন—মক্কেলকে দোষী জানিয়াও তাহার প্রাণরক্ষার জন্য কৌঁসুলীর মিথ্যা বলা কর্তব্য। "...Lawyer's to do his best for his client even if he knows him to be guilty and his defence to be a lie.' (Essays On The Gita, Vol. I, p. 50, 3rd Ed., 1937)।" [শ্রীঅরবিন্দ, ৩৫৫-৫৬]

৫ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ", (১৯৫৬), 'ভূমিকা,' পৃ. "গ"।

৬ বিমানবিহারী লিখেছেন:

"শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য স্বাধীনতার পরে তাঁর পণ্ডিচেরীর ভক্তবৃন্দকে বলেছিলেন—'যদি তিনি সহিংস বিপ্লবের ফলোৎপাদন ক্ষমতায় বিশ্বাস না করতেন, কিংবা তাকে অপছন্দ করতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয় গুপ্তসমিতিতে যোগদান করতেন না, যার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি।...প্রকাশ্যতঃ তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের উপায় হিসাবে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সেটাই একমাত্র পথ নয়; যতদিন তিনি বাংলায় ছিলেন ততদিন তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহের প্রস্তুতি হিসাবে গুপ্ত বৈপ্লবিক কাজ চালিয়ে গেছেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পদ্ধতি কার্যোদ্ধারে অসমর্থ হলে ঐ পথকে গ্রহণ করেছিলেন।" [বিমানবিহারী, ৭৭-৭৮]

ঐ সংক্রান্তি ভূমিকার কথা কেউ বিস্তারিত বলতে পারেন না। তবু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে কোনো-কোনো ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য পাই না তা নয়—যার থেকে "শব্দ-গর্ভে অর্থ আবিষ্কারে পারদর্শী ব্যক্তিরা" অনেককিছু পেয়ে যেতে পারেন।

নিবেদিতার শোকসভাতে দাঁড়িয়ে স্যার রাসবিহারী নিম্নের কথাগুলি বলেছিলেন :

"সিস্টার নিবেদিতা উঠতি যুবকদের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছেন—এমন বলা হয়েছে। হতে পারে, কিছু কাঁচা ছোকরা, জ্ঞানগম্যি হবার বয়স যাদের হয়নি—বিপথগামী হয়েছিল। এ-বিষয়ে আমি অবশ্য নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না।" ৭

এর আগে ব্রেয়ার আরও পরিষ্কারভাবে লিখেছিলেন :

"এক সংকটকালে নিবেদিতা বাংলার রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জাতীয় আন্দোলনের উপর তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব সম্বন্ধে অতিকথন সম্ভব নয়। এই প্রভাব অবশ্য যারপভাবে, না উন্মত্তভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী। তাঁর ধমনীতে স্কচ্ ও আইরিশ, উভয় রক্তধারাই প্রবাহিত ছিল, এবং তিনি স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে যে-ধরনের ইংরাজবিদ্বেষ প্রচলিত, সেইপ্রকার বা ততোধিক তীব্র আবেগের সঙ্গে ইংরাজদের ঘৃণা করতেন। যাকে বলা যায় নারীর একগুঁয়ে ঔদ্ধত্য—সেই মনোভাব নিয়ে তিনি, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যে, কোনো উজ্জ্বল দিক আছে তা মানতে গররাজি ছিলেন। দু'এক বছর আগে তিনি তাঁর ধারণা কিছুটা সংশোধন করেছিলেন [কোন্ অর্থে তা করেছিলেন, আমরা তা পরে দেখব], কিন্তু যে-সংকটক্ষণের কথা আমি বলছি, সেইকালে তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেছেন—ভারতে বৃটিশরাজ পরগাছা ছাড়া কিছু নয় ; ভারত যতক্ষণ না ঐ বিষাক্ত পরগাছাটা সজোরে টেনে উপড়ে ফেলতে পারছে ততক্ষণ সুস্থির হবে না। তিনি তাঁর এই মতামতের ফলপরিণতি সম্বন্ধে একেবারেই সন্ত্রস্ত বা সংকুচিত ছিলেন না। রক্তপাত সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণের মনোভাবের অনুরূপ ছিল তাঁর মনোভাব। এ যা বলছি, এ তো তাঁর কথাবার্তার অত্যন্ত মৃদু একটা চেহারা। অপরপক্ষে তাঁর তুল্য কোমলপ্রাণা নারী জন্মেছেন কিনা সন্দেহ।

"আমার মনে হয়, পরে তিনি বুঝতে পারেন, ভারতীয় পরিস্থিতিতে বা অন্যত্র, সহিংস পদ্ধতি নিরাময়পন্থা নয়। কিন্তু দশ বছর আগে তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারায় পূর্ণ ছিলেন—যে-বস্তু অতঃপর সমগ্র এশিয়া মহাদেশে প্রভূত অপপ্রচার লাভ করেছে। আর যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন তাকে ঢেকে রাখার মতো আত্মপ্রবঞ্চনা করা যেহেতু তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, এবং তরুণ বাংলার উপরে তাঁর প্রভাব অধিকাংশ মানুষ যা মনে করেন তার থেকে অনেক বেশি ছিল, তাই বলা যায়—পৃথিবীর সকল সংবাদপত্র যা করতে সমর্থ নয় তারো থেকে বেশি অশান্তির আবহাওয়া তিনি সৃষ্টি করেছিলেন।"

[স্থূললিপি লেখক-নির্দেশে]

সমকালে রাজনৈতিক সংবাদপত্র হিসাবে সুপরিচিত অমৃতবাজার ব্রেয়ারের লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করার সময় তার সর্বাত্মক সত্যতার বিষয়ে বলেছিলেন :

"লোকান্তরিত মহিলার [নিবেদিতার] বিষয়ে এঁর [ব্রেয়ারের] অঙ্কিত এই সুস্পষ্ট

৭ বেঙ্গলী, ২৪ মার্চ, ১৯১২।

চিত্রটি প্রতি বর্ণে সত্য। নিবেদিতার সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য যাঁদের হয়নি তাঁরা এই রচনা থেকে ওঁর বিষয়ে সঠিক ধারণা করতে পারবেন।" ৮

এলাহাবাদের বিখ্যাত রাজনৈতিক পত্রিকা লীডার, ১৫ অক্টোবর, ১৯১১ তারিখে লেখে :

"রাজনীতিতে ভগিনী নিবেদিতার ছিল চরমপন্থী মত—বোধহয় ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে তাঁর মত অতি চরম।"

নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন, মডার্ন রিভিউ-এর বিখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সতর্কভাবে নিবেদিতার রাজনীতির বিষয়ে একাধিকবার যেসব কথা বলেছেন, তাদের মধ্য থেকে নিবেদিতার রাজনীতির চেহারা কিছুটা বোঝা যায়। ১৯১১, নভেম্বর, তিনি মডার্ন রিভিউ-এ লেখেন :

"নিবেদিতা পূর্ণ জাতীয়তাবাদী।...তাঁর রাজনৈতিক মতামত সবিশেষ চরমপন্থী ও সুনির্দিষ্ট।"

পরবর্তীকালে রামানন্দ উদ্বোধন পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৩৫) আরও পরিষ্কারভাবে বলেন :

"তাঁহার রাজনৈতিক মত জানিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কিন্তু সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখিব না।"

"বিশেষ কিছু লিখিব না"—এই মন্তব্যের দ্বারা অনেক কিছু জানাবার পরে রামানন্দ লিখেছেন :

"সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে, তিনি ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসী ছিলেন। **তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্পর্কে আর একটি কথা এই বলিব যে, তিনি সকল**

---

৮ এম্পায়ার পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রেয়ারের প্রবন্ধটি অমৃতবাজারে ২৬.১০.১৯১১ তারিখে পুনর্মুদ্রিত হয়। বেঙ্গলী ও অন্যান্য কাগজেও এটি ছাপা হয়।

নিবেদিতার বিশ্বস্ত বন্ধু র‍্যাটক্লিফ, যাঁর কাছে লেখা নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে নিবেদিতার বৈপ্লবিক চরিত্র সম্বন্ধে সর্বাধিক ধারণা করতে পেরেছি—তিনি, এদেশে বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের কথা যেহেতু নানামহলে জানা ছিল তাই ইচ্ছাপূর্বক সে-ব্যাপারটিকে চুনকাম ক'রে হাজির করার চেষ্টা করেছেন—সেই ধূলিনিক্ষেপ-চেষ্টা আমরা উপভোগ করেছি বা করিনি। ১৯১১ ডিসেম্বর মডার্ন রিভিউ-এ নিবেদিতার উপরে লেখা প্রবন্ধে, ছাত্রসমাজের উপরে নিবেদিতার প্রচণ্ড প্রভাবের উল্লেখের পরেই, তিনি সামলে নিয়ে বলেছেন :

"Naturally I do not refer to those aspects of the subject ['about the great change that has come about in the character and demeanuor of the Bengali students'] which have caused disquietude among the authorities; they have nothing to do with the influence which went out, in ever-widening circles as they passed, from Bose Para Lane."

নিবেদিতার অপর ইংরাজ বন্ধু ব্রেয়ার কিন্তু নিবেদিতা প্রসঙ্গে এতখানি সাবধানতার সঙ্গে লেখেন নি। এখানে র‍্যাটক্লিফ বোধহয় নিবেদিতার স্মৃতিকে তিক্ত আক্রমণ থেকে, কিংবা নিবেদিতার কাছে যাতায়াত করতেন, এমন যুবকদের সম্ভাব্য পুলিশী সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখতে ইচ্ছা করেছিলেন।

অবস্থাতেই অহিংসার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রয়োজন-বিশেষে স্থান-বিশেষে বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ তিনি আবশ্যক মনে করিতেন। তিনি যোদ্ধৃপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন।'

রামানন্দ আরও জানিয়েছেন : রামানন্দের সম্ভাব্য গ্রেপ্তারের কথা নিবেদিতা চরমুখে শুনে রামানন্দকে সতর্ক করে দেন। এর অর্থ—নিবেদিতাকে গুপ্ত সংবাদ দেবার মতো চর ছিল। এ-বিষয়ে উল্লেখ পরেও পাব।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ তীব্র পর্বে, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৮.৮.৩৯ তারিখে লিজেল রেমঁকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা সম্বন্ধে কী বলেছেন, সেইসঙ্গে একই বিষয়ে—শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য কী—আমরা পরে দেখব।

নিবেদিতার চরমপন্থী রাজনৈতিক ধারণা রাজানুগত্যসম্পন্ন মডারেট মহলে কী ধরনের বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল, তার পরিচয় পাই পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের লেখায়—এবং সেই রচনা নিবেদিতার বিপজ্জনক ভূমিকার বিষয়ে পরোক্ষ কিন্তু পরিষ্কার স্বীকৃতি। পৃথ্বীশচন্দ্র রায়—রাজানুগত্যের বন্ধনে সন্তুষ্ট সুখী—আশঙ্কিত হয়ে দেখেছিলেন, নিবেদিতার হিন্দু-ভাব, ও উগ্র রাজনীতি ব্রাহ্মমহলে প্রবেশ ক'রে সর্বনাশ ঘটাচ্ছে!! সে আশঙ্কা তিনি তাঁর ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড্ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে উক্ত পত্রিকার নভেম্বর ১৯১১ সংখ্যায় বিস্ময়করভাবে তিক্ত এক শোকমন্তব্যে তিনি লেখেন : "দুঃখের কথা, অতীব দুঃখের কথা—এমন বিরল গুণসম্পন্ন এক নারী তাঁর জীবনকে অত্যন্ত দুষ্ট ('most mischievous') ও প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে দান করেছিলেন।" সংস্কারকদের কেউ কেউ (ক্রীশ্চান মিশনারিদের সাহচর্যে) নিবেদিতার হিন্দু ধর্ম-দর্শন-প্রীতিকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে মনে করেছিলেন। আমাদের মনে হতে পারে—পৃথ্বীশ রায়ও তাই করেছেন। কিন্তু "অত্যন্ত দুষ্ট" (বা "অনিষ্টকর") বলা হল কেন? ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে ঐ পত্রিকায় এর কিছুদিন আগে (১৯১০ জুন-জুলাই) প্রকাশিত হেমচন্দ্র সরকারের "এ লাইফ অব আনন্দমোহন বোস" গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা থেকে। উক্ত গ্রন্থে নিবেদিতার লেখা "আনন্দমোহন অ্যাণ্ড এ নেশন্ মেকার" নামে একটি বিশেষ অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই ব্যাপারটি পৃথ্বীশ রায়কে ভয়ানক র‍্যাগিয়ে দেয়। "আমরা দেখে দুঃখিত যে, মিঃ হেমচন্দ্র সরকার মিঃ বসুর সুন্দর জীবনীটির মধ্যে এই অধ্যায়টি ঢুকিয়ে দিয়েছেন, [পৃথ্বীশ রায় লেখেন] কারণ ঐ লেখাটি মিঃ বসুর স্মৃতির প্রতি গভীর অবিচার করেছে।" পৃথ্বীশ রায়ের অভিযোগ—নিবেদিতা তাঁর "হিন্দু গোঁড়ামি ও কুসংস্কার" ঐ লেখাটির মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়েছিলেন। (কী কাণ্ড! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান স্তম্ভের জীবনীতে, যা আবার জনৈক ব্রাহ্মকর্তৃক লিখিত—ঐ দুষ্কার্য!!)। কিন্তু এহো বাহ্য, আসল কথাটা এর পরেই বেরিয়ে পড়েছে : "ভগিনী নিবেদিতা তাঁর লোকান্তরিত বন্ধুর স্মৃতির প্রতি সুবিচার করেন নি, কেননা আমরা দেখি যে...তিনি বিবৃত করেছেন—আনন্দমোহন বসু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আস্থা একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তিনি সেই দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন যারা এদেশে আরও ভালো সরকার তৈরী করার জন্য ইংরাজদের কাছে আবেদন-নিবেদনে আস্থাহীন।" পৃথ্বীশ রায় নিঃসংশয়ে বলেছেন : "মিঃ এ এম বোসকে আমরা যতদূর জানি—আমরা তাঁকে তাঁর জীবনের শেষ অবধি জানতাম—কদাপি তিনি নিয়মতান্ত্রিকতাকে অবজ্ঞা করেন নি, কিংবা ভগিনী নিবেদিতা যে-রকম বলেছেন সেইভাবে তাঁর যৌবনকালের আদর্শ ত্যাগ করেন নি—সে আদর্শ হচ্ছে, আইনমাফিক অগ্রগতিতে, নীতিসংগত আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সর্বোপরি শাসন-

যন্ত্রের উন্নতির জন্য ধারাবাহিক আইনসম্মত আন্দোলনে বিশ্বাস ও আস্থা—কিন্তু কদাপি তা বর্তমান সরকারের উচ্ছেদের আদর্শ নয়।" আনন্দমোহন বসু যে "কখনই ইংলণ্ডের ন্যায়বোধে আস্থা হারান নি," তিনি যে ভারতে বৃটিশ শাসনকে কার্যতঃ দিব্য কাণ্ড মনে করতেন, সে-বিষয়ে পাঠকদের জ্ঞানোদয়ের জন্য পৃথ্বীশ রায় আনন্দমোহন বসুর রচনাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন।৯ক

আনন্দমোহন বসু স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় স্ট্রেচারে বাহিত হয়ে ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন—এ-জিনিস আমরা অনুমান করতে চাই, ব্রাহ্মসমাজের বড়ো অংশের রক্ত চঞ্চল করেছিল; কিন্তু ঐ সমাজেই একটি অংশ ছিল যারা আনন্দমোহনের উক্ত 'আনুগত্যহীনতায়' ক্রুর ক্রোধ বোধ করেছিল। নিবেদিতা ২৫ নভেম্বর, ১৯০৯, একটি চিঠিতে লিখেছেন: "তোমাকে জানাতে ভুলে গেছি, পি কে রায়রা সরকারের কাছে কোন্ ভয়ানক পরিকল্পনা দাখিল করেছেন। তাঁরা ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলের জন্য ফেডারেশন হলের জমি [সরকারের সাহায্যে] দখল করে নিতে চান!!! সরলার ব্রাদার-ইন-ল', ইনসপেকটার মুখার্জিও মনে হচ্ছে এর পিছনে আছে। ব্রাহ্মরা এতে চটে অস্থির। জমিটির দাম আমরা ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছি। ও জমি যদি আমাদের কাছ থেকে নিতেই হয়—গায়ের জোরে কেড়ে নিতে হবে।"৯খ

৯ক হেমচন্দ্র সরকারকৃত "আনন্দমোহন বোস," গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ভগিনী নিবেদিতার "আনন্দমোহন বোস অ্যাজ এ নেশন মেকার" লেখাটি থেকে অপরাধী অংশটি উদ্ধৃত করা উচিত। ঐ অংশটির আগে নিবেদিতা লিখেছিলেন, আনন্দমোহন ইংলণ্ড থেকে শিখেছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। গণতান্ত্রিকতার প্রতি তাঁর ছিল একান্ত বিশ্বাস। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে নেতৃত্ব করে তিনি তাকে ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের আবির্ভাবক্ষেত্র করেছিলেন। তিনি ক্রমেই অগ্রসর হয়েছেন—তার ফলে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে জাতীয়তায়।—

"The glory of the truth-seeker lies in openness to new truth . . . The supreme text of Mr. A. M. Bose's political life came to him on his death-bed, and he was not found wanting. Suddenly the Indian people awoke to the realisation that their future depended on themselves alone; that Nationality, not Constitutionalism, was henceforth to be their watchword, that nation-building, not political organisation, was the task before them. In that hour there was found one man, clear-eyed enough to see that the story of the past was a tale only of experiments; high-souled enough to acclaim that banner round which the armies of the future were already gathering; and by universal consent worthy to confer the chrism and *abhishek* of a new life on the Indian Nation of the dawning age."

পৃথ্বীশ রায়গণ রাজানুগত্যের প্রকোপে পড়ে বুঝতে পারেন নি, ইতিহাসে আনন্দমোহন বসুর দীর্ঘজীবন বহুলাংশে নির্ভর করেছে নিবেদিতা-কথিত আনন্দমোহনের পরিবর্তিত আকারের উপরই। ওঁরা আনন্দমোহনের যে-মৃত্যুর ব্যবস্থা করছিলেন, তার বিরোধী চেষ্টা করেছেন নিবেদিতা—একথা ওঁরা না বুঝলেও একালের মানুষ যথেষ্ট বোঝেন।

৯খ পৃথ্বীশ রায়ের নিবেদিতার প্রতি রাগের কারণ দুর্বোধ্য নয়। সে রাগ সাম্প্রদায়িক এবং

এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, নিবেদিতাকে সরকারী মহল কোন্ ক্রূর দৃষ্টিতে দেখছিল। অপরপক্ষে নিবেদিতার একই প্রকার ভূমিকার জন্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ছিলেন সম্ভ্রমে অভিভূত। স্বদেশী যুগে চরমপন্থী নেতারূপে পরিচিত লাজপত রায় ১৯০৫ সালে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎপ্রসঙ্গে লিখেছেন :

"তাঁর মুখ থেকে যে-কথা শুনেছিলাম তা কখনো ভুলব না। বৃটিশ-শাসনের সম্বন্ধে তাঁর দারুণ ঘৃণা, এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর প্রবল ভালবাসা। রাজনীতিতে তিনি মাৎসিনী-নীতির অনুসারী ছিলেন।"

রাজনৈতিক, দুইই। তিনি দেখেছেন, আনন্দমোহন বসুর অশেষ স্নেহপাত্রী এই মহিলা বসু-পরিবারে ঢুকে পড়েছেন—আনন্দমোহনের শ্যালক জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী অবলা বসু নিবেদিতার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পুত্র অরবিন্দমোহন বসু নিবেদিতার পুত্রতুল্য, আনন্দমোহনের সমাজভুক্ত, এবং তাঁর জীবনীকার হেমচন্দ্র সরকার নিবেদিতার প্রীতিভাজন। [পৃথ্বীশ রায় মনে হয় জানতেন যে, হেমচন্দ্র সরকারের আনন্দমোহন-জীবনীর পিছনে নিবেদিতার সক্রিয় সাহায্য ছিল। নিবেদিতার প্রতি হেমচন্দ্র সরকারের শ্রদ্ধার পরিমাণ বোঝা যায় নিবেদিতার মৃত্যুর পরে মুকুল পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩১৮) তাঁর লেখাটি পড়লে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ-সম্ভব ভাব ও ভাষায় তিনি নিবেদিতার চরিত্রমহিমা ও গুণগরিমার কথা বলেছেন]। নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বড় অংশ ব্রাহ্ম, যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। স্বদেশী আন্দোলনকালে এঁদের কারো-কারো লেখায় বা কথাবার্তায় একটু বেশি সাকার-গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, বৃটিশ ন্যায়বোধে পূর্বস্বীকৃত আস্থার কিছু বিচলিত রূপও—সে বস্তু পৃথ্বীশ রায়-গণের কাছে আপত্তিকর মনে হতেই পারে। তীব্র বিতৃষ্ণায় তাই পৃথ্বীশ রায়, আনন্দমোহন বসু সম্পর্কে নিবেদিতার অনবদ্য লেখাটিকে (যেটি গভীরতায় ও সৌন্দর্যে এখনো অনতিক্রান্ত এবং তা পৃথ্বীশ রায়ের অসাধ্য সৃষ্টি) ঐরকম কুশ্রীভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

এইসব কারণেই, চরমপন্থী আন্দোলন, বিশেষতঃ বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে সংস্কারক ও ব্রাহ্মমহলের বিরূপতা বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছিল (বিপ্লব-আন্দোলনের পট-ভূমিকায় লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাস—ঘরে বাইরে ও চার অধ্যায়ের বিরুদ্ধে চরমপন্থী রাজনৈতিক মহলের তীব্র নিন্দার কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে)—তার দূরীকরণের জন্য ডঃ সুমিত সরকার বিপ্লব-আন্দোলনে ব্রাহ্মদের অংশ-পরিমাণ বোঝাতে সংখ্যাতাত্ত্বিক উদ্যম দেখিয়েছেন। তাঁর ব্রাহ্মপ্রীতির প্রশংসা করেও (সুমিত সরকার তাঁর প্রশংসনীয় গ্রন্থে ঐ প্রীতির আনন্দিত পরিচয় বারবার দিয়েছেন) আমরা বলব—অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, দেবব্রত বসু প্রভৃতি বংশ-ব্রাহ্ম বা স্বয়ং-ব্রাহ্মগণ, উক্ত ধর্মকে পরিহার ক'রে ঘোর হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন। [এঁদের গুরু বা ভাবগুরু স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন প্রাক্তন ব্রাহ্ম]। সুমিত সরকার নিজ বক্তব্যের সমর্থনে প্রাক্তন-ব্রাহ্ম ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন (পৃ. ৪৮৩-৮৪), কিন্তু এইকালের ব্রাহ্মদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে একই লেখকের অজস্র কঠিন উক্তি তাঁর দৃষ্টি এড়াল কিভাবে জানি না। ভূপেন্দ্রনাথ এই কথাগুলিও বলেছেন : "একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যাঁদের উপর 'প্রতিক্রিয়াশীল' শব্দটি দেগে দেওয়া হয়েছে, তাঁরাই সশস্ত্র জাতীয়তার জনক।...সমাজসংস্কারকেরা উনিশ শতকের গোড়ার দিককার বিশেষ ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক কর্মপরিকল্পনার পুরোনো খোটায় বাঁধা ছিলেন—ঐ শতাব্দীর শেষাংশে সেই রজ্জুবন্ধন তাঁরা ছিঁড়তে পারেন নি।...স্বাধীন জাতীয়তার কথা উঠতেই তাঁরা

লাজপত রায়ের কাছে মাৎসিনী-নীতি বলতে কী বোঝাত, সে সম্বন্ধে বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন :

"যৌবনে লাজপত রায় মাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবন অনুধাবনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন—সেইসঙ্গে ইউরোপের গুপ্ত সমিতিসমূহের ইতিহাসও।...উর্দুতে তিনি মাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবনী লিখেছেন।"১০

নিবেদিতার অপরিসীম মাৎসিনী-প্রীতির সংবাদ আমরা যথাস্থানে দেব।

ডবলিউ নেভিনসন, নিবেদিতার সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে-রেখাচিত্র এঁকেছেন, তার

আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।...একথা ঠিক যে, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যেরা রাজনীতির ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন।...সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যেরা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের নেতারা জাতীয় কংগ্রেসেও ছিলেন, কিন্তু ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অথবা তৎকালের জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি ঘটনাগতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়েছিল।...পরবর্তীকালের সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনে ব্রাহ্ম-সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের বৈপ্লবিক বা অহিংস অংশের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যেসব তরুণ সদস্য যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মনোভাব নবরূপ নিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের দ্রাবক শক্তিতে।" ['পেট্রিয়ট-প্রফেট', ১৬৯-৭০]।

ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা" থেকে বলেছেন : "স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরো জোয়ার যখন, সেইসময়ে ব্রাহ্মসমাজ থেকে কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি, তবে গোড়ার দিকে দু'একজন জাতীয়তায় 'ধর্মান্তরিত' হয়েছিলেন বটে।" স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যপর্বে বিশিষ্ট ব্রাহ্মদের প্রচণ্ড ইংরাজ-আনুগত্যের দৃষ্টান্ত ভূপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তার মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিবরণ আছে। ভূপেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে দিয়ে ইংরাজ-বিতাড়নের কাজে লিপ্ত আছেন জেনে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন : "আমি ভাবছি, ইংরেজকে তাড়িয়ে তোমরা কি শাসনকার্য চালাতে পারবে?" ভূপেন্দ্রনাথ দুঃখে বলেছেন : "এই একই ফ্র্যাংকেনস্টাইন স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতেও এঁদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল।"

ইতিহাসের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ক্রমেই বাড়ছে। সুতরাং বিপ্লবীদের জাতিকুল নিয়ে আলোচনা ঠেকানো যাবে না। আবার যদি দেখা যায়, কোনো ঐতিহাসিক সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখাচ্ছেন, তাহলে তাঁর জাতিকুল সন্ধানের প্রয়োজনও হয়ে পড়ে।

এইসঙ্গে আমরা ঐতিহাসিক রচনার ক্ষেত্রে আরও একটি চিত্ত-চমৎকার ব্যাপারের সম্মুখীন ইদানীং হচ্ছি। সুধী সম্পন্ন কোনো-কোনো গবেষকের কাছ থেকে আমরা জানতে পারছি—দেশ-প্রেম একটা বাজে অজুহাত, আসলে বেকারীর জ্বালাতেই কিছু যুবক রিভলবার-বোমা ইত্যাদি নিয়ে স্বাধীনতা-যুদ্ধ করেছিল, যাতে ভবিষ্যতে তারা (উক্ত গবেষকদের তুল্য!!) সমৃদ্ধ অবস্থায় পোঁছতে পারে। ঠিক! ঠিক! তবে এইসব ঐতিহাসিকেরা খেয়াল করে দেখেন না যে মধ্যবর্তী-কালে বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে অল্পস্বল্প অসুবিধাজনক ব্যাপার ঘটে যায়—তা আর কিছু নয়—কারাবাস, নির্যাতন, ব্যাধি, পঙ্গুতা, নির্বাসন কিংবা ফাঁসি।—আর ঐ সকল ভ্রান্তবুদ্ধি লোক-গুলির পেটের কথা টেনে বার করতে পেরেছেন বলে সন্ধানী ঐতিহাসিকেরা লাভ করেন—মৌলিক সৃষ্টির ভাবাবেশ, এবং সেমিনারগত বন্ধুগণের বাহবা ও পৃষ্ঠবৃত্তির দাক্ষিণ্যে দেশবিদেশ সন্দর্শনের সরস সুযোগ!!

১০ বিমানবিহারী, ১২২-২৩।

মধ্যে অগ্নির অক্ষর ছাড়া আর কিছু নেই। তারই কয়েক লাইন দুর্বল অনুবাদে এই প্রকার :

"নির্বোদিতার সামগ্রিক জীবনময় ব্যক্তিত্ব আমাকে প্রায়শঃ অগ্নির কথা স্মরণ করিয়ে দিত ; অগ্নির মতোই...তিনি একই সঙ্গে ধ্বংসকারী ও সৃষ্টিকারী, ভয়ঙ্কর ও কল্যাণকৃৎ...। শত্রুর সম্মুখীন হলে তাঁর চোখ হয়ে উঠত জ্বলন্ত ইস্পাত, রুষ্ট হলে তাতে গাঢ় রঙ ধরত, যেমন হত গ্যারিবল্ডির।...পৃথিবীর সংগ্রামক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তাঁর তুল্য কোনো সত্তার দর্শন সহজে মিলবে না—আর আমি তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে সৈনিকরূপেই দেখেছি—হাতে-ধরা জ্বলন্ত তলোয়ার।"১১

॥ ৬ ॥ মডারেটদের বিষয়ে নিবেদিতার মনোভাব

জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হলেও তাকে কেবল বাংলাতেই তিনি আবদ্ধ রাখেন নি। বস্তুতঃ ভারতের জাতীয় আন্দোলনেই তিনি অংশ নিয়েছিলেন—বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যার অংশ। স্বদেশী আন্দোলনকে সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলন করে তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বোদিতা ব্যক্তিগতভাবে চরমপন্থী, বাস্তবপক্ষে বিপ্লববাদিনী হলেও, জাতীয় আন্দোলনে মডারেটদের (যদি তাঁরা আন্তরিক দেশহিতব্রতী হন) সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করতে রাজি ছিলেন না। এর দ্বারা তাঁর ভারতপ্রেম ও প্রখর রাজনীতিবুদ্ধি, দুইই দেখা যায়। তিনি জানতেন, নিছক নিন্দা করে মডারেটদের চরমপন্থী করা যাবে না। রাগে বা অভিমানে যদি তাঁদের সাহায্য ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ বিদ্যায় বুদ্ধিতে কর্মদক্ষতায় এঁদের অনেকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। বৃটিশ শাসনের নানা অংশের সঙ্গে এঁরা জড়িয়ে আছেন বলে জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ এঁদের দ্বারা করিয়ে নেওয়া সম্ভব। এঁদের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে শাসকচক্রের ভিতরের কথা বার করে নেওয়াও যায়। মডারেটদের সঙ্গে বন্ধুতার দ্বারা নির্বোদিতা সত্যই অনেক গোপন খবর বার করেছেন, তাঁর পত্রাবলীতে তার ইঙ্গিত যথেষ্টই আছে। তাছাড়া, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যুক্ত-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন, অন্ততঃ সেই-সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না চরমপন্থীরা নিজ শক্তিতে অপর সকলকে হঠিয়ে দিতে সমর্থ হচ্ছে। আলাপ-আলোচনা বা তাগিদের দ্বারা মডারেটদের যথাসম্ভব সংগ্রামমুখী করে তোলা—সেইসঙ্গে চরমপন্থী শক্তিগুলিকে জোরদার করা—এই ছিল তাঁর কর্মনীতি। তাছাড়া নির্বোদিতা ছিলেন উদার ও ব্যাপক সংস্কৃতির মানুষ। মডারেটদের মধ্যে সেই প্রকার সংস্কৃতির বিকাশ দেখলে তাকে অগ্রাহ্য করবার মতো সংকীর্ণতা দেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা আগেই জানিয়েছি, জাতীয় জাগরণকে তিনি কেবল রাজনৈতিক অভ্যুত্থান মনে করতেন না—শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞানের এমন বহু ধারা আছে যেখানে রাজ-নৈতিক ধারণায় নিতান্ত মডারেট একজন দেশকে অসাধারণ দানে ঐশ্বর্যপূর্ণ করেছেন।

১১ 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম'।

এ-বিষয়ে তাঁর মনোভাবকে চমৎকার ধুলে ধরেছেন রাজভক্ত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর স্মৃতিকথায়। "ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য" গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : "নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একেবারেই করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন—রাজনৈতিক কোনো কথা বলিলে ক্রোধের সহিত বলিতেন—'দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে, আমি আপনার সঙ্গে ও-সম্বন্ধে কথা বলিব না'।" একই নিবেদিতা দীনেশচন্দ্রের "অপূর্ব সাহিত্যিক শক্তিতে" মোহিত হয়ে বলেছিলেন, "দীনেশবাবু, আপনি সত্যই একজন প্রধান কবি।" নিবেদিতার কোনো এক ইংরাজ বন্ধুর কাছে দীনেশচন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন : "বঙ্গদেশের সামাজিক তত্ত্ব ইনি যেরূপ জানেন, এই দেশের কুঁড়েঘর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সকল জায়গার ইতিহাস যাহা ইনি ছেঁড়া পুঁথিপত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছেন—সে-বিষয়ে ইহার সমকক্ষ কেহ নাই।" দীনেশচন্দ্রকে নিবেদিতা এই অনাবৃত সত্য কথাগুলি শুনিয়েছিলেন : "দীনেশ-বাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সেদিক দিয়া আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নহে, মর্মপীড়া দান করে ; কিন্তু তবুও আমার আপনাকে ভালো লাগে। কেন, শুনবেন? আপনি বিনা **আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন ও দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের স্থানের দাবি করিবার যোগ্যতা রাখেন।"** [স্থূললিপি লেখক-নির্দেশে]

মডারেট গোখলে ভাইসরয় কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য—তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার গভীর বন্ধুতা ছিল। বন্ধুত্বের সুযোগে নিবেদিতা গোখলের মারফত জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে সরকারী সাহায্য সংগ্রহ করতেন। একই কাজ করতে চাইতেন ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মারফত। ভূপেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে তিনি সরকারের অনেক গোপন খবরও পেতেন। মডারেট রমেশচন্দ্র দত্তর বই "ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস"—ইংরাজদের অর্থনৈতিক শোষণের ভয়াবহ বিবরণ তুলে ধরে এদেশের চরমপন্থী আন্দোলনকে গতিবেগ দিয়েছিল (যা অরবিন্দ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন)—তাঁর সেই কৃতিত্বকে অস্বীকার করা কি নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব? মডারেট আনন্দমোহন বসুর সর্বসময়ের দেশভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে তিনি নমস্কার না জানিয়ে পারবেন কিভাবে? আবার নিবেদিতার বৈশিষ্ট্য এই—এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের ও অনুরূপ ব্যক্তিদের গভীর আস্থা ও প্রীতিভাজন হয়েও, তিনি চিন্তায় ও কর্মে বিপ্লববাদী থেকে গিয়েছিলেন।

এখানে আরও স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন—বৈপ্লবিক কার্য সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে, (ঐতিহাসিকদের মধ্যেও?), বিচিত্র একমুখী ধারণা বর্তমান। এরকম দেখি যে—কোনো একটি গোপন সভায় বসে (সভাটি অবশ্যই মিটমিটে আলোয় অর্ধভৌতিক দেখাবে) কয়েকজন ব্যক্তি (তাঁদের মুখে মুখোশ থাকলেই ভালো) যদি অমুকচন্দ্র তমুকের খুনের অর্ডার দিয়ে ফেলেন—এবং তারপর পিছনে শিরশিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে নিঃশব্দে সভাত্যাগ করে যান—তবেই তাঁরা পরিপাটি বিপ্লবী। নিবেদিতা এই ধরনের বিপ্লবকর্ম করেছেন কিনা, অবশ্যই প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু তিনি আরও বহুকিছু করেছেন, যার জন্য তাঁকে বিপ্লবী না বলে উপায় নেই।

॥ ৭ ॥ নিবেদিতার বিপ্লবী-চরিত্র সম্বন্ধে মোট সিদ্ধান্ত

নিবেদিতার বিপ্লবী চরিত্র সম্বন্ধে আমরা যা জেনেছি (বা বুঝেছি) তার মোট কথা এই :

(১) তিনি কোনো স্বদেশী ডাকাতি বা বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন, তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ এখনো পর্যন্ত মেলেনি।

(২) কিন্তু দেখা গেছে, ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত কোনো ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া তিনি দোষের কাজ মনে করতেন না ; এবং যে-গোয়েন্দা তাঁর পিছনে লেগেছে তাকে যমালয়ে পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির নামে বিবেচনাহীন হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করতেন না।

(৩) ভারতে বৈপ্লবিক কার্যের সূচনায় তিনি যে-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তারা স্বদেশী ডাকাতি করত। পরবর্তীকালেও পুলিশ-মহল তাঁকে স্বদেশী ডাকাতির নেত্রী বলে মনে করেছে।

(৪) নিরীহ দেশীয় মানুষের সম্পত্তি লুণ্ঠন করাকে তিনি কাপুরুষতা মনে করতেন।

(৫) তাঁর গ্রেপ্তারের এবং দীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনা ছিল ; সে সম্ভাবনা বারে-বারেই দেখা গেছে।

(৬) গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন, ভারত ত্যাগ করেছেন, এমনকি ভারতে ফরাসি উপনিবেশে আশ্রয় নেবার পরিকল্পনাও করেছেন।

(৭) তিনি বৈপ্লবিক বক্তব্য ছাপাবার জন্য 'গোপন প্রেসে'র ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন ; কণ্ঠরোধের সরকারী ব্যবস্থার ফলে গোপন প্রেসকেই একমাত্র আত্মপ্রকাশের উপায় মনে করতেন।

(৮) ভারতের রাজনীতির গোপন খবর তিনি বিদেশে চালান দিতেন ;বিদেশ থেকে বৈপ্লবিক পত্রপত্রিকা ও পুস্তক আনাতেন ; এইসব আদান-প্রদানের কাজ এজেন্ট-মারফত ঘটত।

(৯) বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যাপারে বোধহয় তাঁর হাত ছিল।

(১০) তাঁর নিজস্ব দল ছিল।

(১১) রাজনৈতিক প্রয়োজনে উচ্চমহলে যোগাযোগ রাখতেন ; নানাস্থানে তাঁর চর থাকত ; বৈপ্লবিক কাজকর্মে কঠোর মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেন ; বিপ্লব নিয়ে বাগাড়ম্বর পছন্দ করতেন না।

(১২) ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন তিনি, কৌশলগত কারণে নানাজনের কাছে নানারকম ভূমিকা নিতেন, যদিচ তাঁর মূল লক্ষ্য অব্যাহত থাকত।

॥ ৮ ॥ ভারতীয় রাজনীতিতে ১৯০২-১৯০৫ 'নিবেদিতা যুগ' কেন?

॥ নিবেদিতার ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনকে আমরা দুই পর্বে ভাগ করতে পারি।

প্রথম পর্ব : ১৯০২ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত —তিন বৎসর।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর দেহান্ত পর্যন্ত—৬ বৎসর।]

আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই দুই পর্বে নিবেদিতার ভূমিকার রূপ ও গুরুত্ব লক্ষ্য করব।

ভারতীয় রাজনীতিতে যদি আগস্ট ১৯০২ থেকে জুলাই ১৯০৫—এই খণ্ডকালকে "নিবেদিতা যুগ" বলে চিহ্নিত করি, তাহলে অবশ্যই আপত্তি উঠবে—প্রথমতঃ এইজন্য যে, কোনো এক বিশেষ সময়কে কোনো ব্যক্তির নামে চিহ্নিত করার মধ্যে গোঁড়ামির লক্ষণ আছে, যা সহজেই অন্য গোঁড়ামির প্রতিঘাত লাভ করতে পারে। তাছাড়া, ভারতবর্ষের মতো বৃহৎ, জটিল সংস্কৃতি ও সমস্যায় আকীর্ণ কোনো দেশকে কোনো বিদেশী এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেন কি যাতে তাঁর নামে উক্ত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি বৎসরকে উৎসর্গ করা যায়—এ প্রশ্ন উঠবেই। এসব দিক থেকে আপত্তি উঠলে তাকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অপরপক্ষে যদি এমন দেখা যায়, উদ্দিষ্ট সময়টিতে সর্বভারতীয় চেতনাসৃষ্টিতে এবং সক্রিয় কর্মে উদ্দীপিত করার ব্যাপারে বিশেষ একজনের ভূমিকা অপর মানুষদের ভূমিকার তুলনায় অধিক, তখন সংকীর্ণ অর্থে, অন্ততঃ তাঁর নামে যুগটির নামকরণ করা সম্ভবপর। আমরা মনে করি, পূর্বোক্ত সময়টিতে নিবেদিতা অন্য সকল জাতীয় নেতা অপেক্ষা ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে এবং রাজনীতিতে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এইকালে নিজ ভূমিকার মূল্য সম্বন্ধে স্বয়ং নিবেদিতা সচেতন ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পরে তিনি চিঠিতে লিখেছেন : "জাগরণের পূর্বেই এসেছিল আমার সময়।" (২৫.১৯০৬)। এস কে র‍্যাটক্লিফ, তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন : নিবেদিতা জাতীয় চেতনাকে কোন্ অবস্থায় প্রথম পেয়েছিলেন, এবং নিজ চেষ্টায় তাকে কোথায় হাজির করেছিলেন :

"নিবেদিতা ভারতবর্ষে যখন কাজ করতে শুরু করেন তখন সেখানে মননজীবন ও জনজীবনে অদ্ভুতরকম নিষ্প্রাণ স্থবিরত্ব। কিন্তু পরিবর্তনের কম্পনও দেখা যাচ্ছিল। নবচেতনার বিকাশ, নূতন আদর্শের দ্রুত সংগঠন, এবং জাতীয় জীবন ও শক্তির উদ্বোধনের উষালগ্ন দেখার উল্লাস তিনি কিন্তু লাভ করেছিলেন। নবভারত গঠনে যেসব প্রভাব সক্রিয়, তাদের ঠিক চেহারা এখনো অস্পষ্ট ; কিন্তু একথা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলবে, সক্রিয় প্রভাবগুলির মধ্যে এমন একটিও নেই যা ভগিনী নিবেদিতার জীবন, চরিত্র ও বাক্যের শক্তি-প্রভাবকে অতিক্রম করতে পেরেছে, এমনকি তার সমতুল্যও হতে পেরেছে।" [স্মৃতিলিপি লেখক-নির্দেশে]

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষ-পর্ব

॥ ১ ॥ নিবেদিতার ভারতপূর্ব জীবনে রাজনৈতিক সংস্রব

আরও অগ্রসর হবার আগে নিবেদিতার ভারত-পূর্ব জীবনের রাজনৈতিক ধারণা ও কার্যাবলীর বিষয়ে সংবাদ নেওয়া যায়। এখানে প্রধান উৎস রেমঁ-র নিবেদিতা-জীবনী [আমি উক্ত ফরাসি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ 'দি ডেডিকেটেড', এবং নারায়ণী দেবী-কৃত বাংলা অনুবাদ 'নিবেদিতা' ব্যবহার করেছি]। রেমঁ-র গ্রন্থে পাই, নিবেদিতার পরিবারে রাজনৈতিক ঐতিহ্য, এমন-কি খানিকটা বিপ্লবী ঐতিহ্য ছিল। তাঁরা যদিও স্কট-আইরিশ. এবং ধর্মবিশ্বাসে প্রোটেস্টান্ট, তবু আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর পিতামহ জন নোবলের সক্রিয় সংযোগ ছিল। তাঁর পিতা স্যামুয়েল নোবলও উক্ত আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। লণ্ডনে নিবেদিতা আইরিশ হোম রুলের জন্য সংগ্রামরত 'ফ্রি আয়ারল্যাণ্ড' দলে যোগদান করেছিলেন। এইসব ব্যাপারে তিনি ইংলণ্ডের আইরিশ দলসমূহের মুখপত্র উইম্বলডন নিউজের সম্পাদক অক্টেভিয়াস বীটীর সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছিলেন। অক্টেভিয়াস বীটী নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন। আইরিশ জাতীয়তাবাদের সম্বন্ধে নিবেদিতার আসক্তির কথা তাঁর ভাই রিচমণ্ড নোবল (স্বয়ং আইরিশ জাতীয়তাবাদী) জানিয়েছেন।১

---

১ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, মডার্ন রিভিউ (জানুয়ারি, ১৯২২) পত্রিকায় প্রকাশিত রিচমণ্ড নোবলের একটি লেখার পুরো অনুবাদ দিয়েছি, তার মধ্যে নিবেদিতার উপর আইরিশ জাতীয়তাবাদের প্রভাবের বিশদ উল্লেখ আছে। প্রত্যেক মানুষের মতো প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠীর স্বাধীন আত্মবিকাশের অধিকার থাকা উচিত, এই ধারণা নিবেদিতার মনে দৃঢ়মূল ছিল. তিনি দেখেছিলেন যে, সেই অধিকার অস্বীকৃত হচ্ছিল আইরিশদের উপর ইংরাজদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ক্রমবিস্তারে। এই সত্তানাশী ব্যাপারটির মোকাবিলা করতে নিবেদিতা গেলিক ভাষা, আচার-আচরণ, নৃত্যরীতি ইত্যাদি পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন—এক কথায় আইরিশ জাতির ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। নিবেদিতার মন ও কর্মের এই পূর্বভূমিকা মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব—কেন তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তার জাতীয়তার সংরক্ষণে অতখানি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এইসঙ্গে আমরা নিবেদিতার সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারব যদি মনে রাখি যে, তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেষ্টাকে যুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পেট্রিয়ট প্রফেট গ্রন্থে জর্জ ফ্রিম্যান নামে নিবেদিতার অনুরূপ এক আইরিশ জাতীয়তাবাদীর কথা বলেছেন। ইনি আইরিশ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'গেলিক আমেরিকান'-এর সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং আমেরিকাবাসী আইরিশ বিপ্লবীদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতেন। পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের

অক্টেভিয়াস বীটীর সঙ্গে নিবেদিতা মাৎসিনী-চর্চা করতেন। অক্টেভিয়াসকে যে, মাৎসিনীর ব্যাখ্যাতা হিসাবে গ্রহণ করা যায়, অক্টেভিয়াসের মধ্যে আছে দুর্বল ও উৎপীড়িতদের প্রতি সুকোমল সহানুভূতি, সেইসঙ্গে মানবতা সম্বন্ধে জ্বলন্ত বাসনাময় উৎকণ্ঠা —একথা নিবেদিতা পত্রে (৩১.১.১৮৯৮) বলেছেন, আমরা জেনেছি যে, নিবেদিতা আইরিশ বিদ্রোহীদের সঙ্গে বাস করেছেন, সশস্ত্র সংগ্রাম কাকে বলে তিনি তা প্রত্যক্ষ জানতেন, গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল (আইরিশ গুপ্তসমিতির সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের ব্যাপারে অবশ্য ভূপেন্দ্রনাথ সন্দেহপ্রকাশ করেছেন), বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে এই পর্বেই তাঁর পরিচয় হয়।২ নিবেদিতার ইংরাজ জীবনীকার বারবারা ফক্স আলোচ্য পর্ব সম্বন্ধে জানিয়েছেন : "নিবেদিতা রাজনীতির ক্ষেত্রে এইকালে বিস্তারশীল নব সোস্যালিস্ট ভাবধারার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।"৩ নিবেদিতা যে ভারতে আসার আগেই উগ্র মতাবলম্বী ছিলেন তার আভাস পাওয়া যায় 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এর সম্পাদক উইলিয়ম স্টেড-কৃত তাঁর বেনামা চরিত্রচিত্রণ থেকে। সে রচনার অংশবিশেষ আমরা নিবেদিতা-স্টেড অধ্যায়ে উপস্থিত করব।

॥ ২ ॥ ভারতে প্রথম আগমনকালে 'রাজভক্ত' নিবেদিতা—বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের ক্রমপরিবর্তন

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ধারণার বিষয়ে কতখানি জেনেছিলেন বলা শক্ত। জিজেল রেম-র পূর্বে-উদ্ধৃত পত্র অনুযায়ী—তিনি কিছুটা অন্ততঃ জানতেন। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর—নিবেদিতা ইংলণ্ডে অবস্থানকালে স্বামীজীকে কেবল ধর্মাচার্যরূপেই জেনেছেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব কতখানি কঠোর ছিল তা একেবারেই জানতে পারেন নি, যদিও মহেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষ্য অনুযায়ী ("লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে), স্বামীজীর ইংরাজ-শিষ্য, ও স্টেনোগ্রাফার জে জে গুডউইন তা যথেষ্ট জানতেন।৪ স্বামীজী এই পর্বে ঘোরতর বৃটিশ শাসন-বিরোধী

প্রতি এঁর সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল, এবং ইনি ঘোরতর পাশ্চাত্যবিদ্বেষী ছিলেন। ইংরাজদের মতোই ইনি ইহুদীদের ঘৃণা করতেন। প্রায়ই বলতেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষণ করছে ইহুদী মূলধন।" [নিবেদিতার অনুরূপ ধারণার বিষয় আমরা পরে লক্ষ্য করব।] খুবই বিস্ময়ের কথা, এঁর মৃত্যুর পরে জানা গিয়েছিল, এই আইরিশ জাতীয়তাবাদী আইরিশ ছিলেন না—নিবেদিতার মতোই প্রোটেস্টান্ট ইংরাজ। ভূপেন্দ্রনাথ ১৯১১ সালে আমেরিকায় নিবেদিতাকে খোঁচা দেবার জন্য যখন বলেন, আপনি খাঁটি আইরিশ নন, স্কট-আইরিশ, তখন নিবেদিতা অবশ্য বলেন "না না, আমি আইরিশ।"

২ ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত হবে।

নিবেদিতার ভারত-পূর্ব রাজনৈতিক জীবনের কথা 'দি ডেডিকেটেড' গ্রন্থের ২৮-২৯, ৬৪, ২২৯, ২৬০, ৩২৬-২৭ পৃষ্ঠাগুলিতে আছে।

৩ বারবারা ফক্স, 'লঙ জার্নি হোম', ১৬।

৪ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতে ইংরাজ-শাসন সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আমি

হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ইংরাজদের ব্যক্তিচরিত্রে মুগ্ধ হয়ে কিছুকালের জন্য সন্দিগ্ধভাবে ভেবেছিলেন—ইংরাজদের সঙ্গে সম্মানজনক মীমাংসার একটা চেষ্টা করলেও করা যেতে পারে। নিবেদিতার অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল। নিবেদিতা আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধে যে-ভূমিকাই নিন—ভারতবর্ষে এসেছিলেন "রাজানুগত্য-সম্পন্ন ব্রিটিশ নাগরিক" হিসাবেই। নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকের কাছে শেষোক্ত ব্যাপারটি জানা ছিল না, কেননা উপযুক্ত তথ্য তাঁরা পান নি। এ-সম্বন্ধে নানা সংবাদ নিবেদিতার পত্রাবলীতে আছে।

ভারতে আসার অব্যবহিত পরে নিবেদিতা তাঁর বান্ধবী মিসেস নেল হ্যামণ্ডকে লেখেন (১০.২.১৮৯৮): "[স্বামী বিবেকানন্দের] এই আন্দোলন আধ্যাত্মিক ধারাপথে সাম্রাজ্যের সংহতিসাধন ছাড়া কিছু নয়।" থিয়জফিক্যাল সোসাইটিকে রুশ সরকারের "স্টকিং-হর্স" (যে-ঘোড়া বা ঘোড়ার মূর্তির পিছনে শিকারী লুকিয়ে থাকে) ধরে নিয়ে নিবেদিতা একই পত্রে লিখেছেন: "থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সদস্যরা...সাম্প্রতিক সংকটের কালে আমাদের বিরুদ্ধে [অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের] বিরুদ্ধে [ভারতীয়] জনগণকে রাজদ্রোহ ও বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে।[৫] এক্ষেত্রে নিবেদিতার বিশ্বাস, "স্বামীজী যতক্ষণ ভারতে আছেন ততক্ষণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততঃ রাজদ্রোহ বা তার ছায়া পর্যন্ত থাকবে না।"

॥ ৩ ॥ রাজভক্তি প্রশ্নে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার মানসিক সংঘাত

মার্গারেট নোবল নাম্নী ইংরাজ মহিলার স্বদেশপ্রেমে কিছু ধাক্কা লাগল যখন শুনলেন—স্বামীজীর পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে। তাঁর প্রতিক্রিয়া হল তাঁর মনে। চিঠিতে লিখলেন (২২.৫.১৮৯৮): "নির্ঘাত সরকারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যদি স্বামীজীকে কোনোভাবে বাধা দেওয়া হয় তাহলে সরকার সত্যি প্রমাণ করে দেবে—তার মাথা খারাপ। তাতে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠবে—যা ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। আর আমি—এদেশের

"বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থে বিভিন্ন খণ্ডে আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে চতুর্থ খণ্ডের ১২-৫৫ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে পঠিতব্য।

৫ পূর্বোক্ত গেলিক আমেরিকান পত্রের সহ-সম্পাদক জর্জ ফ্রিম্যান ভূপেন্দ্রনাথকে আরও বলেন: "রাশিয়ার জার-সরকার মাদাম ব্লাভাৎস্কিকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন রাশিয়ার পক্ষে কাজ করতে। ভারতের বৃটিশ সরকার তাঁদের এজেন্টের মারফত ব্যাপারটির আঁচ পেয়ে যখন তিনি দ্বিতীয়বার ভারতে যান—তাঁকে ভাগিয়ে দেন।" ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "নিবেদিতার কাছে যখন আমি ব্লাভাৎস্কিকে রাজনৈতিক সন্দেহে ভারত থেকে ভাগিয়ে দেবার কথা বলি তখন তিনি চেঁচিয়ে বলেছিলেন—আরে, লণ্ডনে তো ঐকালে এটা সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল।" [পেট্রিয়ট-প্রফেট, ১২১]

ঐ ঘটনার পরে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির নেতৃত্ব অধিকার ক'রে অ্যানী বেশান্তের ভারতে আগমন, এবং হিন্দুধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে তাঁর রাজানুগত্য প্রচার সম্বন্ধে আমি অন্যত্র [সমকালীন, ৩য়, ৫৪-৬৬] যা বলেছি, তার থেকে এই সন্দেহ জাগতে পারে, বেশান্ত জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ব্লাভাৎস্কির বিপরীত ভূমিকা নিয়েছিলেন॥

মাটিতে শ্বাস নিয়েছে এমন সর্বাধিক রাজানুগত্যসম্পন্ন ইংরাজ রমণী আমি—এদেশে আসার আগে নিজের রাজানুগত্যের গভীরতা বুঝতে পারি নি এমন আমি—আমিই প্রথম জ্বলে উঠব।" নিবেদিতা আরও লিখলেন : "ইংলণ্ড থেকে তুমি বুঝতেই পারবে না—জাতিবিদ্বেষ কাকে বলে।...তিনজন শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে স্বামীজী ও অন্য 'নেটিভরা' যখন ভ্রমণ করেন তখন তাদের জঘন্য ধরনের অপমান সহ্য করতে হয়।"

মার্গারেট নোবলের 'স্বদেশপ্রেম' সর্বাধিক ধাক্কা খেয়েছিল সরাসরি স্বামীজীর কাছ থেকে। নিবেদিতা যেমন গোড়ায় ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব ঠিকভাবে জানতে পারেন নি, তেমনি স্বামীজীও বোধহয় নিবেদিতার মধ্যে দেশপ্রেমের সংস্কার কতখানি দৃঢ়মূল, আঁচ করতে পারেন নি। স্বামীজী ইংলণ্ডে নিজের ধর্মাচার্যের রূপকেই উন্মোচন করেছিলেন, নিবেদিতা সেইটুকু অংশের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। নিবেদিতা পত্রে লিখেছেন, ভারতে আসার আগে তিনি ব্যক্তিগত মানুষরূপে স্বামীজীর কোনো পরিচয়ই জানেন নি। স্বামীজীও মনে হয়, নিবেদিতা সম্বন্ধে বাইরে থেকে এইটুকু জেনেছিলেন যে, মেয়েটি আইরিশ জাতীয়তাবাদের অনুরাগী। এক্ষেত্রে তাঁর মনে হতে পারে, তাহলে সে ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন হবে। ভারতে আসার আগে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে যেসকল দারুণ উদ্দীপক পত্র পান তাদের মধ্যে "পৃথিবীর বীরোত্তম ও সর্বোত্তমদের" জন্য আত্মোৎসর্গের আহ্বান ছিল, "জ্বালাময়ী বাণী ও জ্বালাময় কর্মের" প্রেরণামন্ত্র ছিল, ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অসহনীয় যন্ত্রণার কথা ছিল। ভারতের জন্য বিদেশ থেকে 'সিংহিনী' আনবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে স্বামীজী বলেন, "তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই নারী যাকে ভারতের প্রয়োজন।"

এইসব কথা স্বামীজী যখন লিখেছেন তখন হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল—ভারতের অপরিসীম দারিদ্র্যের মুখ্য কারণ যে, ইংরাজ শাসন—সে সম্বন্ধে মার্গারেট সচেতন। মার্গারেট ভারতে আসছে ভারতের সেবা করতে, সুতরাং রাজানুগত্যে সে অন্ধ নয়—একথাও স্বামীজী মনে করতে পারেন। সুতরাং তিনি যখন মার্গারেটের রাজানুগত্যের অটুট শিকড়ের চেহারা দেখলেন তখন অত্যন্ত বিস্মিত ও আহত হলেন। স্বামীজী ভারতের জন্য কোনো উদারহৃদয় পাশ্চাত্ত্য সমাজসেবীকে চাইছিলেন না—ভারতকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করবে, ভারতবাসীকে নিজের রক্ত নিজের ভাই মনে করবে—এমন প্রেমিককে চাইছিলেন। ফলে নিবেদিতার মনোভাবে তাঁর অত্যন্ত আশাভঙ্গ হল, ক্ষোভের সীমা রইল না—তীব্র হয়ে দাঁড়াল নিবেদিতার সঙ্গে মনের সংঘাত। এই সংঘাতের বিবরণ নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে দিয়েছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, তাঁকে দীক্ষাদানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর "ইংরাজ হওয়ার মননগত তাৎপর্য, ভারতের স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইংরাজদের বদ্ধমূলে ধারণার প্রকৃতি, নিজ জাতির ইতিহাস ও কীর্তির বিষয়ে তাঁর ইংরাজসুলভ উচ্চ ভাবাবেগ—এই সকলের বিষয়ে স্বামীজীর কোনো ধারণাই ছিল না।" সুতরাং স্বামীজী দীক্ষাদানের পরে যখন নিবেদিতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এখন তুমি কোন্ জাতিভুক্ত," তখন তিনি আকাঙ্ক্ষিত উত্তর "আমি এখন ভারতীয় জাতিভুক্ত"—কথাগুলি শোনেন নি। নিবেদিতা অবশ্যই বলেছিলেন, তিনি ইংরাজ জাতিভুক্ত। স্বামীজী দেখেছিলেন, "ইংরাজের জাতীয় প্রতীকের প্রতি শিষ্যার অপরিসীম আনুগত্য ও অর্চনা।" আহত অস্থির বিবেকানন্দ কিছুদিন পরে নিবেদিতাকে বলেন, "তোমার যে দেশপ্রেম, তা পাপ ছাড়া আর কি?...

আমি তোমাকে এইটুকু শুধু দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, অধিকাংশ মানুষ কাজ করে স্বার্থের তাগিদে—আর তুমি কেবলই সে-কথার বিরোধিতা করে বোঝাতে চাইছ, কোনো-কোনো জাতির [অর্থাৎ ইংরাজদের] সকলেই দেবতাবিশেষ। এমন মরীয়া অন্ধতা—বন্যজাতি ছাড়া আর কি?"

দীক্ষাদানের পরবর্তী কয়েক মাস, বিশেষত আলমোড়ায় ভ্রমণকালে, নিবেদিতার মন থেকে বিশেষ "দেশ ও জাতির সম্বন্ধে সংস্কার ছেদনের জন্য" স্বামীজীর চেষ্টা এবং নিবেদিতার প্রতিরোধ এমনই তিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, নিবেদিতা সে সম্বন্ধে বলেছেন, সে এক "ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।" নিবেদিতা অবশ্য একথাও বলেছেন, শিষ্যার মন থেকে একদেশিতা দূর করার চেষ্টা করলেও স্বামীজী কিন্তু "কখনো শিষ্যার কাছে নূতন বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি বা নূতন মতের ঘোষণা দাবি করেন নি।"

১৮৯৮ মে মাসের এই মানসিক সংঘর্ষ, এবং কিছুদিনের মধ্যে ভারতে ইংরাজের জাতিবিদ্বেষের রূপ দেখার কটু অভিজ্ঞতা—এর ফলে নিবেদিতা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও ভারত ও ইংলণ্ডকে ভালবাসায় বেঁধে ফেলাবার স্বপ্ন না দেখে পারেন নি। সেজন্য প্রভাবশালী ইংরাজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যাতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতের জন্য সুবিচার আদায় করে নিতে পারেন। [পরবর্তীকালে যখন নিবেদিতার রাজনৈতিক মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে তখনও তিনি ভারতের ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বজায় রেখেছিলেন—বৈপ্লবিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য]। তবু নিবেদিতার ধারণা কতখানি নাড়া খেয়েছিল তা তাঁর রাজনৈতিক কল্পনাবিলাসে পূর্ণ একটি পত্রে (৫.৬.১৮৯৮) দেখা যায়:

"ইংলণ্ড ও ভারতকে পরস্পর ভালবাসাতে পারব—এই আমার জীবনস্বপ্ন। ইংলণ্ডের প্রতি সুবিচারের প্রয়াসে একথা আমাকে বলতেই হবে—ইংলণ্ডের সন্তানগণ অনেক ক্ষেত্রেই ভারতকে ভালভাবে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে, সেবা করেছে। কিন্তু যেভাবে তারা সেকাজ করেছে, তা ভারতবাসীর মধ্যে যথার্থ ভাবাবেগমূলক সাড়া জাগাতে পারেনি। অপরদিকে প্রতি জাতিই স্বাধীনতা দাবি করে—অস্ট্রিয়া থেকে ইতালি, তুরস্ক থেকে গ্রীস, ইংলণ্ড থেকে ভারত। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুরা নিজেদের ও মুসলমানদের জন্য শান্তিপূর্ণ সরকার গঠনের উপযোগী হবে। বর্তমানে ভারতের সামাজিক অগ্রগতির জন্য যে-ধরনের রাজনৈতিক শান্তির অবশ্য প্রয়োজন, তা বলশালী তৃতীয় শক্তির অবস্থিতির উপর নির্ভর করে—ঐ তৃতীয় শক্তি এমন দূরস্থান থেকে আসবে যা তাকে স্থানীয় সংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রাখতে পারবে।"

ঐ তৃতীয় শক্তি কে হলে ভালো হয়, রাশিয়া না ইংলণ্ড—সে-বিষয়ে নিবেদিতার চিন্তা:

"আমার বিবেচনায়, রাশিয়া দৈনন্দিন শাসনকার্য আরও দয়ালুভাবে করতে সমর্থ। শাসিত প্রদেশগুলির জনগণের ভাষা যাতে ঐ প্রদেশের গভর্নর ও বিচারকেরা জানতে বাধ্য হয়—তার ব্যবস্থা রাশিয়া নিশ্চিত করতে পারবে। অপর পক্ষে আমাদের চির ধিক্! ও-ব্যবস্থা আমরা করিনি। এদেশে অশিক্ষিত আসামীরা অজানা এক ভাষায় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কী সুসংস্কৃত নিষ্ঠুরতা! অন্যদিকে দেখি যে, রাশিয়ার নিজস্ব রাজনৈতিক ধারণা এমন সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্যদেশীয় যে, তা অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কোনো তৃতীয় বিকল্পের কথা জানে না; অথচ ভারতীয়েরা মূলে ইউরোপীয়

জাতি—তাদের ইতিহাস ও জাতিগত সামর্থ্য রাজনৈতিক বিকাশের যে-রূপকে আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে রাশিয়া কোনোভাবেই দিতে পারবে না।"

এর কয়েকমাসের মধ্যে কাশ্মীরের ঘটনাটি ঘটল, যা নিবেদিতাকে প্রায় উৎপাটিত করে দিল। সেকথা অন্যত্র লিখেছি। ['সমকালীন', ৪র্থ, ৩৮-৪১] সংক্ষেপে ঘটনাটি এই : কাশ্মীরের মহারাজা স্বামীজীকে কাশ্মীরে সংস্কৃত কলেজ করার জন্য জমি দেবেন স্থির করেন কিন্তু মিশনারিদের উস্কানিতে এবং অতিঅবশ্যই বৃটিশ সরকারের গোপন নির্দেশে, বৃটিশ রেসিডেণ্ট স্যার অ্যাডালবার্ট ট্যালবট বারবার ভেটো প্রয়োগ ক'রে তার আলোচনা পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দেন। মিসেস ওলি বুল, মিসেস প্যাটারসন (আমেরিকান কনসাল-পত্নী) এবং নিবেদিতা বৃটিশ রেসিডেণ্টের দুষ্ট চেষ্টা বরবাদ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। "ইংরাজ রমণী হিসাবে," নিবেদিতা মনে করলেন, "ইংলণ্ড নীচ কাজ ক'রে যাবে, এটা সহ্য করা যায় না।"

ইংলণ্ড কিন্তু "নীচ কাজ" চালিয়ে যেতেই লাগল। নিবেদিতাও তাঁর মুমূর্ষু আশার পক্ষে মরীয়া লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। কার্জন যখন কলকাতায় প্লেগের সূচনাকালে দৃঢ় অথচ সুবিবেচনাপূর্ণ নীতি কার্যকর করলেন তখন নিবেদিতা ভাবতে চাইলেন (২২.২.১৮৯৯)—তাহলে কি ভারতে শুভদিন আসবে? পলাতক স্বপ্নের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ভাবাবেগের সঙ্গে ভেবেছেন, ভবিষ্যতে যখন তাঁরা কেউ থাকবেন না, তখন "ভারত ও ইংলণ্ড এক হবেই—আমি জানি—জানি—জানি।"

॥ ৪ ॥ স্বামীজীর প্রভাবে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে নিবেদিতার মোহনাশ : মৃত্যুদর্শনে দীক্ষা

কিন্তু স্বপ্ন—স্বপ্নই। স্বপ্নের বিরুদ্ধে বেদনাময় বিরাট বাস্তবের আকারে বর্তমান ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। নিবেদিতা দেখলেন—ভারতবর্ষের প্রতীক-পুরুষ বিবেকানন্দ নিরুপায়ে কোন্ অপমান সহ্য করছেন ইংরাজ শাসকদের কাছ থেকে। কিছুদিন আগেই তিনি স্বামীজীর মুখে শুনেছিলেন—"সবল দুর্বলের উপরে অত্যাচার করলে, দুর্বলের কর্তব্য—ঐ সবলকে ছিঁচে দেবার চেষ্টা করা।" "একথা ভুলো না," স্বামীজী বলেছিলেন, "বিদ্রোহে তোমার চির অধিকার।"

বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত নেই। নিবেদিতা গভীর মর্মপীড়ার সঙ্গে দেখলেন, ভারতে ইংরাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ইংলণ্ডে আবেদন করেও সাড়া পাচ্ছেন না। নিবেদিতার মাৎসিনী-ভক্ত বন্ধু অক্টেভিয়াস বাটী পর্যন্ত কাশ্মীরের ঘটনা ইংলণ্ডের কাগজে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। (৪.১.১৮৯৯, চিঠি)।

১৮৯৮ সালে স্বামীজীর দলের সঙ্গে ভারতভ্রমণকালে নিবেদিতা স্বামীজীর নিরন্তর যন্ত্রণাময় দেশপ্রেম লক্ষ্য করেছেন। আকবর, প্রতাপ সিংহ, শিবাজী এবং শিখ গুরুগণের বীরজীবন নিয়ে স্বামীজীকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছেন; যে-দেশে কখনো বিশ্বাসঘাতক দেখা যায় নি সেই জাপান, এবং ধর্ম-শিল্প-সাম্রাজ্য সংগঠন, তৎসহ স্বাধীনতার জন্মভূমি মাৎসিনীর দেশ ইতালির কথা বলতে শুনেছেন; কিভাবে এলিজাবেথের আমলের দীন ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে শোষণ ক'রে ঐশ্বর্যশালী হয়েছে, তার বিবরণ পেয়েছেন। "তাঁর বন্দনার রাণী ছিল তাঁর মাতৃভূমি", নিবেদিতা লিখেছেন। বিবেকানন্দের কাছে "ভারতের

ভাবনা শ্বাসযন্ত্রের মতো।" তার অসামান্য রূপচ্ছবি নিবেদিতার রচনায় : "ভারতের সীমার মধ্যে এমন কোনো চাপা কান্নার স্বর শোনা যায় নি যা তাঁর মধ্যে আহ্বানের আবেগে প্রতিধ্বনিত হয় নি ; ভারতে এমন কোনো আতঙ্কের চীৎকার, দুর্বলতার শিহরণ, অপমানের সংকোচ ছিল না যাকে তিনি জানতেন না বা বুঝতেন না ; ভারতের পাপের প্রতি কঠোর আঘাত হেনেছেন, তার পার্থিব জ্ঞানের অভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন—সেগুলিকে নিজের ঘুটি ধরে নিয়েই। অপরদিকে আর কেউই তাঁর মতো ভারতের ভাবী মহিমার দর্শনে ভাবাচ্ছন্ন থাকতেন না।"৬

নিবেদিতা দেখেছেন, সন্ন্যাসীর অহিংসাকে গৃহীর জীবনে স্থাপন করাকে স্বামীজী মোটেই উচিত কাজ বিবেচনা করেন নি ; বৌদ্ধদের বাড়াবাড়ি-অহিংসার জন্যই ভারতের পরবর্তী জাতীয় জীবনের কাপুরুষতা, তাই ছিল তাঁর মত। "প্রতিরোধ গৃহীর কর্তব্য—অপ্রতিরোধ সন্ন্যাসীর ব্যাপার।...যেখানে জয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে সেখানে তাঁর মতে কেবল কাপুরুষই এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেয়।"৭ নিবেদিতা স্বামীজীর মুখে শুনেছিলেন, "যতই বয়স বাড়ছে ততই দেখছি—সবকিছু আছে পৌরুষের মধ্যে। এই আমার নতুন বার্তা। পাপ যদি করতে চাও—পুরুষের মতো করো। বদমাশ যদি হতে চাও—বিরাট আকারে হও।"৮ এই কথাগুলি অগ্ন্যুদ্গারের মতো বেরিয়ে এসেছিল যখন নিবেদিতা একবার তারিফ ক'রে ভারতে অপরাধীর সংখ্যাল্পতার কথা বলেছিলেন। গভীর বিষাদের সঙ্গে স্বামীজী বলেন, "হায়! এ যে মৃতের সাত্ত্বিকতা!"৯

"একদিকে বিশেষ অধিকারভোগীদের ক্রমবর্ধমান পরিতৃপ্তি ও নোংরা স্থূলতা, অন্যদিকে বঞ্চিতগণের ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য—এই নিয়ে বিদ্যমান পৃথিবীতে"—১০ নিবেদিতা দেখেছেন—স্বামীজী সর্বদাই চির পরাজিতগণের পক্ষে দণ্ডায়মান। বিবেকানন্দের চোখে ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রূপ এই : "পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি কেবল দাঁড়িয়ে চীৎকার করে এইটুকুই বলতে পারে : যার আছে তাকে আরও ঢেলে দাও, আর হৃতসর্বস্বের শেষ সম্বলটুকুও ছিনিয়ে নাও। সাবধান! সাবধান! হেরে গেলেই সর্বনাশ।"১১ এই শোষক সভ্যতার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ যখন বিস্ফোরিত হতেন তখন "প্রায়শঃই তাঁর সন্ন্যাসীর গৈরিক খসে গিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ত যোদ্ধার বর্ম।"১২ নিবেদিতা বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে তাঁর চরম আত্মউন্মোচনকে দেখেছিলেন :

"মর্মান্তিক আঘাত পেলেই সিংহ দারুণতম গর্জন করে ; মাথায় ঘা খেলে তবে

---

৬ ভগিনী নিবেদিতা, 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ৫৯। [অতঃপর 'দেখিয়াছি' বলে উল্লিখিত হবে।]

৭ ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ২৪।

৮ ঐ, ১৭৭।

৯ ঐ, ১৭৭।

১০ ঐ, ১০০।

১১ ঐ, ১০০।

১২ ঐ, ৫৬।

সর্প সোজা ফণা ধরে খাড়া হয়ে ওঠে ; আর মানুষের আত্মার বিপুল মহিমা প্রকাশ পায় যখন সে মর্ম-গভীরে আহত হয়।"১০

বিপ্লবের মহাদেবী কালীকে নিবেদিতা এইকালেই বিবেকানন্দের মধ্যে দর্শন করেন। নিবেদিতার চেতনায় তার ফলে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তাঁর খ্রীস্টীয় সংস্কারের উপরে কালীর এই কৃষ্ণচ্ছায়াপাত সত্যই বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচক। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার জীবনে কালীর ভূমিকা বিষয়ে বেশ কিছু কথা আমি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেছি। এখানে নিবেদিতার রাজনৈতিক চেতনাগঠনে কালীর ভূমিকার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ভারতে আসার কিছুদিনের মধ্যে নিবেদিতা কলকাতায় এক দারুণ সরকার-বিরোধী বিক্ষোভের রূপ দেখেন। প্লেগ ও প্লেগের টীকাদানসূত্রেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে রোষে অস্থির হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ মহামান্য সাহেবগণের জীবন প্রকাশ্য রাজপথে নিরাপদ ছিল না। নিবেদিতা "অ্যান ইংলিস লেডি" এই ছদ্মনাম নিয়ে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ লিখে পাঠান কোনো একটি বিলেতি কাগজে (৪.৫.১৮৯৮), যার পাণ্ডুলিপি রেমণ্ড সংগ্রহে আছে। তার শেষ দুটি অনুচ্ছেদ :

"গত কয়েক মাস ধরে ইউরোপীয়রা এখানে অস্বাচ্ছন্দ্যে আছে। এখানকার মুসলমানগণ সর্বদা ধিক্-ধিক্ ক'রে জ্বলছে। পাঁচ সপ্তাহ আগে শহরের সকল রিভলবার কিনে নেওয়া হয়। জানা যায় যে, ঐ সময়ে পুলিশ একটি ষড়যন্ত্র অঙ্কুরে বিনাশ করেছিল।

"এই মুহূর্তে অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং গোঁড়ামি একত্র হয়েছে—শান্তি বিঘ্নিত করতে। অনুগতরাও ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে ছাড়ছে না—বৃটিশ সরকার টলমল করছে, ভেঙে পড়ে বুঝি। চাঁদের চারপাশে লোহিতাভ কুয়াশা—সামাজিক জীবনে আলোড়নেরই সূচক।"

এই বিষয়টির উল্লেখ নিবেদিতা তাঁর "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" গ্রন্থেও করেছেন (প্রথম খণ্ডে, পৃ. ২৯৩ উদ্ধৃত)। সেখানে দেখি—স্বামীজী ঘটনাটির মধ্যে ভয়ঙ্করী কালীর ছায়া দেখেছিলেন, এবং বলেছিলেন, ঈশ্বর শুভের মতো অশুভের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেন, আর কেবল হিন্দুরা তাঁকে অশুভ রূপেও পূজা করতে সাহস করে।

স্বামীজী নিবেদিতার কাছে কালীতত্ত্বকে যে-রূপে উপস্থিত করেছিলেন তা যে-কোনো বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ দর্শন বলে প্রতিভাত হবে। নিবেদিতার রচনা থেকে তেমন কিছু অংশ প্রথম খণ্ডে উপস্থিত করেছি। (৩৩১-৩৩২)। তেমনই আরও কথা স্বামীজীর :

"ভয়ঙ্করের পূজা করো, মৃত্যুর পূজা করো।...এ কিন্তু দুর্বলের, কাপুরুষের মৃত্যু-ইচ্ছা নয়, আত্মহত্যা নয়। এ হল শক্তিমানের মৃত্যুসম্ভাষণ ;—সবকিছু জানার পরে, সকল বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে সে বুঝেছে—এছাড়া অন্য পথ নেই।"

"আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলে ভালবাসি, নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলে ভালবাসি, দুঃখকে দুঃখ বলে ভালবাসি। সংগ্রাম করো—অবিরাম সংগ্রাম করো—প্রতি পদে পরাজয় তবু সংগ্রাম করো। এই হল আদর্শ—এ-ই আদর্শ।"

বিবেকানন্দের মুখে বিপ্লবের অমোঘ ধ্বনি শুনে নিবেদিতা লিখেছেন :

"এবং তারপর উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতরা যখন একই আশা ও আতঙ্কে সম্মিলিত—সৈন্যবাহিনীসমূহের সগর্ব পদসঞ্চার, জাতিসমূহের লণ্ডভণ্ড আলোড়নের শব্দ মানস-কর্ণে

১০ ভগিনী নিবেদিতা, 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি', ১৮০।

ক্রমেই উচ্চতর ও স্পষ্টতর আকারে ধ্বনিত—তখন তারই মধ্যে এই মহাস্তোত্রের বজ্রনির্ঘোষ ফেটে পড়ল :

হে ভয়ঙ্করী অমারাত্রি,
হে ভয়ঙ্করী মোহরাত্রি,
হে ভয়ঙ্করী কালরাত্রি,
তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম।"১৪

স্বামীজীর এইসকল উচ্চারণের মধ্যে নিবেদিতা "ঐতিহাসিক নাটকের মহাসমবেত সঙ্গীত" শুনতে পেয়েছিলেন। নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর ছিল প্রচণ্ড আশীর্বাদ :

"অগ্রসর হও পৃথিবীর পথে। ধ্বংস হও, যদি আমি তোমাকে নির্মাণ করে থাকি। চিরজীবী হও—যদি স্বয়ং মাতা তোমাকে নির্মাণ করে থাকেন।"১৫

নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন :

"স্বামীজীর কাছ থেকে বিদায় নেবার অর্থ যুদ্ধপতাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়া।"১৬

॥ ৫ ॥ নিবেদিতার মনের সম্পূর্ণ রূপান্তর : রাজানুগত্যের বিলয়

নিবেদিতার মন দ্রুত বদলাচ্ছিল। কাশ্মীরের ঘটনার সূত্রে তিনি নেল হ্যামণ্ডকে যে-চিঠি লেখেন (৪.১.১৮৯৯), তার মধ্যে তাঁর পূর্বতন রাজনৈতিক জীবনের ইঙ্গিত আছে। নেল হ্যামণ্ড বোধহয় আশঙ্কা করেছিলেন, কাশ্মীরের ঘটনা নিবেদিতাকে রুষ্ট করেছে, তাতে হয়ত তিনি আবার রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়বেন। নিবেদিতা উত্তরে লেখেন :

"তোমার রাজনীতি-সংক্রান্ত সতর্কবাণীর উত্তর দিয়ে উঠতে পারিনি। মিঃ বীটীর আচরণ দেখে আমার মন ভেঙে গিয়েছে। [ইনি যে নিজ কাগজে কাশ্মীর-প্রসঙ্গ প্রকাশ করতে রাজি হননি, তা আগেই বলেছি]। আমি ভেবেছিলাম—তিনি সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার চান। যাইহোক, তোমাদের কাউকে না কাউকে এই ব্যাপারটা প্রকাশ করার ভার নিতে হবে। বাদবাকি বিষয় সম্বন্ধে, প্রিয় নেল, আমি কোনো উগ্রপথ অবলম্বন করব না। তোমরা যা বলো তাই ঠিক, আমার বর্তমান কর্মক্ষেত্র এখানেই ; তাকে সহসা ছেড়ে দেবার কোনো চিন্তাই আমার মাথায় নেই ; হয়ত আমি ভয়ানক কিছু কথাবার্তা বলে ফেলেছি ; হয়ত 'রাজনীতির' কথা বলা আমার পক্ষে ভুল হয়েছে ; কিন্তু যে-কোনো ভাবেই হোক আমি নিশ্চিত বোধ করছি যে, তীব্র গভীর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের এবং আমাদের ইংরাজজাতির ভূমিকার চেহারা জানানোর অধিকার আমাকে দেওয়া হবে, আর শীঘ্র বা বিলম্বে আমার কাজ যথার্থ রাজনীতি বলে গৃহীত হবে।

"কাজে যদি নাও হয়, কাজের প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক হয়ে দাঁড়াবে। আমি স্বীকার করি রাজনীতির খেলায় আমার কোনো নৈপুণ্য নেই, কিন্তু মূলে শক্তিগুলিকে যাঁরা নাড়া দেন তাঁরা জুয়া খেলেন না, তাঁরা হাড় পর্যন্ত ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ।

---

১৪ ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ৩০৮-৯।
১৫ ঐ, ২২৫।
১৬ ঐ, ২২০।

"ইতিমধ্যে স্যার এ ট্যালবটের কার্যাবলী অতি অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে, তার ফল যাই হোক। আমাকে অনুগ্রহ করে এ-ব্যাপারে সাহায্য করো।"

রাজানুগত্য বজায় রাখার জন্য নিবেদিতার বাসনা ক্রমাগত আঘাতে-আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল এরই মধ্যে ; ডাঃ বসুর বিজ্ঞান-সাধনায় বাধাসৃষ্টির জন্য শিক্ষাবিভাগের ইংরাজ কর্মচারীদের ধারাবাহিক নীচ চেষ্টার কথা নিবেদিতা জানলেন। সে-বিষয়ে সংবাদ দেবার পরে মিসেস ওলি বুলকে তিনি লিখলেন ২৬.৪.১৮৯৯) : "আমি আমার দেশবাসীকে ঘৃণা করি। তারা এত নীচ!" একই চিঠিতে তিনি নিজের আনুগত্য বদলের কথা খোলাখুলি জানালেন :

"তোমার মনে পড়ে, কিভাবে স্বামীজীকে বলেছিলাম—আমি কখনো ইংরেজের পতাকাকে নমিত করতে পারব না? এখন কিন্তু আর আমি ইংরেজের পতাকার সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না। আমার পক্ষে আকাশে ওড়া যেমন অসম্ভব, এও তাই। দেখতে পাচ্ছি, এদেশে ইংরেজের প্রতিপত্তির দিন এখনো শেষ হয়নি। সেই দিন কবে আসবে—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তারই কামনা করছি। প্রার্থনা করি, পুনর্জন্ম নিয়ে আমি যেন আমাদের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার দিনটিতে ধ্বনি তুলতে পারি—'জয় তরুণ ভারত!'—যেমন ধ্বনি তুলেছিল ইতালির স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনগুলিতে ম্যাৎসিনীর পাশে দাঁড়িয়ে তরুণতম, ব্যগ্রতম, নবদলভুক্তরা।"

এর পরে নিবেদিতা ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি পাশ্চাত্যযাত্রা করেন—স্বামীজী, তুরীয়ানন্দ-স্বামী প্রভৃতির সঙ্গে। যাত্রাকালে তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে পূর্বোক্ত কালী-দর্শন বা মৃত্যুদর্শন সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন, তা তাঁর "কালী দি মাদার" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন, যে-বইটির প্রভূত প্রভাব পড়ে বিপ্লব আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের মনে। অল্প-দিনের মধ্যে নিবেদিতা স্বামীজীকে গণবিপ্লবের ভবিষ্যদর্শনের এক অসাধারণ উন্মাদনার ক্ষণে দর্শন করেন। নিবেদিতার মনে হয়েছিল, তিনি যেন সেই খ্রীস্টকে স্বচক্ষে দেখছেন যিনি জ্বলন্ত চোখে খ্রীস্টধর্মের সূচনার দিনগুলিকে লক্ষ্য করছেন, যখন খ্রীস্টধর্মের নূতন শিকড়গুলি রোমসাম্রাজ্যের ভিত্তিতে প্রবেশ করে তাকে গ্রাস করছে। প্রলয়ের আলো চোখে নিয়ে বিবেকানন্দ দেখেছেন—জাতিসমূহের আলোড়িত মিশ্রণ, ভয়াবহ সংক্ষোভ, বিপর্যয়, তারই মধ্য দিয়ে পরবর্তী যুগের উদয়; কলিযুগের প্রচণ্ড আকার ; টাকা তার ঈশ্বর, দুর্বলের প্রতি উৎপীড়ন তার স্বভাবধর্ম।১৭

এইসময়ে বুয়োর যুদ্ধের ধ্বংসলীলার সংবাদে সংবাদপত্রগুলি পূর্ণ। নিবেদিতার মনে তার প্রতিক্রিয়া নিদারুণ। লিখলেন (৬.১২.১৮৯৯) :

"চিঠি লিখতে বসেছি, এমন সময়ে রাস্তায় চীৎকার শুনলাম—'এক্সট্রা স্পেসাল! এক্সট্রা স্পেসাল! বুয়োর যুদ্ধের খবর!' তখন সভয়ে শিউরে বুঝলাম—তুমি আমি যেকথা নিয়ে হাসাহাসি ও মজা করছিলাম, সেটা এখানে-ওখানে কোনো-কোনো মানুষের লাভলোকসানের ব্যাপার নয়—বিরাট বিশ্বসমস্যা। তারপরেই আমার সাহস ও শক্তির প্রত্যাবর্তন। সিংহাসন টলে পড়ুক, জাতির অবস্থান-বিপর্যয় হোক, সবকিছুর মুখোমুখি হবার শক্তি আমাদের আছে, সংগ্রামে নির্ধারিত অংশ আমরা নিতে পারব, কারণ আমাদের কাছে 'ওয়াহ্ গুরু' ধ্বনি আবার ফিরে এসেছে।"

১৭ সমকালীন, ৩য়, ৪৬৭-৬৮।

চতুর্থ অধ্যায়

বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিন ও নিবেদিতা

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি দেখা গেল—নিবেদিতার মন প্রিন্স ক্রপটকিনের চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে মথিত। নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তায় তিনজনের বিশেষ প্রভাব—জোয়ান অব আর্ক, জোসেফ মাৎসিনী এবং ক্রপটকিন। কালগত কারণে প্রথম দুইজনের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটতে পারে না। ক্রপটকিনকে নিবেদিতা ব্যক্তিগতভাবে জানতেন।

ক্রপটকিনের সঙ্গে কখন নিবেদিতার প্রথম পরিচয় হয়, সে সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। লিজেল রেম'-র মতে, ঐ পরিচয় ঘটে ১৮৯৪ সাল নাগাদ, অর্থাৎ নিবেদিতার ভারতে আগমনের আগেই। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, উভয়ের প্রথম পরিচয় হয় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি, ইউরোপে, মিসেস ওলি বুলের মধ্যস্থতায়।১ এখন, লিজেল রেম' যদি এই বিষয়ের সংবাদ নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসনের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকেন তাহলে এক্ষেত্রে তাঁর কথাই গ্রাহ্য। রেম' লিখেছেন: ১৮৯৪ সালে এক সন্ধ্যায় 'ফ্রি আয়ারল্যান্ড' গোষ্ঠীর এক জমায়েতে ক্রপটকিন বক্তৃতা করতে এসেছিলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে মার্গারেট নোবলের পরিচয় হয়। মার্গারেট এই বিখ্যাত বিপ্লবীকে দেখবার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। ক্রপটকিনের কণ্ঠস্বরে মার্গারেট যেন পিতার কণ্ঠস্বর শোনেন, তাঁর মধ্যে দেখেন যথার্থ নেতাকে। পরে তিনি লন্ডনের উপান্তে যেখানে ক্রপটকিন থাকতেন সেখানে প্রায়ই যেতেন এবং ক্রপটকিন দম্পতির সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনা করতেন। ক্রপটকিন বলতেন, 'বিপ্লব, দ্রুততর বিবর্তন ছাড়া কিছু নয়।' মার্গারেট তাঁর আইরিশ বন্ধুদের সঙ্গে এই উক্তির বিশেষ পর্যালোচনা করতে ভালবাসতেন।২

এই পর্বে প্রিন্স ক্রপটকিন কী ছিলেন—সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যায়।

প্রিন্স পিটার আলেকসিভিচ ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১) তখন ইংলন্ডে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। তাঁকে ঘিরে ছিল আদর্শের ও ত্যাগের জ্যোতির্মণ্ডল। অভিজাত বংশের সন্তান তিনি, সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের পার্ষদ-কর্মচারী-দলভুক্ত। কিন্তু জার রাজসভা-জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে আমীর কসাক অশ্বারোহী বাহিনীতে অপেক্ষাকৃত গৌণ চাকরি নিয়ে সাইবেরিয়ায় চলে যান। সেখানে পাঁচ বছর চাকরিকালে 'সরকার-নিয়ন্ত্রিত শাসনশৃংখলায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং বনভূমের জীবজন্তুর আচার-আচরণের মধ্যে অধিকতর শিক্ষণীয় জিনিস দেখতে পান।... ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনাদিরও ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করেন।' সেইসময়ে জৈব বিষয়ে চার্লস ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিস্' ছিল বহু-বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ, তার সিদ্ধান্তসমূহ

---

১ পেট্রিয়েট-প্রফেট, ৩৩১।

২ 'ডেডিকেটেড', ২৯।

অকাট্য বলে গৃহীত। কিন্তু ক্রপটকিন তাঁকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বলেন, "ডারউইন-কথিত সামাজিক জীবনের বর্বর নিয়মসমূহকে পারস্পরিক সহযোগিতা তত্ত্ব (*mutual aid*) দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে খণ্ডন করা যায়। পারস্পরিক সহযোগিতা নীতি উচ্চতর জীবজন্তুর মধ্যে, এমনকি শ্বাপদদের মধ্যেও বর্তমান।" "একই প্রজাতির পশুদের জীবন নিষ্ঠুর ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষে পূর্ণ, এবং সেই ব্যাপারটি তাদের জৈব জীবনের উপর পূর্ণাধিকার বিস্তার করেছে—ডারউইনপন্থীদের এই মতের সত্যতা ক্রপটকিন জীব-জগতে দেখতে পাননি। তাঁর সিদ্ধান্ত—মনুষ্যজাতি যদি উচ্চতর জীবগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত আচরণের শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে তারা লাভবান হবে।"

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ক্রপটকিন সুইজারল্যাণ্ডে প্রখ্যাত অ্যানার্কিস্ট এম এ বাকুনিনের সঙ্গে পরিচিত ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। সুইজারল্যাণ্ডে তিনি জুরা ফেডারেশনের ঘড়ি-নির্মাতাদের সঙ্গে বাস করেছিলেন। পরিশ্রমী, কুশলী, সৌহার্দ্যযুক্ত ঘড়ি-নির্মাতা শিল্পীগোষ্ঠীর ব্যবহারনীতি তাঁর কাছে সামাজিক সহযোগিতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ছবি এনে দেয়—যার উপরে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ নেই। "এইখানেই আছে সুশৃংখল সুখী নৈরাজ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

অল্পদিন পরে ক্রপটকিন রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য কারারুদ্ধ হন। দু'বছর পরে পালিয়ে গিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয় নেন—সেখানে ১৮৮১ পর্যন্ত থাকেন। ঐ সময়ে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার খুন হন, ক্রপটকিনকে ষড়যন্ত্রকারী বলে সন্দেহ করা হলে তিনি ফ্রান্সে চলে যান; সেখানে গ্রেপ্তার করে তাঁকে পাঁচ বছর জেল দেওয়া হয়, কিন্তু মেয়াদের আগেই ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে মুক্তি পান। তারপর ইংলণ্ড গিয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন। নির্বাসনের জীবনকালে তিনি প্রবন্ধ লিখে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন। বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ছিল অ্যানার্কিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক রূপ—তবে একইসঙ্গে ভূগোল ও সংহত কৃষিকার্য সম্বন্ধেও লিখতেন।

ইংলণ্ডে আসার অনেক আগেই ক্রপটকিন ১৮৭২ সালে সোস্যালিস্ট ইনটারন্যাশন্যালে [প্রথম ইনটারন্যাশন্যাল] যোগদান করেছিলেন। বাকুনিনের অনুগামীরা ইনটারন্যাশন্যালের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলে তিনিও তা করেন এবং তাদের সঙ্গে একত্রে জুরা ফেডারেশনে নিজেকে যুক্ত করেন। ক্রপটকিন সোস্যালিজম বা কমিউনিজমকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। কমিউনিস্টদের মতো তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলয় চেয়েছেন, একইসঙ্গে কিন্তু অবিলম্বে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপও চেয়েছেন। "অ্যানার্কিস্ট সমাজ গোড়া থেকেই উৎপাদকদের স্বাধীন সমবায়ের দ্বারা গঠিত হবে; আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে, বিনা শক্তিপ্রয়োগে, শিথিল ফেডারেশন স্থাপিত হবে। কমিউনিস্টরা কিন্তু এই ব্যবস্থা দূর ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখার পক্ষপাতী।"[৩]

১৯ শতকের শেষ দশকেই ক্রপটকিন প্রতিষ্ঠিত লেখক। নিবেদিতা তাঁকে সৃষ্টিশীল চিন্তাবীর ও লেখক হিসাবে জেনেছেন।[৪] কিন্তু তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য বিরাট মানবতাবাদী

---

৩ ক্রপটকিন সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি পেয়েছি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (১৩ খণ্ড, ১৯৭৩ সংস্করণ) এবং এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা থেকে।

৪ নিবেদিতার জীবনকালে প্রকাশিত ক্রপটকিনের কয়েকটি বই:
1885: *Paroles d'un revolte.* 1892: *La Conquete du pain.* 1896: *L'*

ক্রপট্‌কিনের উদ্দেশ্যেই। "ক্রপট্‌কিনের বোহিমেবী, প্রায় ঋষিজনোচিত চরিত্র, কৃচ্ছ্রকঠোর জীবনকে সানন্দে সহ্য করার শক্তি—তাঁর অ্যানার্কিস্ট আন্দোলনের পক্ষে প্রভূত সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল।"৫

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দ যখন ফ্রান্সে আছেন তখন তাঁর সঙ্গে ক্রপট্‌কিনের দীর্ঘ আলাপ হয়। কুমুদবন্ধু সেন রেমঁ-কে সাক্ষাৎকারকালে একই কথা বলেছেন, যদিও অপর কোনো বিবেকানন্দ-জীবনীতে এই ঘটনার সমর্থন নেই, নিবেদিতার চিঠিতেও কোনো উল্লেখ পাইনি।৬

নিবেদিতার সঙ্গে এইকালে ক্রপট্‌কিনের বিশেষ যোগাযোগ হয়েছিল, তা আমরা ধরে নিতে পারি। প্রচণ্ড গতিশীল চরিত্রের ঐ নারী, ভারতে বৃটিশ শাসনের অনৌচিত্য সম্বন্ধে যখন স্থিরনিশ্চয় হলেন, এবং অস্থির হয়ে পড়লেন ঐ শাসনকে উৎখাতের চিন্তায়—ঠিক তখনি ক্রপট্‌কিনের মতাদর্শ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। অ্যানার্কিস্ট ক্রপট্‌কিনের মতবাদকে ভারতীয় পটভূমিকায় প্রয়োগের ইচ্ছা করে নিবেদিতা যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে তার বিশেষ মূল্য আছে। পরাধীন ভারতীয়রা কিভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবে, কিভাবে

Anarchie, sa philosophie, son ideal. 1898: *Fields, Factories and Workshops.* 1899: *Memoirs of a Revolutionist (two vols.).* 1902: *Mutual Aid, a Factor of Evolution.* 1903: *Modern Science and Anarchism.* 1906: *L' Etat, son role historique.* 1909: *Terror in Russia.* [এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে সংকলিত]

৫ একই গ্রন্থ।

৬ ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "স্বামীজী পাশ্চাত্যে থাকার সময়ে পিটার ক্রপট্‌কিন লণ্ডনে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন (স্বামীজীর সঙ্গে ক্রপট্‌কিনের সাক্ষাৎ হয় প্যারিস ইনটার-ন্যাশন্যাল এগজিবিশনে), তখন প্লেখানফের দল খুবই সক্রিয়, এবং লেনিন তখনো শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন নি। প্যারিসে স্বামীজীর সঙ্গে ক্রপট্‌কিনের কোন্ কথাবার্তা হয়েছিল তা কেউই জানেন না। তাঁরা একবারই মিলিত হয়েছিলেন। স্বামীজীর কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য শিষ্য ক্রপট্‌কিনের অত্যন্ত অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। এঁরা আমার কাছে সর্বদাই ক্রপট্‌কিনের বিষয়ে বলতেন।" [পোট্রিয়ট-প্রফেট, ভূমিকা পৃ. ৯]

স্বামীজীকে প্রত্যক্ষ জানতেন কুমুদবন্ধু সেন; তিনি ২১.১.৪৮ তারিখে রেমঁ-কে বলেন:

"ইউরোপে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ক্রপট্‌কিনের দীর্ঘ আলোচনা হয়। কথাবার্তার বিষয় গোপন ছিল, তবে আলোচনার পরে স্বামীজী বলেন, ভারত কখনো জাপান বা রাশিয়া হবে না, তাকে নিজের আদর্শের উপরই নির্ভর করে দাঁড়াতে হবে। তাকে সকল বর্ণের মানুষ নিয়ে সরকার তৈরী করতে হবে, বর্ণগুলির মধ্যে কোনো উচ্চম্মন্যতার ভাব থাকা চলবে না। বর্ণভেদ চলে গেলেও কিন্তু বর্ণগুলির গুণরূপ বর্তমান থাকবে। ঐ সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাজ্ঞ মানুষ, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী এবং শ্রমজীবী থাকবে—সকলেরই সমান মর্যাদা। প্রথম কাজ জনগণের শিক্ষা।" [রেমঁ-সংগ্রহ]।

স্বামীজী যে ক্রপট্‌কিনের দ্বারা কোনোভাবে প্রভাবিত হননি, তা ভূপেন্দ্রনাথ পরিষ্কার জানিয়েছেন। [পোট্রিয়ট-প্রফেট, ভূমিকা, ১১]।

সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে স্বদেশের সামাজিক সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী ক'রে তুলে উপরে-চাপানো ইংরাজের সাম্রাজ্যিক শাসন-কাঠামোকে অকেজো ক'রে দিতে পারবে, তার পরিকল্পনা নিবেদিতা ক্রপটকিনের চিন্তাসূত্রে প্রস্তুত করেছিলেন, এবং স্বীকার্য, এক্ষেত্রে নিবেদিতার চিন্তা, চার বৎসর পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনার (সেইসঙ্গে অরবিন্দ, বিপিন পাল বা মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পরিকল্পনার) পূর্বসূরী। অধিকন্তু বলা যায়, নিবেদিতার চিন্তা রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মতো নিরুপদ্রব সামাজিক চিন্তামাত্র ছিল না—তার একটা দারুণ রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ছিল। নিবেদিতাকে কেউ-কেউ নিহিলিস্ট বলেছেন,৭ অপরপক্ষে আত্মপ্রাণা প্রভৃতি লেখিকারা নিবেদিতার সাংগঠনিক প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেকথার প্রতিবাদ করেছেন। আমাদের মনে হয়, যাঁরা নিবেদিতাকে নিহিলিস্ট বলেছেন তাঁরা অ্যানার্কিস্ট ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কসূত্রেই ওকথা বলেছেন : এবং, স্মরণ করানো যায়, ক্রপটকিনের অ্যানার্কিজম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরোধী হলেও সামাজিক সংগঠন ও সমবায়কে অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করেছিল।

১৮ অগস্ট, ১৯০০ তারিখে লেখা নিবেদিতার যে-পত্রে ক্রপটকিনের সূত্রে নিজ রাজনৈতিক ভাবনা প্রকাশিত, সেটি খুবই দুঃখের বিষয়, অত্যন্ত খণ্ডিত। সেটি কাকে লেখা তাও বোঝবার উপায় নেই। তবে উক্ত পত্রের বক্তব্যকে নিবেদিতা এমনই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন যে, এমনও বলেন—তিনি সত্বর মারা গেলে ঐ পত্র হবে তাঁর 'Last Will and Testament.' পত্রের গোড়ার দিকে মনে হয় নিবেদিতা ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছিলেন।

নিবেদিতার পত্রের যে-অংশ পেয়েছি তা এই :

> "ক্রপটকিন অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে অধিক মাত্রায় ভারতের প্রয়োজন কী, তা জানেন। গভর্নমেন্টগুলির সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়তার কথাই আমি বিশেষ-ভাবে বলতে চাইছি। ঐ জিনিসটিই আমরা শিখতে চাই। ঐ জিনিসটি শেখার পরে জনগণের রক্ত ও স্নায়ুর মধ্যে তাকে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে সক্রিয় ক'রে তুলতে চাই—যাতে কখনো কোনো রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রই যেন একটি কৃষকের উপরও চেপে বসার সুযোগ না পায়। এক্ষেত্রে ভারতের সিংহাসনে কে বসলেন —ইংলণ্ডের সপ্তম এডওয়ার্ড কিংবা রাশিয়ার জার—তাতে কিছু এসে যায় না। ভারতের যথার্থ আশা তার জনগণের শিক্ষার উপরে। কিভাবে এই ধরনের শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর, সে সম্বন্ধে ক্রপটকিন স্বয়ং বহুবর্ষের দীর্ঘ প্রচার-কার্য, রচনা, মুদ্রণ, বক্তৃতাদির কথা বলেছেন—যার ফল কেবল এখানে-ওখানে অপ্রত্যাশিত ক্ষণে দেখা গেছে।...
>
> "[সিপাহী] বিদ্রোহের নৈরাশ্যজনক ব্যর্থতার বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাবে বলেছি এইজন্য যে, কোনো 'ধারাবাহিক নীতি' তার পিছনে বর্তমান ছিল না। কিন্তু গ্রাম-সমাজব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো সরবরাহ করেছে। ওর তুলনায় অন্য সকল কিছুই জনগণের কাছে অপ্রয়োজনীয়—এই

৭ গিরিজাশঙ্কর "ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে লিখেছেন : "ব্যারিস্টার সুরেন হালদার নিবেদিতার সহিত খুব পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, 'She was a Nihilist of the worst type'" (পৃ. ৩১)।

বিষয়ে জনগণের দৃঢ়কঠিন বিশ্বাসই ভবিষ্যতে একমাত্র 'নীতি'-রূপে হয়ত স্থায়ী ও ধারাবাহিক ব্যাপার বলে প্রমাণিত হবে। সুতরাং এখন দেখতে পাচ্ছি—আমাদের কী করতে হবে। ইংলণ্ড, রাশিয়া বা অন্য কোনো সরকারের ভাবনা নয়—চাই অ্যানার্কির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর ভারত ইতিমধ্যেই যেহেতু পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য দেশ, তাই আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ঠিক বর্তমানে একমাত্র ভারতেই একটি বিরাট জাতি সমগ্রভাবে ঐ [গ্রাম-স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের] কাজে নিয়োজিত আছে। এখানেই তাই পৃথিবীর সমস্যাসমূহের সমাধান হবে। যুদ্ধ নয়, রক্তপাত নয়—একদিন আমরা প্রশান্তভাবে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁকে সহাস্যে জানিয়ে দেব—তাঁকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। যতদিন না তা হচ্ছে, ততদিন ঐ উদ্দেশ্যে অন্য কিছু যদি ক'রে উঠতে না পারি—তবু অন্ততঃ প্রত্যেক রাজতন্ত্রকে ধ্বংস হতে দেখলে আনন্দিত হব। এই চিঠিটি নকল ক'রে তাদের দিও যারা আমার শেষ উইল ও বিশ্বাসের ঘোষণা জানতে চায়।"

আলোচ্য পর্বে (১৮৯৯-১৯০২) এবং তার পরেও নিবেদিতার পত্রে ক্রপটকিনের অনেক উল্লেখ আছে। ক্রপটকিন-পরিবারের সঙ্গে তাঁর রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এমন যে, সাংসারিক প্রয়োজনেও মাদাম ক্রপটকিনের সাহায্য নিতেন। [ফরাসি ভৃত্য খুঁজে দেওয়ার ব্যাপারে মাদাম ক্রপটকিনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা নিবেদিতা বলেছেন ১৫.৫.১৯০৯, পত্রে]। মাদাম ক্রপটকিন এক পত্রে নিবেদিতার সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। [এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৪৬৪]। স্বয়ং ক্রপটকিনও এক পত্রে নিবেদিতার প্রতি প্রীতিজ্ঞাপন করেছেন। [ঐ, ৪৬৪]। ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন, "নিবেদিতা ও মিসেস ওলি বুল ক্রপটকিনের বিশেষ বন্ধু।"৮ ইনি ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ, ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে ক্রপটকিনের বার্তা, ক্রপটকিনের গ্রন্থ সম্বন্ধে নিবেদিতার উৎসাহের সংবাদ দিয়েছেন।৯

---

৮ পেট্রিয়ট-প্রফেট, ১১১।

৯ ভূপেন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থে ক্রপটকিন-নিবেদিতা সংবাদ ছড়িয়ে আছে। 'দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' গ্রন্থে তিনি নরওয়েতে এক গ্রীষ্মকালে ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপের কথা বলার পরে লিখেছেন: "নিবেদিতাকে ক্রপটকিন তাঁহার যত শিষ্য-শিষ্যা শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের ফটো এক-এক করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং কী প্রকারে তাঁহারা শহীদ হইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতেছিলেন। আমার জেলে যাইবার পূর্বে নিবেদিতা আমাকে এই গল্প বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনেক ইংরাজ ও আমেরিকান শিষ্যরা এই রুশ অ্যানার্কিস্ট নেতার বন্ধু ছিলেন।"

'পেট্রিয়ট প্রফেট' বইয়ে ভূপেন্দ্রনাথ নরওয়েতে ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার উপরিউক্ত আলোচনার প্রসঙ্গে লিখেছেন: "সেখানে ক্রপটকিন নিবেদিতার কাছে নিজের সন্ত্রাসবাদী শিষ্যগণের ট্রাজিক ভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করতেন।...১৯০৭ সালে আমার জেলে যাওয়ার আগে নিবেদিতা আমায় কাছে রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের চরিত্র ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। তাঁর মতে, এ সংগ্রাম—সম্পন্ন ও সর্বহারাদের মধ্যে নয়। তিনি বলেছিলেন অভিজাতরা উভয় পক্ষেই আছেন।

কেবল বিপ্লবী রাজনৈতিক হিসাবে নয়, মানুষ ও মনীষীরূপে ক্রপটকিনকে নিবেদিতা অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা করেছেন। অধ্যাপক ম্যাভরের এই কথাটা নিবেদিতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন—"ক্রপটকিন...ইউরোপের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ব্যক্তি—প্রথমজন হলেন টলস্টয়।" [পত্র, ১১.৪.১৯০৬]। প্যাট্রিক গেডেসের কাছে সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপারে নিবেদিতা ঋণী—সেই ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করার পরে তিনি লিখেছেন : "কিন্তু আমি অনুভব করি, ক্রপটকিনের মানবতাবোধ যেন বৃহত্তর, এবং নির্দেশাদির ব্যাপারে তিনি অধিকতর নির্ভর-যোগ্য।...স্বামীজী ক্রপটকিনকে ভালবাসতে পারতেন।[২৩·৪·১৯০৩]"১০

কেবল চিন্তাক্ষেত্রে মহান মানবতা নয়, ক্রপটকিনের ব্যক্তিগত জীবনেও তার প্রকাশ নিবেদিতা দেখেছিলেন।—"এই রুশ মানুষগুলির হৃদয়ে সর্বদাই অপর অভাবী দেশগুলির প্রয়োজনের স্বীকৃতি আছে। এঁদের ভালবাসা কোনো একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সমগ্র গণমানুষের জন্যই এঁদের প্রেম—আর এঁরা জানেন যে, দুনিয়ার জনগণ এক।"১১ নিঃস্বার্থ জ্ঞানচর্চায় আত্মনিবেদিত মানুষকে নিবেদিতা ঋষি বলে মনে করতেন। ডারউইন তাই তাঁর কাছে 'মহান ঋষি' এবং "ইংলণ্ডে শ্রমজীবীর কুটীরবাসী ক্রপটকিন—মানুষকে নতুন ধরনের 'পারস্পরিক সাহায্যের' নীতি গ্রহণে প্রণোদিত করবার জন্য রুদ্ধশ্বাসে কর্মরত—তিনি কি এক নব বার্তাবহ নন?"—নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন।১২ এমনই একজন মানুষের কাছে শিক্ষা নেবার জন্য নিবেদিতা তাঁর দলের বিপ্লবী যুবক জি এন মুখার্জিকে পাঠাতে ইচ্ছা করেছেন। [পত্র, ৩.৮.১৯০৫]।

ক্রপটকিনের 'পারস্পরিক সহায়তা' (Mutual Aid) তত্ত্বকে নিবেদিতা একটি

এর থেকে মনে হয়, তিনি প্লেখানফের দ্বারা সূচিত মার্কসীয় আন্দোলনের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তিনি রাশিয়ার কথা রাজবংশীয় অ্যানার্কিস্ট ক্রপটকিনের কাছ থেকে শুনেছিলেন। [পৃ. ১১৮]।

ভূপেন্দ্রনাথের শেষোক্ত বক্তব্য মোটেই স্বীকার্য নয়। নিবেদিতা প্লেখানফ-প্রবর্তিত মার্কসীয় আন্দোলনের কথা শোনেন নি, এমন হতেই পারে না, কারণ ঐকালের ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় ও-সম্বন্ধে নানা সংবাদ বেরিয়েছে। তবে নিবেদিতা প্লেখানফের মত মানতেন কিনা, সে প্রশ্ন সহজেই করা যায়। যাইহোক, ভূপেন্দ্রনাথের লেখায় আরও পাই : "১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মিসেস ওলি বুলের মারফত ক্রপটকিন ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন : '১৯০৬ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে রুশ বিপ্লবীদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা দেখে সাবধান হও। ওরা পরস্পরকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।'" [পৃ. ১১৯–২০]।

ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন : "আমার জেলে যাবার আগে ভগিনী নিবেদিতা আমাকে প্রিন্স ক্রপটকিনের 'কেরিয়ার অব এ রিভলিউসানিস্ট ইন রাশিয়া অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ প্রিজন' বইটি...উপহার দিয়েছিলেন। জেলে যাবার আগেই তিনি আমাকে ক্রপটকিনের বইগুলি পড়তে অনুরোধ করেছিলেন।।" [ঐ, ১১৯]

১০ নিবেদিতা লিখেছিলেন : "Swamiji would have loved Kropotkin, I think." এই কথাগুলির ঠিক তাৎপর্য কি? নিবেদিতা কি বিবেকানন্দ-ক্রপটকিন সাক্ষাতের কথা জানতেন না?

১১ মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮।

১২ নিবেদিতা রচনাবলী, ৩য়, ৪৫০-৫১।

মহান মানবতাবাদী তত্ত্ব বলে মনে করেছেন—যার মূল আকার তিনি ক্রপটকিনের বই বেরুবার অনেক আগেই স্বামীজীর মধ্যে দেখেছেন।১৩ এই বইটির জন্য, নিবেদিতার মতে, ক্রপটকিন "আধুনিক সোসিওলজিস্টদের সম্রাট", যিনি "কার্যকর উপায়ে দেখিয়েছেন—পারস্পরিক সহায়তা, সমবায়, স্ব-সংগঠন—পারস্পরিক প্রতিযোগিতা অপেক্ষা জীবনের উচ্চতর বিবর্তনের ক্ষেত্রে, এবং সমাজের উন্নতিমুখী সাফল্যের ক্ষেত্রে, অধিক শক্তিশালী উপাদান-কারণ।" নিবেদিতা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন : "আমার মতে, এখানে আমরা নতুন একটি যুগে প্রবেশ করছি যেখানে পারস্পরিক সহায়তা ও স্ব-সংগঠন হবে আদর্শনীতি।"১৪

নিবেদিতা "মিউচুয়াল এড্" বইটির বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারতে (ডিসেম্বর, ১৯০৭) আলোচনা করেন। তার মধ্যে তিনি মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে ক্রপটকিনকে স্থাপন করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হারবার্ট স্পেনসারের "ডক্ট্রিন্ অব দি সারভাইভ্যাল অব দি ফিট" এবং চার্লস ডারউইনের "অরিজিন অব দি স্পিসিজ্"—এই বই দুটি জীবজগতে টিকে থাকার জন্য অবিরাম সংঘাতের ছবি তুলে ধরেছিল। এক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন টমাস হাক্সলি ; সেইসঙ্গে মেটারলিঙ্ক—তাঁর "দি লাইফ অব দি বী" গ্রন্থে। নিবেদিতার মতে, বিবর্তনবাদকে ক্রপটকিন তাঁর "মিউচুয়াল এড্" বইয়ে আরও এক পর্যায় এগিয়ে দিয়েছেন। অ্যানার্কিস্ট ক্রপটকিন এমন একটি বই প্রস্তুত করেছেন যা ডারউইনের মতবাদকে বহুলাংশে খণ্ডন করেছে। ক্রপটকিন দেখিয়েছেন : "জাতিসমূহের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সংঘাত, রক্তপাত, পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি,...সহযোগিতা ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহায়তার অনুরূপ বৃহৎ ভূমিকা নেয়নি।" নিবেদিতার আনন্দ এইখানে—ধর্মের শত্রু বলে কথিত ক্রপটকিন ধর্মের মূল সত্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছেন। "ধর্ম যা ঘোষণা করে, [নিবেদিতা লিখেছেন] এখানে বিজ্ঞানের দ্বারা তাই প্রমাণীকৃত হয়েছে। তা হল—যথার্থ সভ্যতা লুণ্ঠনের দ্বারা গতিলাভ করে না, শক্তি আর ন্যায় এক জিনিস নয়, বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্বর সংঘর্ষ যে, কেবল অক্ষমণীয়, তাই নয়, তা স্বার্থ-সহায়ক পর্যন্ত নয় ; তা আগ্রাসীর টিকে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করে না।"১৫

ক্রপটকিনের বৈপ্লবিক রচনাদি ও বক্তব্যকে প্রচার করার জন্য নিবেদিতা কী প্রকার চেষ্টা করেছেন তার উল্লেখ পরে আমরা করব।

---

১৩ "কোনো-কোনো সমাজে নরমাংসভোজন নিত্যকার ব্যাপার—এক ইউরোপীয়ের মুখে একথা শুনে স্বামীজী যে-ধরনের আহত ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, তার রূপ কখনো ভুলব না। উক্ত ব্যক্তির কথা শেষপর্যন্ত শুনে স্বামীজী বলেন, না, ওটা সত্য নয়। ধর্মীয় বলিদান, যুদ্ধ, বা প্রতিহিংসার ব্যাপার না হলে কোনো জাতি কখনো নরমাংসভোজন করে না। বুঝতে পারছ না—ওটা দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবদের রীতিই নয়। ও-রকম করলে যে, সামাজিক জীবনের মূলোচ্ছেদ করা হবে।' এই কথাগুলি যখন বলা হয় তখনও ক্রপটকিনের 'পারস্পরিক সহায়তা' বিষয়ক মহান বইটি বেরোয়নি। বিশ্বমানবের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসা এবং প্রত্যেককে নিজ ভূমিতে দর্শন করবার মতো তাঁর সহজাত সংস্কার তাঁকে ঐ প্রকার অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল।" [নিবেদিতা রচনাবলী, ১ম, ১২৩]।

১৪ নিবেদিতা রচনাবলী, ৪র্থ, ৩১৫।

১৫ নিবেদিতা রচনাবলী, ৫ম, ৩০০-৩০১।

পঞ্চম অধ্যায়

নিবেদিতা কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সিদ্ধান্ত

॥ ১ ॥ বৃটিশ শাসনকে নিবেদিতার প্রচণ্ড আক্রমণ

পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক। নিবেদিতা এখন বৃটিশ সম্পর্কহীন ভারতের জন্য অত্যন্ত অস্থির। ১ নভেম্বর, ১৯০০, লিখলেন: "ভারতের ভরসা ভারতেরই হাতে—ইংলণ্ডের হাতে নয়।" ইংলণ্ডের শুভঙ্কর শক্তি সম্বন্ধে ছিন্নমোহ তিনি—ক্রমেই তিক্ততর হয়ে উঠতে লাগল কণ্ঠস্বর। ১১ জানুয়ারি, ১৯০১ তারিখে ইংলণ্ড থেকে লেখা পত্রে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের ভণ্ডামী, দুমুখো আচরণ সম্বন্ধে বললেন:

"একথা শুনতে খুবই ভালো লাগে যে, আমার দেশবাসীর সামাজিক গুণাবলী আছে। কেউ যদি নিজ পরিধির মধ্যে থাকে তাহলে পৃথিবীতে তার তুল্য কেউ নয়, অবশ্যই। কিন্তু পরিধির বাইরে গেলে তার চেহারাটা কি দাঁড়ায়। সেকথা যেন ভুলে না যাই। স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা যে-সকল কথা বলে থাকি—'পৃথিবীর সকল মানুষের স্বাধীনতা চাই, পৃথিবীর প্রতিটি জাতির প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা চাই'—যেসব কথাকে আমি আমাদের জাতীয় আদর্শ বলে ধরেছিলাম—তাদের অর্থ যখন দেখলাম, তা আর কিছু নয় কেবল ইংরাজদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য ও স্বর্ণশিকার—তখন হায়, আমার কাছে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল—প্রত্যাবর্তনের আর কোনো পথই রইল না। আশঙ্কা হয়, আমার সম্পূর্ণ আশাভঙ্গ হয়েছে, মন চিরতরে তিক্ত হয়ে গেছে। তথাপি এখানে কিছু সৎ ব্যক্তি এখনো আছেন।...কিন্তু কয়েক ব্যক্তির সাধুতাকে ইংলণ্ডের খাতে জমা দেওয়া যাবে না, কারণ ওঁরা নিখিল মানবতার প্রতিনিধি।"

২৯ মার্চ নিবেদিতা লিখলেন: "সাম্রাজ্য কী অভিশাপ!" ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কার্যে নিজ দায়িত্ব স্বীকার করেও লিখলেন (১০ জুন): "আমি কিন্তু একই-সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনকেও অত্যান্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি।...আমার এখন বিশ্বাস হয়েছে, উঠতি ভারতের জন্য, ভারতীয় পুরুষদের জন্য, আমার কিছু করার আছে। সেই 'কিছু'কে আমার দ্বারা কিভাবে করানো হবে, সে ভাবনাচিন্তার দায় জগন্মাতার, আমার নয়।"

এর পরে ১৯ জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে লেখা দীর্ঘপত্রে নিবেদিতা নিজেকে পুরোপুরি খুলে ধরলেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই পর্বে বৃটিশ শাসনের উপর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ অল্পই দেখা যায়। (তু: বিবেকানন্দের মেরী হেলকে লেখা ৩০ অক্টোবর, ১৮৯৯, চিঠি)। "বুয়োর যুদ্ধ ইংরাজদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত অধঃপতন সূচিত করেছে", একথা বলার পরে তিনি লেখেন, "ইংলণ্ডের মধ্যে যা কিছু মহৎ ছিল সবই যেন মরে গেছে। সোনার গুঁড়োর লোভে পাগল একদল পাবলিক স্কুলের ছাত্রকে প্রতিনিধিত্ব করতে দিয়ে ইংলণ্ড পরিতুষ্ট।"

তারপর অগ্নিপ্রবাহ:

"আমি তোমাকে একান্তভাবে বলছি, ভারতের জন্য সরকারের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার কোনোই আগ্রহ নেই। আমার মতে, জনগণ নিজের জন্য নিজেরা করেনি এমন সমস্ত কাজই মন্দ কাজ—যত চমৎকারই তাদের চেহারা হোক। যত দিন যাচ্ছে, ক্রমেই আমি দেখছি, একদা যাকে [যে-মতকে] ব্যক্তির পক্ষে সত্য বলে মনে করেছিলাম, তা সম্প্রদায়-সমূহের পক্ষেও সত্য। শিশুকে ছবি আঁকা শেখাবার শিল্পী শিশুর ছবিতে তুলি বুলিয়ে তাকে চমৎকার ক'রে তুলতে পারেন কিন্তু শিশুর একটা নিজস্ব হিজিবিজি ছবি ঐসব সংশোধিত হাজার-হাজার ছবির চেয়ে অনেক মূল্যবান। দেশ সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। দেশবাসী নিজেরা যা উৎপন্ন করে তা উত্তম, আর তাদের হয়ে যা তৈরী ক'রে দেওয়া হয় তা হল সাজানো রঙিন প্রদর্শনী।

"ভারতের জন্য আমি কিছুই করছি না—আমি শিখছি আর তাড়িৎস্পর্শে শিউরে জাগছি। কিভাবে চারাগাছ বেড়ে ওঠে, তাই দেখতে চাইছি। সেটা বুঝে উঠতে পারলেই মনে হয় আমি জানব যে, ওটিকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার দরকার নেই। ভারত জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন ছিল, সেইসময়ে একদল ডাকাত তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ভূসম্পত্তি ধ্বংস করেছে। ফলে ভারতের তন্ময়ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। ডাকাতের দল তাকে শেখাবে? না। ডাকাতদের খেদিয়ে দিয়ে ভারতকে ফিরে যেতে হবে স্বভূমিতে। এখন এই ধরনের প্রচেষ্টাই ভারতের পক্ষে যথার্থ কার্যক্রম। সুতরাং যতক্ষণ সরকার বিদেশী ততক্ষণ খ্রীস্টান [মিশনারি] বা সরকারের তাঁবেদারদের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া নয়। যা-কিছু ভারতীয়, তা যত তুচ্ছ ও অর্থহীন হোক, তার পাদস্পর্শ করি। বাদবাকি যা-কিছু, তারা যত না ভালো করবে মন্দ করবে অনেক বেশি, তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। হাঁ, আমার পথও কিছু মন্দ করবে, কিন্তু আমার পথ জনগণের পক্ষে মূলগত, অপরিহার্য—ভালো বা মন্দ যাই ঘটুক সে সবই তাদের নিজস্ব, অন্য কারো নয়—তাই ক্ষতির পরোয়া করি না। ভারতের প্রয়োজন আছে তা।

"হে ভারত! ভারত! আমার জাতি তোমার যে ভয়ানক ক্ষতি করেছে, কে তার অপনোদন করবে? হে ভারত! তোমার সন্তানগণের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা সাহসী, তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন, এবং শ্রেষ্ঠ—তাদের উপর এই-যে প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ অপমান বর্ষিত হচ্ছে—কে তার একটিরও প্রায়শ্চিত্ত করবে, বলো?

"ইংলণ্ডে অবস্থান ক'রে ভারতের [মঙ্গলের] জন্য কিছু করার চিন্তাকে কি-না হাস্যকর মনে হচ্ছে বলে বোঝাতে পারব না। ওটা সময়ের নিতান্ত অপব্যয়। তুমি কি ভাবো, ক্ষুধার্ত নেকড়েকে শান্তশিষ্ট শিশু করে তোলা যায়? তাদের বাচ্ছা মেয়ের মতো নম্রমধুর করা যায়? ইংলণ্ডে অবস্থান ক'রে ভারতের জন্য কাজ করার মানে তাই। ইংলণ্ডে কাজ করার দরকার অবশ্যই আছে, কাজ করতেও হবে, সেকাজের রূপ জানো? স্বামীজী, ডাঃ বসু, মিঃ [রমেশ] দত্তর মতো মানুষেরা ইংলণ্ডে এসে নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন—ভারত যথার্থতঃ কী, এবং কী হতে পারে। অবশ্যই এখানে তাঁদের লক্ষ লক্ষ বন্ধু, অনুরাগী ও শিষ্য করতে হবে। ফলে এখন থেকে কুড়ি বছর পরে যখন আঘাত হানা হবে (তা হবেই আমি জানি), তখন সহসা ইংলণ্ডের একদল নরনারী উত্থিত হয়ে বলবে—যে-ভূমিকায় তারা নিজেদের কখনো দেখবে বলে ভাবেনি—'তফাত যাও! এই মানুষ-

গুলি অবশ্যই স্বাধীনতা পাবে।'১ কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে ও-কাজ তো প্রায়শ্চিত্তের, ওটা ভারতের জন্য ইংলণ্ডের কাজ নয়, বুঝলে? আর আমি ঐ [প্রায়শ্চিত্তের] কাজ করার জন্য জন্মাইনি।...

"ভারতে এখন আমরা চাই—কী চাই?—আমরা চাই, পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা যেন আমাদের কাছে আমাদেরই বার্তা বহন ক'রে আনে। ধীর-বিকশিত সংগঠনী শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে আমরা চাই। মনে করো না যে, শিশুশিক্ষা, বৃক্ষরোপণ, বা কৃষিকার্য প্রভৃতির কথা আমি ভুলে গেছি। কিন্তু একইসঙ্গে চাই—আহ্বানের ঝঞ্ঝনা, লক্ষ-লক্ষ মানুষের উন্মাদনা, মৃত্যুপিপাসা। এগুলিকে কোনোমতে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের প্রয়োজনের [বিরাট] আকারের কথা ভাবলে নৈরাশ্যবোধ করি, কিন্তু যখন মনে পড়ে যে, কাল পূর্ণ, এবং আমরা নয়, মা-ই কাজ করেন, তখন সাহস ফিরে পাই।

"স্রোতে গা-ভাসান দেওয়াই এখন আমাদের কাজ—যেখানেই তা নিয়ে যাক। যে-পুরো বাণীটি পেয়েছি তার উচ্চারণ যেন করতে পারি—উত্তাপের ক্ষণটিতে যেন আঘাত হানতে পারি। ব্যর্থ হব না—এই আশা কি সাহসের সঙ্গে পোষণ করব না?

"আমার কাজ—দেখা এবং দেখানো। বাকি আপনিই হবে। 'দর্শনে'র কালই তো সন্ধিক্ষণ।

"আমি কী বোধ করছি, এবং কেন করছি—বুঝতে পারছ? আমার কাছে এখন যে-কোনো মিশনারি একটা সাপের মতো যাকে পায়ে পিষে মারা দরকার। সে যত ভালো করবে তত মন্দ, অন্ততঃ আমার কাছে। ওদের বিষয়ে রায় দেবার জন্য মুহূর্তমাত্র সময় দিতে পারব না। শাস্তি যদি দিতেই হয়, দ্রুত অভিযোগ জানিয়ে তা সমাধা করে ফেলাই ভালো।

"ইংরেজ রাজকর্মচারীরা নির্বোধ। ধূমায়িত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খেলে বেড়িয়ে, তারপর বড় রাস্তায় উঠে তারা চেঁচাচ্ছে—'আমরা ভালো গড়তে পারি।' আর দেশী খ্রীস্টানেরা স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক।

"এইসকল এবং অন্যান্য কেনা তাঁবেদার ও গুপ্তচরদের জন্য ভারতের প্রয়োজন নেই, ধৈর্য নেই। একেবারে ভিন্নধরনের কাজের মানুষ তার চাই, যারা তাকে রক্ষা করবে, কিংবা কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় দেখিয়ে দেবে। কংগ্রেস নির্বোধ সন্দেহ নেই, ক্ষেত্রবিশেষে বজ্জাতও, কিন্তু তারা মিঃ টাটার পরিকল্পনা, বা সোরাবজি-মতলব থেকে দশ হাজার গুণে ভালো। জানা মানুষদের মধ্যে স্বামীজীই সবকিছুর মূলদেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন, জাতীয় মনুষ্যগঠনের কথা বলেছেন, কিন্তু জানি না, ঐসব অন্যতর বিষয়গুলির পরিকল্পনা তিনি করেছেন কি না; মনে হয়না করেছেন।

"আমাকে ভুল বুঝো না। ভারত যদি একবার আত্মরক্ষার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে সে ইচ্ছামতো যে-কোনো বিদেশীকে, খ্রীস্টানকে, এখানে-ওখানে কাজে লাগাতে পারে। সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু বর্তমানে তারা [মিশনারি ইত্যাদিরা] ঘাড় ধরে ভারতকে আফিম-মেশানো মিষ্টি সরবৎ খাইয়ে তার নাম দিচ্ছে শিক্ষা।"

---

১ বিচিত্র কথা, নিবেদিতার ভবিষ্যৎবাণী অন্ততঃ আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। এই চিঠি লেখার কুড়ি বছর পরে ভারতে অসহযোগ আন্দোলন হয়, এবং কিছু উদারনৈতিক ইংরাজ ভারতের স্বাধীনতার সমর্থন করতে থাকেন।

To Sister Nivedita

REVERED AND BELOVED SISTER IN HIM,

We, the members of the Patna Hindu Boys' Association, approach you today with this address of welcome. Your genuine love of Aryavarta, your advocacy of her claims, your sympathetic interpretation of her life and thought, and above all your consecration of yourself to her service, have kindled in every Hindu heart gratitude and joy not unmingled with hope. In the East charity never faileth. What more precious gift can one bestow than one's entire self? And what glorious result might we not expect from your devotion to Hinduism of your fervid enthusiasm, keen insight, untiring energy, and pure devotion? We had hitherto heard of you from afar, and now consider ourselves blessed that you have come in our midst to communicate the vital spark of spirituality to our souls. That we may often see you and learn to profit by your example and precept is our earnest prayer and hope.

Bankipore
the 22nd January } *Yours faithfully*
[illegible] Bose
Secretary

পাটনা হিন্দু বয়েজ অ্যাসোসিয়েশনে নিবেদিতাকে প্রদত্ত মানপত্র (২২-১-১৯০৪)।'

'বিহার বন্ধু' নামক হিন্দী পত্রিকায় (১৫-৪-১৯০৪) 'হিন্দু বালক সভা'-র বাৎসরিক উৎসবে নিবেদিতা-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ বেরিয়েছিল। তাঁর দেহান্তের পরে একই সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভার বিবরণ বেরোয় 'বেহারী' নামক ইংরাজি পত্রিকায় (২৪-১১-১৯১১)। বক্তা ছিলেন, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, জে টি মানসুখানি, কামাখ্যানাথ মিত্র, রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, অধ্যাপক শিবেশ্বর দয়াল প্রমুখ।

SISTER NIVEDITA'S LEAFLETS. No. 2.

SUGGESTIONS FOR THE INDIAN VIVEKANANDA SOCIETIES.

Throughout the length and breadth of India, and especially perhaps in the Southern Presidency, one comes upon towns and villages possessing Vivekananda Societies. A group of students, fired by the glorious name, band themselves together with a vague idea of doing something to justify its adoption and then turn round to enquire — what?

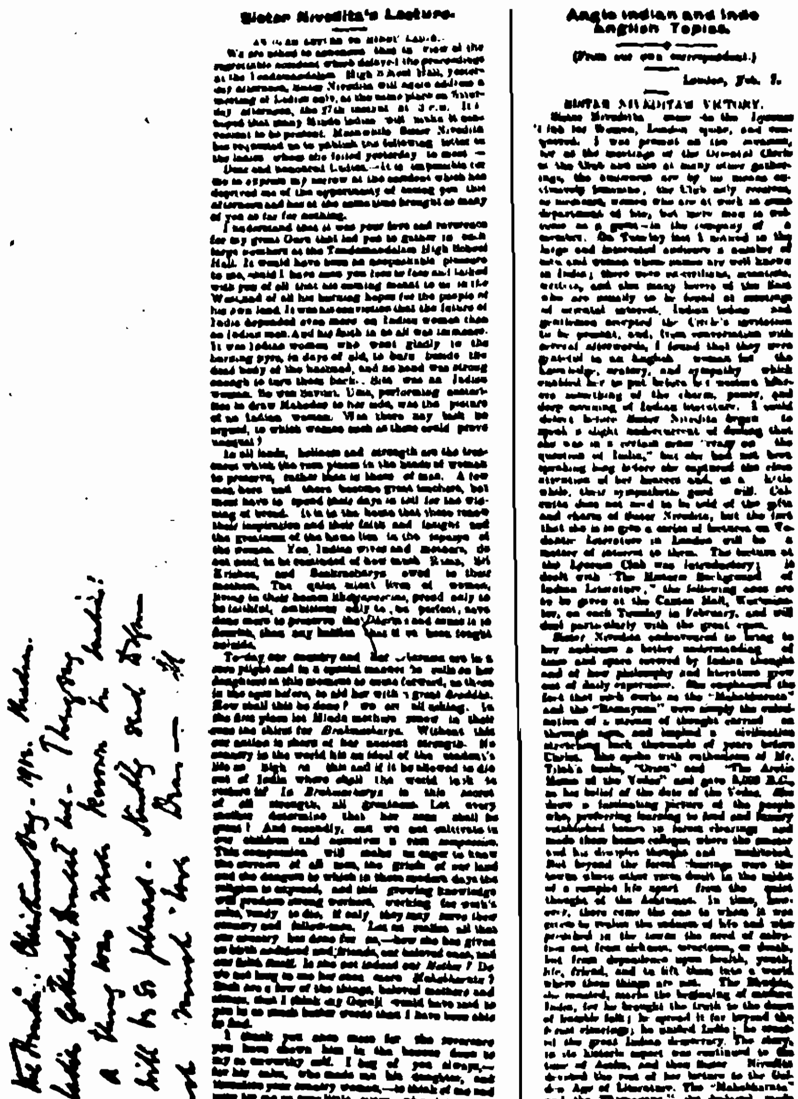
What shall be the main duty of Vivekananda Societies?

In a Western country, the answer would be, Work!

In Protestant lands, there would perhaps be an effort to work and live in the city slums, to assist in local sanitation, to carry on attempts at manual education,—such as wood-carving, or metal and glass work,—or athletic training, or even to organise amusements only, amongst those who were socially lower and less fortunate than the Vivekananda boys themselves.

In Catholic countries, the seven corporal works of mercy [feeding the hungry, giving drink to the thirsty, clothing the naked, nursing the sick, visiting prisoners, harbouring the harbourless, burying the dead], would be the natural expression of the energy of these societies, which would become in effect minor associations of some great religious order, relating themselves to the Order of Ramakrishna, for instance, as their Third Orders are related to the Franciscans and Domincans, or as, amongst women, the Filles de Marie are affiliated to the Society of Jesus.

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিবেদিতা সারাভারতে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'-জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনে আগ্রহী ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে প্রচারিত পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠা।



Sister Nivedita's Lecture.

Anglo-Indian and Indo-English Topics.

(From our own correspondent.)

London, Feb. 7.

SISTER NIVEDITA'S VICTORY.

[বামে] স্বামীজীর দেহান্তের পরে নিবেদিতা জাতীয়তা প্রচারে বক্তৃতা-সফর করেন। মাদ্রাজ 'হিন্দু'-তে প্রকাশিত বক্তৃতা-বিবরণের পাশে এই মন্তব্য তিনি লিখে পাঠান—সম্ভবত মিসেস ওলি বুলকে : "হিন্দু থেকে। বড়দিন ১৯০২। মাদ্রাজ। ১০০০ মহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সমবেত। ওঁরা বললেন, এ-জিনিস মাদ্রাজে পূর্বে ঘটেছে বলে জানা যায়নি। তুমি একথা শুনে কত না খুশি হবে! এটি দয়া ক'রে য়ুম-কে [মিস ম্যাকলাউডকে] পাঠিও।"

[ডাইনে] অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৭-২-১৯০৮) নিবেদিতা-সংবাদ।

The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work.

[BY SISTER NIVEDITA]

Of the bodily presence of him who was known to the world as Vivekananda, all that remains to-day is a bowl of ashes. The light that has burned in seclusion during the last five years by our river side, has gone out now. The great voice that rang out across the nations is hushed in death.

Fate had come often to this mighty soul as storm and pain. But the end was peace. Silently, at the close of evensong, on a dark night of Kali, came the benediction of death. The weary and tortured body was laid down gently, and the triumphant spirit was restored to the eternal samadhi.

He passed, when the laurels of his first achievements were yet green. He passed, when new and greater calls were ringing in his ears. Quietly, in the beautiful home of his illness, the intervening years with some few breaks, went by amongst plants and animals, unostentatiously training the disciples who gathered round him, silently ignoring the great fame that had shone upon his name. *Man-making* was his own stern brief summary of the work that was worth doing. And laboriously, unflaggingly day after day, he set himself to man-making, playing the part of Guru, of father, even of schoolmaster, by turns. The very afternoon of the day he left us, had he not spent three hours in giving a Sanskrit lesson on the Vedas?

External success and leadership were nothing to such a man. During his years in the West, he made rich and powerful friends, who would gladly have retained him in their midst. But for him, the Occident, with all its luxuries, had no charms. To him, the garb of a beggar, the lanes of Calcutta, and the disabilities of his own people, were more dear than all the glory of the foreigner, and detaining hands had to loose their hold of one who passed ever onward toward the East.

What was it that the West heard in him, leading so many to hail and cherish his name as that of one of the great religious teachers of the world? He made no personal claim. He told no personal story. One whom he knew and trusted long had never heard that he held any position of distinction amongst his Gurubhais. He made no attempt to popularise with strangers any single form or creed, whether of God or Guru. Rather, through him the mighty torrent of Hinduism poured forth its cooling waters upon the intellectual and spiritual worlds, fresh from its secret sources in Himalayan snows. A witness to the vast religious culture of Indian homes and holy men he could never cease to be. Yet he quoted nothing but the Upanishads. He taught nothing but the Vedanta. And men trembled, for they heard the voice for the first time of the religious teacher who feared not Truth.

Do we not all know the song that tells of Siva as he passes along the roadside, "Some say He is mad. Some say He is the Devil. Some say—don't you know?—He is the Lord Himself!"? Even so India is familiar with the thought that every great personality is the meeting place and reconciliation of opposing ideals. To his disciples, Vivekananda will ever remain the arch type of the sannyasin. Burning renunciation was chief of all the inspirations that spoke to us through him. "Let me die a true sannyasin as my Master did," he exclaimed once, passionately, "heedless of money, of women, and of fame! And of these the most insidious is the love of fame!" Yet the self-same destiny that filled him with this burning thirst of [illegible]

But he had learnt, not only the hopes and ideals of every sect and group of the Indian people, but their memories also. A child of the Hindu quarter of Calcutta, returned to live by the Ganges-side, one would have supposed from his enthusiasm that he had been born, now in the Punjab, again in the Himalayas, at a third moment in Rajputana, or elsewhere. The songs of Guru Nanak alternated with those of Meera Bai and Tansa Sena on his lips. Stories of Prithi Rai and Delhi jostled against those of Chestore and Pratab Singh, Siva and Uma, Radha and Krishna, Sita-Ram and Buddha. Each mighty drama lived in a marvellous actuality, when he was the player. His whole heart and soul was a burning epic of the country, touched to an overflow of mystic passion by her very name.

Seated in his retreat at Bellur, Vivekananda received visits and communications from all quarters. The vast surface might be silent, but deep in the heart of India, the [illegible] was never forgotten. None could afford, [illegible] fewer wished, to ignore him. No hope but was spoken into his ear, —no woe but he knew it, and strove to comfort or to rouse. Thus, as always in the case of a religious leader, the India that he saw, presented a spectacle strangely unlike that visible to any other eye. For he held in his hands the thread of all that was fundamental, organic, vital; he knew the secret springs of life; he understood with what word to touch the heart of millions. And he had gathered from all this knowledge a clear and certain hope.

Let others blunder as they might. To him, the country was young, the Indian vernaculars still unformed, flexible, the national energy unexploited. The India of his dreams was in the future. The new phase of consciousness initiated to-day through pain and suffering was to be but the first step in a long evolution. To him, his country's hope was in herself. Never in the alien. True, his great heart embraced the alien's need, sounding a universal promise to the world. But he never sought for help, or begged assistance. He never leaned on any. What might be done, it was the doer's privilege to do, not the recipient's to accept. He had neither fears nor hopes from without. To reassert that which was India's essential self, and leave the great stream of the national life, strong in a fresh self-confidence and vigour, to find its own way to the ocean, this was the meaning of his sannyas. For his was pre-eminently the sannyas of the greater service. To him, India was Hinduistic, Aryan, Asiatic. Her youth might make their own experiments in modern luxury. Had they not the right? Would they not return? But the great deeps of her being were moral, austere, and spiritual. A people who could embrace death by the Ganges-side were not long to be distracted by the glamour of mere mechanical power.

Buddha had preached renunciation, and in two centuries India had become an Empire. Let her but once more feel the great pulse through all her veins, and no power on earth would stand before her newly-awakened energy. Only, it would be in her own life that she would find life, not in imitation; from her own proper past and environment that she would draw inspiration, not from the foreigner.

For he who thinks himself weak *is* weak: he who believes that he is strong is already invincible. And so for his nation, as for every individual, Vivekananda had but one word, one constantly reiterated message:—

"Awake! Arise! Struggle on,
And stop not till the
Goal is reached!"

NIVEDITA.

CALCUTTA.

হিন্দু পত্রিকায় (২৭-৭-১৯০২) স্বামীজী-বিষয়ে নিবেদিতার বিখ্যাত প্রবন্ধ। ভারতের নানা পত্রিকায় এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। নিবেদিতা বলেছেন, এই প্রবন্ধের জন্যই এর পরে বোম্বাইয়ের বৃহৎ জনসভাগুলি সফল হয়েছিল। নিবেদিতা এই প্রবন্ধে জাতীয়তার মহান আচার্য-রূপে স্বামীজীকে উপস্থিত করেন। নিবেদিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহে (রেমঁ সংগ্রহ) প্রবন্ধটির প্রুফ ছিল—তার আংশিক প্রতিলিপি।

The Cry of the Mother to the
Indian Youth

Sons of the Indian past, Awake.
From Jagannath to Dwarka Nath
From Kedar Nath to Rameswaram are ye not one?
Your history, look ye, dieth not.
In your to-day lives all the greatness of your past.
Awake then and arise!
Struggle ye on and stop not till the
Goal is reached!

March all ye in your armies!
March forth in your hosts
Are ye not one?
Children of one motherhood
Nurslings of one land
Brethren of a single home
Are ye not one?

Sons of Bengal, heirs of the ancient
Magadh,
The one-time centre of a ring of
Sovereigns,

You who fitted the infinite mind
[illegible] ised [illegible] peoples,
You who bore Gods East and
North and South
You who created Scriptures and made
Great learning
Shall ye be [illegible] —
My children of Bengal?

Lo the past lives in you!
Are ye not me?

Sons of Ayodhya, Children of Benares,
Dwellers in the sacred shrines
And regal towns
Awake and arise! In you
lives all your past!
Are ye not one?

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত নিবেদিতা-পরিকল্পিত 'ন্যাশন্যালিটি' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই খসড়া-কবিতাটি ছিল। গ্রন্থটি নিবেদিতা সম্পূর্ণ করেন নি। তাঁর দেহান্তের পরে কবিতাটি মডার্ন রিভিউ-এ (অক্টোবর ১৯২১) বেরোয়। [**Sister Nivedita's Lectures and Writings, p.p. 227-28**]

The Cry of the Mother to the Indian Youth

Sons of The Indian past, awake!
From Jaganath to Dwarka Nath,
From Kedarnath to Comorin, are ye not one?
Your history, look ye, dieth not.
In you to-day lives all the greatness of your past.
Awake then, and arise!
Struggle ye on and stop not till the Goal is reached!,

Marshall ye in your armies!
March forth in your posts!
Are ye not one?

Children of one Motherhood,
Nurselings of one land,
Brethren of a single home,
Are ye not one?

Sons of Bengal, heirs of the ancient Magadh,
The one-time centre of a ring of Sovereigns,
You who carried the message that bred strong peoples,
You who bore Gospels East and North and South,
You who created Scriptures and made great learning,
Shall ye be nought,—
My children of Bengal?
Lo the past lives in you!
Are ye not one?

Sons of Ajodhya, children of Benares,
Dwellrs in far famed shrines
  and regal towns,
Awake and arise! In you
  lives all your past!
Are ye not one?

Sons of Gurus! People of the Prophet,
  Children of heroes, strong and austere!
    Ever ye are one!

Rajput, Mahratta, Sikh, Mussalman and Dravid,
  Is not Your past yours!
Fear not machines!
  Assert the mind that lives in you;
Include, create, assault and take by might
  The strongest city of the mind of man.
    Be not content to crawl,
    But leap ye high.

THE NATIONALISTS OF INDIA.

A NOTABLE CREDO.

THE *Indian World* of February publishes the following Credo of Indian nationality, which has won for its writer, a Punjab graduate, the Vivekananda gold medal which was offered for general competition in the September number of the *Indian World* :—

1. I believe in India, one and indivisible.
2. I believe in India, beloved mother of each and all her many million children.
3. I believe in India's divine mission.
4. I believe in the saints of her birth and the heroes of her breeding.
5. I believe in India the invincible, whom the world's loftiest and holiest mountains defend.
6. I believe in the invigorating power of the ocean, on whose lap lies my mother secure.
7. I believe in India, the beautiful ;—Nature's own paradise of loveliest flowers and streams.
8. I believe in the sanctity of her every particle.
9. I believe in India's departed sons, whose ashes are mingled in the air, earth, and water, that give me my food, and form my very blood.
10. I am bone of their bone and flesh of their flesh.
11. I believe in the abiding relationship of Indians of all times and all communities.
12. I believe in the brotherhood of all who belong to India's soil, be they of whatsoever caste or creed.
13. I believe in the living Indian nation, dearer to her children than aught else of earthly kinship.
14. I believe in its golden past and glorious future.
15. I believe in the righteousness, valour and patriotism of Indian manhood.
16. I believe in the tenderness, chastity and selflessness of Indian womanhood.
17. I believe in India for the Indian people to live for and to die for.
18. I believe in one land, one nation, one ideal, and one cause.
19. The service of my countrymen is the breath of my life,—the be-all and end-all of my existence.
20. So help me Bharat! *Bande Mataram.*

SHIV NARYEN.

নিবেদিতা-প্রবর্তিত সর্বভারতীয় 'বিবেকানন্দ মেডাল' প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্তের এই রচনাটি ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড্ পত্রিকা থেকে রিভিউ অব রিভিউজ-এ পুনর্মুদ্রিত হয় (এপ্রিল ১৯০৬)। রচনাটিতে নিবেদিতার জাতীয়তা-চিন্তার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি।







[উপরে] অনুশীলন সমিতির আদি সংগঠক ও প্রধান নেতা প্রথমনাথ মিত্র (পি মিত্র)। [নীচে, বামে] চিত্তরঞ্জন দাশ ; [ডাইনে] বিপিনচন্দ্র পাল। (মডার্ন রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯১০)।

বন্দে মাতরম্ 27/11/05

প্রিয় অশ্বিনি,

~~আপনি~~ এসময় কিন্তু
কল্য লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়াছি।
অনেক সংবাদ আছে। আমার
শরীর কিছুই ভাল নাই তবুও
যাহা কিছু সমস্ত সংবাদ
তোমাকে দিতে পারিতেছি
না। তুমি একবার আসিলে
তবে ত বড় ভাল হয়।
প্রীতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র

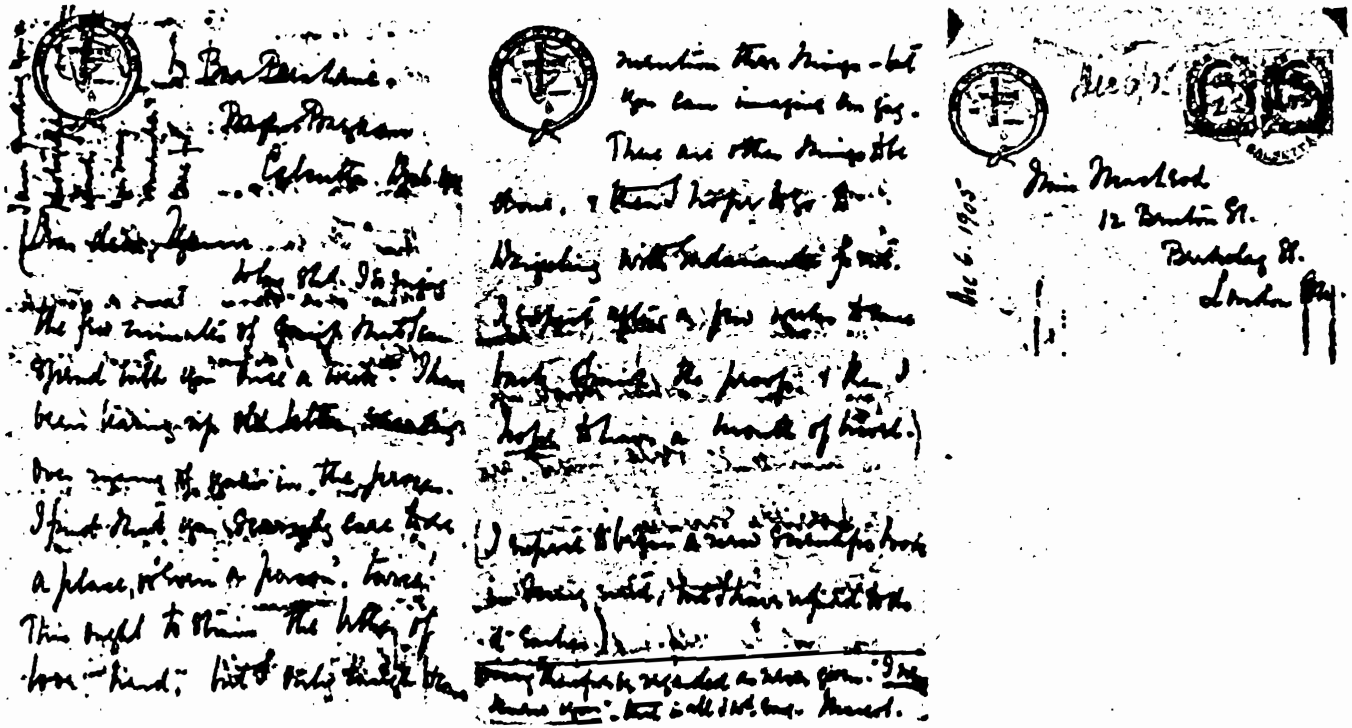
29/ 04

My dear Aswini,

Mr Bipin Pal & Chitta & Suren are coming here between 5 & 6 P.M. this afternoon & consult about a meeting for Japan. They want you here. Will you come at that hour?

Yours aff.
P. Mitter

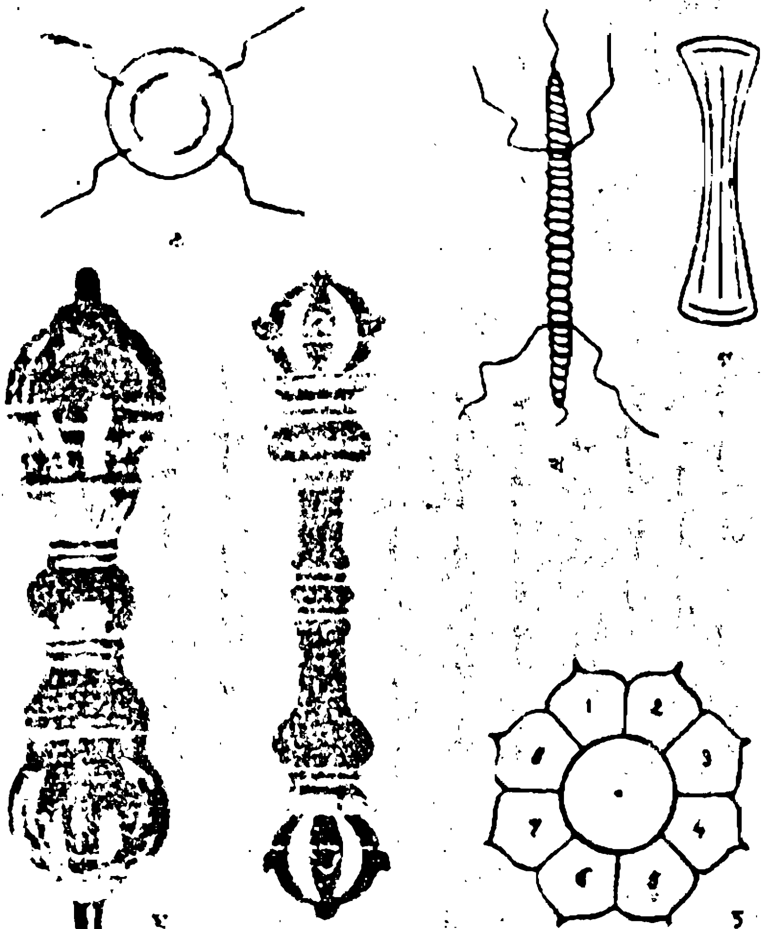
[বামে] অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পি মিত্রের চিঠি (২৭-১১-১৯০৫)। [ডাইনে] ঐ (২৯-২-১৯০৪)।



Dec 6. 1905

Miss Macleod
12 Bruton St.
Berkeley Sq.
London

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৬ ডিসেম্বর ১৯০৫, চিঠি। চিঠির কাগজের উপরে এবং খামের উপরে মুদ্রিত প্রতীক-চিহ্নে অর্ধবৃত্তাকারে লেখা—'আমার বাংলা তোমায় বড় ভালবাসি।' মধ্যে ভারতের মানচিত্র—তার উপরে 'ভারতবর্ষ' ও 'বন্দেমাতরম্‌' লেখা।

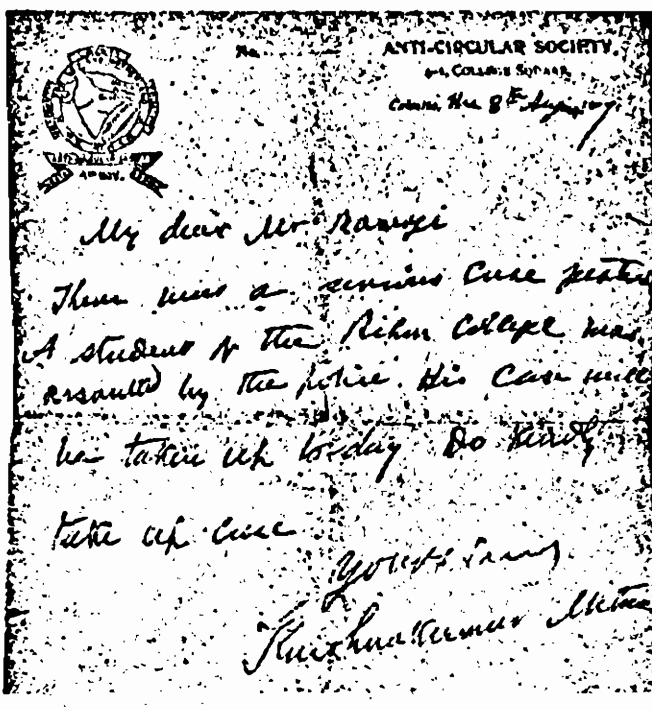


(ক) [illegible] বজ্র (খ) [illegible] বজ্র (গ) [illegible] বজ্র (ঘ) [illegible]
(ঙ) [illegible] (চ) [illegible]
[illegible]

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (নভেম্বর ১৯০৯) জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে *নিবেদিতার* প্রবন্ধের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের বজ্রচিহ্ন। নিবেদিতা বজ্রকে জাতীয় প্রতীক করতে আগ্রহী ছিলেন। প্রবন্ধমধ্যে তিনি দেখিয়েছেন, বজ্র কেবল জাতীয় নয়, পৃথিবীর নানা দেশে স্বীকৃত প্রতীক।



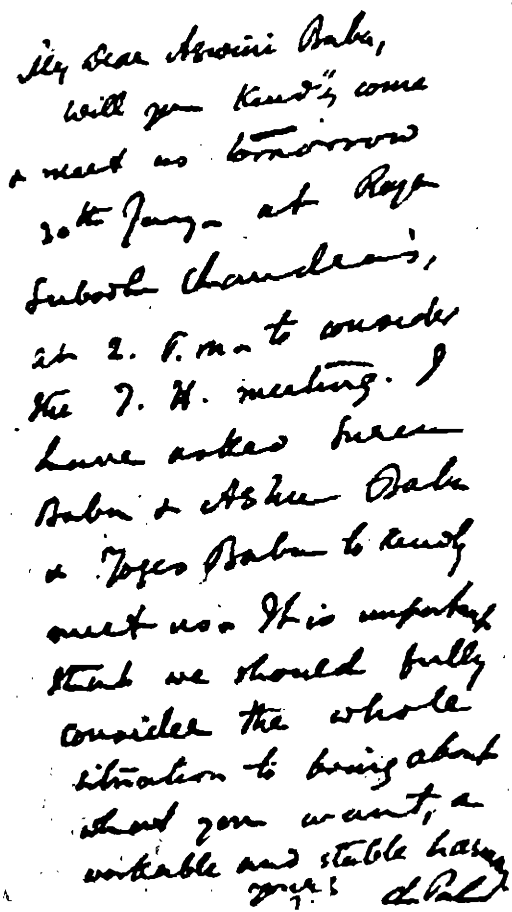




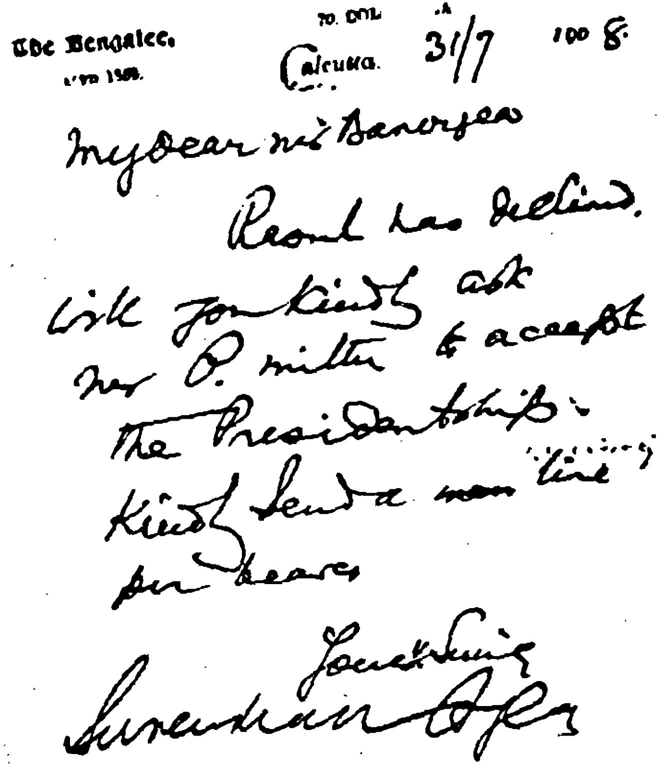
ANTI-CIRCULAR SOCIETY.
6-1, College Square,
Calcutta the 8th August 1907

My dear Mr. Banerji
There was a serious case yesterday.
A student of the Ripon College was
assaulted by the police. His case will
be taken up today. Do kindly
take up case.
Yours sincerely
Krishna Kumar Mitra

[উপরে, বাঁয়ে, মধ্যসারিতে] দীনশা ওয়াচা (মাথায় টুপি) ; মেঝেয় হেলে বসা—অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। (মডার্ন রিভিউ, জানুয়ারি ১৯০৯) [ডাইনে] সুবোধচন্দ্র মল্লিক (দাঁড়িয়ে)।
[নীচে] কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্র (৮-৮-১৯০৭)।



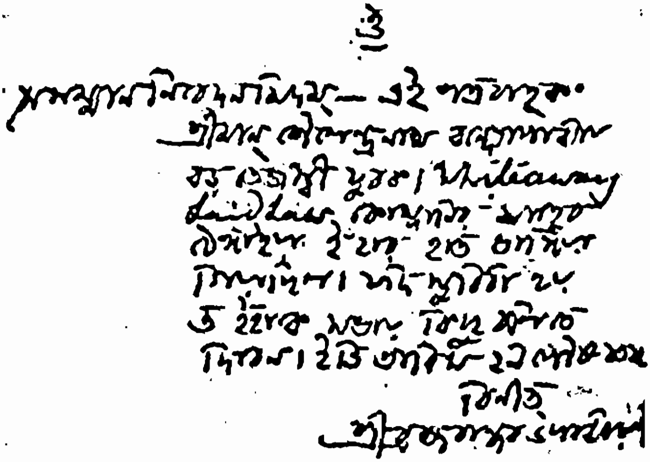
My dear Aswini Babu,
Will you kindly come & meet us tomorrow 30th Jany — at Raja Subodh Chandra's, at 2. P.m. to consider the T.H. meeting. I have asked Suren Babu & Ashu Babu & Joges Babu to kindly meet us. It is important that we should fully consider the whole situation to bring about what you want, a workable and stable harmony.
Yours
B. Pal

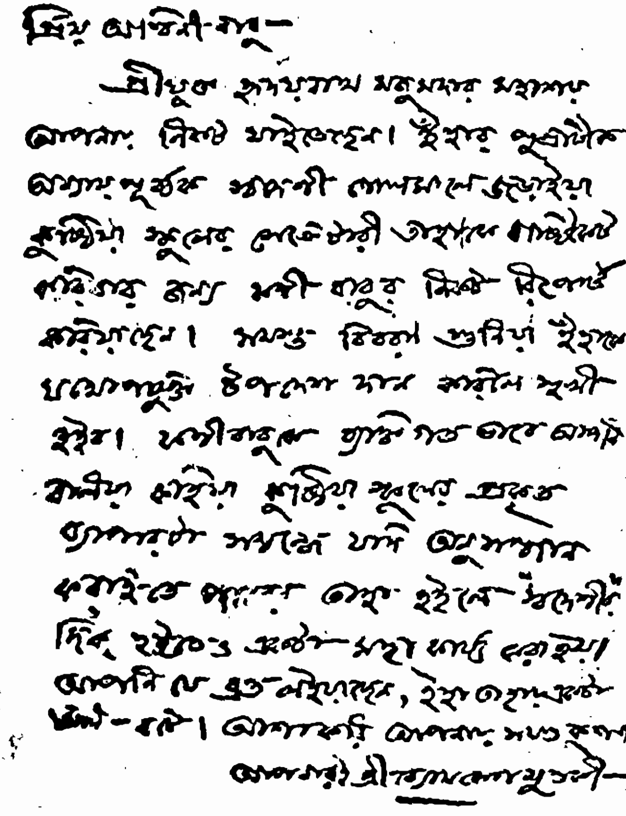


The Bengalee.
Calcutta 31/7 1908

My dear Mr Banerjea
Rash has declined.
Will you kindly ask Mr P. Mitter to accept the Presidentship. Kindly send a line per bearer.
Yours sincerely
Surendranath Banerjea

[বাঁয়ে] বিপিনচন্দ্র পালের পত্র (২৯-১-১৯০৬) ।
[ডাইনে] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র (৩১-৭-১৯০৮) ।





[উপরে] ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পত্র (২৯ পৌষ ১৩১২)।
[নীচে] ব্যোমকেশ মুস্তফীর পত্র (১৪-৭-১৯০৬)।

সুহৃদ্ সমিতি
ময়মনসিংহ
২৮শে আশ্বিন, ১৩১২

শ্রীচরণেষু—

অদ্য আমরা আমাদিগের প্রীতি-শ্রদ্ধা ও একপ্রাণতার চিহ্নস্বরূপ আপনার নিকট একটি রাখী পাঠাইলাম।

৩০শে আশ্বিন, বাঙ্গালীর মিলন-তিথিতে আপনি এ রাখী বন্ধনকালে অনু-গ্রহপূর্বক "সমিতি"র প্রতিভূস্বরূপ উহা আপনার আত্মীয় বন্ধুবর্গের হাতে বাঁধিয়া দিবেন। ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ভগবান মঙ্গলময় আমাদিগের সহায় হউন।

বিনয়াবনত
সুহৃদ্ সমিতি।

জাতীয় *দিবসে* ময়মনসিংহের সুহৃদ্ সমিতির আবেদন— *রাখীবন্ধনের* জন্য (২৮ আশ্বিন ১৩১২)।

[স্বদেশী আন্দোলনকালে খ্যাতনামা আইনজীবী অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশী মামলায় জড়িত ব্যক্তিদের পক্ষসমর্থন করতেন। তাঁকে লেখা দেশনেতাদের পত্রগুলি শ্রীঅরণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহে রক্ষিত। ব্যবহৃত প্রতিলিপিগুলি পেয়েছি *শ্রীচিন্মোহন* সেহানবিশের সৌজন্যে—শ্রীরণজিৎকুমার সাহা মারফত]।

এই দীর্ঘ পত্রের শেষে নিবেদিতা বেপরোয়া হয়ে লেখেন : "যদি তোমার মনে হয়, আমার সমস্ত কথাই ভুল এবং বিপজ্জনক, তাহলে তোমার পাদস্পর্শ ক'রে, তোমার কাছে অনন্ত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমি নিজের পথে চলে যাব। যে ভিশন্ দেখবার সুযোগ পেয়েছি, তাকে কার্যে পরিণত আমাকে করতেই হবে।"

বৃটিশ শাসনের পক্ষে কোনো কথাই এইসময়ে নিবেদিতা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। মিস ম্যাকলাউডের এক বন্ধু ভারতে বিদেশী শাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলায় নিবেদিতা সেসব কথাকে মানবতার বিরুদ্ধে কুৎসা বলে চিহ্নিত করেছিলেন : "তোমার মুসলমান বন্ধুর উক্তি একেবারেই ভ্রান্ত। কোনো দেশে বিদেশী শাসনের অর্থ কি, সে-বিষয়ে তাঁর বা তাঁর মতো ব্যক্তিদের যদি সামান্যতম ধারণা থাকত, সর্বোপরি, ভারতের পক্ষে বর্তমান সময়ে বিদেশী শাসন কোন্ নৈতিক অধঃপতন, ঘৃণ্য দুর্বলতা সৃষ্টি ক'রে চলেছে তা যদি তিনি জানতেন, তাহলে মানবতার বিরুদ্ধে ও-রকম কুৎসা করার চেয়ে তিনি নিজের গলায় ছুরি দিতেন। ঐ একটিমাত্র রাজনৈতিক ধারণা সম্বন্ধে আমি একেবারে অসহিষ্ণু। আমি যদি জাতীয় সরকারের কর্তা হতাম তাহলে ঐ প্রকার মনোভাবের ব্যক্তিদের আদালতে দাঁড় করিয়ে এমন এক জায়গায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাতাম যেখানে কেবল বিদেশী শাসন আছে।" (৩.১০.১৯০১ পত্র)

॥ ২ ॥ এই পর্বে ইংলণ্ডে নিবেদিতার বক্তৃতা ও প্রচার

এই পর্বে নিবেদিতা ইংলণ্ডে বেশকিছু ভারত-বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। তাদের অল্প-সংখ্যকের কথা আমরা জানি। প্রকাশ্য বক্তৃতায় নিবেদিতা অবশ্যই সংবৃত কণ্ঠে কথা বলেছিলেন। আবার যা বলেছিলেন তার সামান্যই সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রে লণ্ডন-সংবাদদাতা-প্রেরিত বিবরণে নিবেদিতার কোনো-কোনো বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আছে, সেইসঙ্গে নিবেদিতার প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্বের কথাও।২ এইসব বক্তৃতায়

২ নিবেদিতা "অর্ডার অব রামকৃষ্ণ" বিষয়ে বক্তৃতা করবেন, ডেইলি নিউজে এই বিজ্ঞপ্তি অনেকের কাছেই চমকপ্রদ ছিল, যেমন মাদ্রাজ হিন্দু পত্রিকার লণ্ডন সংবাদদাতার কাছে, যিনি উক্ত বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রথম সংগঠনটির নাম শুনেছিলেন। ৫ নভেম্বর, ১৯০০, হিন্দু পত্রিকায় তিনি ডেইলি নিউজে প্রকাশিত 'রামকৃষ্ণ অর্ডার' সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেন। ১২ নভেম্বর, হিন্দুতে তাঁর পাঠানো বক্তৃতার সংবাদ বেরোয় : "লেডি চ্যাম্পিয়নস্ ফর ইণ্ডিয়া"। আর বক্তৃতাটি বেরোয় ১৬ নভেম্বর। (একই রিপোর্ট অমৃতবাজারে বেরোয় ১৫ নভেম্বর; ব্রহ্মবাদিনে এটি সংকলিত হয় নভেম্বর সংখ্যায়)। ১২ নভেম্বর উক্ত লণ্ডন সংবাদদাতা নিবেদিতার বিষয়ে প্রশংসা-সূচক যেসব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল :

"This new champion...is a lady, belonging to the ruling power in India, a lady of exceptional ability, who has given up a promising career in England to devote herself to the service of women in India. Miss Margaret Noble is her name...She is a striking figure to English people, garbed in a gown of white flannel, graceful in cut but of extreme simplicity; the beads round her neck suggest a rozary,....the beads seem to be of the most use to her when she is speaking particularly earnestly, by affording her fingers

নিবেদিতা প্রধানতঃ ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির মহিমার বিষয় উত্থাপন করেন, বিশেষভাবে বলেন ভারতীয় নারীর পারিবারিক মর্যাদার কথা, যেহেতু ঐ বিষয়টি মিশনারিদের অবশ্য কুৎসালক্ষ্য ছিল। যে-ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার প্রবল বাসনা নিবেদিতা বোধ করছিলেন, সেই ভারতবর্ষ যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনোভাবে ন্যূন নয়, সেটা প্রতীয়মান করাই ছিল তাঁর এই ধরনের বক্তব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিবেদিতা তাঁর আপাত নিরীহ বক্তব্যের মধ্যে বৃটিশ শাসন ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কতদূর ক্ষতি-সাধন করেছে, তাও মাঝে-মাঝে জানিয়েছেন। ১৯ অক্টোবর হাইড পার্কে ডাঃ উইল্ডি'র ভবনে নিবেদিতার বক্তৃতার বিষয় ছিল, "বৃটিশ শাসন ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর হয়েছে কিনা।" (অমৃতবাজারে ১৫ নভেম্বর বক্তৃতাটির রিপোর্ট ছিল)। নিবেদিতা ধীরস্থিরভাবে বুঝিয়ে দেন—উক্ত শাসনের মঙ্গলকর দিক সম্বন্ধে যেসব দাবি করা হচ্ছে তাদের অধিকাংশই অন্তঃসারশূন্য। বৃটিশ-পক্ষে অন্যতম দাবি : ইংলণ্ড ভারতকে 'সভ্য' করেছে। নিবেদিতা বলেন, 'সভ্য' করার মানে যদি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করা হয়, তাহলে কথাটা কিছু সত্য। কিন্তু নিবেদিতা সভ্যতার ঐ অর্থ গ্রহণে অস্বীকার করেন। তিনি পরিষ্কার বলেন, বৃটিশ শাসন ভারতের গভীর তলদেশের ভাবজগতে একেবারেই পৌঁছতে পারেনি। ইংরেজ শাসনের পক্ষে আর একটি দাবি—তা ভারতের ঐক্যবিধান করেছে। এই রাজনৈতিক ঐক্য যে ভাবৈক্য নয়, তাও নিবেদিতা পরিষ্কার ক'রে তুলেছিলেন। বৃটিশ তন্ত্র-প্রভাবিত ন্যাশন্যাল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে একটা সাধারণ বক্তব্য উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাও গভীর-প্রবিষ্ট কিছু নয়। নিবেদিতা ভারতবর্ষে ইংরাজদের আগমনের বহুপূর্ব থেকে ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বিশেষে অখণ্ড ভাবধারা কিভাবে বর্তমান আছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেন। এইসঙ্গে ইংরাজদের মহা গর্বের বস্তু যন্ত্রশিল্প কিভাবে ভারতের পুরাতন শিল্পকে ধ্বংস করেছে, অথচ বিকল্প কিছু দেয়নি, তার বিবরণও দেন।৩

---

something to toy with...Her eloquence is striking, she speakes without notes, animated simply by an intense sympathy for the people of India and the desire to break down some of the false ideas which have been associated with Indian ladies by English people."

২৬ নভেম্বরের হিন্দুতে লণ্ডন সংবাদদাতার আর একটি নিবেদিতা-বিবরণী বেরোয়। অত্যন্ত প্রশংসার সঙ্গে ইনি লেখেন :

"I have seldom witnessed more fervour in anyone than she exhibits, and *I do not doubt that she will be a great element and a potent force for good in India during the rest of her life.*"

অব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী।

এর পরে উক্ত সংবাদদাতা ডেইলি ক্রনিকলে প্রকাশিত নিবেদিতার একটি চমৎকার বিবরণ উদ্ধৃত করেছিলেন।

৩ নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে বলেন :

"Machinery has been introduced by us and has absolutely killed the Indian industries. What we might do is to educate the Indian people technically and teach them the new way of earning a living as compensation for the old way of which they have been robbed. The old skilled labour is gone.

প্রায় বছরখানেক পরে নিবেদিতা চার্লস রাওলি-র সভাপতিত্বে নিউ ইসলিংটন হলে একটি বক্তৃতা করেন, যার রিপোর্ট ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে বেরোয় (ইণ্ডিয়ান মিরার সেটি উৎকলন করে ২৬ নভেম্বর, ১৯০১)—তার মধ্যে নিবেদিতা মেরেডিথ টাউনসেণ্ডের "এশিয়া অ্যাণ্ড ইউরোপ" বইয়ের আলোচনাসূত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কঠোর সমালোচনা করেন। মেরেডিথ টাউনসেণ্ড নিবেদিতার কাছ থেকে ভদ্রতাসূচক প্রশংসা অনেক পেয়েছিলেন : তাঁর বই "চমৎকার, দীপ্ত, উপভোগ্য, শৈল্পিক অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টিতে পূর্ণ", ইত্যাদি। কিন্তু মোক্ষম কথাটি ছিল এই—"ভিতরে প্রবেশ ক'রে বুঝবার কোনো ক্ষমতাই মিঃ টাউনসেণ্ডের নেই।" অতঃপর নিবেদিতা ধারালোভাবে টাউনসেণ্ড-কথিত 'শুভশাসন'-সমাচারকে খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। এশিয়াবাসীরা নিষ্ঠুর—এই অভিযোগের উত্তরে নিবেদিতা বলেন, এ-ব্যাপারে এশিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার তুল্য ঘটনা ইউরোপে যথেষ্ট। "একথাটা অবশ্যই ঠিক হাজার-হাজার নারী ও শিশুকে ক্যাম্পে অনাহারে শুকিয়ে মারার অপূর্ব আইডিয়া এশিয়াবাসীদের মাথায় কদাপি খেলেনি"—তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে তিনি বলেন। ইউরোপ ও এশিয়ার তুলনা-মুখে আরও কিছু মনোরম তথ্য নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন :

"এশিয়াবাসীরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন মাঠে কৃষিকাজে ব্যাপৃত কৃষকেরা নিরাপদে থাকে। চারদিকে যখন নির্ঘোষ, আঘাত, তখনো সে তার ধান বুনে যায়, ধান কেটে যায়। কেউ কি ভাববে যে, ও হল সেই ধরনের মানুষের নিদর্শন যারা ক্ষেত-খামার পুড়িয়ে দেয়? [যে-কাজটা ইউরোপীয়রা ক'রে থাকে আর কি!]। তারপর এশিয়ার ভূমির জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ঐ যে লালসা—তার পক্ষে যুক্তি কিনা—মাল বেচবার বাজার তো চাই! এখানকার [অর্থাৎ ইংলণ্ডের] কিছু লোকের মনে কখনো একথাটা ওঠেই নি যে, প্রভু যীশুর 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্ট' সকল মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, এবং [চুরি করিও না, এটা অন্যতম কম্যাণ্ডমেণ্ট হলেও] মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান যে-জিনিসটি চুরি ক'রে নেওয়া যায়, কোনো মানদণ্ডে যার হিসাব হয় না, মুঠিতে যাকে ধরা যায় না, তথাপি যার থেকে বাস্তব জিনিস আর কিছু নেই—তা হল, যাকে আমরা বলি 'আমাদের স্বাধীনতা।'...বিচিত্র কথা এই, ভারতে ইংরাজ শাসনের আশীর্বাদের কথা বলার সময়ে মিঃ টাউনসেণ্ড দুর্ভিক্ষ শব্দটি উচ্চারণ করেন নি।...শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নৈতিক বিষয়ে আমাদের সকল শিক্ষা ভারতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ আমরা যা-কিছু ভারতীয় তাকে ধ্বংস ক'রে, একটিও খাঁটি ইউরোপীয় জিনিস গড়ে তুলতে পারিনি। মিঃ টাউনসেণ্ড অবশ্য একটা কথা ঠিকই বলেছেন, যদি ইংরাজরা ভারত ত্যাগ করে আসে কিংবা বিতাড়িত হয়, তাহলে তারা পিছনে ফেলে আসবে, রোমানরা বৃটেন ছেড়ে আসার আগে যা ফেলে এসেছিল—চমৎকার রাস্তা, প্রচুর অকেজো বাড়ি, পরাধীন মানুষগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা, এবং কিছু স্মৃতি যা একশো বছরের মধ্যে মুছে যাবে।"

The beautiful dyes for which India was so celebrated are only to be found in places scarcely touched by British influence." [Amrita Bazar Patrika, November 15, 1900.]

রমেশচন্দ্র দত্ত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে বিশেষ ধন্যবাদ দেন।

॥ ৩ ॥ মিশনারি-আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের মর্যাদারক্ষায় নিবেদিতার চেষ্টা

অল্প পূর্বে উদ্ধৃত একটি পত্রে মিশনারিদের বিরুদ্ধে নিবেদিতার মন্তব্যকে অতিরিক্ত কর্কশ এবং অবুঝ একগুঁয়েমির পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে। যাঁরা এইরকম মনে করবেন তাঁরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিষয়ে শতাধিক বর্ষব্যাপী মিশনারি-কুৎসার কাহিনী সম্বন্ধে অজ্ঞ। সেই ইতিহাস সামান্য পরিমাণে আমি উপস্থিত করেছি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে। ইংরাজরমণী নিবেদিতা ভারতে আসার আগে ঐসকল নিন্দাকে সহজ সত্য বলেই গ্রহণ করেছিলেন। অন্ততঃ মিশনারি-প্রচারিত তথ্যগুলি বিশেষভাবে আপত্তিকর বলে মনে করেছিলেন, এমন কথা জানি না, যদিও তিনি ক্রমেই খ্রীস্টীয় তাত্ত্বিকতার সংকীর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ভারতবর্ষে আসার পরে, স্বামীজীর সান্নিধ্যে থেকে, ভারতবর্ষীয় পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে, তাঁর মনোপরিবর্তন হয়েছিল, তথাপি বোধহয় কখনো কখনো তিনি আমেরিকায় স্বামীজী কেন ঐপ্রকার প্রচণ্ড-ভাবে মিশনারিদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, তার ঔচিত্য বিষয়ে কিছু সন্দেহ বোধ করেছেন। একথাও মনে রাখতে হবে, ইংলণ্ডে মিশনারি-কুৎসা আমেরিকার তুলনায় কম তীব্র ছিল, এবং স্বামীজী নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন। ১৮৯৯ সালের মাঝা-মাঝি সময়ে নিবেদিতা ভারত থেকে যাত্রা করে প্রথমে ইংলণ্ড পরে আমেরিকা যান। ভারতীয় নারীদের শিক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ করা তাঁর আমেরিকা গমনের অন্যতম কারণ। ঐ চেষ্টা শুরু করা মাত্র 'চার্চ উইমেন'-জাতীয় অত্যন্ত সংকীর্ণচিত্ত নারীদের প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়। তখন তিনি বুঝতে পারেন—স্বামীজীকে কোন্ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতের মর্যাদারক্ষার লড়াই করতে হয়েছিল। নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে এইজাতীয় সংঘর্ষের ছবি তুলে ধরছি। ১৬ জানুয়ারি, ১৯০০, মিস ম্যাক-লাউডকে লিখেছেন :

"জীবন কত অভিজ্ঞতাই না এনে হাজির করে! অ্যান অ্যারবরে নষ্ট-দুষ্ট শিশুর প্রাপ্য প্রশ্রয় ও পিঠচাপড়ানি লাভ করবার পরে, গতকাল অপরাহ্নে আমি সহসা নিজেকে কণ্টকবনে অবস্থিত দেখলাম—এবং বুঝলাম কোন্ মনস্তাত্ত্বিক কারণে স্বামীজী লড়াই করতেন ও ফিরে আক্রমণ করতেন। গতকাল আমি নিজেই প্রায় তাই করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা শোনার পরে তুমি হাসির চোটে কেঁদে ফেলবে। ডেট্রইটের 'উইমেনস্ ক্লাব' যেন ২৬ বছরের গৃহযুদ্ধের পরে গতকাল অপরাহ্নে সহসা জেগে উঠে দেখল—আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে সেখানে হাজির। একথা বলতেই হবে, আমি সেখানে এমন কিছু বলেছিলাম যা তারা পূর্বে শোনেনি। তারপর আলোচনা আরম্ভ হল। এক মহিলা চেষ্টা করলেন যাতে আমি মিশনারিদের আক্রমণ করি। আমি সোজা অস্বীকার করলাম। আর একজন নাক কুঁচকে বললেন, মিশনারিদের কাছ থেকে শোনেন নি এমন একটা কথাও আমি বলতে পারিনি ; অমুক-অমুক এবং অমুক ব্যক্তিগণ এই ধরনের কথা সর্বদাই বলে গেছেন। সেকথা শুনে খাড়া হয়ে উঠে আমাকে কঠোরভাবে এই বলে ধাতানি দিতে হল : এপর্যন্ত কেবল একজন জ্ঞানী ব্যক্তিই [অর্থাৎ স্বামীজী] এইভাবে এইসকল বস্তুকে দেখার প্রতিভা ধরেছেন; তিনি অবশ্যই চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব এনে ব্যাপারটার সমাধা করবেন। একথা ঠিক, পণ্ডিতরা মিশনারিদের চেয়ে চিন্তাক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন, কিন্তু যেহেতু হাণ্টার ও অন্য পণ্ডিতেরা এই ধরনের কথা বলার বুদ্ধি ধরেননি, তাই কোনো মিশনারি পূর্বে এইপ্রকার কথা বলেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না।

"সভানেত্রী তারপর আতিথেয়তা-রীতি ভঙ্গ ক'রে আমাকে বহুবিবাহ সম্বন্ধে জেরা করতে শুরু করলেন। আমি ঐ প্রথাকে বিবাহবিচ্ছেদের বিকল্প বলে হাজির করলাম। জেরার কালে আমি জাতীয় ভাবাদর্শ ইত্যাদির দিক দিয়ে হিন্দু পুরুষের চরিত্রের প্রশংসা করলাম। সভানেত্রী রক্তহীন শাদা-মুখ, পাতলা-ঠোঁট এক মহিলা, ঘৃণায় সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'হুম্! মর্মন। ঠিক আমাদের মর্মনদের মতো। মর্মনরাও ঠিক ঐসব কথা বলে থাকে।' ["আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক ধর্মসম্প্রদায়—মর্মন ; ইঁহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে এই প্রথা রহিত হয়।"]। এইক্ষেত্রে স্বামীজী নিশ্চয় যা করতেন—মর্মনদের পক্ষ সমর্থন করা—আমি সেই ইচ্ছা দমন ক'রে উত্তর দিলাম : 'না মর্মনদের মতো নয়। অন্ততঃ খ্রীস্টানদের তুল্য মন্দ নয়।' 'আঃ না না—ওসব মর্মন। মর্মন।'—সর্বসমক্ষে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। ভদ্রবংশে জন্মের কারণে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর এক মহিলা চাপাচাপি ক'রে বললেন, আমার উচিত ভারতের স্বামীদের ধমকানো—কেন তারা স্ত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খায় না? আমার উচিত তাদের সামনে উচ্চতর পথপ্রদর্শন করা। আমি আপত্তি ক'রে বললাম, বিবাহিত দম্পতি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে নেবে, এই অধিকার তাদের থাকা উচিত। ওটা তাদেরই ব্যাপার। 'ওঃ, ঐখানেই তোমার ভুল,' মহিলা বললেন, 'তোমার মতো কথা সকলেই বলে, কিন্তু ব্যাপারটা কারো ব্যক্তিগত নয়, সকলের ব্যাপার।' আমি তাতে চেঁচিয়ে বললাম, 'অন্ততঃ আমার ব্যাপার নয়। আমি এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গররাজি।' তারপর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললাম, 'যদি আমেরিকান দম্পতিকে ইংরাজের উপদেশ শোনানো হয় তারা কি মনে করবে?' ঐ ধরনের কথাবার্তার পরে কুমীরের মুখে শিশু নিক্ষেপের রীতিমাফিক প্রশ্ন তো অতীব মোলায়েম কথা মনে হল। তখন এক মহিলা, আমার প্রতি স্পষ্ট বন্ধুত্ববশে, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দিকে কথার মোড় ঘোরাবার জন্য জাতিপ্রথাকে সুবিহিতভাবে ব্যাখ্যা করতে বললেন। যাইহোক, আমি এইপ্রকার পাগলাগারদের মধ্যে কখনো ঢুকিনি।"

এই ধরনের অভিজ্ঞতা নিবেদিতার চোখ খুলে দিয়েছিল। ভারতের জাতীয়তার সংগ্রামের পক্ষে তিনি জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষসমর্থনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে গিয়ে প্রায় একই প্রকার মিশনারি-প্রচারের মুখে পড়ে রোষে ক্ষোভে অস্থির হয়ে পড়লেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্যাদার বিষয়ে তিনি ইংলণ্ডে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করছিলেন—মিশনারিরা সেইসব বক্তৃতাকে মারাত্মক জ্ঞান ক'রে তার প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিল। স্কটলণ্ডের এডিনবরায় বক্তৃতা করতে গিয়ে কী ঘটেছিল তা তিনি মিস ম্যাকল্যাউডকে ৭ মার্চ, ১৯০১ লিখে পাঠিয়েছিলেন :

"এডিনবরায় মিশনারিদের তরফে প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ জানানো হয়।...তারা ভারত ও তার রীতিনীতি সম্বন্ধে বীভৎস সব বিবরণ দিয়েছে। তাদের একটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অস্ত্র ছুঁড়ে আমি বিদায় নিই। তারপর অবশ্য তারা নিজেদের মতো ক'রে ব্যাপারটা সাজিয়ে নিয়েছিল—এবং একজন তরুণ ভারতীয় খ্রীস্টানকে বলতে অনুরোধ জানিয়েছিল। সেই তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার সমস্ত কথাই ঠিক, এবং ইউরোপে হাজির হবার পর থেকে তাঁর নিজেকে খ্রীস্টান বলে পরিচয় দেবার কোনো বাসনাই নেই!! এইপ্রকার অপূর্ব ও পুরুষোচিত ব্যাপার আর কখনো শুনেছ? তরুণটি মাদ্রাজী। এখন উক্ত ক্লাব [যেখানে নিবেদিতা বক্তৃতা করেছিলেন] আমাকে উত্তর দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়। ওরা অবশ্যই ভয় পেয়ে গেছে। মনে হয় তারা ভারত সম্বন্ধে যেসব উপাদান

হাজির করা হয়েছে তাদের 'মিশনারি-বিবরণ' বলে চিহ্নিত করা হোক, চাইবে না। [অর্থাৎ ওসব উপাদান মিশনারিদের পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ নয়, নিরপেক্ষ সূত্রলব্ধ বিবরণ, এটা প্রচারিত থাক, এই ছিল তাদের অভিপ্রায়]। যাইহোক, চলে যাবার আগে যে-কোনো আকারেই হোক আমি মিশনারি-বক্তব্যের কণ্ঠপেষণ করে যাব।"

সেই কাজ নিবেদিতা করেছিলেন—"ল্যাম্‌স্‌ অ্যামং উলভ্‌স্‌" প্রবন্ধের মধ্যে, যা ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট-এর অক্টোবর, ১৯০২ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। অসাধারণ সেই রচনা —মানবতার পক্ষে সংগ্রামের এক দলিল। ধর্মসাম্রাজ্যবাদীরা বৎসরের পর বৎসর ধরে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে অপর ধর্মের মানুষের উপর যে অপমানভার চাপিয়ে দিয়েছে—তার বিরুদ্ধে এই নারী উত্থিত হয়েছিলেন মানবের মর্যাদারক্ষায়—তাঁর কণ্ঠে ছিল বজ্রধ্বনি কিন্তু হৃদয়ে ছিল প্রেমপ্লাবন।

নিবেদিতার এই ভূমিকাকে সমকালেই অভিনন্দিত করা হয়। হিন্দু পত্রিকায় ২১ অক্টোবর, ১৯০২ তারিখে "লন্ডন থেকে নারী-সংবাদদাতা প্রেরিত" "এ ডাউটি চ্যাম্পিয়ান অব দি ইন্ডিয়ান পীপল্‌" নামক রচনার মধ্যে সেই শ্রদ্ধাসূচক বিবরণ পাই।[৪] ঐ লেখার সূচনার অংশ এই :

"'চ্যাম্পিয়ান' কথাটি মনের মধ্যে একটি বর্মধারী, শক্তিশালী, সদাসতর্ক পুরুষের ছবি এনে দেয়, তরবারি উন্মোচন ক'রে যিনি দুর্বলের রক্ষায়, বিশেষতঃ নিপীড়িত নারী-জাতির রক্ষায়, যুদ্ধ করতে অগ্রসর। কিন্তু এখনকার দিনে যখন মধ্যযুগীয় চ্যাম্পিয়ানের দেখা মেলে না, এবং সেকালে বর্মধারী পুরুষেরা যে-সব মস্ত-মস্ত অস্ত্র ব্যবহার করতে সমর্থ ছিলেন তাদের তোলবার মতো শক্তি এখন অতি অল্পসংখ্যক পুরুষেরই আছে—তখন আমরা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি—'লেখনী তরবারির চেয়ে অধিক শক্তিশালী।' কলমকে অস্ত্ররূপে ঐভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ এক নারীর বিষয়েই আমি আজ লিখতে চাই। ঐ অত্যন্ত মনোহারিণী, অতি মনস্বিনী ইংরাজ-নারীর বিষয়ে উল্লেখ আমি আগেও করেছি—তিনি রামকৃষ্ণ সংঘভুক্ত ভগিনী নিবেদিতা—ভারতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। প্রায় দুবৎসর ধরে সিস্টার নিবেদিতা ভারতীয় জনগণ, বিশেষতঃ ভারতীয় নারী-বিষয়ে আমেরিকা ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বক্তৃতাদিতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ত ও কাব্যময় ভাষণাদি যাঁরা শুনেছেন—যেগুলি বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে গভীরতম আনুগত্যে ও সহানুভূতিতে প্রোজ্জ্বল—তাঁরা অনুভব না করে পারবেন না, এখানে সেই নারীর দর্শন মিলেছে যিনি আপাদমস্তক ঐকান্তিক, যিনি ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তথ্য পরিবেশনেই নিরত, যিনি ভারতীয় গৃহজীবন সম্বন্ধে ইংলন্ডে প্রচারিত বিকৃত ধারণার গ্রন্থিমোচনের জন্য নিজের শক্তিশালী মনস্বিতাকে সর্বপ্রযত্নে নিয়োজিত করেছেন। সিস্টার নিবেদিতা আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে ভারতীয় নারীর জীবন যাপন করছেন এবং প্রাচ্য ভগিনীগণের জীবনধারার পর্যালোচনা করছেন একান্ত নিষ্ঠায়। তাই বলে প্রাচ্যদেশ তাঁকে এমনভাবে অধিকার করেনি যে, পাশ্চাত্যে তাঁর কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেছে। এই মাসের ওয়েস্টমিনিস্টার রিভিউ-এ তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছে, পনর পৃষ্ঠা ঠাসা। তার বিষয়—অধিকাংশ ইংরাজ-মিশনারি, বিশেষতঃ এডিনবরার কিছু নারী-মিশনারি ভারতীয় গৃহজীবন সম্বন্ধে যে-চিত্র উপস্থিত করেছেন, তার খণ্ডন। গত বৎসর মিস

৪ *Hindu*, Oct 21 1902, *A Doughty Champion of the Indian People.*

নোবল বিতর্কমুখে যে-একটি বক্তৃতা করেছিলেন—এই প্রবন্ধটি তারই সারাংশ। তাঁর বক্তব্য অপর পক্ষকে এমনই উদ্বেগ দিয়েছিল যে, তাঁরা স্বীকৃত শর্ত পালনে গররাজি হন। শর্ত ছিল : উভয়পক্ষ যেসব কথা বলবেন তা শর্টহ্যান্ডে লিখে নিয়ে, আলোচনার আয়োজক উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। মিস নোবল অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্যের প্রকাশক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছেন। প্রবন্ধটি তিনভাগে বিভক্ত ; যুক্তিতে, বাণী-সৌন্দর্যে, চিত্রাঙ্কনসামর্থ্যে, শ্রদ্ধায় সেটি সম্মোহন। মিশনারিদের কাছে আপত্তিজনক ভারতের অনেক আচার-ব্যবহারের মধ্যে সৌন্দর্য ও সহজ বুদ্ধির প্রকাশ তিনি দেখেছেন, যা প্রাচ্যমনের কাছে অতীব স্পষ্ট, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মন যদি বহির্গত রূপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে তাদের কাছে বাধার প্রাচীর। পরিশীলিত যুক্তি-ক্ষমতা নিয়েই নিবেদিতা আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন ; ইংলণ্ড-জীবনের বহুবৎসরব্যাপী মূল্যবান অভিজ্ঞতা তাঁর নিজস্ব অনন্যসাধারণ প্রতিভাশক্তিকে বিকশিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে, এবং তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে পৌঁছে আমরা এই দুঃখবোধ করতে প্রলুব্ধ হই [সংবাদদাতা ঈষৎ তির্যক কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন], হায়, আমাদের জন্ম কেন ভারতে না হয়ে ইংলণ্ডে হল—নাহলে আমরা তো ভগিনী নিবেদিতার সমর্থনের মর্যাদা লাভ করতাম।"

এই ইংরাজ মহিলা-সংবাদদাতা অতঃপর নিবেদিতার প্রসঙ্গ থেকে 'রত্নতুল্য' বিস্তৃত অংশ উদ্ধার করেছেন ; শেষে বলেছেন, এই প্রবন্ধ মিশনারি সোসাইটি সমূহ থেকে চড়া প্রতিবাদ আকর্ষণ করবেই।

নিবেদিতার প্রবন্ধটির দিকে অল্পাধিক দৃষ্টি দেওয়া যায়। প্রথমেই তিনি 'শেক্সপীয়ারের আত্মাকে' আবাহন করেছেন। [নিবেদিতার শেক্সপীয়ার-প্রীতির উল্লেখ করেছেন তাঁর ভাই রিচমণ্ড নোবল তাঁর স্মৃতিকথায় ; প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য]। কারণ শেক্সপীয়ারের তুল্য মানবজীবনচারী লেখক আর কেউ নন। বিকৃত তথ্যে ও ব্যাখ্যায় মানব সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত করেছেন যেসব মিশনারি তাঁদের বিরুদ্ধে শেক্সপীরীয় মনোরীতিকে উপস্থিত করেছিলেন নিবেদিতা—শেক্সপীয়ার-প্রেমিক বলে কথিত ইংরাজদের কাছে। তিনি বলেছেন, শেক্সপীয়ারের মধ্যে ছিল সেই 'প্রেম' যার সাহায্যে তিনি প্রতিটি মানুষের জীবনতরঙ্গের অনুকূলে, প্রতিকূলে নয়, সন্তরণ করতে পারতেন। নিবেদিতা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বহির্গত-ভাবে যদি কেউ হ্যামলেটের জীবন ও কার্যের বিচার করেন তাহলে হ্যামলেট দুর্বল-জানু স্বাপ্নিক ছাড়া আর কিছু বিবেচিত হবেন না, তেমনি ওথেলো হবেন এক বর্বর খুনী। কিন্তু শেক্সপীয়ারের রচনাসূত্রে ঐসব চরিত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর পাঠক, চূড়ান্ত স্থূলবুদ্ধি পাঠকও, ঐ ধরনের চিন্তা করতে পারবেন না। নিবেদিতা বললেন, বিদেশীদের বিষয়ে সত্যকথা বলতে হলে শেক্সপীরীয় মনঃপ্রকৃতির প্রয়োজন আছে। "সাম্রাজ্যের এই দুর্দৈব যে, যে-দেশ একদিন শেক্সপীয়ারের জন্ম দিয়েছে সেই দেশের পক্ষে আজ অন্য যে-কোনো দেশ অপেক্ষা শেক্সপীয়ারকে অধিক প্রয়োজন। একথা ভাবাই যায় না, আমাদের ঐ বিরাট চারণ কবি, ইহুদীদের বেদনা ও ক্ষোভকে যিনি ওহেন মহান রূপ দিয়েছেন, তিনি চীনা, হিন্দু, আফ্রিকাবাসী বা রেড ইন্ডিয়ানদের বহিরাবরণকে ছিন্ন ক'রে সর্বজনীন মানবতার পোশাকে মণ্ডিত ক'রে তাদের উপস্থাপিত করতে পারতেন না—যখন ঐসব মানুষগুলি আমাদের অনুরূপ, কতকগুলি ক্ষেত্রে আমাদের অপেক্ষা হ্রস্বাকার, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রগুলিতে অনন্তগুণে মহত্তর।" নিবেদিতা আরও বললেন, বহিরিন্দ্রিয় যেখানে কেবল পার্থক্য দেখে সেখানে যাঁরা অন্তর্নিহিত ঐক্য দর্শন করতে পেরেছেন, ভারতবর্ষ তাঁদের ঋষি বলে থাকে।

শেক্সপীয়ারের মধ্যে নিখুঁত অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে "বর্তমানের বৃহত্তর সুযোগ-সুবিধার সময়ে তিনি বর্তমান থাকলে মানবতার ঋষি হয়ে উঠতে পারতেন, কারণ তাঁর কাছে মানবসমাজের রীতি-নীতি, চিন্তাপ্রকৃতি, বাস্তব পটভূমি ও পরিস্থিতি—বিস্তারিত বিশাল লুতাজাল ছাড়া আর কিছু নয় যাদের মধ্য দিয়ে সকল মানুষের মৌলিক মানবত্ব বিভিন্ন বাতাবরণে প্রদর্শিত হয়।" নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন : আমাদের "ভ্রাম্যমান প্রচারকদের মধ্যে কোথায় রয়েছে শেক্সপীরীয় সহানুভূতি যা আলোড়িত আত্ম-উন্মোচনের বাণী সম্ভব করতে পারে?" সেই বাণী-স্রোত একদা উৎসারিত হয়েছিল প্রাচীন চারণ কবিদের মধ্য দিয়ে—প্রাচীন মহাকাব্যসমূহে। দান্তের মধ্যে স্তোত্রধ্বনিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় চার্চ। শেক্সপীয়ারের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল দুঃসাহসিক জীবন-বিস্তারের যুগ।

এমন একটি সুমহান ভূমিকার পরে নিবেদিতা বললেন : ভ্রমণকারীর বিবরণের মধ্যে অবশ্য থাকা চাই (১) নির্ভুল তথ্য ; (২) ঐ তথ্যের সতর্ক ব্যাখ্যা ; (৩) তথ্যের পশ্চাদ্‌বর্তী কারণ-নীতি অনুধাবনের কিছু চেষ্টা। এইজাতীয় দায়িত্ব অবশ্যই মিশনারি বা অহঙ্কৃত পাশ্চাত্ত্য পর্যবেক্ষকেরা পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তাঁদের কাছে ভারতীয় সমাজ অশালীন, অসৎ, অকৃতজ্ঞ। নিবেদিতা তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন : "সমগ্র পৃথিবীতে দেখা যায়, সমাজ গ্রথিত থাকে তার অন্তর্গত মনুষ্যগণের ভ্রাতৃত্ব ও নিঃস্বার্থতার দ্বারা। নৈতিক ভূমিতে যাকে বলা হয় 'ন্যায়', আঙ্গিক ক্ষেত্রে তাই হল 'পারস্পরিক সংসক্তি।' তাই কোনো মনুষ্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে যদি বলা যায়, তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা, সততা, কিংবা বিনয় ইত্যাদি লক্ষণ অজ্ঞাত তাহলে সেটা প্রলাপ ছাড়া আর কিছু হয় না—তার দ্বারা বক্তা অযোগ্য সাক্ষীরূপে প্রমাণিত হন। তবে একথা খুবই বিশ্বাস্য যে, ঐসকল অপরিচিত মনুষ্যের মনোভাব প্রকাশের রীতি আমাদের মতো নয়, এবং তারা ভিন্নতর প্রতীতি অনুসরণ করে থাকে। একটা সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ভারতীয় সমাজে 'প্লীজ', 'থ্যাঙ্কস্‌' ইত্যাদি শব্দের চল নেই। [অহো, সেকাল গত ; এখন আমরা ভারতীয়, আমরা মুহুর্মুহু 'ধন্যবাদ' বর্ষণ ক'রে ভাষা-দুর্বলতা দূর করতে বদ্ধপরিকর], তাই ইংরাজরা ধরেই নেন, ছোটখাট ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা বোধ করার রীতি ভারতীয় সমাজে বলবৎ নেই। এসব ব্যাপারে অন্যের মতো আমিও ভারতীয় শৈথিল্যের প্রত্যক্ষগোচর রূপ দেখে বিরক্তিবোধ করেছি। একদিন কিন্তু আমার শিক্ষা হয়ে গেল। এক হিন্দু-বন্ধু আমার জন্য একটা কাজ করে দেবেন বললেন, যার জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন ছিল। আমি তাঁকে উত্তপ্ত ধন্যবাদ জানালুম। তার পরিণতি যা হল কখনো ভুলব না। 'আপনি দেওয়া-নেওয়া করছেন।'—কক্ষ ত্যাগ করার সময়ে তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে বললেন। সে ঘটনার পরে, আজ যদি কোনো হিন্দু আমাকে 'প্লীজ', বা 'থ্যাঙ্কস্‌' বলে তাহলে আমার মনোভাব সেই মাতার মনোভাবের মতো হয়ে দাঁড়ায়ে যাঁকে তাঁর পুত্র মাতৃস্নেহের বিনিময়ে প্রশস্তিবাক্য শুনিয়েছে। দৃষ্টান্তটি ক্ষুদ্র কিন্তু এটি শত-শত ঘটনার প্রতিনিধি, যার থেকে বোঝা যায়, মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ধৈর্য ও বিশ্বাস রাখলে তা আমাদের 'সহানুভূতি' ও 'অভিব্যক্তির ভাষা-ভাণ্ডারে' অমূল্য রত্নরাজি দান করবে।" নিবেদিতা এর সঙ্গে যোগ করলেন : "যদি কেউ তার স্ব-জাতীয় রীতিনীতিকে আদর্শের মানদণ্ড ধরে নিয়ে তার দ্বারা অন্য সকল জাতিকে মাপতে চায় তাহলে তার থেকে উদ্ভট কাণ্ড আর কিছু হতে পারে না।" নিবেদিতা এইসূত্রে ভিন্নদেশীয় মানুষদের বিষয়ে মিসেস ফ্লোরা অ্যানী স্টীলের সহানুভূতিপূর্ণ রচনার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। অপরদিকে হাজির করেছিলেন মিশনারিদের বিপরীত

প্রয়াসের চেহারা, যারা অপর জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে ব্রতী। "একালে ভ্রাম্যমান প্রচারকেরা মিশনারি-চেহারা ধরে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন চৌকো গর্তে গোল জিনিস ঢোকাতে, আর সেই চেষ্টায় ধ্বংস করছেন কাব্য, পুরাণ, লোকসংস্কৃতি, তৎসহ সেইসকল বিরল, সুন্দর গুণাবলী যাদের সমাদর করার মতো জ্ঞানগম্যি ওঁদের নেই।" নিবেদিতা দৃষ্টান্ত দিলেন : বহুকাল পূর্বে ঐ ধরনের কাজ করেছিল রোমকরা—আইরিশ সংস্কৃতিকে ধ্বংস ক'রে। স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্যভূমি অনুর্বর হয়ে গেছে স্কটিশ চার্চের চেষ্টায়, যারা উপড়ে ফেলেছিল স্থানীয় লোকগাথা ও অন্য সংস্কৃতির চিহ্ন। স্ক্যান্ডি-নেভিয়াতে সে-কাজ করা যায়নি বলে নরওয়েতে অক্ষুণ্ণ আছে জাতীয় প্রাণশক্তি। নিবেদিতা দুঃখ জানালেন—ইংলণ্ডেরও একই জাতীয় দুর্গতি ঘটছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের প্রাণ-মন-জীবন এখন এমন একছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছে যে, সেখানে মিঃ পিকউইকের মতো চরিত্র আর মিলবে না—"আহা, ঐসব উদ্ভট-অদ্ভুত, খেয়ালী, প্রীতিজনক, অপ্রত্যাশিত সংঘটনের সামর্থ্যে ঐশ্বর্যশালী, পুরো মাপে মানবিক, ক্ষণে-ক্ষণে আলোকিত মনোভূমি-যুক্ত মানুষ!" "ওঁরা সেই কালের লোক যখন প্রতিটি মানুষই ছিল জীবন-ঘনিষ্ঠ। তাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন কর্ষিত ভূমির সঙ্গে।"

নিবেদিতা বললেন, ইংরেজি ভাষাকে অপমানিত করেছে মিশনারিদের কুৎসা-রচনা। আর মিশনারি-পদ্ধতির শিক্ষা অশুচি করেছে ভারতীয় শিশুদের চিত্ত। তিনি এক হিন্দু-পিতার অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। ঐ ব্যক্তি নিজ কন্যাকে এক ইংরাজনারীর স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে মেয়েটি অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষে ঈশ্বরাবতার বলে গৃহীত রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে কতকগুলি নোংরা শব্দ শিখে ফেলেছিল। নিবেদিতা ধিক্কার দিয়ে বললেন, কোনো জাতির সর্বোত্তম আদর্শ-পুরুষদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহানি ঘটাবার এই চেষ্টার চেয়ে জাতির সংহতিনাশক অসাধু চেষ্টা আর কি থাকতে পারে? "ভারতে খ্রীস্টধর্ম তাই সামাজিক সংস্কৃতির স্বপক্ষীয় শক্তি নয়, পরন্তু তার বিপরীত।" "যে-ধর্ম মানুষকে বলে —'এতদিন তুমি যাদের ঠিক বলে মনে করে এসেছ সে সকলই ভুল'—সেই ধর্ম নিঃসন্দেহে অপরিমেয় সামাজিক দুষ্ক্রিয়ার হেতু। এই ধর্মপ্রভাবিত শিক্ষার্থীরা অতঃপর নির্ঘাত ধরে নেবে, তাহলে এতদিন সে যাদের ভুল বলে মনে করেছে, তারা অবশ্যই ঠিক। এক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, ভারতে খ্রীস্টধর্ম মদ্যাসক্তিকে পিছনে বেঁধে নিয়ে এসেছে তাহলে বিস্ময়ের কোনো কারণই থাকতে পারে না। এই কারণেই গৃহস্থ-মানুষ পারলে খ্রীস্টান-ভৃত্য বাড়িতে রাখেন না।"

ভারতে সমাজসংস্কারের কাজে মিশনারিদের একচেটিয়া অধিকারদাবির উত্তরে নিবেদিতা ভারতীয় রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নাম করেছেন, এবং রামমোহনেরও অনেক আগে ঘোরতর 'সতী'-বিরধী নানক, ও জাতিভেদবিরোধী চৈতন্যের মতো বিরাট পুরুষদের উল্লেখ করেছেন। নিবেদিতা মিশনারিদের একটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করতে চাইলেন। ভারতবর্ষে ত্যাগ ছাড়া ধর্ম হয় না। কি বিচিত্র, যে-খ্রীস্টধর্মের প্রথম প্রচারকরা কঠোর দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করে বহির্দেশে যেতেন, তারই প্রচারকরা এখন বিলাসসুখে নিমজ্জিত থেকে চতুষ্পার্শ্বের মানুষগুলিকে ঘৃণা করছেন, যেহেতু ঐসব মানুষের জীবনে আছে আদিম অকৃত্রিম সরলতার স্পর্শ!! প্রেমে ও প্রার্থনায় পূর্ণ খ্রীস্ট-জীবনের পাশে ভোগসুখী মিশনারিদের জীবনচিত্র নিবেদিতা এঁকেছিলেন। অসাড়চিত্ত ঐ মিশনারিরা মানুষকে তার নিজ শক্তির ক্ষেত্রে দেখতে অসমর্থ। তারা কি জানে, "চার্লস ডারউইন কে, নিউটন কে?"

"চার্লস ডারউইন কে? সকল জীবনের মধ্য দিয়ে, নিজ জীবনের মধ্য দিয়েও, প্রবাহিত অখণ্ড জীবনের অনন্ত তরঙ্গধারাকে দেখবার দৃষ্টি ও হৃদয়সম্পন্ন পুরুষের নাম ডারউইন। নিউটন কে? সর্বনিয়ন্ত্রী শক্তিসমূহের বিকাশলীলার মধ্যে মহাজাগতিক অসংখ্য কণার এক তুচ্ছ কণারূপে এই পৃথিবীকে দর্শন করার মতো মনঃশক্তির অধিকারী পুরুষের নাম নিউটন।" অর্থাৎ নিবেদিতা বলতে চাইলেন, মানবসৃষ্টি ও মানবসমাজকে অখণ্ডরূপে দর্শন করাই যথার্থ মানবতা। একজন হিংস্র যুদ্ধবীর, শত্রুতাই যার ধর্ম, সেও নিজ অনুগামীদের সঙ্গে অন্ততঃ ঐক্যবন্ধ। সেখানে কবি ও ঋষিদের মানবাত্মিকতার কথা তো বলাই বাহুল্য। তাঁরা সর্বদাই অপরকে নিজের অপেক্ষা অধিক মানবিক ও অধিক সুন্দর মনে করেন। এই ধরনের মানুষ নিন্দা ও কুৎসা কদাপি করতে সমর্থ নন। "ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষ সম্বন্ধে মানহানিকর কুৎসার উন্মত্ত আমোদ—বৈকালী চায়ের আসর বা গির্জার বক্তৃতাবেদী, যে-স্থানই তার উৎস হোক—এঁদের কাছে তা অকথ্য নোংরামি।" মিশনারিদের শুভবাসনাকে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেও নিবেদিতা ব্যর্থ হয়েছেন যেহেতু দেখেছেন যে, যাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে যান তাঁদের সম্বন্ধে ও'রা একটাও ভালো শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন না। নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন, কেন ভারতীয়দের বিষয়ে কেবল গঙ্গায় কুমীরের মুখে শিশুনিক্ষেপের কাহিনী বা অনুরূপ অন্য কাহিনীর প্রচারণা? কেন মিশনারিদের মুখে হিন্দু গৃহজীবনের সৌন্দর্য, হিন্দুনারীর অপূর্ব আদর্শ, ভারতীয় রীতিনীতির কাব্যিক সুকুমারতা ও মধুরিমার কথা শোনা যায় না? "প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, উক্ত মিশনারি-বক্তার নিজ ধর্মের মর্যাদা ও তার বিস্তারের আশা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল—অন্যরীতির জীবনের শূন্যগর্ভতা ও অপদার্থতার ঘোষণার উপরে!!"

ভারতীয়দের যেসব দোষে দোষী করা হয়, সেইপ্রকার দোষ অন্য দেশীয়দের মধ্যেও আছে, সেকথা প্রশান্তভাবে স্মরণ করাবার পরে নিবেদিতা বলেন: "প্রতিটি পদ্ধতি অপর পদ্ধতিকে অবিশ্বাস করে—দলবদ্ধতার এই কুসংস্কার।" ভারতীয়দের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিশনারি-অভিযোগগুলিকে নিবেদিতা অতঃপর ১৩ ভাগে ভাগ ক'রে প্রতিটির উত্তর দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি বিশেষ অভিযোগ: ভারতে হিন্দু নারীদের জোর করে অজ্ঞ রাখা হয়। নিবেদিতা বললেন: "এক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষকের অযোগ্যতা প্রমাণিত। স্পষ্টই 'নিরক্ষরতা' ও 'অজ্ঞানতা' একার্থে ব্যবহৃত। না, নারীদের জোর করে ঐ অবস্থায় রাখা হয়েছে একথা সত্য নয়। কিন্তু যদি তা করা হয়ে থাকেও তবু গৃহ-পরিচালনার ও রন্ধনের জ্ঞানের কি কোনো মূল্য নেই? অনুশীলিত সহজ বুদ্ধি কি তুচ্ছ ব্যাপার? কোনো নারীকে কি অশিক্ষিত বলা যাবে যদি সে লিখতে বা পড়তে না পারলেও মহাকাব্য ও পুরাণ-সমূহের সাহিত্যিক সংস্কৃতিতে পূর্ণনিষিক্ত থাকে? চিত্তাকর্ষক এই সংবাদটি জানানো যায়—বাংলার সর্বাধিক সুপরিচালিত জমিদারীগুলি বিধবাদের নিয়ন্ত্রণাধীন, আইনজীবীরা অতি অবশ্য যাঁদের মতামতের সম্মান করেন। মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অহল্যাবাঈ একই ধরনের দৃষ্টান্ত।"

ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও সমাজের ত্রুটি সম্বন্ধে সাক্ষ্য মিশনারিরা কোন্ কোন্ সূত্র থেকে সংগ্রহ ক'রে থাকেন, তাদের বিষয়ে নিবেদিতা এর পরে সন্ধানী দৃষ্টি দিলেন। সাক্ষী তিন ধরনের: (১) ভারতীয় সংস্কারক, (২) খ্রীস্ট-ধর্মান্তরিত ভারতীয়, এবং (৩) প্রয়োজনে হাতে-পাওয়া পুরো আহাম্মক। এদের মধ্যে, ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, মিশনারিদের কুক্ষিগত, ভারতীয় খ্রীস্টানরা যে, মিশনারি-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তুলবে তাতে

আশ্চর্যের কিছু নেই। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত উৎসাহী আহাম্মকদের বিষয়ে মনোযোগ না দিলেও চলবে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কারকদের মধ্যে অনেকেই তো জ্ঞানীগুণী—তাঁদের নিন্দাবচন খণ্ডিত করা যাবে কি করে? নিবেদিতার উত্তর : " এই শ্রেণীর [অর্থাৎ সংস্কারক-দের] সাক্ষ্যের মূল্য কতখানি তা আমরা সকলেই জানি। একবার ভেবে দেখা যাক : [ইংলণ্ডের] 'নারী-অধিকার বিষয়ে আন্দোলনকারিণীরা' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নারীর অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা করছেন। সেইকালে তাঁরা এই কথাগুলিকে কিভাবে পরিপাক করবেন—ক্ষেত্রবিশেষে প্রাচ্য নারীদের এমন অধিকার ও কৃতিত্ব আছে যার অনুরূপ কিছু তাঁরা অর্জন করেন নি? ওটা শোনালে অবশ্যই অসহ্য ঠেকবে। অথচ উক্ত 'নারী-অধিকার বিষয়ে আন্দোলনকারিণীরা' হয়ত মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই নিজেদের অধঃপতিত অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—ভোটার-লিস্টে তাঁদের 'অপরাধী, পাগল ও দেউলিয়াদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।' পরিষ্কার দেখা যায়, উৎসাহী সংস্কারকরা নিজেদের মধ্যে যেসব কথা বলে থাকেন, সেগুলিকে যদি ওঁদের দেশের রীতিনীতির ভাবী ব্যাখ্যাতারা আক্ষরিক সত্য বলে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হন তাহলে তাঁদের দুঃখের অন্ত থাকে না। সংস্কারকরা তখনই এগিয়ে গিয়ে বলেন, ওসব নিন্দাকথার আপেক্ষিক মূল্যই মাত্র স্বীকার্য।" নিবেদিতা অধিকন্তু জানালেন, যে-সব ভারতীয় সংস্কারক বৎসরের পর বৎসর বিদ্বেষ-বিরক্তির পিত্তাধিক্যে ভুগেছেন, তিক্ততা ও মনোবিকারের শিকার হয়েছেন, এবং বৃহত্তর সামাজিক জীবন থেকে ঘৃণাভরে বিচ্ছিন্ন থেকেছেন—সামাজিক বিষয়ে তাঁদের সাক্ষ্যকে অধিক মূল্য দেওয়া যায় না।

নিবেদিতা ছবিটি উল্টে ধরেছেন : "আমাদের মত ও পথের ভ্রান্তি দূর করবার জন্য প্রচারক পাঠাবার অভ্যাস যদি হিন্দুদের মধ্যে থাকত, এবং সেইসব প্রচারক যদি স্বদেশে ফিরে আমাদের আতিথেয়তা সম্বন্ধে কদর্য নিন্দাদি করত, অতিথির সভ্য আচরণ ভুলে গিয়ে আমাদের পারিবারিক দুর্ভাগ্যের কথা সারা পৃথিবীর সামনে গলা বাজিয়ে শোনাত, আমাদের ব্যক্তিচরিত্রের কর্কশ সমালোচনা করত, কেননা আমাদের অন্দরমহলে ঢুকতে দিয়ে অরক্ষিতভাবে আমাদের দেখার সুযোগ তাদের আমরা দিয়েছি—তখন তাদের সেই বিশ্বাসহন্তার কাজকে আমরা কী বলতাম? তথাপি তাদের অন্যায় আমাদের অন্যায়ের তুলনায় তুচ্ছ হত কারণ শক্তি ও আধিপত্য তাদের নয় আমাদের আয়ত্তে। ভারতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তুলতে মিশনারি-কুৎসার তুল্য ভূমিকা আর কিছুর আছে কিনা সন্দেহ। মিশনারি চেষ্টা অপেক্ষা আর কোনো চেষ্টাই [ভারতবর্ষ সম্বন্ধে] আমাদের ঘৃণাকে অধিক তীব্র ও ঘনীভূত করেনি। ইউরোপীয়দের মধ্যে কেবল একটি শ্রেণীই কিছুটা ভারতীয় অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, সেই সুযোগে সেখানকার কথা বাইরে প্রচার করতে পেরেছে—তারা হল প্রোটেস্টান্ট মিশনারি-চিকিৎসক। ঐসব লোকের কথা শুনে মনে হয়, তাদের কাছে কোনো কিছুই পবিত্র নয়। সর্বদেশেই ডাক্তার ও পুরোহিতগণ গৃহসংসারের ভিতরকার দুর্ভাগ্যের প্রত্যক্ষদর্শী—কিন্তু বৃত্তিগত নৈতিকতা তাদের মুখ বন্ধ রাখে। অথচ এইসব মিশনারি সবকিছু বাজারে ছেড়ে দেন। মেডিক্যাল রেকর্ড (সর্বদাই অমনোরম ব্যাপার) বক্তৃতামঞ্চ ও গির্জার বেদী থেকে বিস্তারিত আকারে বিতরিত হয়েছে—আর এই ধরনের অশালীন কার্যকে নিবারিত করতে পারে যে-বৃত্তিগত নৈতিকতা—তার প্রয়োগ করা হয়েছে বিপুল জনতার কাছে সংবাদগুলি পরিবেশনের কালে সংবাদ-দাতার নামটি গোপন রেখে!!"

নিবেদিতা বুঝেছিলেন, ভাড়াটে ধর্মপ্রচারকদের কাছ থেকে নৈতিকতা দুরাশা মাত্র। তাই বলে তাঁদের ভণ্ডামির মুখোশে টান দেবার কাজে তিনি শৈথিল্য দেখান নি। মিশনারিদের মন্দগুণগুলি পর্যালোচনার কালে দেখেছেন, তাঁরা ফ্যানাটিক, তথ্যভ্রান্তির ব্যাপারে উদাসীন ও সহজবুদ্ধিহীন, এবং মাসমাহিনাভোগী ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনকারী। নিবেদিতা ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন—ঐসব দোষমাত্রা লঘু হতে পারে, যদি ধরা যাক, জ্বলন্ত ত্যাগী কোনো সাধু ফ্যানাটিক হন, সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টিকারী কোনো কবি তথ্যব্যাপারে উদাসীন ও সহজবুদ্ধিহীন হন, বৃত্তিগত দায়িত্ব ও শিষ্টাচার পালনকারী কোনো ডাক্তার মাহিনাভোগী ও স্বাচ্ছন্দ্যভোগী হন। মিশনারিরা ঐসব শ্রেণীর মানুষের দোষ-অংশ অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু তাঁদের গুণ-ভূমিকা কি নিয়েছেন? অবশ্যই নেন নি। নিবেদিতা অধিকতর প্রখর হয়ে মিশনারিদের জন্য তাঁদের পক্ষে অসম্ভব জীবননীতির বিধান না দিয়ে ছাড়েন নি। "যেসব ব্যক্তি খ্রীস্টান-মিশনারির ভূমিকা নেবেন তাঁদের কাছে পরিষ্কার একটি পথই আছে—তাঁরা প্রশান্ত প্রাচ্যদেশে গমন করুন আদর্শে দৃঢ় ও ত্যাগে জ্বলন্ত হয়ে—'নেকড়েদের মধ্যে মেষশাবকদের মতো।' তাঁদের জন্য বিবাহ বা সন্তান উৎপাদন নয়, জাতি বা পদের পার্থক্যজ্ঞান নয়, লাভ বা সঞ্চয়ের চিন্তা নয়।"

বয়ে গেছে। আমরা উল্টো কাজ করব। আমরা যাব মেষশাবকদের মধ্যে—নেকড়ে হয়ে। সুতরাং মিশনারিরা সাধুজীবন যাপন না করেও ফ্যানাটিক হবেন; কবিদের মতো সৌন্দর্য-মাধুর্যের স্রষ্টা না হয়েও বুদ্ধি বিবেচনাহীন তথ্যভ্রান্তি ঘটাবেন; ডাক্তারদের মতো বৃত্তিগত শিষ্টাচার রক্ষা না করেও মাসমাহিনাসহ ভোগের জীবন যাপন করবেন।

মিশনারিদের সেই অধিকার ঘোষিত হয়েছিল—একদিকে নিবেদিতার বক্তব্য প্রচার বন্ধ করার চেষ্টায়, অন্যদিকে মুহুর্মুহু প্রতিবাদে। আর, নিবেদিতা নিজ মানবিকতার অধিকার ঘোষণা করেছিলেন পরাভূত মানুষদের মর্যাদারক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় পর্ব

নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রয়াসের প্রথম পর্যায়

১৯০২—১৯০৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিবেদিতা-ওকাকুরা বৈপ্লবিক পর্ব

॥ ১ ॥ সূচনার কথা

বৃটিশ শাসনের অনৌচিত্য বুঝে নিবেদিতা যখন বিদারণমুখী আগ্নেয়গিরি, ঠিক সেইসময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল এক অভারতীয় প্রাচ্যবাসীর, যিনি ভারতে এসে কিছু-একটা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর নাম কাকুজো ওকাকুরা। নিবেদিতা ও ওকাকুরা মিলিত হয়ে ভারতবর্ষে কিছু সময়ের জন্য যেসব বৈপ্লবিক কার্য করেছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও তার বিবরণ ঠিকভাবে উদ্ধার করা হয়নি বা করা যায়নি। এ-সম্পর্কে প্রথম অল্পাধিক সংবাদ দেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। লিজেল রেমঁ তাঁর নিবেদিতা-জীবনীতে আরও কিছু সংবাদ দেন, যদিও তাকে অপ্রচুর মনে করেছিলেন মিস ম্যাকলাউড। সুখের বিষয়, নিবেদিতার পত্রাবলীতে অতিরিক্ত সংবাদ আছে, তার দ্বারা আমরা নিবেদিতা-ওকাকুরার কয়েক মাসের কাজকে ভারতবর্ষে প্রথম সত্যকার গোষ্ঠীগত বৈপ্লবিক প্রয়াস বলতে পারব।

১৯০২ সালের কিছু সময়ে নিবেদিতা-ওকাকুরার কার্যাবলীকে ভারতবর্ষে প্রথম সত্যকার বৈপ্লবিক কার্য বললে বিতর্কের সৃষ্টি হবে, যার সম্মুখীন হতে গেলে প্রয়োজন —ঐ সময়ের পূর্ববর্তী বাংলা বা ভারতের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের তথ্য সন্ধান করা। বৈপ্লবিক কাজ বলতে ঠিক কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে মতৈক্য নেই। তবে পরাধীন দেশের ক্ষেত্রে তার সরলীকৃত এই রূপকে আমরা গ্রহণ করেছি—সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের জন্য প্রকাশ্য বা গুপ্ত 'সশস্ত্র' প্রয়াস। গুপ্ত পরিকল্পনা প্রকাশ্যে ব্যক্ত হত বৃটিশ শাসক ও তাঁদের ভারতীয় সহযোগীদের হত্যায় এবং অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি ইত্যাদি কার্যে। সেইসঙ্গে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না—প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের মনকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা।

॥ ২ ॥ ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি বাংলায় বৈপ্লবিক প্রয়াস

এদেশীয় বিপ্লবচেষ্টার ইতিহাস নাড়াচাড়া করলে দেখি, ১৯০২ সালের অনেক আগেই বিপ্লবের বিদেশী সাহিত্য ভারতে প্রবেশ করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের উচ্চকিত করেছে। সিপাহী যুদ্ধের পূর্বেই তা ঘটেছে। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের বাস্তব আঘাতে বাঙালী ও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব-সম্বন্ধীয় রোমান্টিক কল্পনাবিলাস কিভাবে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল তা অন্যত্র বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছি।[১] এরও আগে

---

১ সমকালীন, ৪র্থ, ১৮-২০।

দেখা গিয়েছিল, ফরাসি বিপ্লব ও অন্যান্য বিপ্লবের ভক্ত রামমোহন—অনুরূপ কিছুকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে দিতে রাজি ছিলেন না। রামমোহন ও ডিরোজিওর শিষ্য ও ভক্তগণ বিপ্লব-সাহিত্যের সুখতাপ কিছুদিন পুইয়ে, অধিকতর সুখতপ্ত বৃটিশ শাসনের কোলে ঠাঁই খুঁজে নিয়েছিলেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বৈপ্লবিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে তথ্য দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর "দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" গ্রন্থে, কিন্তু সেখানে সংবাদসূত্র এতই ক্ষীণ যে, টানাটানি করলে সেগুলি সহজেই ছিঁড়ে যাবে।২

---

২ ভূপেন্দ্রনাথ "দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" (জুন, ১৯৪৯) গ্রন্থে রামমোহনের বৈপ্লবিক প্রয়াস সম্বন্ধে লিখেছেন :

"কয়েক বৎসর পূর্বে রামমোহন লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকীতে 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতাতে প্রকাশ করেন—ছয়খানা ফার্সি পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে রামমোহন দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহকে শীর্ষস্থানীয় করিয়া ইংরেজের বিপক্ষে একটি নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।"

উক্ত ফার্সি পত্রগুলির জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করব, মধ্যবর্তীকালে এইটুকু জ্ঞানে স্থগিত থাকব—রামমোহন বহির্ভারতের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যতই উৎসাহিত থাকুন, ভারতের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ইংরেজী সহবাস চেয়েছিলেন, যার দ্বারা, তিনি আশা করেছিলেন, ভারতবর্ষ ইংরেজের সবকিছু নিয়ে ফেলবে—এমনকি তাদের ধর্ম পর্যন্ত। [এ-বিষয়ে সমকালীন-এর তৃতীয় খণ্ড, ২২৫-২৮ পৃ. দ্রষ্টব্য]।

বিদ্যাসাগরের বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "মেদিনীপুরের একটি স্কুলের একজন অতিবৃদ্ধ পণ্ডিত আমাকে...বলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুদের কাছে বলিতেন, 'তোমাদের আর উপায় নাই, জঙ্গলে গিয়া পল্টন তৈয়ার করো।' তিনি সময়ে-সময়ে এত গরমভাবে কথা বলিতেন যে, বন্ধুরা তাঁহার ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিতেন।" [পৃ. ৩৯]। দুঃখের বিষয়, বন্ধ কপাট এখনো বন্ধই আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কিভাবে জাতীয়তাসৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনের তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য ভূপেন্দ্রনাথ হাজির করেছেন :

"বঙ্কিমবাবু যখন হুগলীতে কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেইসময়ে হেমবাবু প্রত্যেক শনিবার তথায় আসিতেন। (হুগলি তাঁহার শ্বশুরালয়)। ভূদেববাবু তথায় চাকরি করিতেন। ইঁহারা দেশকে জাগাইবার জন্য পরামর্শ করিতেন। এই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' এবং ভূদেববাবুর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' পরামর্শ করিয়া লিখিত হয়। 'ভারত সঙ্গীতের' কবিতা সর্বপ্রথম যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহার সুর অতি চড়া ছিল। সেইজন্য তাহা পরিবর্তিত করিয়া কাগজে প্রকাশিত হয়। এইসঙ্গে বিদ্যাভূষণকে দেশপ্রেমোদ্দীপক নানা পুস্তক লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তিনকড়িবাবুকে হুগলি এবং চন্দননগরের আশেপাশে ব্যায়ামাগার স্থাপন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।" [৮৭-৮৮]।

রাজনৈতিক সাহিত্যসৃষ্টির জ্বলন্ত কর্মশালার এই সংবাদ চমকপ্রদ সন্দেহ নেই, তবে এখনো পর্যন্ত এর আশ্রয়—ভূপেন্দ্রনাথ-শ্রুত তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি। বিশ্বাস-বা অবিশ্বাসের দায় পাঠকের।

প্রথম স্পষ্ট রাজনৈতিক গুপ্তসভা রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "হাঞ্চু পামু হাফ", যেটি নিঃসন্দেহে 'গুপ্ত' কিন্তু বাস্তবপক্ষে কতখানি 'রাজনৈতিক' বলা শক্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, এটি মাৎসিনীর বিপ্লববাদের প্রভাবে গঠিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই মাৎসিনীর প্রভাব বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক মহলে বলবৎ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় মাৎসিনীর জীবনী লিখেছিলেন, তা যুবকদের উদ্দীপনা দিয়েছিল। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ মাৎসিনীর উপরে বক্তৃতাও করেছেন। হাড়ে-মজ্জায় মডারেট সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য মাৎসিনীর বিপ্লবদর্শনকে কার্যকরী করার কথা ভাবতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখেরা গুপ্তসমিতি স্থাপন ক'রে ফেলেছিলেন, যার সমাপ্তি ঘটতে বিলম্ব হয়নি, যদিও বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী থেকে এই ভয়াল সংবাদ পাই, "সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন ক'রে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্তে অঙ্গীকারপত্রে নিজ-নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।"

একই পরিণতি হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুর উপরিউক্ত সঞ্জীবনী সভা বা সাংকেতিক ভাষায় চিহ্নিত "হাঞ্চু পামু হাফ" নামক গুপ্ত সভাটির। উক্ত গুপ্ত সভা অবলম্বনে ঠাকুরবাড়ির রোমান্টিক কল্পনার চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছিল, সে এক বৈপ্লবিক নাটকের উপযোগী মনোরম মঞ্চসজ্জা—তার সকৌতুক বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে করেছেন। ব্যাপারটা সত্যই মজাদার।৩

---

৩ ঠনঠনের এক পড়ো বাড়িতে স্থাপিত এই সভার বিষয়ে "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে পাই :

"সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপালবাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সভার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল ভাঙা ছোট টেবিল একখানি, কয়েকখানি ভাঙা চেয়ার, ও আধখানা ছোট টানা পাখা—তারও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।...যেদিন কোন নূতন সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ-সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে, এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ-ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পরে তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্প গুজব) আরম্ভ হইত। কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় সঞ্জীবনী সভাকে 'হাঞ্চু পামু হাফ' বলা হইত।"

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে সানন্দে লিখেছেন, পড়ো বাড়িতে রহস্যমণ্ডিত অনুষ্ঠানের মধ্যে "গোপনীয়তাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল।" "দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না।" "উত্তেজনার আগুন পোহানোর" অতিরিক্ত তাঁরা কিছু করতে আগ্রহী ছিলেন না;

'হাণ্ডু পামু' নিশ্চয় প্রহসন তবু একটা আয়োজন—সুতরাং উল্লেখ্য। ওর সময় অনুমান ১৮৭৫-১৮৮০-র মধ্যে। তার পর্যবসানের কয়েক বৎসরের ভিতরে সত্যকার বৈপ্লবিক অভিপ্রায় দানা বেঁধে ওঠে—ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের চেষ্টায়, যিনি নিঃসন্দেহে বাংলার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রথম পর্বের মূল নেতা। একথা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, হেমচন্দ্র কানুনগোও তাই। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" (১ম খণ্ড) গ্রন্থে এঁর বিষয়ে লিখেছেন :

"বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র। মিত্র মহাশয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু। তিনি ইংরাজিতে উত্তমরূপ লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, তথাচ কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিয়া নামার্জন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার কখনও ছিল না। কংগ্রেসে চেঁচাইয়া দেশবিখ্যাত 'নেতা' হইবার সুবিধা তাঁহার বিশেষই ছিল, কিন্তু তিনি বক্তৃতা দেওয়াকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন এবং কখনও আবেদন ও নিবেদনকারীদের রাজনীতির সহিত মিশেন নাই। তিনি প্রথমাবস্থায় বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্যের সহিত বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন।"

হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর "বাংলায় বিপ্লব প্রয়াস"-এর মধ্যে জানিয়েছেন, "বৃদ্ধ ব্যারিস্টার" পি মিত্রই ছিলেন "বাংলার বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির প্রধান কেন্দ্রের সভাপতি।" গুপ্তসমিতি স্থাপনের বহু পূর্বেই, যখন তিনি "বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই সিক্রেট সোসাইটির খেয়াল তাঁর মাথায় ঢুকেছিল এবং 'ক'-বাবুর [অরবিন্দের] অনেক পূর্বে অনুশীলন সমিতি বা ঐরকম কিছু নাম দিয়ে একটি গুপ্তসমিতি চালিয়ে আসছিলেন।"

পি মিত্র অবশ্যই অরবিন্দর অনেক আগে থেকেই গুপ্তসমিতি চালিয়ে আসছিলেন, তবে অনুশীলন সমিতি নাম দিয়ে নয়। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর "দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম"

তাঁরা যে "বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয়" করেছিলেন, যার স্মৃতিতে পরবর্তী জীবনে কেবল *হাসতেন—সেকথাও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।*

রবীন্দ্রনাথ কোনকালেই গুপ্ত বিপ্লবের সমর্থক নন, একথা সর্ববিদিত। হিন্দুমেলার 'ন্যাশান্যাল' নবগোপাল মিত্র, জাতীয় ভাবধারার প্রচারে যাঁর শ্রদ্ধেয় ভূমিকা—তিনি হাণ্ডু পামু হাফ-এর মধ্যে ঢুকলেও কোনমতে বিপ্লবী হতে পারেন না তা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি থেকে বোঝা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নবগোপালকে হিন্দুমেলার *প্রদর্শনীতে দেশী পেন্টিং দেখাবার ব্যবস্থা করতে* অনুরোধ করলে নবগোপাল একটি ছবি আঁকিয়েছিলেন যাতে দেখা যায়—"ব্রিটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাত জোড় করিয়া বসিয়া আছে।" *ন্যাশন্যাল মেলায় এইরকম ইন্টারন্যাশন্যাল কাণ্ড* দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ শিউরে বলেছিলেন, "উল্টে রাখো, উল্টে রাখো।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়)।

হিন্দুমেলার বিশিষ্ট কর্মকর্তারা নাকি পাখি শিকারের ভান করে বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করতেন। বিপিনচন্দ্র পাল অন্ততঃ তাই জানিয়েছেন। (রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পরিশিষ্ট)। ঐ প্রকার শিকার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"তে এই : "রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন।...এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্ততঃ সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুর-মাত্রায় ছিল—আমরা হত-আহত পশুপক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না।"

গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে স্বয়ং পি মিত্রের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "'প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় বলিতেন, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে [?] বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্বে কয়েকবার তিনি বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্বে চারবার তাঁহার এই উদ্যম ব্যর্থ হয়।" ঐ পর্বে তাঁর সর্বাধিক ব্যর্থ অভিপ্রায়—১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেল ভেঙ্গে উদ্ধারের বাসনা।৪

পি মিত্র ও সরলা দেবী কর্তৃক ১৮৯৭ সালে সংগঠিত একটি সমিতির কথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থে লিখেছেন। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য, ছেলেদের লাঠিখেলা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করা।৫ ঐ '১৮৯৭' সালটি প্রভাতকুমার কোথা থেকে পেলেন জানাননি, এবং সরলাদেবীর আত্মজীবনীতে এ-সম্পর্কে যেসব বিবরণ আছে, তাদের কোনোটিতেই সন-তারিখের বালাই নেই।৬

---

৪ ১৮৮৩, মে মাসে বেঙ্গলী পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়ের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে আদালত দোষী সাব্যস্ত ক'রে ৬ মাসের জেল দেয়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপার। সারা ভারতের মন এই ঘটনায় আলোড়িত হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী "এ নেশন ইন মেকিং" বইয়ে দাবি করেছেন—"জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আমিই আমার প্রজন্মে প্রথম কারাবাস করেছি।" বিচারকালে হাইকোর্টে তিলধারণের জায়গা ছিল না। সকলেই, বিশেষতঃ ছাত্রগণ বিশেষ উত্তেজিত। তারা পুলিশের উপর ইঁটপাটকেল ছুঁড়েছিল, জানলা ভেঙেছিল। উপদ্রবকারী যুবকদের একজন ছিলেন পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কিছু ছেলেকে এই কাজের জন্য গারদেও ঢোকানো হয়। রায় দেবার দিন যেহেতু হাইকোর্টের আশপাশ উত্তেজিত জনতায় ভরে গিয়েছিল, তাই শাস্তিপ্রাপ্ত সুরেন্দ্রনাথকে পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ দিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর জেলে যাওয়ার দিন দেশীয় পল্লীতে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়; বিক্ষোভসভায় এতবেশি লোক হয় যে, হল-ঘরে কুলোয় নি, তার ফলেই নাকি খোলামাঠের জনসভা কলকাতায় আরম্ভ হয়। বাংলার বাইরেও বহু সভাসমিতি হয়। কোনো-কোনো সরকারী কর্মচারী তাতে অংশ নিয়ে শাস্তিও পেয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ যেদিন মুক্তি পান, পাছে সেদিন ভয়ানকরকম কোনো গণ্ডগোল বাধে তাই ব্যারাকপুরে মিলিটারি তৈরী রাখা হয়েছিল।

এইসব সংবাদ থেকে বোঝা যায়, পি মিত্র কেন প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। সে পরিকল্পনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "যখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডিফামেশন কেস্-এ জেলে নিক্ষিপ্ত হন তখন তাঁহার [পি মিত্রের] বৈপ্লবিক বন্ধুরা তাঁহাকে এই উদ্দেশ্যে বরিশালে পাঠাইয়াছিলেন যে, তথায় বৈপ্লবিক পতাকা উড্ডীন করিয়া বহুসংখ্যক লোকসমেত কলিকাতায় আসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জেল ভাঙিয়া নিষ্কৃতি দিবেন। তিনি বলিতেন, এজন্য বরিশালের লোকও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কলিকাতার নেতারা প্রতিশ্রুত sign দিলেন না। উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।" ['অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস']

পি মিত্র মহাশয়ের উদ্যম অঙ্কুরে বিনষ্ট হতে বাধ্য ছিল কারণ তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জেল ভেঙে নিষ্কৃতি নিতে মোটেই রাজি ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি এতই অনুগত কয়েদী ছিলেন যে, তাঁর সহ-কয়েদীরা যখন সন্ধ্যাকালে গান গেয়ে তাঁকে আনন্দ দেবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন তখন ঐ কার্যটি আইন-মোতাবেক নয় বলে তিনি গররাজি হন।

৫ গিরিজাশঙ্করের "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় নবযুগ" গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৬ সরলাদেবী তাঁর আত্মজীবনী "জীবনের ঝরাপাতা"-য় লিখেছেন—রুডিয়ার্ড কিপলিঙ-এর

বাংলার বৈপ্লবিক সংগঠনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন সমিতি—আদি যুগান্তর কর্মীরা যার অন্তর্ভুক্ত (অনুশীলন সমিতির একটি বিশেষ গোষ্ঠী যুগান্তর পত্রিকা বের করে ঐ নামে চিহ্নিত হয়)—এর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে যে-লিখিত বিবৃতি দেন, ঐতিহাসিকেরা তার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। সতীশ বসু বলেছেন :

"আমি আগে 'নারায়ণচন্দ্র বসাকের আখড়ায় (গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট) ব্যায়াম করিতাম। এইস্থান হইতে আমি জেনারেল অ্যাসেম্বিব্র কলেজের জিমনাস্টিক ক্লাবে ভর্তি হই।...এইসময়ে অধ্যাপক Wann-এর কাছে ফাস্ট ইয়ারে পড়ি। ওয়ান উপরোক্ত ব্যায়াম ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। এই ক্লাবের সংযুক্ত 'কাশীনাথ লিটারারি ক্লাব' নামক একটি বিভাগ ছিল। একদা তথায় একজন সেক্রেটারি মিনিটস্ লিখিবার জন্য বিলাতি কাগজ আনয়ন করেন ; কিন্তু ওয়ান মহোদয় বলিলেন, 'ইণ্ডিয়া-মেড কাগজ আনো, না-হয় আমি এই ক্লাব বন্ধ করে দিব।' তখন আমার মনে পড়িল, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এতদ্দ্বারা মনে ধাক্কা লাগিল—আমরা স্বামীজীর স্বদেশী, জিমনাস্টিক, লাঠিখেলা, বস্তীতে স্যানিটারি ওয়ার্ক প্রভৃতি করার উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার পর আমরা স্বামী সারদানন্দের কাছে যাই। তিনি বলিলেন : 'স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, যে-কার্য করিতেছ তাহা করিবে, কখনও তাহা ছাড়িবে না। তিনি [স্বামীজী] আরও বলিয়া গিয়াছেন, একটা কাক দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিলে যেমন মুক্তির জন্য ছটফট করে, তেমনি তোমরাই-বা কেন মুক্তির জন্য জীবন দিবে না? সিস্টার নিবেদিতার কাছে যাহা বলিয়া গিয়াছি তাহা তোমরা ছাড়িবে না। তিনিই তোমাদের উপদেশ দিবেন।' ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর উপদেশ জানো—বস্তীতে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কার্য করিবে, লাঠি ও মুগুর-খেলা করিবে, শরীরচর্চা করিবে।'৭

একটি গল্পে বাঙালী চরিত্রে কলঙ্কারোপ দেখে তিনি নিতান্ত ক্রোধে চ্যালেঞ্জ জানাবার বাসনা বোধ করেছিলেন। কিপলিঙ তাঁর গল্পে পাঠান মুলুকের এক বাঙালী আই সি এস অফিসারের কথা বলেন যিনি পাঠানদের লুঠতরাজের সময়ে পালিয়ে যান ; পরে পাঠানরা তাঁকে খুঁজে পেয়ে তাঁর মুণ্ডু কেটে শূলে গেঁথে শহরময় ঘোরায়—বাঙালী গিদ্দরের (শৃগালের) দুর্দশা দেখাতে। এই গল্প পড়ে "লজ্জা ঘৃণা অপমানে" সরলাদেবীর "রক্ত টগবগ করে" উঠেছিল। তিনি কিপলিঙকে চিঠি লেখেন : "আমার জাতিকে তুমি যে কলঙ্কিত করেছ, সে কলঙ্ক ঘোচানোর জন্য আমি তোমাকে আহ্বান করছি—আমার ভাইদের একজন কারো সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। পাঁচ বৎসর সময় দিচ্ছি তোমায়। বন্দুক হোক, তলোয়ার হোক, যেকোনো অস্ত্র তুমি ইচ্ছে করো নিজেকে তাতেই অভ্যস্ত করে নাও—আজ থেকে পাঁচ বছর পরে সে তাতেই তোমাকে যুদ্ধদান করবে।" এরকম আগুনে চিঠি অবশ্য পাঠানো হয়নি, কারণ উড়িষ্যার দেশভক্ত মধুসূদন দাস ঐ আবেগের আগুনে কিছু বুদ্ধির ধূলিবর্ষণ ক'রে বলেছিলেন—পাঁচ বছরে বাঙালী ছেলেদের অস্ত্রচর্চায় পারদর্শী ক'রে তবে যেন কিপলিঙকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়, সেটাই বুদ্ধির কাজ হবে। তখন সরলাদেবী তাঁদের ২৬ নং সার্কুলার রোডের বাড়ির পিছনে পুকুরধারে ছেলেদের লাঠি ও তরবারি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। এই ক্লাবের খবর ছড়িয়ে পড়লে নানা জায়গা থেকে ছেলে আসত। ক্রমে অন্যত্রও এইরকম ক্লাব হয়। এইসব ক্লাবের ছেলেরা ফুটবল মাঠে সাহেবদের সঙ্গে মারামারি পর্যন্ত করে।

এসব ঘটনা কোন্ সময়কার, তা বলা শক্ত।

৭ স্বামীজীর এইজাতীয় উপদেশের কিছু অংশ নিবেদিতার রচনায় মেলে :

"On the last Charok Puja day of his life, a gymnastic society came to

"তৎপর একবার কলিকাতার সাতদিন বৃষ্টিপাত হয়। কলিকাতায় প্লেগ হইয়া গিয়াছে, আমরা রিলিফ ওয়ার্ক করিবার জন্য ওয়ানের সঙ্গে বাহির হইলাম। তিনি ড্রেন সাফ করিতে আরম্ভ করান। তৎপর বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হইল। স্বামী সারদানন্দ প্রথম সভাপতি হন। তিনি বলেন, বিবেকানন্দ সোসাইটি ধর্মচর্চা নিয়াই ব্যস্ত থাকুক, আখড়া আলাদা থাকুক, তুমি [সতীশ] ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রচার করো। তৎপর ওয়ানের অনুমতি-ক্রমে স্বামীজীর ধর্মবিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত কলেজের আমতলায় Historical Club বসিতে আরম্ভ হয় (কলেজের চ্যাপেল-ঘর ব্যবহারার্থ অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই), কিন্তু লাঠিখেলার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। এইজন্য ইহার পর মদন মিত্রের লেনে একটি ছোট লাঠিখেলার ক্লাব স্থাপন করিলাম।...

"এইসময় আমরা নরেন্দ্রবাবুকে (নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেডমাস্টার নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) আখড়ার নামকরণের জন্য অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি 'অনুশীলন সমিতি' এই নাম ধার্য করেন। এই নামটি বঙ্কিমবাবুর সাহিত্য হইতে গৃহীত হয়। এইসময়ে ওয়ান বলেন, তোমাদের ইংরাজ তাড়ানো দল বলিয়া বদনাম উঠিয়াছে। ইত্যবসরে তেঘরিয়ার শশী চৌধুরী, ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে আমাদের লইয়া যান। আমি শশীদাকে বলি, আমাদের সভাপতি বা নেতা নেই। আমাদের ক্লাবের কথা শুনিয়া চৌধুরী বলিলেন, 'এই কর্মের উপযুক্ত লোক হইতেছেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র।' চৌধুরী মিত্রের নামে পত্র দিয়া তাঁহার কাছে আমাদের পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে সবকথা বলিলে তিনি excited হইয়া আমাকে জাপটাইয়া ধরিলেন; পরে তিনি ক্লাবের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ হইলেন। সাতদিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে—তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্বপ্রকারের ট্রেনিং তাহারা দিবে। তাহাদের সহিত তোমাদের amalgamate করিতে হইবে।' আমরাও রাজি হইলাম। এইসময়ে উভয় দলে মিল হইয়া গেল। তাহার ফলে যে-দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ হইলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এইসঙ্গে দলে আসিলেন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার (চিত্তরঞ্জনের শ্যালক) ব্যারিস্টারদ্বয়। সভ্যদের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করার জন্য হালদার মহাশয় একটি ছোট ঘোড়া এই দলকে দান করিয়াছিলেন। এইসঙ্গে একটি ব্যায়ামের আখড়া আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হইল। বরোদা হইতে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, 'মদন মিত্রের লেনের আখড়া পৃথকভাবে থাকুক। আমাদের জুনিয়ার সভ্যরা মদন মিত্র লেনের আখড়ায় থাকুক, আর সিনিয়ার সভ্যরা যতীনবাবুর নেতৃত্বে আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করুক।'" [ভূপেন্দ্রনাথের "দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম" গ্রন্থে সংকলিত]।

প্রশ্ন এই—অনুশীলন সমিতি কবে স্থাপিত হয়েছিল? সতীশ বসুর বিবৃতির

---

the Math for sports and prizes, and he spoke of his desire that the Hindu Lent should be celebrated henceforth by special courses of athletic exercises. The energy which had hitherto gone into the mortification of the body, might rightly, in his opinion, under modern conditions, be directed to the training of the muscles." [*NCW*, Vol. 1. 42]

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুযায়ী তা হয়েছে ১৯০২-এর শেষের দিকে। অবিনাশ ভট্টাচার্য ১৯০২ সালের কথাই বলেছেন। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার (তাঁর 'মিলিটান্ট ন্যাশন্যালিজম ইন ইণ্ডিয়া' বইয়ে) তাই বলেছেন ; জীবনতারা হালদার-রচিত 'অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এও তাই। কেবল ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, যেহেতু তিনি গোয়েন্দা রিপোর্টে ১৯০১ সালের শেষভাগে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরোদা থেকে বাংলায় আগমনের কথা পেয়েছেন, তারই সূত্রে ১৯০১ সালের শেষের দিকে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। এখানে স্বতঃই প্রশ্ন করা যায়, ঐ গোয়েন্দা রিপোর্ট কখন প্রস্তুত হয়েছিল? আমরা শুনেছি যে, তখনকার দিনে বর্তমানের মতো অবিলম্বে রিপোর্ট প্রস্তুত করার পদ্ধতি ছিল না, এবং অনেক রিপোর্টই পরে তৈরী করা হত। এইসব কারণে, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় বলে, আপাততঃ ডঃ মজুমদার-নির্ধারিত সময়কে গ্রহণ করতে পারছি না।

অনুশীলন সমিতি স্থাপনের সময় নির্ধারণের বিশেষ প্রয়োজন এইখানে—বিপ্লব আন্দোলনের প্রায় অনালোকিত যে-স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়টির উপরে আমরা কিছু আলোকপাত করতে চাইছি, তার কাল, অনুশীলন সমিতি স্থাপনের অল্প পূর্ববর্তী। এই পর্বকে আমরা নিবেদিতা-ওকাকুরা পর্ব নামে আগেই চিহ্নিত করেছি।

॥ ৩ ॥ ওকাকুরার ভারতে আগমন ও তার আপাত কারণ

জাপানী শিল্পশাস্ত্রী কাকুজো ওকাকুরার "আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট" বই [বইটি অতঃপর 'আইডিয়ালস্' নামে উল্লিখিত হবে] ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে সবিশেষ প্রেরণার কারণ হয়েছিল—একথা নানা মহলে স্বীকৃত। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনে তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণার উল্লেখ কেউ-কেউ করেছেন। কিন্তু তিনি যে এদেশে বৈপ্লবিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা সাধারণভাবে জ্ঞাত নয়—এবং উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে যে-অল্পমাত্র সংবাদ প্রচারিত আছে তা ইতিহাসে উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি। উক্ত অল্পমাত্র সংবাদের প্রাথমিক উৎস ভূপেন্দ্রনাথের রচনা।

ওকাকুরার ভারতে আগমনের আদি কারণ কি, প্রথম ভারতবাসকালে রাজনীতির বাইরে তিনি কি-কি করেছেন, তার যথাসম্ভব বিবরণ আমি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর পঞ্চম খণ্ডে 'বিবেকানন্দ—ওকাকুরা' অধ্যায়ে উপস্থিত করেছি। এখানে তার থেকে কিছু সংবাদ পরিবেশন করব, সেইসঙ্গে নিবেদিতা-লিখিত 'আইডিয়ালস অব দি ইস্ট'-এর ভূমিকা থেকে প্রাপ্ত ওকাকুরার জীবনকথা থেকেও। এইসূত্রে জানাই, ওকাকুরা সম্বন্ধে মূল্যবান বহু সংবাদ আছে জাপানী লেখিকা শ্রীমতী ইয়াসুকো হোরিওকা কর্তৃক প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রদত্ত (জানুয়ারি, মার্চ ১৯৭৫ ; মার্চ ১৯৭৭) কয়েকটি প্রবন্ধে।

ওকাকুরার জন্ম ১৮৬৩ সালে ; [নিবেদিতা এই সংবাদ দিয়েছেন ; হোরিওকা বলেছেন ডিসেম্বর ১৮৬২] বাল্যকাল থেকে পুরাতনী সংস্কৃতির অনুরাগী : ১৮৮০ সালে কলেজ ছাড়ার পর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ক্লাব, সোসাইটি ইত্যাদির সংগঠনে তৎপর ; ১৮৮৬-তে জাপানের ইম্পিরিয়াল আর্ট কমিশনের সদস্যরূপে ইউরোপ আমেরিকা ঘুরেছেন ; ইউরোপীয় শিল্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পরেও প্রাচ্যশিল্পের প্রতি অটুট অনুরাগ নিয়ে দেশে ফেরেন ; জাপান-সরকার তাঁকে টোকিওর 'নিউ আর্ট স্কুলে'র অধ্যক্ষ

করে দেন; কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় রীতি অনুসরণের জন্য চাপ দেওয়া হলে ১৮৯৭ সালে পদত্যাগ করেন ও তরুণ শক্তিমান শিল্পীদের নিয়ে টোকিওর শহরতলীতে 'নিপ্পন বিজিৎসু' বা 'হল অব ফাইন আর্টস' স্থাপন করেন; পরে আবার সরকারী প্রতিষ্ঠান ইম্পিরিয়াল আর্কিয়লজিক্যাল কমিশনের প্রধান সংগঠক হন।

মিস ম্যাকলাউড ১৯০১ সালে জাপানে থাকাকালে ওকাকুরার বন্ধু হন। ওকাকুরা তারপর ভারতে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানের এক ধর্মমহাসভায় নিয়ে যাবার জন্য। স্বামীজীর জীবনীতে, তাঁর বহু পত্রে ও প্রাসঙ্গিক স্মৃতিকথায় এই বিষয়টি পরিষ্কার লেখা থাকলেও ওকাকুরার ভারতে আগমনের হেতু সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত কথা প্রচারিত হয়েছে যে, তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ভারতে এসেছিলেন। অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি পত্রে, এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ওকাকুরা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—নিবেদিতাই ওকাকুরার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথাতেও ('জোড়াসাঁকোর ধারে') একই ধরনের কথা পাই। যাইহোক, মিস ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথায় দেখি, স্বামীজী ওকাকুরাকে উদারভাবে গ্রহণ করেন, এবং পরে মিস ম্যাকলাউডকে বলেন—"মনে হচ্ছে, বহুদিন পরে যেন হারানো ভাইকে ফিরে পেলাম।" ওকাকুরাও মিস ম্যাকলাউডকে বলেন, "বিবেকানন্দ আমাদের—তিনি প্রাচ্যের—তিনি তোমাদের নন।" বিবেকানন্দকে নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মধুর টানা-টানির বিবরণ তৃপ্তিভরে পরিবেশন করার পরে মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন: "বুঝলাম, ওঁদের মধ্যে সত্যকার বোঝাপড়া হয়েছে।"৮ ওকাকুরা এইসময়ে জাপানে অবস্থিত বৌদ্ধ পুরোহিত ওডা টোকুনো-কে পত্রে লিখেছিলেন—"বিবেকানন্দ সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় পুরুষ।" শ্রীমতী হোরিওকা পত্রটির সন্ধান দিয়েছেন।

হোরিওকার লেখা থেকে জানতে পারি: ওকাকুরা কলকাতায় আসেন ১৯০২, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে বেলুড় মঠে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ২৭ জানুয়ারি তিনি বুদ্ধগয়ায় যান স্বামীজীর সঙ্গে। ১০ ফেব্রুয়ারি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারত ভ্রমণে যাত্রা করেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে কলকাতায় ফেরেন। জাপানী পুরোহিত রেভাঃ ওডা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে কলকাতায় আসেন—২ এপ্রিল। ১৫ এপ্রিল [নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী ১১ এপ্রিল] ওডা, ওকাকুরা ও তরুণ জাপানী হোরি বুদ্ধগয়ায় যান। ২৮ এপ্রিল তাঁরা বেলুড় মঠে ফেরেন। স্বাস্থ্যের কারণে স্বামীজীর পক্ষে জাপান যাওয়া সম্ভব হয়নি। ওডা ১ মে জাপানের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। তারপরেই ওকাকুরা নিবেদিতাদির সঙ্গে মায়াবতী যান; ১০ জুন মঠে ফেরেন। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির পরিচয় হয়েছে। সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ৪ জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ। ৬ অক্টোবর ওকাকুরা ভারত ত্যাগ করেন জাপানের উদ্দেশে। কিছুদিন সেখানে থেকে আমেরিকার বস্টনে চলে যান মিউজিয়াম অব আর্টস-এ কাজ নিয়ে। তিনি পরেও একবার ভারতে এসেছেন।

---

৮ *Reminiscences of Swami Vivekananda*, by his Eastern and Western Disciples, 250.

॥ ৪ ॥ ওকাকুরা ভারতে আসার আগেই তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার পত্রে যোগাযোগ : রাজনৈতিক ভাব-বিনিময়

নিবেদিতা ও ওকাকুরার বৈপ্লবিক সম্পর্কের পটভূমিকারূপে উপরের সংবাদগুলি পরিবেশন করেছি। এখানে জিজ্ঞাস্য, উভয়ের মধ্যে প্রথম যোগাযোগ এবং প্রথম সাক্ষাৎ কবে হয়? প্রথম সাক্ষাতের কাল আমরা মোটামুটি নির্ধারণ করতে পেরেছি—১৯০২, মার্চের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে। নিবেদিতা ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় ফেরেন ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে—স্বামীজী তখন বারাণসীতে, এবং ওকাকুরা মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারতভ্রমণ করছেন। নিবেদিতা কলকাতায় আমেরিকান কনস্যুলেটে অবস্থান করতে থাকেন। এই সময়ে ওকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি কতখানি উদ্‌গ্রীব, তা দেখা যায় মিস ম্যাকলাউডকে লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে : "আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ব্যাকুল। তাঁর জ্ঞান, মর্যাদা বা অন্যকিছুর জন্য আমি ব্যস্ত নই। আমি যাচাই করে নিতে চাই—তাঁর ইচ্ছাশক্তি, পরিমাপ করতে চাই তাঁর আত্মা, তাঁর কাছ থেকে শুনতে চাই—জাতির জীবনতৃষ্ণার শেষ কোথায়? আমি মনে করি—না, আমি বিশ্বাস করি যে, উত্তর আমি পাবই, যে-উত্তর আমি সফল মানুষদের কাছ থেকে এখনো পাইনি।"

এই চিঠির ভাষা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, উভয়ের সাক্ষাৎ না হলেও উভয়ে পরস্পরের মতাদর্শ সম্বন্ধে অবহিত। এই ধারণার পক্ষে কিছু প্রমাণ নিবেদিতার চিঠিতে পেয়েছি। প্রায় একবছর আগে, ৭ মার্চ, ১৯০১, নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : "তোমার জাপানের কবিকে জানতে ইচ্ছা হয়।" এই কবি অবশ্যই ওকাকুরা।[১] আমাদের সংগ্রহের নিবেদিতা-পত্রাবলীতে ওকাকুরার এই প্রথম পরোক্ষ উল্লেখ। নরওয়ে থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা ১৯ জুলাইয়ের চিঠির সূত্রে জানতে পারি, মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতাকে জাপানী কাগজপত্র ('Japanese Papers') পড়বার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়, ওকাকুরার "আইডিয়ালস্" গ্রন্থের যে-খসড়া প্রথমে মিস ম্যাকলাউড করেন (একথা কোন্ সূত্র থেকে জেনেছি পরে বলব) তাই তিনি নিবেদিতার কাছে পাঠিয়ে দেন, তৎসহ হয়ত ওকাকুরার রাজনৈতিক অভিপ্রায় সম্পর্কিত কিছু লেখাও। একইসঙ্গে তিনি ওকাকুরাকে নিবেদিতার প্রচণ্ড বৃটিশ শাসন-বিদ্বেষ ও ভারতে জাতীয়তাসৃষ্টির অভিপ্রায়ের কথাও জানিয়েছিলেন। উক্ত পত্রে নিবেদিতা লেখেন :

"তোমার পাঠানো জাপানী কাগজপত্র আমাকে অসীম আনন্দ দিয়েছে।...আমেরিকা ও নরওয়ে, এবং এখন কিছুটা জাপান থেকে এই কথা শুনে আমি অফুরন্ত সাহস পেয়েছি যে, জাতীয় আদর্শ আমি ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছি। স্বামীজীর কাছ থেকে খাঁটি বস্তু কিছু পেয়েছি বলেই এ-জিনিস সম্ভব হয়েছে, নচেৎ হত না।"

ইংলণ্ডে থাকার সময়ে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের চিঠি ও জাপানী কাগজপত্র

---

১ রোমাঁ রোলাঁ ডায়েরিতে লিখেছেন, মিস ম্যাকলাউড তাঁকে বলেছিলেন যে, ওকাকুরা বিবেকানন্দের আদর্শের মহিমা বুঝলেও তাঁর পথ নিতে পারেন নি, কারণ ওকাকুরার ছিল "শিল্পের ভুবন।" মিস ম্যাকলাউড ওকাকুরার বর্ণনা এইভাবে করেছিলেন : বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে ওকাকুরা উপবিষ্ট—সকলে নিজ-নিজ কাজ তাঁকে দেখাচ্ছেন, তিনি সেগুলির বিচার করছেন—কোনো ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে চালিত হয়ে নয়—ঐসব শিল্পীরা নিজেদের যে দৃষ্টিভঙ্গিতে চালিত ভাবেন তারই অনুসরণে। ওকাকুরা কবিতা লেখেন; প্রতিদিন রাত্রে লেখা কবিতায় ঠাসা ছিল তাঁর ঘরের তাক। ইত্যাদি।

থেকে ওকাকুরা সম্বন্ধে কতখানি জেনেছিলেন তা ঠিক করে বলা সম্ভব নয়, তবে এতে সন্দেহ নেই যে, ঐ যোগাযোগের দ্বারা নিবেদিতা কেবল ওকাকুরার শিল্পবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি জানেন নি, তাঁর রাজনৈতিক মত ও ইচ্ছার কথাও জেনেছিলেন। সে রাজনীতি অবশ্যই গোপন ও সশস্ত্র। বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে নিবেদিতার ঐকালীন মনোভাবের রূপ আমরা কিছুটা আগেই জেনেছি। তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, স্বামীজীর বিরাট ও সর্বাত্মক ভাবকে এখন একটি বিশেষ খাতে চালিত করা দরকার। ৭ মার্চ, ১৯০১ তিনি লেখেন : "আমি অবশ্যই স্বীকার করি, স্বামীজী আছেন মূল বস্তুতে, বাদবাকি অন্য আন্দোলনগুলি বাইরে প্রকাশিত কিছু কিছু লক্ষণকে আক্রমণ করতে ব্যাপৃত।" কিন্তু নিবেদিতা সেই "মূল বস্তুর" অনুসরণ থেকে কিছুটা সরে যেতে চেয়েছেন, অন্ততঃ সাময়িকভাবে, তা তাঁর ১৫ মার্চের চিঠিতে দেখা যায়। তিনি 'বিশেষ' পথ নিতে চান—তা হল রাজনৈতিক পথ। নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন :

"নিজের বিষয়ে এই বলতে পারি, তোমার আশীর্বাদে আমি অভীষ্ট কর্মের যোগ্য হব।...অনুভব করছি, সমস্ত মানুষের মধ্যে কেবল আমিই যেন বস্তুকে তার ঠিক চেহারায় দেখতে শুরু করছি। একথা নিশ্চয় ঠিক যে, স্বামীজী ছাড়া আর কেউ তাকে দেখেন নি ; আরও জানি যে, তাঁর দর্শন আমার দর্শনকে ব্যাহত করছে না, বরং তাকে অধিকতর প্রয়োজনীয় করে তুলছে।"

১০ জুনের চিঠিতে নিবেদিতা তাঁর কংগ্রেসে বক্তৃতা দেবার ইচ্ছার কথা মিস ম্যাকলাউডকে জানিয়েছেন, আশা করেছেন—স্বামীজীও তাই করবেন। এইসঙ্গে লিখেছেন :

"মহা আতঙ্কে দেখছি, আমার কাছে স্বাধীনতা মূল্যবান হয়ে উঠেছে, কারণ আমার জীবন এমন অনেক কিছু বস্তু গ্রহণ করেছে স্বামীজী সম্ভবতঃ যাদের দান করতেন না। সে সকলই অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য নির্ধারিত—আমার তো তাই বিশ্বাস—আর এখন এই ব্যাপারের জন্য তিনি নিশ্চয় আমাকে কন্যাস্নেহে বঞ্চিত করবেন না।"

নরওয়ে থেকে লেখা ১৯ জুলাই ১৯০১, তারিখের চিঠিতে নিবেদিতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কিভাবে আক্রমণ করেছিলেন দেখেছি। এরই মধ্যে তিনি স্বামীজীর বাণী ও পরিকল্পনার বিশালতার কথা বলেও নিজের জন্য ক্ষিপ্র তীক্ষ্ম পথ গ্রহণের কথা বলেছিলেন :

"হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যখন আবার স্বামীজীর রচনার পৃষ্ঠা ওল্টাই তখন তার বিশালতা আমাকে স্তম্ভিত ক'রে দেয়। তারপর আত্মসংবরণ ক'রে চিন্তা করি, তাঁর জ্ঞান ও কীর্তির বিপুল ভারই বোধহয় এই মুহূর্তে ভারতের জন্য যে-সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, তৎসহ স্পষ্ট নিনাদিত কণ্ঠস্বর সর্বাধিক প্রয়োজন—তার ঘোষণার অন্তরায়। আমার অজ্ঞতা ও অগভীরতাই বোধহয় আমার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। তাই বলে, চিরকালের জন্য স্বামীজীর বাণীই যে, চরম ও পরম বাণী—এই বোধ আমার নেই তা নয়। সে বোধ আমার আছেই। কিন্তু দারুণ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, কোনো এক পুরুষে কার্যকর করার পক্ষে ওটি অতিরিক্ত বৃহৎ। ওর থেকে একটা সূচীমুখ বার করতে হবে।"

ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের স্বর্ণলোভী ধারালো বুদ্ধিমান ছোকরাদের কথা বলার পরে (আগেই সে-বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছি) নিবেদিতা বললেন :

"ঐ ধরনের বুদ্ধির বাহ্য ঝলক কোনো মহান জাতির সর্বোচ্চ বস্তু নয়। এব্রাহাম

লিঙ্কনের ঘরোয়া ঐকান্তিকতা এবং সহজতার মধ্যে তা লক্ষগুণে অধিক পাওয়া যায়। লিঙ্কনের সম্বন্ধে এখানে একটা বই আছে, তার মধ্যে জনৈক জনসনের কথা পাই। ঐ ব্যক্তি যখন ন্যাশভিল্ রক্ষা করছিলেন তখন তাঁর এক সহ-অফিসার স্থির করেন—সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করবেন। তাতে ইনি বলেছিলেন: 'আমি কিছু ধার্মিক লোক নই, তবে সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বাইবেলেও বিশ্বাস করি, সুতরাং বলতে পারি, আমি নরকে যাব যদি ন্যাশভিল্ আত্মসমর্পণ করে।' কী লোক! আহা! যদি ভারতে ঐরকম দু'একটি লোক থাকত!"

উক্ত জনসনের পথের সন্ধান ভারতবর্ষকে দিতে উৎকণ্ঠিত নিবেদিতার কাছে 'জাপানী কাগজপত্র' মিস ম্যাকলাউড পাঠাতে লাগলেন। ৩ অক্টোবর নিবেদিতা যে-চিঠি লেখেন তার মধ্যে পুনশ্চ জাপানী কাগজপত্রের কথা আছে, সে সম্বন্ধে ম্যাকলাউড দীর্ঘ পত্র লিখে-ছিলেন, তাও জানতে পারি। এই চিঠি নিবেদিতা লন্ডনের এক খ্রীস্টীয় ভগিনী নিবাসে (Home of Retreat of the Sisters of Bethany) অবস্থানকালে লেখেন। সেখানে অব্যাহত ঐকান্তিক ঈশ্বরবিশ্বাস ও আনুগত্যের রূপ দেখেছিলেন। তারই উল্লেখ ক'রে বলেন:

"এইপ্রকার চরম তীব্র শক্তির একটি যন্ত্র স্থাপন ক'রে, সেটিকে মানুষের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করবার জন্য, আমি কি-না দিতে পারি। কাজের খুঁটিনাটি চেহারা এখনো স্পষ্ট হয়নি আমার কাছে, তবে আশা করি, 'কালী দি মাদার' গ্রন্থের অনুরূপ একটি ছোট বই লেখার তাগিদ কোনো না কোনোভাবে আমার মধ্যে এসে যাবে—যার নাম দেব 'স্বাধীনতা'। সে বইটি যদিও রাজনৈতিক না হয়ে ধর্মীয় বই হবে, কিন্তু পুরো রাজনীতি তার অন্তর্গত থাকবে।

"পরিকল্পনার কথা কিছু বলছি না, কারণ তা এখনো সন্দেহজনক স্তরে। ভারতে ফেরার পথে জাপান ঘুরে যেতে পারি, যেহেতু সেণ্ট সারা [মিসেস বুল] তার প্রয়োজন অনুভব করেন।...তদুপরি তিনি অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছেন, ওকাজ করলে আমি স্বামীজীর কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ব। আর আমি অনুভব করছি, ওর ফলে ব্যাপারটার মধ্যে সরাসরি এগিয়ে যাওয়া যাবে।"

এইসব ইঙ্গিতবহুল রচনা থেকে অনুমান করতে চাই, নিবেদিতার সঙ্গে ওকাকুরার চিঠিপত্রে যোগাযোগের আদর্শ ও কর্ম-পরিকল্পনার কথা উঠেছিল, যদিও কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। (সে সিদ্ধান্ত পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে পত্র-যোগে হয়ে থাকতে পারে, যেসব চিঠির সন্ধান আমরা পাইনি)। যাইহোক, একথা এখন প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ওকাকুরার ভারতে আগমনের একটা উদ্দেশ্য স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাওয়া হলেও সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তা যদি হত তাহলে তিনি ভারতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বৈপ্লবিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়তে পারতেন না—পূর্বপ্রস্তুতি ভিন্ন তা সম্ভবই নয়। অবশ্যই তিনি মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥ ভারতে জাতীয়তাবাদী মহলে ওকাকুরার পরিচয় করিয়ে দেন নিবেদিতা: সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিক স্মৃতিকথা

১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতা কলকাতায় আসেন, আর মার্চের গোড়ায় তাঁর সঙ্গে ওকাকুরার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এর পূর্ববর্তী দুই মাস সময়ে

দেখি, ওকাকুরা ভারতের নানাস্থানে ঘুরছিলেন—পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য। বিবেকানন্দের সূত্রে কলকাতায় দু'একটি জায়গায় তিনি পরিচিত হলেও হতে পারেন কিন্তু তাঁর সত্যকার বৈপ্লবিক সংযোগ আরম্ভ হয় নিবেদিতা-মারফত। ওকাকুরা যখন ভারত-ভ্রমণ করছেন, তখন নিবেদিতা কলকাতায় ফিরেই বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করে দেন। লক্ষণীয়, এই কাজের সঙ্গে ওকাকুরার কোনো সম্পর্ক ছিল না। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২, নিবেদিতা চিঠিতে লিখেছেন :

"জীবন—জীবন—আমি জীবন চাই! আর জীবনের একমাত্র প্রতিশব্দ—স্বাধীনতা। তা না থাকলে মৃত্যুও শ্রেয়।"

৩ মার্চের চিঠিতে লিখছেন : "আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে—পুলিশ আমার চিঠিপত্র খোলার অনুমতি পেয়েছে। তাদের নজরে পড়ুক, এমন কিছু তোমাকে লিখতে উৎসাহী নই। সে সম্ভাবনা কলম টেনে ধরে। পরিস্থিতি হঠাৎ উত্তপ্ত, ভয় হয়, আমাদের দল [কংগ্রেসের লেফটিস্ট পার্টি] হয়ত ভেঙ্গে যাবে।"

এখনো পর্যন্ত যেহেতু ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হয়নি তাই বোঝা যায়, ওকাকুরার দ্বারা চালিত হয়ে নিবেদিতা বৈপ্লবিক কার্যে লিপ্ত হননি, বরং নিবেদিতাই নিজে আয়োজন ক'রে সেই কাজের সঙ্গে ওকাকুরাকে যুক্ত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন।১০

নিবেদিতা কিভাবে ওকাকুরার সঙ্গে কলকাতার জাতীয়তাবাদী মহলের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তার চমৎকার নমুনা-বিবরণ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় আছে।

---

১০ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্বদেশী যুগের মানুষ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক। আলোচ্য পর্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান ছিল। "ভারতের জাতীয় কংগ্রেস" (১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯) (১৩৫২) গ্রন্থে তিনি ওকাকুরার আগমনের পূর্বেই নিবেদিতা রাজনৈতিক প্রয়োজনে কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তা জানিয়েছেন :

"ইনি [নিবেদিতা] প্রথমে ছিলেন নিহিলিস্ট। পরে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন ও ভারতবর্ষের প্রতি মাতৃভূমির ন্যায় আকৃষ্ট হন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের সহায়তায় তিনি প্রমথ মিত্র (পি মিত্র, ব্যারিস্টার), চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতির সহিত কথাবার্তা বলিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন।"

এর পরে ওকাকুরার আগমন, নিবেদিতার মারফত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ। শেষোক্ত প্রসঙ্গে ডঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন : (পৃ. ৯৯-১২) :

"ওকাকুরাও জাপান হইতে এদেশে আসিয়া মিস মার্গারেট নোবল এবং প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, রজত রায়, সুরেন হালদার, হরিদাস হালদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নের সহায়তায় বর্তমান অবস্থার একটা ছায়া প্রতিবিম্বিত করেন।...ওকাকুরার...প্রস্তাবিত 'এশিয়াটিক ফেডারেশনের' দিকে সকলে আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। চিত্তরঞ্জন তখন হইতেই ইহার জোর পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।...

"বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে আর নিবেদিতা ও ওকাকুরার উদ্দীপনায় অতঃপর যে-রাজনীতি গঠিত হয়—প্রমথ মিত্র, বিপিন পাল, আশুতোষ চৌধুরী, সত্যরঞ্জন দাশ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রজত রায়, সুরেন্দ্র হালদার, অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কুমারকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি হইলেন তাহার প্রধান সেবক. আর এই রাজনীতি প্রচারের মুখপাত্র হয় 'নিউ ইণ্ডিয়া।' ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন চিত্তরঞ্জনের দাদা সত্যরঞ্জন, আর উহা সম্পাদনা করিতেন সুবিখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল।"

সুরেন্দ্রনাথকে নিবেদিতা আগেই "আপাদমস্তক জাতীয়তাবাদী" দেখেছেন (২৮.১.১৮৯৯ চিঠি)। সুতরাং রাজনৈতিক প্রয়োজনে এ'র সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় ঘটানোর দরকার নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন। (রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ওকাকুরার পরিচয় নিবেদিতাই ঘটান১১) বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি পত্রিকায় আগস্ট ১৯৩৬ সংখ্যায় "কাকুজো ওকাকুরা" নামক ইংরাজি রচনায় সুরেন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন :

"ভগিনী নিবেদিতার (যিনি নিজেকে 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলতে ভালবাসতেন) মর্জিমতো আমি মিসেস ওলি বুল-প্রদত্ত একটি পার্টিতে হাজির হয়েছিলাম। মিসেস বুল স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, নিবেদিতার পাতানো মা, আমাদের স্মৃতিলোকে—শালীন মাধুর্যের প্রতিমা। তাঁর আয়োজিত ভোজসভার প্রধান অতিথি অভিজাতবংশীয় কাকুজো ওকাকুরার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই আমরা আমন্ত্রিত। ওকাকুরা ছিলেন নব্য জাপানী শিল্পবিদ্যালয় নিপ্পন বিজিৎসু-র প্রতিষ্ঠাতা, তখন সদ্য তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' লেখা শেষ করেছেন, ও প্রথমবার ভারতভ্রমণ করছেন।

"তাঁর প্রথম দর্শনের ছাপ আমার মনে এখনো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। গৃহস্বামিনীর পাশে উপবিষ্ট মাঝারি উচ্চতার বলিষ্ঠ একটি মানুষ, কালো সিল্কের কিমোনোয় আবৃত দেহ, তার উপরে পারিবারিক প্রতীক চিহ্ন পাঁচ পাপড়ির সাদাসিধে একটি ফুল কাজ করা বা ছাপা। তাঁর হাতে ছিল বাঁশ ও কাগজের তৈরী পাখা, তাতে রক্তপিঙ্গল রঙের পল্লব-গুচ্ছের অলঙ্করণ। জাপানী কাপড়ের মোজায় পা ঢাকা, পরেছিলেন ঘাসের চটি। মুখ দেখলে জাপানীর চেয়ে চীনা মনে হয় ; চোখের পাতা ভারী, যৎসামান্য গোঁফ, কিন্তু গায়ের রঙ লালচে, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে আসীন, গাম্ভীর্যে সমাহিত, মিশরীয় সিগারেটের ধূমপান করে যাচ্ছিলেন ক্রমান্বয়ে।

"ওকাকুরা নীরবে বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যে প্রবলভাবে কথা বলে যাচ্ছিলেন নিবেদিতা—আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় তাঁকে কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনাই ছিল নিবেদিতার সুস্পষ্ট অভিপ্রায়। নিবেদিতা যতই তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর দেশের সম্বন্ধে (যে-দেশ তখন সকলের চোখের উপরে উঠে আসছিল) বা তাঁর বই সম্বন্ধে (যার পাণ্ডুলিপির মধ্যে সানন্দে প্রবেশ করার সুযোগ নিবেদিতা পেয়েছিলেন) প্রশংসাপূর্ণভাবে উল্লেখ করে যাচ্ছিলেন, ততই তিনি তাঁর (ওকাকুরার) কাছ থেকে স্বীকৃতিসূচক আভূমি নতমস্তকের অভিবাদন লাভ করছিলেন, কিন্তু কোনো কথা নয়।

"কিছু পরে ওকাকুরা উঠে গেলেন। আমিও অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে ধরে নিয়ে বিদায় নিতে অগ্রসর হলাম। তখন নিবেদিতা রহস্যময়ভাবে আমার কাছে এসে আমাকে পাশের ঘরে যেতে বললেন। নির্দেশিত দরজা দিয়ে আমি ছোট কাচ-বসানো বারান্দায় হাজির হলাম, সেখানে কেবল একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার, যার একটিতে বসে আছেন ওকাকুরা, তখনো ধূমপান করছেন এবং পূর্বের মতোই অটল গাম্ভীর্যে পূর্ণ। আমি যদিও তাঁর থেকে অল্পবয়স্ক এবং বয়সের তুলনায় অপরিণত, তবু তিনি নত হয়ে সমমর্যাদার অভিবাদন জানালেন, পাশের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন, এবং খুব সুন্দরভাবে হাতের তালু মেলে

---

১১ রবীন্দ্রনাথ ১৬ এপ্রিল ১৯০২, শ্রীমতী অবলা বসুকে লিখেছিলেন : "নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে—অধ্যাপক মহাশয়কে [ডঃ জগদীশচন্দ্র বসুকে] তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছেন।" ['চিঠিপত্র', ৬ষ্ঠ]।

ধরলেন, তাতে আমার জন্য একটি সিগারেট। তখন আমি আবিষ্কার করলাম, তাঁর কিমোনোর ঢোলা হাতার একটিতে রয়েছে পুরো একটিন সিগারেট।

"ওকাকুরা থেমে-থেমে ইংরাজি বলতেন, ঠিক কথাটি যেন খুঁজে পাচ্ছেন না, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা তিনি সর্বদাই পেতেন। 'আপনার দেশের জন্য আপনি কী করতে চান বলুন?'—হঠাৎ প্রশ্ন গোড়াতেই। আমি হতভম্ব। তখন বুঝতে পারিনি, তবে পরে সন্দেহ করেছি যে, নিবেদিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ভূমিকা নিয়ে ওকাকুরাকে বলেছেন, আমাদের জাগিয়ে তুলতে। সে-ধরনের কথার পক্ষে আমি তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত, আমতা-আমতা করে এই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলাম যে, (অন্ততঃ তাই করেছি বলে মনে করেছিলাম) দেশের উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা করার ব্যাপারে আমাদের বাধা কতখানি। যখন আমি আমার অসন্তোষজনক বক্তব্য এই বলে শেষ করেছিলাম—বর্তমানে অবস্থা যে-রকম তাতে নিজের কাজটুকু সমাধা ক'রে সমষ্টিগত ফলাফল কালের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—তখন নিজেকে কী-যে দ্বিধা-দুর্বল লেগেছিল তা এখনো মনে পড়ে।

"আমার কথা নিঃশব্দে শোনার পরে ওকাকুরা বললেন, এদেশের তরুণদের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব তাঁকে ব্যথিত করেছে। বুঝতে পারা গেল, আমার থেকেই তিনি প্রথম এই ধরনের কথা শোনেন নি। তারপর আমাকে তাতিয়ে তোলার জন্য তিনি নিজে কোন্ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন তার বর্ণনা আরম্ভ করলেন। তাঁর অতি বাল্যকালের একটি ঘটনা যখন শোনাচ্ছিলেন তখনই প্রথম তাঁর মুখে হাসির ঝলক দেখলাম: শৈশবে একদা পাশের ঘরে বাগ্‌বিতণ্ডার শব্দ শুনে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন, তাঁর কাকার মুণ্ডহীন ধড় উপবিষ্ট, আর গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে উঠছে রক্তের ফোয়ারা। এই-ভাবে ওকাকুরার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সমাপ্তি, এবং আমার সামনে তাঁর দারুণ গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকারও ইতি।" [অনূদিত]

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় অবশ্য ওকাকুরার বিপ্লবচেষ্টার সংবাদ নেই; সম্ভবতঃ স্বাধীনতার অনেক আগে প্রকাশিত রচনায় বৈপ্লবিক সংবাদ দেওয়া তিনি নিরাপদ মনে করেন নি। তাহলেও ওকাকুরার অমৃতসর ভ্রমণের কথা বলতে গিয়ে এই সংবাদটি না দিয়ে পারেন নি—"তাঁর [ওকাকুরা] সামুরাই বংশের প্রাণ অবিলম্বে শিখদের স্বর্ণমন্দিরের দিকে ধাবিত হয়েছিল—তাদের কৃপাণ-ব্রতের দিকে।" ওকাকুরার উল্লিখিত কৃপাণ-নীতি কিংবা বাল্যকালে নিজ খুল্লতাতের মুণ্ডহীন ধড় ও রক্তফোয়ারা দর্শনের স্মৃতিতে প্রৌঢ় ওকাকুরার মৃদুহাসা—সুরেন্দ্রকে যত শিহরিত করুক, তা অবশ্যই আতঙ্কিত করেনি মৃত্যু-পূজারী বিবেকানন্দের আইরিশ বিপ্লববাদিনী শিষ্যা নিবেদিতাকে। ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্' বইয়ের ভূমিকায় নিবেদিতা জাপানী আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপে প্রচলিত ধারণা দূর করার ব্যাপারে ওকাকুরার প্রচেষ্টার বিষয়ে লিখেছেন: ঐ আর্ট ফোটা ফুলের বর্ণসমারোহ বা হালকা পাখির আকারেই ভর্তি নয় (জাপানী আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপের যে অতীব সুকুমার মনোভাব!)—"তার মূলে আছে ড্রাগনের প্রচণ্ড কল্পনা—যার নাম মৃত্যুপূজা।"

॥ ৬ ॥ নিবেদিতা-ওকাকুরা প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত সংবাদ: মিস ম্যাকলাউডের ভূমিকা

আগেই বলেছি, যতদূর জানি, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম লিখিতভাবে নিবেদিতা-ওকাকুরার বিপ্লবচেষ্টার খবর দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি ১৯২৬-এর মাঝামাঝি প্রকাশিত

"অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" বইয়ে (এটি আগেই বঙ্গবাণী পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরিয়েছে ; গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরে এটি বাজেয়াপ্ত হয়) নাম না করে ওকাকুরা ও নিবেদিতার প্রচেষ্টার বিষয়ে জানান, সেখানে বলেন—এঁদের প্রয়াসের ফলেই মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে বাংলার সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে লিখিত "দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম" গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত উহ্য নামগুলি যে নিবেদিতা ও ওকাকুরার, তা খুলে বলেন, সেইসঙ্গে এই বৈপ্লবিক প্রয়াস সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ দেন। তারপর 'পেট্রিয়ট প্রফেট' বইয়ে পূর্বোক্ত সংবাদের সঙ্গে অধিক সংবাদ যোগ করেন—তার মধ্যে ওকাকুরার রাজনীতির সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগে স্বামীজীর আপত্তির কথা আছে।১২

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা-ওকাকুরার বৈপ্লবিক প্রয়াসের গুরুত্ব সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ বাংলার বিপ্লবচেষ্টার প্রথম পর্ব সম্পর্কে তাঁর তুল্য

---

১২ "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ লেখেন : "যতদূর স্মরণ হয়, তাহার এক বৎসর অগ্রে [১৯০২] এই অনুষ্ঠানের পূর্বসূচনা হয় ও তাহাতে দুইজন বৈদেশিকের [নিবেদিতা, ওকাকুরা] প্রভাব ছিল।" পুনশ্চ : "পূর্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্গে বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্ব-সূচনায় দুইজন বৈদেশিকের প্রভাববিস্তার ঘটিয়াছিল। তাহাদের একজন [নিবেদিতা] বোম্বাই প্রদেশ পর্যটনের কালে সে স্থানের কোনো বিশিষ্ট ভারতবাসীর [অরবিন্দ] সহিত পরিচিত হন। সেখানেও জনকতক মিলিয়া কার্য করিতেছিলেন। এই ভারতবাসী কলিকাতায় আসিয়া অগ্রে যে ভাসাভাসা দলটি ছিল, তাহা দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করেন। ইহারই ফলে মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয় ও উপরোক্ত কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়।"

পরবর্তীকালে লেখা "দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম" গ্রন্থে "দুইজন বৈদেশিক" এবং বোম্বাই-প্রবাসী "বিশিষ্ট ভারতবাসীর" নাম জানাবার পরে, ভূপেন্দ্রনাথ ওকাকুরা প্রসঙ্গে লেখেন : "মিস ম্যাকলাউড নামক স্বামীজীর আমেরিকান শিষ্যার সহিত তাঁহার জাপানে আলাপ হয়। তিনিই ওকাকুরাকে ভারতে আনয়ন করেন। মিস ম্যাকলাউড লেখককে আমেরিকায় বলেন, 'আমিই ওকাকুরাকে ভারতে পরিচিত করিবার জন্য দায়ী।' কলিকাতার নামজাদা লোকেরা ওকাকুরাকে সংবর্ধনাপূর্বক গ্রহণ করেন।"

পুনশ্চ : [অরবিন্দের নেতৃত্বে] এই বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্বে হেম মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগন ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি জাপানী প্রফেসার ওকাকুরাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া আনেন কিন্তু কোনো সমিতি ইঁহারা গঠন করেন নাই। পি মিত্র ও হেম মল্লিক অনুশীলন সমিতির ছেলেদের ওকাকুরার দলের সহিত মিশিতে দেন নাই। ভগিনী নিবেদিতা বরোদাতে অরবিন্দকে এই সমাবেশের সংবাদ দেন।"

এখানে জানানো প্রয়োজন, নিবেদিতা এবং ওকাকুরা উপরে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে দলগঠন করতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়, কিন্তু ওঁদের অনেকেই নিশ্চয় গোটা ব্যাপারটির আসল চেহারা বুঝতে পেরে নিজেদের গুটিয়ে নেন। আরও উল্লেখযোগ্য, হেম মল্লিক প্রভৃতি ওকাকুরার সঙ্গে অনুশীলন সমিতির [?] ছেলেদের মিশতে না দিলেও [অরবিন্দ-গোষ্ঠীর বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্য ভূপেন্দ্রনাথকে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি ওকাকুরার কথা কিছুই জানতেন না] হেম মল্লিকের আত্মীয় রাজেন মল্লিক ওকাকুরার সঙ্গে জাপানে গিয়েছিলেন—একথা শ্রীমতী হরিওকার লেখায় পাই [প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৭৫, পৃ. ১৪২]। আমরা দেখব, নিবেদিতাই কিছুদিন পরে তাঁর দলের ছেলেদের ওকাকুরার সঙ্গে মিশতে দিতে গররাজি। হয়ত ভূপেন্দ্রনাথ সেই ঘটনার কথাই বলতে চেয়েছেন, কিন্তু দীর্ঘদিন পরে লিখতে গিয়ে সময়ের হিসাবে সামান্য গণ্ডগোল করে ফেলেছেন।

মন্তব্য করবার অধিকার অল্প মানুষের ছিল ; ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ থেকেই তিনি ঐ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলেছেন :

"মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তাঁর [স্বামীজীর] দুজন বিদেশী অনুরাগী (তন্মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর শিষ্যা) কলকাতায় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সহায়তায় একটি জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। এই দলটিই পরে বিপ্লববাদী আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল।"১৩ [স্থূললিপি লেখক-নির্দেশে]।

নিবেদিতা-ওকাকুরার বৈপ্লবিক কার্যের সঙ্গে পরোক্ষভাবে (কিন্তু কম গুরুত্বের সঙ্গে নয়) এই মহীয়সী বিদেশিনী মহিলা জড়িয়ে গিয়েছিলেন, যাঁর কথা আগে আমরা বলে এসেছি—তিনি মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড। ভারতীয় রাজনীতিতে (বা কোনো রাজনীতিতেই) এঁর আগ্রহ ছিল না, কিন্তু অপরপক্ষে ইনি স্বামীজীর ভারতবর্ষের ভালো হতে পারে এমন সবকিছুকেই সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। লিজেল রেম' আমাকে লেখা তাঁর পত্রে [পূর্বে-উদ্ধৃত] বৈপ্লবিক রাজনীতির সঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের সম্পর্ক সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউডের কাছে শোনা কথা কিছু-কিছু জানিয়েছেন। এগুলি আপাততঃ চমকপ্রদ, বিশেষতঃ স্বামীজীর ইচ্ছায় মিস ম্যাকলাউডের টাকায় ভারতে অস্ত্র আমদানীর বিষয়টি। স্বামীজীর 'ইচ্ছা' সম্পর্কে উৎসাহিত মন্তব্য না করাই ভালো। কিন্তু একথা পরিষ্কার বলতে পারি, নিবেদিতার চিঠি থেকে দেখা যায়, নিবেদিতা-ওকাকুরার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় মিস ম্যাকলাউডের অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে, মিস ম্যাকলাউডের সূত্রে নিবেদিতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোনো-কোনো উচ্চমহলে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন, তৎসহ গোপন কাগজপত্র কিংবা অন্যান্য জিনিস চালাচালি করতে পেরেছেন।

॥ ৭ ॥ ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্বামীজীর ঘোর আপত্তি ও তার কারণ

ওকাকুরার সঙ্গে যোগসাজসে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ কিন্তু স্বামীজী একেবারেই পছন্দ করেন নি। এ-বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার তীব্র মতপার্থক্য হয়। নিবেদিতার পত্রাবলীতে এই মতপার্থক্যের কথা বহুল উল্লিখিত ; নিবেদিতার মনোভাব সেখান থেকে জানতে পারি ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বামীজীর বক্তব্য কী ছিল তার বিবরণ সেখানে নেই। ফলে মনে হতে পারে, স্বামীজী বুঝি এ-ধরনের ব্যাপারের পুরো বিরোধী ছিলেন। কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ, বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ে স্বামীজীর মনোভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি, সেখানে দেখেছি, এসব ক্ষেত্রে কতখানি বিস্ফোরক ছিল তাঁর মনোভাব।১৪ নিবেদিতার ক্ষেত্রে স্বামীজীর মুখ্য প্রশ্ন ছিল—ঐ চরমপন্থী কার্যকলাপ কে করবে, এবং কখন ? আমরা দেখি, স্বামীজী

---

১৩ ভূপেন্দ্রনাথ, "স্বামী বিবেকানন্দ" (পেট্রিয়ট-প্রফেট বইয়ের বাংলা সংস্করণ) পৃ. ২-৩।

১৪ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ১ম : ২৮৬-৩০৫; ৩য়: ৩৫৫-৭৪, ৩৮৭-৯৬, ৪০৭-২৪, ৪৩৮-৯২ ; ৪র্থ : ১-৫৫ ; ৫ম : ৪৩৪-৫৩।

যখন নিবেদিতাকে ওকাকুরার রাজনীতিতে জড়িত হতে নিষেধ করছেন, ঠিক তখনি তিনি যোগ্য ভারতীয় যুবকদের প্রণোদিত করেছেন—বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঘাত হানতে। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ বসু তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ, বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষও তাই। পাটনার জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক কামাখ্যানাথ মিত্রকে স্বামীজী বলেছিলেন—ভারতের প্রয়োজন এখন বোমা। স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করতেন ও তাঁর কাছ থেকে দেশপ্রেমের প্রেরণা পেয়েছেন এমন বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে ছিলেন ক্ষীরোদ-গোপাল মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক জোয়ারদার, পুলিন মুখার্জি, ডঃ যতীন ঘোষাল প্রভৃতি—এ সংবাদ দিয়েছেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি অনুযায়ী, ঢাকায় ১৯০১ সালে স্বামীজী, বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রীশ পাল (পুলিশ ইনস্‌পেকটার নন্দলাল ব্যানার্জির হত্যাকারী), যোগেন্দ্র দত্ত এবং স্বদেশী যুগে মাস্টার সাহেব নামে খ্যাত মৌলবী আলিমুদ্দিন প্রমুখদের কাছে দেশপ্রেম, বীরত্ব, দুঃসাহসিকতার জ্বলন্ত বাণী শুনিয়েছিলেন, তাঁদের ঝাঁসির রাণীর আদর্শ গ্রহণ করতে বলেছিলেন।১৫ ঢাকাতেই এইকালে তিনি বলেন, ফুটবল উত্তম খেলা কারণ তাতে পদাঘাতের উত্তরে পদাঘাত করা যায়।১৬ অরবিন্দের পরে বিপ্লব আন্দোলনের 'সুপার লীডার' যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) স্বামীজীর প্রত্যক্ষ সংস্রবে এসেছিলেন।১৭ যে-সময়ে স্বামীজী নিবেদিতাকে ওকাকুরার কাজের সঙ্গে জড়িত হতে নিষেধ করছেন, তারই নিকট কালে, ১৯০২ সালে গোড়ার দিকে তিনি বেলুড় মঠে আগত বালগঙ্গাধর তিলককে বলেছেন :

"বিদেশী শাসনাধীন আমরা। আমাদের রাজনীতিকে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আমাদের পদ্ধতি অবশ্যই হবে সংঘাতশীল ও প্রতিরোধাত্মক। তা এমন রূপ ধরুক যার ফলে আমাদের শাসকরা নতিস্বীকারে বাধ্য হয়।"১৮

স্বামীজীর সঙ্গে ওকাকুরা-রাজনীতির ব্যাপারে নিবেদিতার মতভেদের কথা যিনি প্রথম আমাদের গোচর করেছেন, সেই ভূপেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক আরও কিছু উক্তি উদ্ধৃত করা থাক (এক্ষেত্রে কিছু কিছু পুনরুক্তি ঘটবে) :

"অধ্যাপক ওকাকুরা 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতার দ্বারা পাণ্ডুলিপিটি সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ওকাকুরা বলিয়াছিলেন, এশিয়া মহাদেশের কৃষ্টি এক। এই অধ্যাপকটি একটি আজগবি গল্প প্রচার করিলেন—এশিয়ার সমস্ত স্বাধীন দেশগুলি এই ভূখণ্ডে ইউরোপীয় আধিপত্য বিনষ্ট করিবার জন্য সংগঠিত হইয়াছে, ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়। এইজন্য ভারতকে স্বাধীন

---

১৫ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, "স্বামী বিবেকানন্দ"। ৩০৫-৬।

১৬ সমকালীন, ৫ম, ৪১৮।

১৭ "বিপ্লব আন্দোলন : স্বামীজী—নিবেদিতা—যতীন মুখার্জি," পৃথ্বীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, "নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ," ২য় খণ্ড।

যতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক শিষ্য হরিকুমার চক্রবর্তী স্বামীজীর সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথের বিপুল শ্রদ্ধার কথা জানিয়েছেন। ['বিশ্ববিবেক']। যতীন্দ্রনাথের আর এক শিষ্য নলিনীকান্ত কর রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী শঙ্করকে লিখিত বিবৃতিতে একই কথা জানিয়েছেন।

নিবেদিতা ও যতীন্দ্রনাথের কথা পরেও আসবে।

১৮ 'সমকালীন।' ৫ম, ৪০৮।

করিয়া এই সংঘের মধ্যে আনিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতে মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য কলিকাতার জনকতক নামজাদা লোক লইয়া একটি ভাসা-ভাসা মণ্ডলী গঠিত হয়। ইহার মধ্যে যতদূর অবগত আছি, হেমচন্দ্র মল্লিক (সুবোধচন্দ্র মল্লিকের খুল্লতাত) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, নিবেদিতা রাজনীতিতে যাইয়া তাঁহার আন্দোলনকে বিপদগ্রস্ত করিবেন।...স্বামীজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। তাঁহার বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা বাংলার স্বদেশহিতৈষিতার ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।...এইসব বক্তৃতার ফলে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে সন্দেহের চোখে দেখিত। নিবেদিতার বরোদায় বক্তৃতা উপলক্ষে গমনকালে তথায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সহিত পরিচয় হয়। তিনিই অরবিন্দকে কলিকাতার দলের কথা বলেন। ইহার ফলে অরবিন্দ কলিকাতায় আসেন এবং পূর্বোক্ত দলটি পূর্ণ বৈপ্লবিক দলরূপে পুনঃসংগঠিত হয়। এই সংঘটনটি স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়। এইসময়ে অরবিন্দ আর একটি আজগবি গল্প বাংলায় আসিয়া প্রচার করিলেন। সমগ্র ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, কেবল ভীরু বাঙালীরা সুপ্ত আছে। এই গল্পের ফলস্বরূপ নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক সংঘের শাখারূপে পাকা-পাকিভাবে ১৯০১ [১৯০৩] খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বাংলার গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি সংস্থাপিত হয়।" [স্থূললিপি লেখক-নির্দেশে]।

এই বক্তব্যের মধ্যে অনেকগুলি দরকারী কথা আছে। প্রথমতঃ দেখি, বিপ্লব-আন্দোলনের পক্ষে উত্তেজনাসৃষ্টির জন্য ওকাকুরা বা অরবিন্দ কোন্ ধরনের প্রচার চালাতেন। দ্বিতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের মূল দায়িত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দের নয় (যেকথা কোনো-কোনো অত্যুৎসাহী লেখক বলতে চেয়েছেন)—দায়িত্ব স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার। এই বিচ্ছেদের জন্য নিজ দায়িত্বের কথা স্মরণ ক'রে নিবেদিতা নিদারুণ মর্মযাতনা বোধ করেছিলেন।১১ তবে উদ্ধৃত অংশে নিবেদিতার রাজনীতির বিরুদ্ধে স্বামীজীর আপত্তির যে-কারণ ভূপেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, তা যথার্থ নয়, এইজন্য যে, রামকৃষ্ণ মিশন নামক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থেকে (রামকৃষ্ণ মিশনে রাজনীতিচর্চা বিধি অনুসারে নিষিদ্ধ) নিবেদিতার রাজনীতি করার কথা ওঠে না, ও-কাজ

---

১১ সিস্টার দেবমাতার নিবেদিতা-স্মৃতিতে আছে :

"নিবেদিতার [বাগবাজারের] স্বল্পালোকিত ঘরে রবিবারের একটি গোটা বিকেল আমি বসেছিলাম—নিবেদিতা মিশনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কাহিনী বলে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য তাঁর রাজনৈতিক উৎকণ্ঠা এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে সেবা করার জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা—এই উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ তীব্র সংগ্রামের কথা যখন তিনি আমাকে বলছিলেন তখন তাঁর কণ্ঠে গ্রীক ট্রাজেডির নিয়মিত সুর ঘনিয়েছিল। স্বামীজী তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন—কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। মিশনকে রাজনৈতিক কাজে জড়ানো চলবে না। দীর্ঘ হয়েছিল নিবেদিতার অন্তঃসংঘাত; শেষে তিনি বেছে নিয়েছিলেন—ভারতকে স্বাধীন করতেই হবে। স্বামীজীর দেহত্যাগ হল; মিশনের তৎকালীন সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁকে বললেন—নিবেদিতা যেন কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে জানিয়ে দেন, মিশন তাঁর কথা বা কাজের জন্য আর দায়ী নয়। কাহিনীটি বলতে-বলতে নিবেদিতা এক মুহূর্ত থামলেন, তারপর নীচু চাপাস্বরে বললেন, 'যখন আমি ছাপার অক্ষরে ঐ কথাগুলি দেখলাম, তখন মনে হল, ওঃ আমার মৃত্যুই ভালো।'" [রেমঁ-সংগ্রহ]।

করতে হলে সম্পর্কচ্ছেদ বাধ্যতামূলক—না, স্বামীজীর আশঙ্কা ছিল অন্যত্র—তিনি মনে করেছিলেন, নিবেদিতা ওকাকুরার সঙ্গে যেভাবে আন্দোলন চালাতে চাইছেন তাতে ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। এই বিষয়টির উপরে প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন সিস্টার ক্রিস্টিন। এখানে বলে নেওয়া যায়, নিবেদিতার ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত কথা ক্রিস্টিন সূচনা থেকেই জানতেন, চৌরঙ্গীতে আমেরিকান কনস্যুলেটে ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতাদির আলোচনাসভায় ক্রিস্টিন উপস্থিত ছিলেন, এবং রেম‑এব্‌র-র সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে র‍্যাটক্লিফ জানিয়েছিলেন—ক্রিস্টিন রাজনৈতিক ধারণায় অত্যন্ত র‍্যাডিক্যাল ছিলেন (মডারেট গোখলের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও) যদিও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তিনি কখনো জড়িত হননি। ভূপেন্দ্রনাথ ক্রিস্টিনের কাছে এইপ্রসঙ্গে যা শুনেছেন তার থেকে বোঝা যায়, ওকাকুরার ব্যাপারে নিবেদিতাকে নিষেধ করলেও স্বামীজী সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন না। ক্রিস্টিনের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের কথাবার্তার বিবরণ এই :

"স্বামীজী কেন নিবেদিতাকে রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছিলেন, সে *সম্বন্ধে সিস্টার ক্রিস্টিন স্বামীজীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন* : '*নিবেদিতা* ভারতের অবস্থা ও তার রাজনীতির কথা কি বোঝে? আমি তার থেকে অনেক বেশি রাজনীতি করেছি। বিদেশী শাসন উৎখাতের জন্য আমি ভারতের দেশীয় রাজন্যগণের জোট ঘটাবার চেষ্টা করেছিলাম। সেই উদ্দেশ্যে আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ঘুরেছি, সেই কারণে আমি কামান-নির্মাতা *স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু* দেশ থেকে কোনো সাড়া আমি পাইনি। দেশ মরে গেছে।' স্বামীজী অন্য একদিকে তাঁর আরও চেষ্টার কথা বলেন। তিনি পুনশ্চ বলেন, 'ভারতের এখন পচা-গলা অবস্থা। এখন চাই একদল নিঃস্বার্থ তরুণ কর্মী যারা জনগণকে শিক্ষা দিয়ে উন্নীত করবে।' স্বামীজী সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে তাঁর কার্যাবলীর আরও বিবরণ দেন, কিন্তু তিনি বর্তমান গ্রন্থকারের [ভূপেন্দ্রনাথের] কাছে তা খুলে বলতে রাজি হননি।"২০

এই বক্তব্যের কিছু অংশের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, বিশেষতঃ প্রব্রজ্যাকালে বিবেকানন্দ কর্তৃক ইংরাজ বিতাড়নের জন্য রাজন্যজোট বাঁধাবার চেষ্টা ইত্যাদি। যদি ঐ বিষয়টি স্বীকার করতে হয় তাহলে অস্বীকার করতে হয় স্বামীজীর ধর্মব্যাকুল পরিব্রাজক জীবনকে, যা হবে অত্যন্ত উদ্ভট ও অনুচিত, কিন্তু একইসঙ্গে মনে রাখা ভালো, বিবেকানন্দের বিরাট মন ও মনীষায় কখন কোন্ তরঙ্গ উঠত তা নির্ণয় করা দুরূহ, এবং স্বীকার্য, তিনি স্বয়ং লিপ্ত না হয়েও পরাধীন মানুষকে তার সংগ্রামের পথ দেখিয়ে দিতে পারতেন।

নিবেদিতাকে নিষেধ করার আসল কারণটা উদ্ধৃতির শেষাংশে আছে। ভারত পর্যটন ক'রে স্বামীজী সমগ্র দেশের জীর্ণ অবস্থার পুরো চেহারাটা দেখতে পেয়েছিলেন। ক্রিস্টিনকে স্বামীজী যেকথা বলেছেন—নিঃস্বার্থ তরুণদল জনগণকে শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করলেই তবে বাঞ্ছিত উত্থান ঘটবে—সেরকম কথা তিনি বেশ কয়েক বৎসর আগে থেকেই বলে আসছিলেন। ২০ অগস্ট, ১৮৯৩, বিবেকানন্দ তখনো চিকাগো ধর্মমহাসভায়

২০ *Patriot Prophet*, 'Foreword', VIII—IX.

বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হননি, অজানা একজন ভিক্ষুক মাত্র, আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন :

"লক্ষ-লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ঈশ্বরে অনন্ত বিশ্বাস-রূপ বর্মে সজ্জিত হয়ে, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতের প্রতি সহানুভূতির সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক—তারা মুক্তি, সেবা, সামাজিক উত্থান ও সাম্যের বার্তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বহন করে নিয়ে যাক।"

স্বামীজী হয়ত ভেবেছিলেন, নিবেদিতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগবশে রাজনৈতিক আন্দোলনকে সংকীর্ণখাতে চালিত করবেন। নিবেদিতার সহযোগী ঠাকুর-পরিবারের অভিজাত বিপ্লব-কুতূহলীদের বিষয়ে তাঁর আস্থাও যথেষ্ট ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে বেপরোয়া আত্মত্যাগে জনচিত্তে তড়িৎ-শিহরণ আনা যায়, তা তিনি জানতেন, কোনো-কোনো তরুণকে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধও করেছেন, কিন্তু একইসঙ্গে তিনি তাদের গণ-উন্নয়নের কর্মসূচীতে অংশ নেবার জন্য তাগিদও দিয়েছেন—সতীশ বসু, হেমচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে তা দেখা যায়। পরিণত রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা স্বামীজী বুঝেছিলেন, জনগণের অপ্রস্তুত অবস্থায় যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে যায় তাহলে মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিমান লোক সেই ক্ষমতা আয়ত্ত করে নেবে—জনগণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে এ-বিষয়ে সতর্ক করে তিনি বলেছিলেন, "মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের 'জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি' পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবে না, কে বলিতে পারে?" এই অবস্থা যাতে ভবিষ্যতে ঘটতে না পারে সেজন্য তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনের কথাও বলেছেন।

সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে স্বামীজী যা বলেছেন [ভূপেন্দ্রনাথ অন্ততঃ তার যে-বিবরণ দিয়েছেন] তার মধ্যে নিবেদিতাকে নিষেধের আরও একটি কারণ পাই। স্বামীজীকে দেউস্কর জিজ্ঞাসা করেন— বৈপ্লবিক আন্দোলনে ভারতবাসী বিদেশী সাহায্য নেবে কিনা? স্বামীজী সজোরে বলেন, "না, ভারতবাসীরা চতুর্থবার ঐ ভুল করবে না।"২১ আমাদের মনে হয়, এইখানেই ছিল স্বামীজীর মূল ভয়—বিদেশী-কুমীরকে যেন খাল কেটে ঘরে না আনা হয়। ওকাকুরাকে স্বামীজী ভালবাসতেন, কিন্তু ওকাকুরার সূত্রে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ না হয়ে পারেন নি। ব্যক্তিগত বা জাতিগত—যে-কোনো ক্ষেত্রেই স্বামীজী আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতে বিদেশী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী করেছেন, বিপ্লবের ক্ষেত্রেও তাঁর একই মনোভাব। আমদানীকৃত ধর্ম বা আমদানীকৃত বিপ্লবে তাঁর আস্থা ছিল না। মোহিনী রাশিয়ান মাদাম ব্লাভাৎস্কি, উচ্চাভিলাষী আমেরিকান কর্নেল অলকট, পূর্বে নাস্তিক পরে সহসা ঘোর আস্তিক বাগ্মী ইংরাজনারী অ্যানী বেশান্ত—এঁরা ভারতকে ধর্মদান করার যোগ্য বলে বিশ্বাস তাঁর যেমন ছিল না, তেমনি ভারতে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাবেন বহিরাগত জাপানী শিল্পবেত্তা ওকাকুরা—তাও মেনে নিতে পারেন নি। একজন জাপানী, যিনি তাঁকে জাপানের ধর্মমহাসভায় নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছেন, তিনি অকস্মাৎ ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লবে উৎসাহী কেন—সে সম্বন্ধে সন্দেহ যদি স্বামীজীর মনে না উঠে থাকে

২১ *Patriot Prophet*, 'Foreword', IX

তাহলে বৃথাই তাঁর বুদ্ধি। এইসঙ্গে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা নিশ্চয় নবজাগ্রত জাপানের আত্মপ্রসারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন রেখেছিল, যদিও অপরপক্ষে তিনি ভারতের কারিগরি শিক্ষা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার জন্য জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পক্ষপাতী ছিলেন।

মার্গারেট নোবলের ইংলণ্ড-আনুগত্যকে ঘুচিয়ে স্বামীজী কিভাবে তাঁকে সর্ব-মনপ্রাণে ভারতীয় ক'রে তুলে তবে ভারতের কাজে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। নিবেদিতার আন্তরিকতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস থাকলেও নিবেদিতাকে তিনি নেতৃত্ব থেকে সর্বদাই দূরে রাখতে চেয়েছেন, কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল, তাঁর অবর্তমানে নিবেদিতার মতো প্রচণ্ড জেদী ব্যক্তিত্বময়ী নারী অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতায় নিজ ভাব-ধারাকে অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। নিবেদিতার সঙ্গে বারবার মানসিক সংঘর্ষ থেকে তাঁর এইপ্রকার ধারণা হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস।

॥ ৮ ॥ নিবেদিতার পত্রে ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের সংবাদ : ওকাকুরা-'কুহকে' আচ্ছন্ন নিবেদিতা

নিবেদিতা স্বীকার করেছেন—তিনি কিছুদিন 'ওকাকুরা-স্পেল'-এ ছিলেন। এর কালপরিমাণ মোটামুটি সাত মাস—১৯০২-এর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর। নিবেদিতার চিঠিতে এই কালপর্বে ওকাকুরা-সংশ্লিষ্ট বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে যেসব সংবাদ রয়েছে, তাদের কিছু-কিছু উল্লেখ এবার করব। এইসব চিঠি কেবল মিস ম্যাকলাউডকে লেখা যিনি এই রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বলে নেওয়া ভালো, নিবেদিতা সহজবোধ্য কারণে সংবাদগুলি অত্যন্ত আবৃত ভাষায় লিখেছিলেন। 'ওকাকুরা' নাম পত্রগুলিতে খুব কম ক্ষেত্রেই করা হয়েছে—নানা ছদ্মনামে বা ইঙ্গিতে তিনি সূচিত। সেগুলি মোটামুটি এই :

"Your [Miss MacLeod's] Japanese friend." "Japanese poet." "Nigu." "Chieftain." "Subject." "The Other." "Your Child." "Banner Chief." "Genghis."

একই চিঠিতে একাধিক নামে ওকাকুরাকে বোঝানো হয়েছে, এমনও দেখা যায়।

১৯ এপ্রিল, ১৯০২, চিঠিতে নিবেদিতা ওকাকুরার আর একবার ভারতভ্রমণে যাত্রার কথা বলেছেন। এ-ভ্রমণ যে বিশেষ উদ্দেশ্যে তাও ইঙ্গিতে বোঝা যায়। মিস ম্যাকলাউডের ৩০০০ টাকা বিশেষ কারণে খরচের কথা বলা হয়েছে। জনৈক *Rhinoceros*-এর উল্লেখ আছে, যিনি নেপালে যাবার পাসপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন।

[নেপালের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের ইঙ্গিত অনেকগুলি চিঠিতে আছে। 'রাইনোসেরস্' কে বলা শক্ত, তবে একটি চিঠিতে, (সম্ভবতঃ মে মাসের গোড়ার দিকে লেখা) সদানন্দের নেপাল যাওয়ার পরিকল্পনার কথা মেলে, যিনি পাসপোর্ট না পাওয়ার অপেক্ষা করছেন। "এই ব্যাপার স্বামীজী জানেন না।" (২১ এপ্রিল)]

২০ এপ্রিলের চিঠি সংবাদে ভর্তি। এর মধ্যে ওকাকুরা প্রভৃতির ভারত সফরের পূর্ববর্তী বিদায়ভোজের কথা আছে, যাতে ক্রিস্টিন উপস্থিত ছিলেন। "আমি ও ক্রিস্টিন আমাদের পানপাত্রে একফোঁটা ব্রাণ্ডি পেয়েছিলাম কারণ বিদায়ের পানপাত্র অবশ্যই মদ্যের

হওয়া চাই। [এখানের অনুষঙ্গ হল, খ্রীস্টের বিদায়ভোজ]। যখন নৈশভোজ সমাপ্ত হল তখন সকলেই গান গাইলেন। প্রিয় মিঃ ওডা সন্দের স্তোত্রগান শোনালেন ; হোরি গাইলেন সুমধুর এক ফ্রাজিয়ারা গান, যা ঠিক গ্রেগোরিয়ান ধর্মসঙ্গীতের মতো শোনাল, শেষ হলও সেইভাবে ; ক্রিস্টিন গাইল মনোরম জার্মান বিদায়গীতি ; চৌফটেন্ তাঁর দৈত্যদানা, অগ্নিনিশ্বাস ইত্যাদির একটি হুলস্থুলে গান গাইলেন।...আর আমি কি করি—শিবগুরুর উদ্দেশ্যে প্রণামমন্ত্র এবং 'হরি ওম্'।" এই চিঠিতে ম্যাকলাউডের সাহায্য সম্বন্ধে ওকাকুরার সশ্রদ্ধ উল্লেখ, ওকাকুরাকে ভারতে এনে দেবার জন্য মিস ম্যাকলাউডের কাছে নিবেদিতার কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির সঙ্গে ওকাকুরার দুঃসাহসিকতা সম্বন্ধে নিবেদিতার এই স্বীকৃতি : "যেট যা বলেছে তা ঠিক—উনি আমার থেকেও নির্ভীক, যে-কাজ উন্মাদ ছাড়া কেউ করবে না সেই কাজ করতে এগিয়ে যান।"

আগেই দেখেছি, ১৯ জুলাই, ১৯০১-এর চিঠিতে নিবেদিতা ভারতের রাজনৈতিক প্রয়োজন সম্পর্কে নিজের ভিশনের কথা প্রকাশ করেছিলেন। এখন দেখলেন, তাঁর ভিশন ও ওকাকুরার ভিশন এক। উপরের চিঠিতে নিবেদিতা ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয়ের পরবর্তী দেড়মাস কাল একই ভিশনের মধ্যে অবস্থানের আনন্দে মশগুল আছেন, তারই উল্লেখ ক'রে লিখেছেন : "আমি একলা তবু একলা নই, কারণ আর একজনের হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং চক্ষু ৬ সপ্তাহ ধরে আমারই প্রয়োজনে নিয়োজিত। আমার ভিশন এখন কেবল আমার নয়, তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ও'র ভিশনও।"

২১ এপ্রিলের চিঠিতে ওকাকুরাকে ভারতে আনার জন্য মিস ম্যাকলাউডের কাছে নিবেদিতা পুনশ্চ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি গুরুর কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন, এই সম্ভাব্য সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহের সুরে বলেছেন :

"আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি, নতুন কোনো ব্যক্তি দিতে পারেন এমন সকল প্রেরণাই আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত, সে-ব্যক্তির জাতি বা আচার-আচরণ যাই হোক না কেন।" এর সঙ্গে নিবেদিতা যোগ করেছিলেন : "তা বলে এটাকে আমি ব্যক্তিগত ব্যাপারের বেশি মনে করছি না, আমার গুরু এসব ক্ষেত্রে যেমন করেন তার বেশি করছি না। আমি তাঁকে [ওকাকুরাকে] বিশ্বাস করেছি, যেমন স্বামীজী স্বয়ং আমাকে বিশ্বাস করেছেন। আমি যাই করি না কেন, স্বামীজীর মধ্যে এই বোঝাপড়ার মনোভাব সর্বদাই দেখতে চাইব।"

১ মে-র চিঠিতে দলবলসহ ওকাকুরার বুদ্ধগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন, এবং নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, সদানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে ওকাকুরার মায়াবতী যাত্রার আয়োজনের উল্লেখ আছে। সেইসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের টাকাকড়ি ব্যবহারের প্রসঙ্গ ও একটি 'বাক্স' সম্বন্ধে কিছু রহস্যময় কথাবার্তা।

৫ মে-র চিঠিতে নিবেদিতা স্পষ্টভাবে তাঁর রাজনৈতিক কাজে স্বামীজীর অননুমোদনের কথা বলেছেন। নিবেদিতা ঐসময় ওকাকুরার কতখানি প্রভাবাধীন তা তাঁর উক্তি থেকেই বোঝা যায় :

"তিনি [ওকাকুরা] বলছেন, 'স্বামীজীকে সরিয়ে রাখো, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাঁকে কিছু জানিও না।' আমার মনে হয়, ওকাকুরার কথাই ঠিক।...স্বামীজী যদি কিছু লেখেন, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না। তাঁর [মেজাজের] ওঠা-পড়া হয়—স্নায়ুর তটে অসুস্থতার ভাটার টান থেকেই।"

২৫ মে-র চিঠিতে [চিঠিটি খণ্ডিত] নিবেদিতা স্বামীজীর মনোভাব সম্বন্ধে প্রচুর রুষ্ট অভিযোগ করেছেন। তাঁর আশঙ্কা, "তিনি [স্বামীজী] আমার ও অন্যান্যের কাছে যা পবিত্র বস্তু তাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।" সুতরাং সে ব্যাপারে সতর্ক থাকাই নিবেদিতার অভিপ্রায়।

এই চিঠিতে নিবেদিতার কথাবার্তায় অপরিচিত আত্মম্ভরিতার সুর :

"তোমার [মিস ম্যাকলাউডের] কাছে একথা বলে বোঝাতে হবে না যে, যেহেতু আমি তাঁকে [স্বামীজীকে] ভালবাসি, তাঁকে যথার্থ সেবা করতে চাই, তাই তাঁর নিজের প্রয়োজনেই এই ধরনের একটি পরিকল্পনার সম্মুখীন হয়েছি শান্তভাবে। আ-হা, তিনি যদি এখন ভারতের বাইরে থাকতেন [তাহলে কি ভালোই না হত।]। তাঁর দেশসেবার শক্তি শেষ হয়ে গেছে, তা অবশ্য আমি কোনোমতেই মনে করি না, কিন্তু এদেশে তাঁর উপস্থিতি যে, দেশসেবার পরিপন্থী, অন্ততঃ যতক্ষণ-না কোনো বিরাট সংকটকাল উত্তীর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ যে তা সত্য, একথা খুবই বিশ্বাস করি। এই বিষয়ে আমার মনোভাবের রাশ না-খুলে পারিনি বলে দুঃখিত নই—কারণ আমি বিশ্বাস করি, এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি আমার কাছে এই দাবি করতে পারতেন : আর কিছু নয়, যুদ্ধের আলোড়নের মধ্যে আমার পতাকা তুলে ধরো, আর ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে সরিয়ে রাখো, পাছে তা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে কিংবা দুর্বল করে বাহুকে।"

একই চিঠিতে নিবেদিতা এমনও বলতে চেয়েছেন, তিনি যে-পথ বেছে নিয়েছেন সে পথে ওকাকুরার সাহায্য পর্যন্ত দরকার নেই—ওকাকুরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে পূর্ব কার্যে রতী থাকলেই ভালো করবেন।

২ জুন, ১৫ জুন, ২ জুলাইয়ের চিঠিতে অল্পবিস্তর ওকাকুরা প্রসঙ্গ আছে। ৪ জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ হয়। বলা চলে, নিবেদিতার বিশ্বভুবন গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। মহাশূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত নিবেদিতা—সেখান থেকে উদ্ধার পাবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছিলেন এই রাজনীতি থেকেই। গুপ্ত রাজনীতির উন্মাদনা ভিন্ন নিবেদিতার পক্ষে এই নিদারুণ শোক সহ্য করা সত্যই শক্ত ছিল।

৭ জুলাইয়ের চিঠিতে রাজনৈতিক কথা আছে। আর্ত হয়ে মিস ম্যাকলাউডকে ঐ চিঠিতে বলেছিলেন : "টাকাকড়ির ব্যাপারে আগামী সপ্তাহে আমি পরিষ্কার ক'রে লিখতে চেষ্টা করব, কিন্তু এখন পারছি না। যে-ভাবে হোক আরও কিছুদিন বেঁচে থাকো, এবং তোমার চাইল্ড-কে [অর্থাৎ নিবেদিতাকে] বিশ্বাস করতে ও বুঝতে দাও যে, তোমার প্রিয় বন্ধু [ওকাকুরা] যথার্থই সমগ্র ব্যাপারটির অংশ, এবং এক্ষেত্রে স্বামীজী বলুন বা না-বলুন—স্বাধীনতাই আসল কাজ। তোমার অপূর্ব জ্বলন্ত ভালবাসার ছোঁয়া কত না চাই আমি। যে-মানুষটিকে [ওকাকুরাকে] তুমি দিয়েছ তিনি সর্বাংশে মহৎ।"

ওকাকুরাকে বালিগঞ্জের ঠাকুর পরিবারের লোকেরা যে "একেবারে গুরুর মতো পুজো করে," সেকথাও ঐ চিঠিতে আছে।

১০ জুলাইয়ের চিঠিতে, ওকাকুরার মধ্য দিয়ে জাপান ভারতের সেবা করেছে, সেকথা বলার পরে নিবেদিতা এর ব্যবস্থাপনার জন্য মিস ম্যাকলাউডের কাছে পুনশ্চ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করেছেন।

১৬ জুলাইয়ের চিঠি রাজনীতির ব্যাপারে মূল্যবান। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বামীজীর সঙ্গে মতভেদ, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে মঠের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, আমিই স্বামীজীর

মূল ভাবাদর্শকে বহন করছি এই অভিমান—নিবেদিতা চিঠিটিতে সবিস্তারে প্রকাশ করেছিলেন :

"হাঁ, তুমি নিগু-র [ওকাকুরার] বিষয়ে যা বলেছ তা ঠিক। নিগুর মতও ঠিক বলে আমার নিশ্চিত ধারণা। কিন্তু তার এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে পথের পার্থক্য এমন চূড়ান্ত যে, আমি মঠ থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন। আমি অনুভব করছি, এক্ষেত্রে স্বামীজী আমাকে যে-যথার্থ মিশন দিয়েছিলেন তাকেই বহন করছি, যদিও স্বামীজী স্বয়ং দৈহিক অস্তিত্বের উৎপীড়নে [শেষের দিকে] ভিন্নতর চিন্তা করেছিলেন। আমার কথা বুঝতে পারছ? আমার নিশ্চিত ধারণা তুমি বুঝবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। আমি এও নিশ্চিত বোধ করি যে, তুমি সবশেষে যে-কথা বলেছিলে তা তোমার মনে সর্বদা জাগরূক থাকবে : ঐক্যবদ্ধ থাকলেই খাড়া থাকবে, ভেদ এলেই পতন।' বহু সময় ঐ কথাগুলি আমার কানে বেজে-বেজে উঠেছে, তা নিগু-কে সরে যেতে না দিতে সতর্ক করেছে। সে [ওকাকুরা] মনে করে, [সন্ন্যাসীদের] অত্যধিক সতর্কতা ও যুক্তিনির্ভরতা সর্বদা সর্বনাশের কারণ হয়েছে। ওঁরা [সন্ন্যাসীরা] মনে করেন, আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে যাচ্ছি। আমি আর বেশি কিছু বলতে পারব না।"

মিস ম্যাকলাউডের টাকার ব্যাপারে অনেক উল্লেখ এই চিঠিতে আছে। তার মধ্যে পাই : ওকাকুরাকে প্রচুর ঘুষ দিতে হচ্ছিল, সেজন্য আরও হাজার টাকা দরকার। "প্রিয় য়ুম, [মিস ম্যাকলাউড], তোমাকে ছাড়া আমাদের চলবে না, সুতরাং আমাদের সকলের জন্য ভালো হয়ে ওঠো [স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদে মিস ম্যাকলাউড অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন], সর্বোপরি ভালো হয়ে ওঠো কাজের জন্য। আমাদের বিশ্বাসকে সঞ্জীবিত রাখো ; আমাদের মনে জাগরূক রাখো যে, ঐ বিশ্বাস ছাড়া আমাদের অন্য বিশ্বাস নেই ; সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়-কার্য করলে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না, হতে পারে না।"

মঠের সমালোচনা ক'রে নিবেদিতা লিখলেন : "এখন মঠ কান্নাকাটি ও পূজা-প্রার্থনায় ডুবে আছে ; অসুস্থতা বা ঝোঁকের মাথায় [স্বামীজী] যা বলেছিলেন তার মধ্যে সবাই ঢুকে পড়তে চায়—বুঝতে পারছ? ঐকথা চিন্তা করলে আমি যেন বদ্ধ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, কিন্তু ওঁরা নিজেদের পথ নিজেরাই করে নেবেন।"

নিজেকে খুব উচ্চ আদর্শের ধ্বজাধারী ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেও নিবেদিতা যথেষ্ট সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন না—সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব একই চিঠিতে ফুটেছে :

"হে স্বামীজী! প্রিয় স্বামীজী! আমাকে শক্তি দিন যাতে আমি আপনার গভীরতম আকাঙ্ক্ষাকে সফল করে তুলতে পারি—আপনার ব্যক্তিগত খেয়াল অথবা দুর্বলতাপ্রসূত আকাঙ্ক্ষাকে নয়। আমি মনে করি—তুমিও [মিস ম্যাকলাউড] কি মনে করো না—মহান শিষ্যের সঙ্গে দীন শিষ্যের পার্থক্য সর্বদা সূচিত হয় আচার্যদের ব্যক্তিগত নয়—নৈর্ব্যক্তিক দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করার শক্তির দ্বারা। যদি অ্যালবার্ট [মিস ম্যাকলাউডের বোনঝি অ্যালবার্ট] মিসেস রোয়েথলিসবার্জারকে [ঐ মিস্টিক নারী] চিঠি লেখে তাহলে সে কি আমার হয়ে একটুকরো কাগজ বা অনুরূপ কিছু তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবে, যেটিকে ধরে তিনি [রোয়েথলিসবার্জার] আমার জন্য বার্তা পাঠাবেন—সত্যই আমি ঠিক পথে চলেছি কি না? যা স্থির ছিল তার থেকে কত না পৃথক হয়ে গেল সব ব্যাপারটি, স্বামীজী দু'মাস আগে কত না ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, আর [মঠের] লোকেরা নিশ্চিতভাবে মনে করেছিলেন, তিনি যা করতে বলছেন আমার তাই করা উচিত। কিন্তু আমি এখন যা

করছি তার থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি না। আমি এখন আদর্শ-মূর্তি। এখন নতিস্বীকার করার চেয়ে মৃত্যুও সহজতর।"

২৪ জুলাইয়ের পত্রে নিবেদিতা স্বামীজীর ভাবধারা থেকে কতখানি সরে এসেছেন সে সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। তিনি আর "নারী-তৈরীর কাজকে" নিজের কাজ মনে করতে পারছেন না। ভাবছেন ১০-১২টি মেয়েকে তৈরী করে বিশেষ কোন্ সুরাহা হবে! পুরুষদের মতো নারীদের মধ্যে 'জাতীয় চেতনা' সঞ্চারিত ক'রে তাদের বৃহত্তর দায়িত্ব-পালনে নিয়োজিত করাই উচিত কাজ।—

"আমার কাজ জাতিকে জাগানো, কয়েকটি নারীকে প্রভাবিত করা নয়। একটি মানুষ এসে আমাকে দেখিয়েছেন—কিভাবে সে কাজ করতে পারি। তবে সেটা আমার তরবারিতে বাড়তি ধার দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কারণ আগেই ও-জিনিস আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

"হাঁ, আমার কাজের কথা। আমি সফল নাও হতে পারি। আমি যেভাবে অনুভব করছি তুমি সেভাবে অনুভব করতে পারবে না—কদাপি ভাবতে পারবে না যে, কী অসম্ভব কাজ, আর কত-না আমার অসামর্থ্য। কিন্তু তাতেই কি উল্টো ঘটবে—আমি কি কাজ ছেড়ে দেব? মাতৃ-সমুদ্রে আমরা কি ঝাঁপ দিয়ে পড়ব না? কোনোদিন তটে উত্তীর্ণ হতে পারব কিনা, সে ব্যাপারটা কি মায়ের হাতে ছেড়ে দেব না?

"কেন তিনি [স্বামীজী] ঠিক এই সময়টিতে নিজেকে সরিয়ে নিলেন? তা কি প্রতিটি পরমাণু যাতে তাঁকে যন্ত্রণা না দিয়ে অব্যাহতভাবে কাজ ক'রে যেতে পারে, সেই-জন্য নয়?—তাঁর জীবনপ্রবাহ যে-বিরাট ভবিষ্যতের দিকে আমাদের চালিত করছে তাকে যাতে পেতে পারি সেইজন্য কি নয়?"

এই চিঠিতে নিবেদিতা যে, বিশেষ উদ্দেশ্যেই বক্তৃতাদি করছিলেন, তার উল্লেখ করেছেন। বক্তৃতার পরে সম্ভাব্য কর্মীদের সঙ্গে তিনি কোন্ ধরনের ব্যক্তিগত আলোচনায় আগ্রহী সে বিষয়ে বলেছেন: "আমি তাদের কাছে গেডেস-ভঙ্গিতে সমাজনীতি বা অনুরূপ বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছি, তাদের ভাবাতে চেয়েছি—জাতীয় কংগ্রেস বা সরকার সম্বন্ধে নয়—কী চেয়েছি তুমি জানোই।"

এই চিঠিতেই দেখি, ওকাকুরা যেখানে সকল রাজতন্ত্রকে স্থূল বর্বর আত্মতুষ্ট কিংবা ক্ষমতাপ্রিয় বলতে গররাজি (কারণ ওকাকুরা যে বিদেশে বিপ্লবী কিন্তু স্বদেশে রাজতন্ত্রের অনুরাগী দেশপ্রেমিক জাপানী!!) সেখানে ইংলন্ডের রাজতন্ত্র সম্বন্ধে একেবারে আনুগত্য-হীন এই ইংরাজনারী বলেছেন:

"আমাদের রাজপরিবার, সাম্রাজ্যবাদী শাসনপদ্ধতির যে-চূড়ান্ত শিখরকে কল্পনায় আনা যায়, তারই চরম বিন্দু। আগাপাশতলা পরজীবী বুর্জোয়া।"

২৯ জুলাইয়ের চিঠিতে সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে ওকাকুরার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার কথা আছে। এই রাজনৈতিক ভ্রমণ অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। নিবেদিতা লিখেছেন:

"শনিবার ওঁরা একমাসের ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন. তাতে মন আশঙ্কায় কিছু আতুর, কারণ তুমি জানো, এই ধরনের ভ্রমণে ওঁর [ওকাকুরা] ক্ষেত্রে মন্দ সম্ভাবনা আছেই।...বর্তমানে উনি এদেশে অতিথি, ওঁর খুন হওয়া চলে না। তুমি ওঁকে আমাদের জন্য এনেছ। যদি উনি আবার আসেন, আসবেন বলছেন, সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত আগমনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ও'র জানা। সুরেনকে উনি ভালবাসেন। কি অপূর্ব ও'র চরিত্র—যাদের

শিক্ষা দেন তাদের ভালবাসেন। তাই শিষ্যরূপে শক্তিশালী মানুষ পেয়ে যান, সেটা অদ্ভূত কিছু ব্যাপার নয়।

৭ অগস্ট সফররত ওকাকুরার প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখলেন : "উনি বাইরে আছেন, কাজ করছেন, 'যে-কাজ কেবল উনিই করতে পারেন', সত্যিই। আমি তাঁর ঠিকানা পর্যন্ত জানিনা, তবে ইচ্ছে করলেই জানতে পারি।"

২১ অগস্ট চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, তিনি মিস ম্যাকলাউডের আরও হাজার টাকা ওকাকুরাকে দিয়েছেন। "যদি তুমি কখনো সে টাকার হদিশ না পাও জেনো যে, তা ভালো কাজেই লেগেছে। এখানে ওঁর কাজের জন্য যে-কোনো ব্যয়ই উত্তম ব্যয়। বর্তমানে উনি পুনায় আছেন। আমার ধারণা, ওঁর কলকাতার ঠিকানা তুমি জানো, সুতরাং সেটা আর জানাচ্ছি না।"

৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে ওকাকুরা ও সুরেন ঠাকুর সফর সাঙ্গ করে ফিরেছেন, এই খবর দিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন : "তাঁরা কি না করেছেন—সবকিছু। এখন আমাদের পথ দেখতে পাচ্ছি।"

১০ সেপ্টেম্বরের চিঠি সফর-প্রত্যাবৃত্ত ওকাকুরার কথায় পূর্ণ। "নিগু ও সুরেন ফিরে এসেছেন, সেকথা তোমাকে বলেছি। যা করার তাঁরা করেছেন, বেশিও করেছেন।" ওকাকুরার সাহস এবং আত্মোৎসর্গের বিষয়ে অত্যন্ত ভাবাবেগ প্রকাশের পরে নিবেদিতা লিখেছেন : "বালিগঞ্জের ছেলেদের মধ্যে এই মিথ্ ছড়িয়েছে—উনি কল্কি, যাঁর বিষয়ে অনেক কথাই শোনা যায়।...ছেলেরা নিগুকে কৃষ্ণও বলে।"

১৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে পুনশ্চ ওকাকুরার বিপুল প্রশস্তি : "দেখে আশঙ্কা হচ্ছে পূর্বের মতোই তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন। ক্ষুদ্র জিনিসে যেমন তেমনি বৃহৎ জিনিসে একই জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ। একেবারে আত্মসচেতনতা নেই, মানুষের পক্ষে সবিশেষে অর্চনীয় বস্তু তা। বাস্তবিক, তুমি যে-মানুষটিকে এনে দিয়েছ তাঁর মহিমা দর্শন না ক'রে উপায় নেই।"

১ অক্টোবরের চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন: "চিঠিতে খুব সামানাই লেখা যায়। 'ব্যানার-চীফ'-এর কথায় আমি [সফরের উদ্দেশ্যে] বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে তোমার সকল চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছি।" [স্থূলোলিপি লেখক-নির্দেশে]

১১ অক্টোবরের চিঠিতে ওকাকুরার ভারত ত্যাগের সংবাদ।

॥ ৯ ॥ ওকাকুরা সম্বন্ধে নিবেদিতার ধারণার সম্পূর্ণ রূপান্তর : ওকাকুরার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ : সরলা ঘোষাল সহ বালীগঞ্জের ঠাকুরগোষ্ঠী সম্বন্ধে নিবেদিতার তিক্ত মনোভাব : যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গ

খুবই বিস্ময়ের কথা, ওকাকুরা ভারত ছেড়ে চলে যাবার পরেই তাঁর সম্বন্ধে নিবেদিতার সুর ঘুরতে থাকে, এবং কিছুদিন পরে তিনি ওকাকুরার বিষয়ে রীতিমতো তিক্ত ভাষায় কথা বলতে থাকেন। কেন এই পরিবর্তন?

প্রথম কারণ, নিবেদিতা যে-বিবেকানন্দকে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর মন থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—সেই বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তন—মরজগৎ থেকে বিবেকানন্দের প্রস্থানের পরে। ১৯০২, অক্টোবরের গোড়ার দিক পর্যন্ত, যে-সময়ে ওকাকুরা ভারত ত্যাগ করে চলে

গেলেন—ওকাকুরার বিষয়ে নিবেদিতার ভাবাবেগ যদিও রয়েছে তবু শেষের দিক তার ঘনত্ব কিছু ফিকে হয়েছিল। নিবেদিতার সমস্ত মনকে তখন অধিকার করেছিল বিবেকানন্দের চিন্ময় সত্তা—আর তখনি তিনি প্রথমে সূক্ষ্মভাবে, পরে স্পষ্টভাবে, অনুভব করতে থাকেন—রাজনীতির দিক দিয়েও স্বামীজীর মূলগত চিন্তাকে গ্রহণ না করে উপায় নেই।

দুই, ওকাকুরার অবর্তমানে তাঁর সাক্ষাৎ প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিবেদিতা যখন ধীরস্থিরভাবে গোটা ব্যাপারটির পর্যালোচনা করতে থাকেন তখন তার ত্রুটির দিকটি তাঁর চোখে ধরা পড়ে। সেকথা তিনি পরিষ্কার স্বীকার করেছেন।

তিন, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে ভারতভ্রমণ করে, বক্তৃতা ও জনসংযোগের ব্যাপারে সাফল্যলাভের ফলে তাঁর বিপুল আত্মবিশ্বাস জেগেছিল—তার দ্বারা নিজ কর্তব্য নিজে নির্ধারণ করার এবং তাকে কার্যকর করার মানসিক শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন—বুঝেছিলেন যে, আর ওকাকুরাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হবার প্রয়োজন তাঁর নেই।

চার, ওকাকুরার ব্যক্তিচরিত্র তাঁর কাছে বিরক্তিকর ঠেকেছিল। ওকাকুরার অতিরিক্ত নেশায় আসক্তি, এবং প্রেমে পড়ার ঝোঁক নিবেদিতার কাছে ব্যক্তিমানুষ হিসাবে ওকাকুরাকে নামিয়ে দেয়। শ্রীমতী হোরিওকার প্রবন্ধে দেখেছি, এক শোচনীয় ব্যর্থ প্রেমের অন্তে ওকাকুরা প্রথম ভারতে এসেছিলেন।২২ পরবর্তীকালে দেখা যায়, তিনি ঠাকুরবাড়ির এক কন্যার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছেন। এসব জিনিস নিবেদিতার পছন্দের বস্তু ছিল না। ওকাকুরা নাকি নিবেদিতাকেও প্রপোজ্ করে বসেন।২৩

পাঁচ, আরও কিছুদিন পরে নিবেদিতা বোধহয় ওকাকুরার রাজনৈতিক মতলব সম্বন্ধে এমন কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন যা তাঁকে সন্দিগ্ধ ও বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল।

এইসমস্ত কারণে (বা অজ্ঞাত অতিরিক্ত কারণে) নিবেদিতার মনোপরিবর্তন ঘটে। আমরা এইসকল বক্তব্যের পক্ষে অল্পবিস্তর প্রমাণ দেব।

১৯ নভেম্বর, ১৯০২, নিবেদিতা চিঠিতে লিখেছেন, ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর কিছুদিন কোনো সাক্ষাৎ-সংযোগ নেই, এবং তাঁর পূর্বনির্ধারিত জাপান যাওয়ার পরিকল্পনাকে যেন সুনিশ্চিত বলে ধরে না নেওয়া হয়। নিবেদিতার ইচ্ছা, ওকাকুরা দু'এক বছর জাপানে অবস্থান করে অচঞ্চলভাবে কাজকর্ম করুন।২৪

---

২২ *Okakura and Swami Vivekananda's Disciples,* Yasuko Horioka, *Prabuddha Bharata,* March 1977, 118-19.

২৩ Swami Ashokananda to M. Herbert (13.1.38):

"I really have very little worthwhile information about her [Nivedita]. On the point you have specially enquired about, I know very little. I have heard that Okakura proposed to her and she rejected him, and my impression is that the man was really attracted to her. More than that I do not know." [*Reymond Collection*].

২৪ নিবেদিতা জাপান যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলেও বিশেষ শিক্ষার জন্য জাপানে নিজের দলের ছেলে পাঠিয়েছেন। ৩ ডিসেম্বর, ১৯০১, লিখেছেন: "আমার একটি সেরা ছেলে জাপানে যাচ্ছে। এতে খুব খুশি। আমি জানি সে স্বামীজীর নির্বাচন। এ-ব্যাপারে আমি মিসেস লেগেটের টাকা খরচ করার স্বাধীনতা নিয়েছি।"

এই চিঠিতেই নিবেদিতা 'ওকাকুরা-স্পেল' কেটে যাওয়ার কথা বলেছেন, সেইসঙ্গে ওকাকুরার কর্মনীতির অসারতার কথা :

"ভারতের জন্য আমার কাজ এতই বিশাল যে, আমি মনে করি না তাকে কয়েক মাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া যাবে—যে-রকম প্রায় আমি কিছু আগে প্রিয় নিগুরে মোহে পড়ে কল্পনা করেছিলাম। আর এই দেশ থেকে বাইরে যাবার যথার্থ কোনো প্রয়োজনও অনুভব করছি না।"

এইসঙ্গে নিবেদিতার মনে ঘনিয়ে এসেছে স্বামীজীর স্মৃতি : "আমি প্রায়ই—প্রায়ই যেন দেখি—বসে আছি তোমাদের [মিস ম্যাকলাউডের] হল-ঘরটিতে, আগুনের ধারে, ছায়া ঘনাচ্ছে, ক্রমেই ঘনাচ্ছে, তিনি [স্বামীজী] কথা বলেই চলেছেন, অবিরাম বাণীর প্রবাহ, আর তারই মধ্যে অপরাহ্ণ কখন যে গড়িয়ে নেমে গেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে।

"সবকিছুই ব্যর্থ মনে হচ্ছে—কেবল ব্যর্থ নয় [স্বামীজীর] সেই বিরাট জীবন। পরিপূর্ণ তার বিজয়।"

এই চিঠিতে নিবেদিতা যে, ওকাকুরার রাতারাতি সেরে-ফেলার কর্মনীতির কথা বললেন, তার রূপ ঠিক কী ছিল? এক্ষেত্রে আমরা সূত্র হিসাবে কেবল শ্রীঅরবিন্দের কিছু উক্তি পাই। তিনি বলেছেন :

"[বাংলায় প্রথম যে-গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়] আমি সে দলের প্রতিষ্ঠাতাও নই, নেতাও নই। পি মিত্র এবং মিস ঘোষাল [সরলা ঘোষাল] ব্যারণ ওকাকুরার মন্ত্রণায় ও প্রেরণায় তা আরম্ভ করে। আমি বাংলায় গিয়ে তাদের এই কাজ সম্বন্ধে জানতে পাই। তখন থেকে আমি শুধু খবর রাখতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত ভারতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। আজ এরা যা করত তা নিতান্ত ছেলেমানুষি, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটকে মারধর করা। পরে ব্যাপারটা ডাকাতি, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির দিকে মোড় নেয়। ওগুলো মোটেই আমার মতানুযায়ী নয়, উদ্দেশ্যও ছিল না।"২৫

অরবিন্দ ঐসব কাজকে পছন্দ না করলেও কেন বাধা দেননি, সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "কোনো জিনিস যখন দৃঢ় রূপ নেয়, তাকে বাধা দেওয়া সমীচীন নয়। কেননা তাতে কিছু ভালো ফল মিলতেও পারে।"

অরবিন্দ কেবল বাধা দেন নি তাই নয়, হেমচন্দ্র কানুনগো ও অন্যান্যের সাক্ষ্যমতো, গুপ্তহত্যার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের উক্তিতে কিছুটা সূত্র পাওয়া গেলেও ফাঁক যথেষ্টই আছে। প্রথমতঃ তিনি ঐ দলের সংবাদ বাংলায় আসার পরে নয়, বরোদাতেই নিবেদিতার কাছে পেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, নিবেদিতাও যে ঐ দলেরই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা জানাতে তিনি ভুলে গেছেন। ভুপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, আগেই তা দেখেছি—নিবেদিতা এই দলটির বিষয়ে বরোদাতে অরবিন্দকে অবহিত করেছিলেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গে নিবেদিতার ২১ ডিসেম্বর, ১৯০২ চিঠি গুরুত্বযুক্ত। ওর মধ্যে

এই ছেলেটি কে জানি না। যাইহোক, আমরা জানি যে, স্বামী সদানন্দ জাপানে গিয়েছিলেন তাঁর ভাগিনেয় অমূল্যচন্দ্র গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে। অমূল্যচন্দ্র সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী শঙ্করানন্দ হন, রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতিও হয়েছিলেন।

২৫ নীরদবরণ, "শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা," ৫১। বইটি অতঃপর 'কথাবার্তা' বলে উল্লিখিত হবে।

ওকাকুরার নেতৃত্বশক্তি, তথাপি তার অনাবশ্যকতা, এবং বালিগঞ্জ-গোষ্ঠী সম্বন্ধে নিবেদিতার আশাভঙ্গ ও বিরক্তির অনেক কথাই আছে। প্রথম প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন :

"লোকজনকে চালিত করার ব্যাপারে প্রিয় নিগু-র শক্তি এত বেশী যে, তার ছোঁয়ায় তারা যোজন-দূরে এগিয়ে যায়, আর সে না থাকলে পিঠ উলটে পড়ে।"

এই চিঠিতেই দেখি, ওকাকুরার যেসব সহযোগীর সঙ্গে নিবেদিতা বৈপ্লবিক আন্দোলন করবেন ভেবেছিলেন, তাঁদের একটা বড় অংশ—বালিগঞ্জের ঠাকুর পরিবারগোষ্ঠী—সম্বন্ধে নিবেদিতা সম্পূর্ণ ভগ্নমোহ, এবং তিনি অত্যন্ত তিক্তভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন।—

"*তোমাকে সত্যি কথাটা জানাচ্ছি—গোটা বালিগঞ্জ-সম্পর্ক বিষয়ে আমার মোহমুক্তি* ঘটেছে। সরলা এখন জগন্মাতার পার্থিব প্রতিনিধিত্বে প্রতিষ্ঠিত। সে আমাকে লিখে পাঠাচ্ছে, ডাঃ বসুকেও বলছে—তার বাহিনীতে ঢুকে পড়তে। তার পত্রিকা নাকি দারুণ কাজ করছে—কালী-উপাসনা ইত্যাদি প্রচার করছে। **মধ্যবর্তীকালে আমি তাদের মধ্যে একটি প্রাণীও দেখতে পাচ্ছি না যে তার মূল্যবান মস্তক সম্বন্ধে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি।** যতই তাদের তীক্ষ্ম কার্কশ ও বকবকানি এগিয়ে চলে ততই আমি চুপ করে যাই। নিগু-র সময় বৃথাই ব্যয়িত হয়েছে।" [স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে]

নিবেদিতা নিজের দলের ছেলেদের বালিগঞ্জ-গোষ্ঠী থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন :

"কি অদ্ভুত, আমি [এখন] **এই গোষ্ঠীর সর্বপ্রকার সংস্পর্শ থেকে নিজের ছেলেদের সরিয়ে রাখার জন্য অতীব উৎকণ্ঠিত—সেটা দেখিয়ে দেয়, কেন স্বামীজী এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার সংযোগের বিষয়ে অত বিরক্ত ছিলেন।**"

বালিগঞ্জ-গোষ্ঠী সম্পর্কে বিতৃষ্ণা নিবেদিতা মাসখানেক পরে (২৪.১.১৯০৩ চিঠি) পুনশ্চ প্রকাশ করলেন :

"একই সঙ্গে বলি, এমন কিছু করো না যা বালিগঞ্জ-গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করতে পারে। ঐ সম্পর্ক অপদার্থ—অপদার্থ—অপদার্থ।"

বালিগঞ্জ-সম্পর্ক সম্বন্ধে নিবেদিতার মোহভঙ্গের এই-যে জ্ঞাত কারণ—ও'দের বচনে বীরত্ব, কর্মে প্রস্থান—সে বিষয়ে কিছু তথ্যযোজনা করা যায়। প্রয়োজনীয় সংবাদ সরলাদেবীর আত্মজীবনী—"জীবনের ঝরাপাতা" এবং গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীকে সরলা-দেবী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে পাওয়া যায়। সরলা যে সত্যই নিজেকে "বিশ্বমাতার পার্থিব প্রতিনিধিত্বে" প্রতিষ্ঠিত দেখতে আগ্রহী ছিলেন, (কিংবা অপরে তাঁকে সেই আকারে দেখতে উৎসাহী ছিলেন) তা তিনি অর্ধশতাব্দী পরে লেখা আত্মজীবনীতে পরিষ্কার জানিয়েছেন। বঙ্গবাসী কাগজ তাঁকে বাঙালী যুবকদের শরীর-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করতে দেখে লিখেছিল, "মরি! মরি! দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন!" সরলার বাড়িতে চা-পানে নিমন্ত্রিত বরোদার গায়কোয়াড় দেওয়ালে টাঙানো জাপানী শিল্পীর আঁকা কালীর ছবি এবং সরলার এলোচুল-মুখের পোর্‌ট্রেট দেখে বলেছিলেন (কৌতুকে না গাম্ভীর্যে আমরা জানবার সুযোগ পাইনি), "কোন্‌ কালী দেখব—এই কালী না ঐ কালী?" সরলাই এসব কথা লিখে জানিয়েছেন। এর কাছে সরলার "জোয়ান অব আর্ক" কিংবা "দেবী চৌধুরাণী" নামকরণ (এ সংবাদও সরলাই দিয়েছেন) সামান্য ব্যাপার।

সরলা আরও দরকারী এই খবর দিয়েছেন : "একবার শুনলুম, রেলেতে একটা

পার্শেল ধরা পড়েছে, ভিতরে বন্দুক ভরা, উপরে কারো নাম নেই। পুলিশের বিশ্বাস, আমি নাকি সেগুলি আমদানী করিয়েছি।"

আরও জেনেছি : "একবার সি আর দাশ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে জানিয়ে গেলেন—আপনি সাবধানে থাকবেন। সন্ধ্যেবেলা বালিগঞ্জে এ-বাড়ি ও-বাড়ি হেঁটে বেড়াতে বেরোবেন না। পুলিশ বলছে, আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন, অথচ আপনাকে ধরবার ছোঁবার কোনো উপায় পাচ্ছে না। তাই তারা এবার পরামর্শ এঁটেছে, কোনোদিন সন্ধ্যেবেলায় আপনি বাড়ির বাইরে বেরোলে তাদের গুণ্ডা দিয়ে আপনাকে আক্রমণ করিয়ে জাহির করিয়ে দেবে—গুণ্ডারা আপনার ক্লাবেরই ছেলে, আপনিই এইসব গুণ্ডা তৈরী করেছেন।"

এসব ব্যাপার সরলার কাছে একেবারে প্রীতিপ্রদ ঠেকেনি। বরোদা থেকে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরীরচর্চা, ড্রিল, অশ্বারোহণ ইত্যাদিতে উৎসাহ দেবার ব্যাপারে মতৈক্য থাকলেও যুবকদের শারীরিক উৎসাহ যখন রাজশক্তির অঙ্গস্পর্শ করতে অগ্রসর হল, তখন তিনি মনে 'পিছু হটো' ধ্বনি শুনলেন। এবং—সন্ত্রাসবাদী অপকর্ম-গুলির জন্য অন্যান্যের সঙ্গে নিবেদিতাকেও দায়ী করলেন। সরলা লিখেছেন :

"খালি আমার মতভেদ হল যখন শুনলুম, তাদের দল থেকে ডাকাতি চালাবার হুকুম বেরিয়েছে। এ-বিষয়ে নাকি নিবেদিতার সঙ্গে তাদের দলের সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল। নিবেদিতা বলতেন বটে, বৃটিশ শাসনে দেশ থেকে চোর-ডাকাতের ভয় লুপ্ত হয়ে দেশব্যাপী শান্তিবিস্তারটাই এদেশের পুরুষদের পৌরুষ ধ্বংসের কারণ ; কতকটা অশান্তি না থাকলে পৌরুষ জাগ্রত হয় না, সেই জন্য ডাকাতি থাকা দরকার।" [হায় সরলীকরণ]।

এইসংগে সরলা জানিয়েছেন : যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে তিনি একদিন শোনেন—ডায়মণ্ডহারবারের কাছে এক বুড়িকে মেরে তার মাটিতে পোঁতা অগাধ ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে আনার পরিকল্পনা এই দল করেছে। শুনে সরলা শিউরে ওঠেন, ধিক্কার দেন, এবং সোজা পুনায় তিলকের কাছে ছোটেন—কারণ তাঁর আদেশেই নাকি একাজ করা হচ্ছে। তিলক দায়িত্ব অস্বীকার করায়২৬ তিনি ফিরে উক্ত পরিকল্পনার পথরোধ করেন। আত্মজীবনীতে এই ঘটনার সময় উল্লেখ না করলেও সরলাদেবী গিরিজাশঙ্করকে দেওয়া নোটে তা ১৯০২-এর সেপ্টেম্বর মাস বলে জানিয়েছেন।

সরলার উপরের বক্তব্য, আমাদের দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, অসঙ্গতি ও বিকৃত তথ্যে পূর্ণ। সরলার পক্ষে বোধহয় অনুমান করা সম্ভব ছিল না নিবেদিতার ঐসময়কার কিছু চিঠিপত্র রক্ষিত থাকবে। তা জানা থাকলে তিনি নিশ্চয় কয়েকটি ঘটনার দায় যেভাবে নিবেদিতার ঘাড়ে চাপিয়েছেন তা করতেন না, কেননা ওসব ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব অল্প ছিল না। অরবিন্দ তো, আমরা আগেই দেখেছি, ম্যাজিস্ট্রেটদের মারধর, স্বদেশী

---

২৬ তিলক কিন্তু স্বয়ং সরাসরি ব্যাপারটির বিরোধিতা করতে রাজি হন নি—

"Tilak told me distinctly, [Sarala wrote], he did not approve of the dacoities, much less authorise them, if for nothing else simply on the score of their being practically useless for political purposes.

"But looking to differences in human nature and the varying processes of evolution suited to different temperaments, he did not condemn them openly."

[সরলাদেবী কর্তৃক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীকে প্রদত্ত নোট ; 'শ্রীঅরবিন্দ'; ৩১৯]

ডাকাতি ইত্যাদির আদি দায় ওকাকুরা, পি মিত্র, সরলা ঘোষালের উপর চাপিয়েছেন। এই-সঙ্গে এই পর্বের কয়েক মাসের কার্যাবলীর সঙ্গে অন্ততঃ নিবেদিতার নাম আমরা যোগ করতে পারি। সরলা যে-সময়ের কথা বলেছেন, সেই ১৯০২ সেপ্টেম্বর মাসে ওকাকুরা ভারতে আছেন, একথা ভুললে চলবে না। ওকাকুরার প্রস্থানের পরেই সরলা বিপদের ভয়ে দলত্যাগ করেন, যার কথা নিবেদিতা তাঁর চিঠিতে ধিক্‌কারের সঙ্গে বলেছেন। মতপরিবর্তনের অধিকার সরলার অবশ্যই ছিল, কিন্তু তিনি স্বদেশী ডাকাতির প্রশ্নে যে-রকম আকাশ থেকে পড়া-ভাব দেখিয়েছেন, তা না দেখালেই ভালো করতেন, কারণ ওকাকুরার দলভুক্ত হিসাবে ওসব বিষয় তাঁর না জানার নয়। যাইহোক আমরা দেখি, ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর "দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম" গ্রন্থে বলেছেন—সরলা ও জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপাতিকে "দল হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়।" কারণ স্বতঃস্পষ্ট। সরলা লিখেছেন :

"ওখানে [নিবেদিতাদির গোষ্ঠীতে] যা-কিছু পরামর্শাদি হত যতীন বাড়ুজ্জে আমাকে জানাত।"

"যতীন বাড়ুজ্জে" যদি তা করে থাকেন, তাহলে বিশ্বাসভঙ্গের কাজই করেছেন। নিবেদিতার চিঠিতে আছে, যতীন্দ্রনাথকেও দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথকে যে অরবিন্দগোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, তা এইপর্বের বিপ্লবচেষ্টার সকল বিবরণেই মেলে। অধিকাংশ লেখক সেজন্য বারীন্দ্রকুমার এবং অরবিন্দকে দোষী করেছেন। যতীন্দ্র সন্ন্যাস নিয়ে 'নিরালম্ব স্বামী' হন। পরবর্তীকালে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা তাঁর বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর বিষয়ে মারাত্মক কথা আছে। আমি বিশ্বাস করতে চাই, নিবেদিতা ভুল সংবাদের উপর নির্ভর করে সেই মন্তব্য করেছেন—তিনি বারীন্দ্র-প্রভৃতির কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। নিবেদিতার ভুল করার সমূহ সম্ভাবনা মেনে নিয়েও, সংবাদটি উপস্থিত করছি। নিবেদিতা ১৫ অক্টোবর, ১৯০৮, লিখেছেন :

"The man Jotindra Mohan [Nath] Banerjee who was captured at Burdwan and is now acquited has clearly in my opinion turned informer. Only Govt. will not again [*i.e.*, after the assasination of Narendra Nath Gossain] expose a man to the popular stigma of this part. The worst of it is that what Banerjee tells will probably be sheer invention —as he was regarded with a certain confidence some years ago, but not, so far as I should imagine, since 1904."

যতীন্দ্রকে কেন দল থেকে তাড়ানো হয়েছিল তার পিছনে বারীন্দ্র প্রভৃতির চক্রান্ত ছাড়াও আর একটি কারণ অনুমান করতে পারি—তিনি দলের অবিশ্বাসের পাত্রী সরলার কাছে সংবাদ সরবরাহকারী, একথা হয়ত ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক, কেবল নিবেদিতা নন, এইকালের গোটা বিপ্লবীগোষ্ঠীর, অন্ততঃ অরবিন্দগোষ্ঠীর যে, যতীন্দ্রের বিরুদ্ধে সন্দিগ্ধ মনোভাব ছিল তা সাপ্তাহিক বন্দেমাতরম পত্রিকার ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ (যার ২৫ দিন পরে নিবেদিতার পূর্বোক্ত পত্রটি লেখা) সংবাদ থেকে দেখা যায়। সংবাদটি এই :

JATINDRA NATH BANERJEE INTERVIEWED

In the chamber of a pleader of the Alipur court sat Jatindra Nath

Banerjee after his release without any apparent exultation in his look. The pleader happened to be an old acquaintance of Jatindra Nath....

Pleader: Well, is there any truth in the rumour that you incriminated Aurobindo Babu by your statement before the Police?

Jatindra Nath: Not at all. I made a statement to the effect that I used to live with Aurobindo Babu at Baroda. I also stated that it was I who first initiated Aurobindo Babu in taking interest in the political condition of India. I further stated that I was a homless Sannyasin and had travelled much in all parts of India, after having renounced the life of a householder.

Pleader: How were you treated in jail after the murder of Narendra Nath Gossain?

Jatindra Nath: We had a very hard time of it. I was stripped naked and my person was searched. And I was made to wear the convicts *Jangia*. I heard a vague rumour in jail that some more revolvers were found, but not in the possession of anyone.

Here the Sannyasin abruptly cut short and walked out of the room leaving his audiences to themselves with wonder-gazing eyes.

চরমপন্থীদের মুখপত্র বন্দেমাতরম কাগজে এ-ধরনের একটি সংবাদ প্রকাশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা না করলেও চলে।

২১ ডিসেম্বর, ১৯০২, চিঠিতেই নিবেদিতা তাঁর ব্যাকুল ওকাকুরা-প্রীতি সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণীর উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে, ২৯ জুন, ১৯০২, রবিবার, কথাগুলি বলেন :

"ঠিক, মার্গট ঠিক, আমি দেখতে পাচ্ছি—এখন তোমার এই-এই বিশ্বাসের কাল। আগে তোমার ব্রাহ্ম-বিশ্বাস ছিল, টেগোর-বিশ্বাস ছিল, বর্তমান তোমার এইসকল [ওকাকুরা-কেন্দ্রিক] বিশ্বাস। এগুলিও যাবে, যেমন গেছে অন্যগুলি।"

২৯ জুন, ১৯০২, স্বামীজী যখন ঐ কথাগুলি বলেছিলেন তখন তা নিবেদিতার কাছে কী-না অরুচিকর ঠেকেছিল! তাঁর মনে হয়েছিল, ওসব স্বামীজীর ব্যক্তিগত খেয়ালের কথা, কিংবা অসুস্থতার ঝোঁকের কথা। ৬ মাস পরে, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, নিবেদিতার কাছে স্বামীজীর ঐ কথাগুলি কত না সত্য ও সার্থক মনে হল। তিনি বললেন, "শব্দগুলি এখন আমার কাণে মধুবর্ষণ করছে।" নিবেদিতা এখন স্বামীজীর অনুসরণে বুঝতে পেরেছেন—ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের মুক্তি খুব অল্প সময়ে, কয়েকটি খুচরো সন্ত্রাসমূলক কাজের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়। তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন। (পরে দেখব, ক্রপটকিন রাশিয়া প্রসঙ্গে একই ধরনের কথা নিবেদিতাকে বলেছেন)। নিবেদিতা বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ছাড়লেন না, কিন্তু ছাড়লেন রাতারাতি সেরে ফেলার মনোভাবকে, যা ওকাকুরার তাগিদে করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং এই ২১ ডিসেম্বরের চিঠিতেই স্বামীজীর চিন্তার পুরো আনুগত্য ক'রে বললেন :

"আমি তীব্রভাবে অনুভব করি যে, নিগু-কে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তার উপর কোনোরকম দাবি যেন আমরা না রাখি।...আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের জন্য বাইরের কোনো সাহায্যের দরকার নেই।"

ওকাকুরার প্রস্থানের পরে তাঁর বিষয়ে নিবেদিতার মনোভাব প্রথমে উদাসীন, পরে কঠোর—কঠোরতর হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি, ১৯০৩, মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, তিনি যেন ওকাকুরাকে অনুভব করিয়ে দেন, "আমাদের ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব সাফল্যের উপর নির্ভর করে না।" ১৯ ফেব্রুয়ারি লিখেছেন, ওকাকুরা জাপানে থেকে কাজ করলেই ভারতের বেশি উপকার করবেন। "এখানে থেকে কাজ করতে চাইলে তিনি উপকারের চেয়ে ক্ষতি করবেন বেশি।" কাছাকাছি সময়ে এই ধরনের কথা অনেকবার বলেছেন। নানা কারণে জাপানে যেতে পারছেন না, একথাও নিবেদিতা অনেকবার বলেছেন। ৯ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে, ওকাকুরা জাপানে ভারতীয় ছাত্রদের কিভাবে সাহায্য করতে পারেন, তার ইঙ্গিত আছে। সদানন্দ ১৯০৩-এর শেষের দিকে কয়েক মাসের জন্য জাপানে যান; সেখানে তিনি নিজস্বভাবে সংযোগ স্থাপন করেন, যার সঙ্গে ওকাকুরার সম্পর্ক ছিল না। ৭ জানুয়ারি ১৯০৪, চিঠিতে ওকাকুরার সম্বন্ধে নিবেদিতার মন্তব্য উৎসাহহীন। ৩ ফেব্রুয়ারি চিঠিতে নিবেদিতা বললেন, ওকাকুরা যা করবেন বলেছিলেন তা করেন নি। ৩ মার্চের চিঠিতে ইঙ্গিত আছে, ওকাকুরা বিষয়ে নিবেদিতার পরিবর্তিত মত সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউড অবহিত। এই চিঠিতে রুশ-জাপান যুদ্ধের কথা আছে, জাপানের প্রতি ভারতবাসীর সহানুভূতি সত্ত্বেও বাস্তব সাহায্য যে করা সম্ভব নয়, নিবেদিতা জানিয়েছেন। "হাঁ, নিশ্চয়, যুদ্ধ আমাদেরও", নিবেদিতা লিখেছিলেন। "ভারতের হাটে-বাজারেও যুদ্ধের কথা জানা। জাপানীরা পীড়িত ও আহতদের জন্য টাকা চায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ [অর্থ-সংগ্রহের] ঐ কাজ আমি গ্রহণ করতে পারব বলে মনে করি না। তবে আমার ইচ্ছা, ভারত কিছু পাঠাক। টোকিও থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞ, কেননা সেই সূত্রে ও-দেশের জন্য আমাদের বিশেষ সহানুভূতির কথা জানানো সম্ভব হয়েছে।" জাপানের সপক্ষে তৎকালীন ভারতীয় ভাবাবেগ এবং ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার পূর্বতন রাজনৈতিক সহযোগিতার পটভূমিকায় উদ্ধৃত কথাগুলি উৎসাহহীন, তাতে সন্দেহ নেই।২৭ কয়েকদিন

---

২৭ সরলা দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি জাপানে রেডক্রশ দল পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। "বাঙালীদের মনুষ্যত্বের পথে আর এক ডিগ্রি ওঠানোর জন্য এই সুযোগটা গ্রহণ-পরায়ণ হলুম। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞপ্তি দিলুম. ইংরেজদের রেডক্রশের মতো বাঙালীদেরও একটা রেডক্রশ দল গঠনের জন্য আমি সচেষ্ট—জাপানের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের সেবার জন্য।" ['ঝরাপাতা', ১৪৬]

নিবেদিতার চিঠি থেকে বোঝা যায়, এঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্যে এগিয়ে যাননি—ওকাকুরা প্রভৃতির অনুরোধ এসেছিল। যাইহোক, সরলাদেবীর লেখা থেকে দেখি, রেডক্রশ পাঠানোর ব্যাপারে উৎসাহ তাঁকে দমন করতে হয়েছিল, কারণ তিনি সহসা অবগত হন যে, যুদ্ধে রেডক্রশ পাঠাতে হলে কিছু ট্রেনিং-এর দরকার হয়। তাছাড়া জাপান সরকার অল্পদিনের মধ্যে জানিয়ে দেন, তাঁদের পক্ষে বিদেশের সহানুভূতিই যথেষ্ট—তাঁরা স্বদেশে সাহায্যকারী বিদেশী চান না। এর পরিষ্কার অর্থ—তাঁরা বিদেশে নানা প্রয়োজনে স্বদেশীয় মানুষদের পাঠাতে রাজি (বিদেশীদের রাজনৈতিক ব্যাপারে উস্কানি দেওয়া সুদ্ধ) কিন্তু স্বদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে সহানুভূতিকাতর বিদেশীদের প্রবেশ করতে দিতে পারেন না।

পরে, ১৭ মার্চ, নিবেদিতা স্পষ্টই লিখলেন, ওকাকুরাকে তিনি ভারতে একেবারেই চান না। "ছেলেদের কাছে শুনলাম, মিঃ ওকাকুরা ৯ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার উদ্দেশ্যে জাপান ত্যাগ করেছেন। আমি তোমাকে এইটুকু বলতে পারি, যদি তিনি ভারত হয়ে না ফেরেন তাহলে আমি খুবই খুশি হব। তাঁর [ভারতে] আগমনের অসচেতন তাৎপর্য খুব বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং যে-লক্ষ্যের জন্য তাঁর প্রয়াস তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাঁর সচেতন উদ্দেশ্য সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না, এবং সরলা ব্যাপারটাকে যেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছে তা দেখার পরে আমার পক্ষে আর পূর্বভূমিকা নেওয়া সম্ভব নয়।"

সরলা কোন্ ব্যাপারকে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা আমরা জানি না।

এর পরে আরও কিছু ঘটেছিল, বা নিবেদিতা আরও কিছু জানতে পেরেছিলেন, যার জন্য ওকাকুরা সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণার শেষ ছিল না। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫, মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন : "আমি নিশ্চয় জানি তুমি বুঝতে পারবে, আমাদের পরিচিত জাপানীদের কেউ যদি ইংলন্ডে উপস্থিত হয়ে মা, রিচ [ভাই] বা বিয়োট্রিসের [ভ্রাতৃবধূ] সঙ্গে দেখা করে, সেটা আমার কাছে অসহ্য ঠেকবে। ওটা একেবারে অসহ্য—আমাদের বাড়ির লোকজনদের ক্ষেত্রে, কিংবা আমার কোনো ঘনিষ্ঠজনের ক্ষেত্রে।"

নিবেদিতার স্নেহভাজন বিপ্লবী যুবক জি এন মুখার্জি বস্টনে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি যাতে পলাতক রুশ বিপ্লবীদের কাছে শিক্ষা নিতে পারেন, তার ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্য মিস ম্যাকলাউডকে ৩ অগস্টের চিঠিতে নিবেদিতা অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে লেখেন : "যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, সে [জি এন মুখার্জি] একটি বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি—সে জাপানী চরিত্রের ইনসিন্‌সিয়ারিটি জানে। এটা বড় ধরনের রক্ষাকবচ।"

স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, ওকাকুরা এইসময়ে বস্টনে আছেন।

১ মে, ১৯০৮, জাপানের দ্বারা ভারতের ক্ষতি সম্বন্ধে একটা অশুভ স্বপ্নের কথা বলে নিবেদিতা লিখেছেন : "ভারতের জন্য সর্বদা এই প্রার্থনা করো, ভালো বা মন্দ যে-কোনো ক্ষেত্রেই ভারত যেন স্বচ্ছদৃষ্টি বজায় রাখে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।" আমেরিকা যাবার পথে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৮, জাহাজে বসে তিনি লেখেন : "আমেরিকায় থাকাকালে অতীব অতীব সাবধানে থাকব মনস্থ করেছি। ওখানে আমি একটি লোকের সঙ্গে দেখা করতে চাইব না, বৎসরের পর বৎসর যে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।"

শেষের দিকে নিবেদিতা কেন ওকাকুরা সম্বন্ধে এই ধরনের কটু মনোভাব পোষণ করেছিলেন, তার রাজনৈতিক কারণ আমরা র‍্যাটক্লিফের উক্তি থেকে পাই। কথাগুলি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা পাঠকের আছে। এখানে স্মরণ করিয়ে দেব, রবীন্দ্রনাথ-সহ ঠাকুর-পরিবারের অনেকের মধ্যে ওকাকুরা সম্বন্ধে দারুণ শ্রদ্ধা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। অধিকন্তু স্মরণ করানো যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিবেদিতার মতো পরিপক্ব বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের ছিল না ; সেসব ব্যাপারে অবিশ্বাস্যরকম সরলতা তিনি দেখিয়েছেন। যাইহোক র‍্যাটক্লিফ—জা এব্রু ও লিজেল রেম-কে ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭, সাক্ষাৎকারে বলেন :

> "July 1902,..She [Nivedita] was just getting over [sic] great admirer for him [Okakura]. She thought the real leadership of Asia would lie with Japs.

"In '04-'05, I can't remember her speaking of the Russo-Jap. war.

"She flinted with the idea of Jap assistance to Indian nationalism. She thought Okakura was a Jap agent.

"There were many [Japs], very active, studying administration, agriculture, . .etc. She felt it was political espionage.

"The Japs in Korea outraged N. and turned the mind of every Indian against Japs." ২৮

ওকাকুরা যে, জাপানের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিবেদিতার সাহায্যে 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' বই তৈরী করেছিলেন, তা নিবেদিতা পরে বুঝতে পারেন। ১ মে ১৯০৮, নিবেদিতা লেখেন : "যদি আমি বইটির আসল তাৎপর্য কি, তা সে-সময়ে ভাবতে বা বুঝতে পারতাম, যা এখন আমি পারছি, তাহলে আমার সাহায্যের দান কদাপি প্রদত্ত হত না।"

কোনোই সন্দেহ নেই, 'আইডিয়ালস্' বইটি ভারতবর্ষের জনমতকে জাপানের বিশেষ পক্ষপাতী করেছিল। সেই কাজটিকে নিবেদিতা পরবর্তীকালে অবাঞ্ছিত মনে করেছিলেন, এবং বইটির রচনায় নিজ ভূমিকার কথা ভেবে অনুতাপ বোধ করেছেন।

বর্বর বলের দ্বারা জাপান কোরিয়াকে অধিকার করে। নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধিক্কারপূর্ণ মন্তব্য করেন। তার মধ্যে লেখেন :

"কোরিয়ায় কী দেখলাম!...অভিযান, লুণ্ঠন—নিষ্ঠুর, নিষ্প্রাণ, নিষ্করুণ রাহাজানি —যার তুল্য কিছু আমরা সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস রক্ত-জমা ইতিহাসেও ঘটেছে কিনা স্মরণ করতে পারি না।...ছাগশিশুর জন্য নেকড়ের মনেও এর তুলনায় বেশি করুণা থাকে, বাঘিনীর বুকে ক্ষুধার্ত শাবকের জন্য থাকে বেশি সহানুভূতি।" নিবেদিতা ব্যঙ্গ করে বললেন : "এখানে তো দেখতেই পাচ্ছি, এশিয়ার দেশগুলির জন্য জাপানের হৃদয়ের চেহারা!" (এটা নিবেদিতার পক্ষে আত্মব্যঙ্গও বটে, কারণ তিনিই তো ওকাকুরার বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "Asia, the Great Mother, is for ever One.")২৯

---

২৮ রেমঁ-সংগ্রহে রক্ষিত নোট, জ্যা এর্ব্র-র হস্তাক্ষরে।

২৯ NCW, V, 243.

কাছাকাছি সময়ে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় জাপান ও কোরিয়া সম্বন্ধে কিছু নোট ভাষাভঙ্গিতে নিবেদিতার বলে অনুমান করি। যেমন ১৯১০ অক্টোবর সংখ্যায় "জাপান অ্যান্ড কোরিয়া" নোটটি সহজেই নিবেদিতার হতে পারে, যার সূচনার কয়েকটি লাইন এই :

"Japan has extinguished the independence of Korea. She wishes to do more. She wants the Koreans and the world at large to forget that there ever was such a name as Korea denoting an independent country and people. But though others may forget the Koreans will not. . . ."

এপ্রিল, ১৯০৯, মডার্ন রিভিউ-এ "ইন্দো-আমেরিকান" লিখিত *Why Japan is Coming to be Disliked* নামক রচনার শেষে জাপানকে "প্রাচ্যবাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক" বলা হয়। ওকাকুরার গ্রন্থে প্রচারিত উক্তির খণ্ডনে লেখা হয় :

"Japan certainly was not inspired by Asia for Asiatics sentiment when it

ভারতের দিকে জাপানের প্রসারিত লুব্ধ হস্ত সম্বন্ধে নিবেদিতা ১৪ অক্টোবর ১৯১০ লিখেছেন : "আর জাপান—ক্ষুধার্ত তার চেহারা।" ১৬ অগাস্ট ১৯১১-তে লিখেছেন : "ইংলণ্ড থেকে জার্মানী। আরেকটি জাপান। জ্বলন্ত কটাহ থেকে সোজা আগুনে—যেন জেদের বশে।"

॥ ১০ ॥ ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থ ওকাকুরা-নিবেদিতার যৌথ সৃষ্টি : এ-সম্পর্কে নিবেদিতার পত্রে তথ্য : 'আইডিয়ালস্' গ্রন্থের প্রভূত প্রভাব

নিবেদিতার ১৯০৫ পর্যন্ত রাজনৈতিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল দুটি গ্রন্থ, জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লববাদী মহলে তাদের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল : "কালী দি মাদার" এবং "আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট"। এই পর্বের শেষের দিকে তিনি আর এক প্রবল প্রভাবশালী বই লেখেন, "দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ," যার আলোচনা পরে করব। "কালী" বইটি যদিও "আইডিয়ালস্" বইয়ের আগেই বেরোয় তবু ওকাকুরার নামে প্রচলিত এই বইটির আলোচনা ওকাকুরা প্রসঙ্গেই সেরে নেওয়া ভাল।

হাঁ, আইডিয়ালস্ বইটি ওকাকুরার নামে প্রচলিত—এই কথা বলাই উচিত, কারণ বিভিন্ন স্মৃতিকথার সংবাদের সঙ্গে নিবেদিতার চিঠির সংবাদকে যোগ করলে, খুব সংযত ভাষাতেও বলতে হয়—এই গ্রন্থের যুগ্ম লেখক। ওকাকুরার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত সরলা-দেবী যদিও পরবর্তীকালে (সব জেনেও?) বইটির গোটা গৌরব ওকাকুরার উপর অর্পণ করেছেন, ৩০ কিন্তু সমকালীন অন্য তথ্যাভিজ্ঞরা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাই বলেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দী, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

---

agreed to that clause in its treaty with the English, where in it promised to assist England in case of an emergency in Hindostan."

এই লেখাটির রচনারীতি অবশ্য নিবেদিতার নয়।

নিবেদিতা ওকাকুরাকে একই সঙ্গে বৃটিশ রাজের শত্রু এবং জাপানের রাজতন্ত্রের সমর্থকরূপে দেখেছেন। ২৪ জুলাই, ১৯০২, এ সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউডকে কী লিখেছিলেন আগেই দেখেছি।

ওকাকুরার "অ্যাওকেনিং অব জাপান" গ্রন্থের ১৯২২ সংস্করণের প্রকাশক তাঁর মুখবন্ধে বলেছেন ·

"The author....declares that there is no *Yellow Peril*, and the empire, though warlike, stands not for aggression but for peace."

৩০ "জীবনের ঝরাপাতায়" সরলাদেবী লিখেছেন :

"তাঁর [ওকাকুরার] একখানি প্রসিদ্ধ বই কলিকাতায় বসেই লেখা, মিসেস ওলে বুল ও মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে এবং নিবেদিতার টাইপিং-এ। তাঁর বইয়ের আরম্ভের সেনটেন্স—*Asia is One;* তার শেষ সেনটেন্স—*Victory from within or death from without.* তাঁর বইয়ের অন্তর্গত ভাব ও বাণী বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত মুখে-মুখে প্রচার হতে লাগল, লাজপত রায় প্রমুখ দেশভক্তের লেখনীতে প্রতিফলিত হতে লাগল।"

সরলাদেবী যদি সবকিছু জেনেও উপরের অংশ লিখে থাকেন তাহলে তিনি অর্ধসত্যের কারবারী। নিবেদিতা কেবল বইটি টাইপ করেছিলেন—এর থেকে চতুর মিথ্যা আর কি হতে পারে? দেশে কি আর কোনো টাইপিস্ট ছিল না যে, নিবেদিতাকে তাঁর অতিব্যস্ত সময়ের একটা বড় অংশ উক্ত মহা-কার্যে দান করতে হবে!! নাকি, টাইপিস্টকে দেবার মতো পয়সার অভাব হয়েছিল—সরলা ও সুরেনের

ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "ওকাকুরা ইংরেজি বেশি জানতেন না ; কিন্তু দেখা গেল, তিনি বৃহত্তর এশিয়ার সংস্কৃতি-সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। এটি ভগিনী নিবেদিতা পুনর্লিখন করেন—আমাকে তিনি তাই বলেছেন।...বইটির নাম 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট'। পুস্তকটি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের বুদ্ধিজীবী-মহলে সাড়া পড়ে যায়। এমন কথা ওঠে যে, তিনি [ওকাকুরা] পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য এক প্যান-এশীয় আদর্শ প্রচারে ব্রতী। তিনি নাকি বালগঙ্গাধর তিলক ও অন্যান্যদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করেন।"৩১

ওকাকুরা যে তিলক প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, সে বিষয়ে তিলকের মরাঠা কাগজের সংবাদ কিছু পরেই দেব।

ভূপেন্দ্রনাথ "দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম" গ্রন্থেও নিবেদিতা কর্তৃক ওকাকুরার বই সংশোধনের কথা বলেছেন। আগেই তা উদ্ধৃত করেছি।

ইন্দ্রনাথ নন্দী লিখেছেন : "জাপানী ওকাকুরা 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' পুস্তকের প্রতিপাদ্য তথ্যগুলি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ভগিনী নিবেদিতাকে দেন। তাহাতে নিবেদিতা উক্ত পুস্তক লেখেন। ফলতঃ ইহা নিবেদিতার লিখিত পুস্তক। ওকাকুরা ইংরাজি কম জানিতেন।"৩২

স্বদেশী যুগের গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে [পৃঃ ২৮৭] লিখেছেন : "ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট'...[সম্বন্ধে] একজন ইংরাজ [Mr Murray] বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, একজন জাপানী ভদ্রলোক ইংরাজি ভাষায় এমন গ্রন্থ লিখিলেন কি করিয়া। আমরা কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার হাতের চিহ্ন এই গ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছি। শুধু ভাবের ঐক্য নয়, ভাষারও মিল আছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে মিঃ ওকাকুরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছেন।"

চিন্তাশীল ভারতীয়দের উপরে বইটির প্রভাবের স্বীকৃতি আমরা নানা সূত্র থেকেই পাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ টোকিও-তে ১৫ মে, ১৯২৯ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"The voice of the East came from him [Okakura] to our young men...One of the influences which acted towards the awaken-

---

মতো ধনী পৃষ্ঠপোষক থাকতেও !!! আমরা দেখি, সরলা রাজনৈতিক কারণে নিবেদিতার প্রতি তাঁর বিদ্বেষকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কিংবা হয়ত এমন হয়েছিল যে, মণ্ডলীর মধ্যে থেকেও সরলা প্রায়-কিছু না দেখবার বা জানবার কুম্ভকযোগে ছিলেন? নচেৎ তিনি কিভাবে লিখলেন, "ওকাকুরা, স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা মিসেস ওলে বুলের বন্ধু"? মিসেস বুলের সঙ্গে ওকাকুরার বন্ধুত্বের কথা অস্বীকার না করেও বলতে হবে—ওকাকুরা বিশেষভাবে মিস ম্যাকলাউডেরই বন্ধু। আবার সরলা-কথিত মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের তত্ত্বাবধানে ওকাকুরার বই লেখা ব্যাপারটি মানে কি? ওকাকুরা কি বালক যে, তত্ত্বাবধান করিয়ে তাঁকে বই লেখাতে হবে? 'আইডিয়ালস্' বইটির ভাষা ইত্যাদির উপর নিবেদিতার দাবি খণ্ডন করবার জন্যই বোধহয় সরলা ওকাকুরার পরিচয় প্রসঙ্গে ক্যাজুয়ালি বলেছেন :. "তিনি আমেরিকায় কিছুকাল অবস্থিত ও ইংরাজি-শিক্ষিত একজন বিশিষ্ট লেখক।"

৩১ পেট্রিয়ট প্রফেট', ১১৬-১৭।
৩২ ভূপেন্দ্রনাথের "দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম" গ্রন্থে উদ্ধৃত।

ing of spirit in Bengal flowed from the heart of that great man, Okakura."৩৩

বইটির বিষয়ে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং শিল্পতাত্ত্বিক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও সি গাঙ্গুলী)। অর্ধেন্দ্রকুমার তাঁর "ভারতের শিল্প ও আমার কথা" গ্রন্থে বলেছেন :

"'আইডিয়ালস্' গ্রন্থখানি লিখতে ওকাকুরাকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং তিনি একটি অপূর্ব ভূমিকা লিখে দিয়ে বইখানির মূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। ১৯০৪ [১৯০৩] সালে বিলাতের জন মারে কোম্পানী যখন নিবেদিতার লিখিত ভূমিকাসহ বইখানি প্রকাশ করলেন তখন সারা ইউরোপ ও ভারতে একটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তখন আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বইখানি বারবার পড়ে অনেক অংশ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। এখনও সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, ডঃ কালিদাস নাগ ও আমি অনেক সময় এই বইখানি থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করি নানা কথায় ও আলোচনায়।...আমার সঙ্গে ওকাকুরার প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল সুরেন ঠাকুরের বাড়িতেই।...[ওঁদের] উপরের ঘরে বসে নানা কথাবার্তা আলোচনা হল অনেকক্ষণ ধরে। খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারতেন না তিনি। তবু অনেক কথা হয়েছিল সেদিন।"৩৪

বইটির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে দু'একটি সমকালীন সাক্ষ্যের উল্লেখ করতে পারি। বইটি প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিলক-গোষ্ঠীর 'মরাঠা' কাগজে এপ্রিল, ১৯০৩, সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় বেরোয়। তার মধ্যে পাই : ওর আট মাস আগে ওকাকুরা জাপানের হিন্দু-বৌদ্ধ সম্মেলনে প্রতিনিধি সংগ্রহের জন্য পুনায় এসেছিলেন। (অন্য কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, সেকথা ছাপার অক্ষরে তখন নিশ্চয় বলা সম্ভব ছিল না)। ওকাকুরার ব্যক্তিত্ব কিন্তু তিলক প্রভৃতিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ওকাকুরা কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে ইংরেজি বলেছেন, নিজের বক্তব্য বোধগম্য করাতে পারেন নি। এতৎসত্ত্বেও ওঁর বই থেকে দেখা যাচ্ছে, মরাঠা লিখল, উনি প্রথমশ্রেণীর ইংরেজি লেখক, এবং ওঁর মন গভীর দেশপ্রেমে পূর্ণ। সম্পাদক বইটির মূল্য সম্বন্ধে বলেন, যদিও ওকাকুরাদের আকাঙ্ক্ষিত জাপানের হিন্দু-বৌদ্ধ সম্মেলন হয়নি কিন্তু তার উদ্দেশ্য বইটির দ্বারা সাধিত হয়েছে। কারণ আর কখনো ভারতবাসীর কাছে ভারত সম্বন্ধে জাপানের মনের গভীর কথা এভাবে প্রকাশিত হয়নি। বইটির মূল বক্তব্য

---

৩৩ রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪১।

৩৪ বিনয়কুমার সরকার লিখেছেন :

"Among the formative forces of young India (1904-10) nothing can be described as having been more constructive and solid than the Japanese artist Kakasu Okakura's two books, *Ideals of the East* and *The Awakening of Japan*. Okakura may even be regarded as perhaps the greatest single foreign influence in the life and thought of Indian intellectuals during the Swadeshi period in the first phases. Japan has taught India great lessons during the generation commencing with the Russo-Japanese War (1904). India's admiration for Japanese industry, efficiency and diplomacy has grown from more to more all the time." [Benoy Kumar Sarkar, *World Culture in India Today*, 'Prabuddha Bharata', January 1936, 10-11]

সংক্ষেপে উল্লেখ করার পরে সম্পাদক বলেছিলেন, বইটিকে বিশ্বসমাজে পরিচায়িত করার দায়িত্ব যে, ভগিনী নিবেদিতা নিয়েছেন, সেটা অতীব উপযুক্ত ব্যাপার হয়েছে। তিনিই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির লোকজনের সঙ্গে ওকাকুরার যথার্থ পরিচয় সাধন করিয়েছেন।৩৫

"রেভারেণ্ড সি এফ এণ্ডরুজ অব দি কেম্ব্রিজ মিশন টু ডেল্‌হি" (তখনো 'ভারত-বন্ধু' নন) প্রচলিত মিশনারি রীতিতে বইটির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, এই বইয়ের বক্তব্য ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর দাঁড়িয়েছে। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের কয়েকটি বিজয় ভারতে কি দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, এবং জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, এণ্ডরুজ তার বিবরণ দেন : "উত্তর ভারতের শিক্ষিত মানুষের উপরে জাপানের বিজয়ের ফল মুহূর্তে *চাঞ্চল্যকর। আমাদের এখানের সকল শহরের উপর দিয়ে উন্মাদনার স্রোত* বয়ে গেছে, যা নতুন ধরনের আশা ও আদর্শ জাগিয়েছে। প্রাচীন এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, সিপাহী বিদ্রোহের পরে এর মতো আর কিছু ঘটেনি।" এণ্ডরুজ অবশ্য ব্যাপারটাকে ভয়াবহ সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চাননি, এবং ঐকালে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার কিভাবে ভারতবর্ষকে আলোড়িত করছিল তার উল্লেখ করেন *নি, কিন্তু এ সংবাদ জানিয়েছেন,* "যেসব ছাত্র আগে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ যেতে উৎসুক ছিল, তারা এখন টোকিও যেতে ব্যস্ত, কেউ-কেউ ইতিমধ্যে যাত্রা করে ফেলেছে।" এণ্ডরুজের কাছে সবচেয়ে মারাত্মক ঠেকেছিল ভারতীয় খ্রীস্টান মহলের চিন্তা-বিদ্রোহ। মিশন কলেজের এক ভারতীয় খ্রীস্টান অধ্যাপকের বক্তৃতার অনেকখানি অংশ তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন, যার মধ্যে দেখা যায়, উক্ত অধ্যাপক *বলছেন,* অতীতে ভারতের *মানুষ ধর্ম-দর্শনের চিন্তায়* অন্তর্মগ্ন জীবন যাপন করার জন্য ঐহিক ব্যাপারে বেশি নজর দেয়নি, তাই "বর্বর শক্তির

---

৩৫ "When Mr Okakura visited Poona eight months ago, *he came as a* man about whose personality previous little was known. He looked like a typical son of Japan. He could but speak English with some difficulty and thus could not possibly make on those who met an impression that could *do him justice.*" "Never before has a Native of India had such an opportunity to know the inner sentiments of Japan towards this country as the one now afforded by Mr Okakura by means of his book, *The Ideals of the East*, with special reference to the Art of Japan." "A perusal of the book at once convinces one that Mr Okakura is a high class writer of the English language." "The central idea of Mr Okakura's book is that there *existed in very ancient times* a common Asiatic art....India, China and Japan are the three trustees on whom the sacred work of the preservation of Asiatic ideals devolves, and Mr Okakura *attempts to trace the exchange transactions in art and spirituality* which the three Asiatic nations have entered into from times out of memory which.....afford a convenient sound basis for common action to be taken by them all..... *The combination of the three nations is not a new or imaginative* ideal. But it is a fact of history." "To complete the conditions of the fitness of things, the book is introduced to the world by Sister Nivedita of *Ramakrishna-Vivekananda.*" "It was *reserved for Sister Nivedita to make the* people of this Presidency better acquainted with Mr Okakura." [*Mahratha,* April 1903].

শিকার হয়েছিল।" মধ্য এশিয়া থেকে আগত বর্বর জাতিগুলি এশিয়াবাসী ছিল বলে পরে ভারতীয় হয়ে যায়, কিন্তু পশ্চিমী আক্রমণকারীরা এসেছে উচ্চতর যান্ত্রিক শক্তি নিয়ে "আর সেখানেই আছে সত্যকার বিপদ। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ইহবাদী কার্য ও দর্শনের দিকটি আক্রমণকারী ও ধ্বংসকারী।...অধিকন্তু তা নীতিসংকোচশূন্য।" উক্ত ভারতীয় খ্রীস্টান অধ্যাপক ইউরোপীয় দেশসমূহের বিবেকহীন জোটবদ্ধতা এবং প্রাচ্য দেশগুলির উপর তাদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে বলেন— এর নাম, *Real White Peril*। তিনি আরও বলেন, "ঐসব ঘটনা জ্বলন্ত লৌহদণ্ডের মতো প্রাচ্যবাসীর বুকে পুড়িয়ে ঢুকেছে।" "কিন্তু এখন জাপানের বিজয় পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্রাচ্যদেশ মুমূর্ষু জাতিসমূহের শ্মশানভূমি নয় ; এশিয়া বহু শতাব্দীর নিদ্রার পর আবার জেগে উঠছে।"

এইসমস্ত বিপজ্জনক সংবাদ পরিবেশন করার পরে এণ্ডরুজ লেখেন : "জাপানের বিজয়-দ্বারা হিন্দু রক্ষণশীলতা দারুণ শক্তি পেয়েছে। তারা মনে করছে, পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এমনকি যুদ্ধের যান্ত্রিক নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে—জাপান ইউরোপীয় অস্ত্র দিয়েই ইউরোপীয়দের হারিয়েছে। এখন জাপানের নেতৃত্ব অনুসরণ ক'রে অন্য প্রাচ্য দেশগুলির এগিয়ে আসার অপেক্ষা কেবল। তা হলে আবার দেখা যাবে—এশিয়া ঐক্যবদ্ধ।"

এই পটভূমিকায় ওকাকুরার বই প্রসঙ্গে এণ্ডরুজের বক্তব্য :

"ভারত তার অধ্যাত্ম রত্নভাণ্ডার থেকে চিন্তারত্ন সরবরাহ করবে, চীন দেবে নীতিবাদ, জাপান দেবে কলাশিল্প।...ভারতের এই রেনেসাঁসের ভাবাদর্শ, তৎসহ এশিয়ার ঐক্যবিধান সম্পর্কেই আবেদন অনবদ্য জাপানী লেখক কাকাসু ওকাকুরার দুটি বই—'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' এবং 'অ্যাওকেনিং অব জাপান'-এর বিষয়বস্তুর ভিত্তি। বইদুটি ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে পঠিত ও অনুশীলিত হচ্ছে।"

এণ্ডরুজ বইটি থেকে অতঃপর যে-একটি বৃহৎ অংশ উদ্ধৃত করেছেন, সেটিতে নিবেদিতার ভাষা ও চিন্তার স্পষ্ট মুদ্রণ। তারপর এণ্ডরুজ নিবেদিতার লেখা বইটির ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেন :

"প্রাচ্য ইতিহাস ও এশিয়ার ঐক্য বিষয়ে এইসকল ধারণা ভারতীয় পাঠকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'—ওকাকুরার প্রথম বইটির ভূমিকা লিখে। বাগবাজার-নিবাসিনী এই পাশ্চাত্য মহিলা ঐতিহাসিক খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ ক'রে বস্তুতঃপক্ষে হিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। খ্রীস্টানদের কাণে এঁর কথাগুলি আপত্তিকর ঠেকবে। আমি সেগুলি উদ্ধৃত করছি কারণ বর্তমান সময়ে পরিষ্কারভাবে জানা খুবই প্রয়োজনীয়, ভারতে সহসা কোন্ ধরনের ভাবের প্রচার চলছে।"

এণ্ডরুজ নিবেদিতার ভূমিকার সেই অংশ উদ্ধৃত করেন, যার মধ্যে পাশ্চাত্যদেশে বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারের কথা ছিল—বিজিত ভারতবর্ষের ধর্মসংস্কৃতি বিজয়ী জাতিসমূহকে আচ্ছন্ন করতে পারে—সেই সম্ভাবনার কথা। এসব কথা এণ্ডরুজের কাছে "দুর্ভাগ্যজনক", "গালভরা", এবং "অনৈতিহাসিক সরলীকরণ।" তথাপি সেগুলি মারাত্মক, যেহেতু "তারা ভারতীয় ছাত্রদের প্রাণবায়ুতুল্য ; যে-সব ছাত্র এখনো স্বপ্ন-জগতে,...যারা কঠিন বাস্তব তথ্য সম্বন্ধে নিরুৎসুক।"৩৬

৩৬ নিবেদিতার এই কথাগুলি এণ্ডরুজ তুলেছিলেন :

এমন যে প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ, লেখক হিসাবে তার গৌরব ওকাকুরা পেয়ে এলেও, সেটা তাঁর পুরো প্রাপ্য নয়, সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, 'আইডিয়ালস্' বইটিকে তিনি নিজের বই বলে মনে করেছিলেন। তিনি কেবল এর ভাষারূপ নির্মাণ করেন নি—এর চিন্তাধারার মধ্যে উচ্চ মনস্বিতার শক্তিকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। জাপান ও চীনের শিল্প সম্বন্ধীয় বক্তব্য নিশ্চয় ওকাকুরার নিজস্ব—কিন্তু সেই বক্তব্যের সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার প্রাণবাণীকে যুক্ত করা, এবং তাকে প্রাচ্যের নব-উত্থিত ও গতিশীল সাংস্কৃতিক অভিযানের ঘোষণাপত্র করে তোলা—নিবেদিতারই বিশেষ দান। আবার বইটির ভূমিকা লেখার সময়ে নিবেদিতা গ্রন্থমধ্যে নিজের যেসব কথা ঢুকিয়েছেন (যা আবার বহুলাংশে স্বামীজীর কথাও), সেগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন।

"Within the last ten years, by the genius of a wandering monk—Swami Vivekananda—orthodox Hinduism has again become aggressive as in the Asokan period. For six or seven years past it has been sending missionaries into Europe and America... It would almost seem as if it were the destiny of Imperial peoples to be conquered in turn by the religious ideas of their subjects. 'As the creed of the down-trodden Jew has held half the earth during eighteen centuries, so', to quote the great Indian thinker just mentioned, 'it seems not unlikely that that of the despised Hindu may yet dominate the world.' In some such event is the hope of Northern Asia. The process that took thousand years at the beginning of our era may now, with the aid of steam and electricity, repeat itself in a few decades and the world may again witness the Indianising of the East... The author [of the *Ideals of the East*] has talked in vain if he has not conclusively proved that Asia, the Great Mother, is for ever one."

এন্ডরুজের প্রবন্ধটি বেরোয় 'দি ইস্ট অ্যান্ড দি ওয়েস্ট' নামক কোয়ার্টারলি পত্রিকায়। তার থেকে সেটি হার্ভেস্ট ফিল্ড নামক মিশনারি পত্রিকার ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬ সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়।

রেভাঃ সি এফ এন্ডরুজ উদ্ধৃত অংশে যে-ভূমিকায় ছিলেন, সেখানে স্থির থাকবেন না, পরিবর্তিত হবেন ক্রমান্বয়ে। পরিবর্তনের মধ্যস্তরে কয়েক বৎসর পরেই তাঁকে তাঁর আক্রমণলক্ষ্য নিবেদিতার দেহত্যাগে একটি চমৎকার কবিতা লিখতে দেখব। কিন্তু ১৯০৮ সালেও এন্ডরুজ কেবল মিশনারি নন, বৃটিশ সরকারের কাছে সংবাদ-সরবরাহকারীর কাজ করছিলেন, তাও দেখা যায়। ১ মার্চ, ১৯০৮, এন্ডরুজ বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি স্যার জেমস ডানলপ স্মিথকে নিম্নের কথাগুলি লিখে পাঠান:

"There is a rapid Hinduising of 'national' ideas going on among the younger men.... The religious element becomes mingled with the political. The key to a great deal of what is happening is contained in a sentence in a recent Oxford Mission Report: 'Keshub Chandar Sen has ceased to be a national hero. Young Bengal is looking now to the ideals of Rama Krishna and Swami Vivekananda.' Our students are all reading cheap reprints of the latter's works, together with Bipin Chandra Pal's book 'The New Spirit' and Swami Abhedananda's 'India and Her People'." [*Servant of India: A Study of Imperial Rule: From 1905-1910: As Told Through the Correspondence and Diaries of Sir James Dunlop Smith, Private Secretary to the Viceroy.*]

নিবেদিতা 'আইডিয়ালস্' রচনায় সাহায্য করাকে তাঁর ভারত-ব্রতের অন্তর্গত কাজ মনে করেছিলেন। তবে বইটির সূচনাকালের সহায়তা যেহেতু মিস ম্যাকলাউডের, এবং পরেও তাঁর তত্ত্বাবধান ছিল তাই নিবেদিতা বইটিকে কখনো-কখনো ওকাকুরা ও মিস ম্যাকলাউড—উভয়ের সৃষ্টি বলেছেন। ১৬ জুলাই, ১৯০২ তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : "সেন্ট সারা [মিসেস বুল] সদা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তোমার পরবর্তী চিঠি বলে পাঠাবে—তোমার এবং নিগু-র বই প্রকাশের জন্য [জন মারে কর্তৃক] গৃহীত হয়েছে—লাভে আধাআধি।" ওকাকুরার ভারত-জীবনে মিস ম্যাকলাউডের অনন্য প্রভাবের কথা শ্রীমতী হোরিওকা অকুণ্ঠে লিখেছেন।৩৭ নিবেদিতা, মিসেস বুল, এবং মিস ম্যাকলাউড কিভাবে বইটির প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন, তার সংবাদ আছে নিবেদিতার ৭ জুন, ১৯০২, চিঠিতে। ২ জুলাইয়ের চিঠি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয়—নিবেদিতাই বইটির রচনা-রীতির জন্য আদ্যন্ত দায়ী। মিসেস বুলের চিঠি পড়ে নিবেদিতার মজা হয়েছিল—বইটির প্রকাশক মারে বইটির কিছু অংশের কঠোর সমালোচনা করেছেন। একে বইটির রচনারীতির বিরুদ্ধে (যা নিবেদিতারই কৃতি) সমালোচনা ধরে নিয়ে নিবেদিতা তীব্রভাবে লেখেন : "আমার হৃদয় চমকে স্থির। ভাবলাম—কী! রচনারীতি ওহেন ত্রুটিযুক্ত?" পরে অবশ্য ওকাকুরাকে লেখা মিসেস বুলের চিঠি থেকে নিবেদিতা বুঝতে পারেন—রচনারীতি নয়, বইটির অন্তর্গত কিছু 'আসল ছোরা' (অর্থাৎ রাজনৈতিক মাত্রা) সম্বন্ধেই মারে-র আপত্তি, তখন নিবেদিতা স্বস্তি পান। [একই চিঠি]। ১৬ জুলাইয়ের চিঠি থেকে জানা যায়,

---

৩৭ "যে বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্ব ওকাকুরাকে ভারতে আকর্ষণ করেছিল—তার নাম জোসেফিন ম্যাকলাউড। মিস ম্যাকলাউডের প্রচেষ্টা ভিন্ন ওকাকুরা তাঁর সহযাত্রী হয়ে ভারতে আসতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ওকাকুরার কখনই দেখাসাক্ষাৎ হত না। মিস ম্যাকলাউডের প্রয়াস ভিন্ন ওকাকুরার সঙ্গে সিস্টার নিবেদিতার সাক্ষাৎ হত না এবং 'আইডিয়ালস্' অব দি ইস্ট' প্রকাশিত হতও না।"

[*Okakura and Swami Vivekananda's Disciples*, Yasuko Horioka, *Prabhuddha Bharata*, March 1977, 118]

মিস ম্যাকলাউডই যে 'আইডিয়ালস্' গ্রন্থের প্রথম খসড়া করেন তার ইঙ্গিত শ্রীমতী হোরিওকার উপরের প্রবন্ধে পাই। তিনি ওকাকুরার পুত্র কাজুও ওকাকুরার রচনা অনুযায়ী জানিয়েছেন—১৯০১ মে-ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ওকাকুরা মিস ম্যাকলাউডকে শিল্প-পাঠ দিয়েছেন। শ্রীমতী হোরিওকা বলেন : "এই সকল বক্তৃতার কোনো পাণ্ডুলিপি বা নোট যদিও মেলে না, তথাপি খুব সম্ভবতঃ সেগুলি আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট বইয়ের অংশীভূত হয়েছে, বিশেষতঃ জাপানী শিল্প-অংশে।" এখানে এইটুকু বলতে পারি, শ্রীমতী হোরিওকার অনুমানের বস্তুভিত্তি আছে। ঐসব শিল্পবিষয়ক নোট সত্যই নেওয়া হয়েছিল, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ের নোটও, যেগুলি মিস ম্যাকলাউড তখন লন্ডনে অবস্থিত নিবেদিতার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে প্রমাণ আগেই দিয়েছি। রেম-সংগ্রহে মিস ম্যাকলাউডের শিল্প বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র নোটও আছে।

মিস ম্যাকলাউড ১৯৩৬ সালে শ্রীমতী রেমকে বলেছিলেন,

"Okakura dictated the *Ideals of the East* to Miss Macleod before he met Vivekananda. He dictated the *Book of Tea* in 269 Madison Avenue in 1903, after coming back from India." নিবেদিতা সন্দিগ্ধ হয়ে যখন ওকাকুরাকে বর্জন করেছেন, তখনো মিস ম্যাকলাউড যে তাঁকে বর্জন করেন নি তা নিবেদিতার ৩ মার্চ, ১৯০৪, চিঠি থেকে দেখা যায়।

মারে বইটি প্রকাশে রাজি, কিছু অংশ কেটে বাদ দিয়ে। ৭ অগস্টের চিঠিতে নিবেদিতা কর্তৃক বইটির ভূমিকা লেখার কথা। ১৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে নিবেদিতা অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন—মিসেস বুল বইটিতে ইচ্ছামতো কলম চালিয়েছেন বলে, যা "সুরসঙ্গতি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।" বাতিল অংশ পুনঃসংযোজন ক'রে নিবেদিতা দৃঢ়ভাবে লেখেন, "এরকম নিজের বুদ্ধি যেন কদাপি খাটানো না হয়।" বইটি ছাপা হয়ে যাওয়ার পরেও তার প্রকাশ বিলম্বিত হচ্ছে দেখে নিবেদিতা ৩ মার্চ, ১৯০৩, উদ্বিগ্নভাবে লেখেন : "শীঘ্র প্রকাশিত হলে এখানে এর বিরাট প্রচার হবে। না হলে কি হবে বলা যায় না।...এখনি বইটিকে আমরা চাই।" ওকাকুরার রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হবার পরেও নিবেদিতা ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪, লিখেছেন, "[ওকাকুরা যদিও] যা করবেন ভেবেছিলেন তা করেন নি, তবু তাঁর বইটির প্রয়োজন ছিল। এর গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে দাঁড়াবে। লোকটি [বইটির মধ্য দিয়ে] সেবা করেছেন—বিপুল সেবা করেছেন।" ১৭ মার্চ, ১৯০৪ চিঠিতেও নিবেদিতা বইটির মূল্যের কথা বলেছেন, এবং এই ধরনের গ্রন্থরচনার মতো নির্দিষ্ট কাজে তিনি ওকাকুরাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, তাও বলেছেন।

এস কে র‍্যাটক্লিফের পূর্বে-উদ্ধৃত উক্তি অনুযায়ী নিবেদিতা নাকি ওকাকুরাকে "পরবর্তীকালে" "অগভীর ও মনের জগতে অসাধু" বলে মনে করেছিলেন। (ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও একই ধরনের কথা বলেছেন৩৮)। কিন্তু নিবেদিতা "পূর্বেও" কি ওকাকুরার মনস্বিতার গভীরতা সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করেছেন? ওকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের আগে, যখন নিবেদিতা ওকাকুরার কিছু কিছু খসড়া লেখার সঙ্গে পরিচিত, তখন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০২, মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন, "আমি তাঁর জ্ঞান বা মর্যাদা বা অন্য কিছুর জন্য ব্যস্ত নই।" এখানে ঠিকভাবে বলা শক্ত নিবেদিতা কোন্ অর্থে কথাগুলি বলেছিলেন। তবে পরবর্তী ঘটনার আলোকে বলা যায়, মিস ম্যাকলাউড হয়ত নিবেদিতাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, ওকাকুরাকে বিরাট জ্ঞানী বলে দেখা যাবে না—নিবেদিতা তারই উত্তরে ঐকথা লিখেছিলেন। একথা ঠিক যে, নিবেদিতা 'আইডিয়ালস্' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, জাপানের কাছে ওকাকুরা "প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পের প্রধান জীবিত বিশেষজ্ঞ"—কিন্তু সে পরিচয়ের দ্বারা গভীর চিন্তাশীলতায় ওকাকুরার অধিকারকে নিবেদিতা স্বীকার করেছেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ভূমিকা-লেখক মূল গ্রন্থকারের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অতিকথন করে থাকেন, এও সাধারণ সত্য। আমরা লক্ষ্য করি, ওকাকুরার পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে 'আইডিয়ালস্'-এর তুল্য মনস্বিতা নেই, কারণ সেগুলিকে নিবেদিতা পুরো সংস্কার করবার সুযোগ পান নি। ঐসব বইয়ের মধ্যে আবার ওকাকুরার *Awakening of Japan* বইটির ভাষা স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা মিস ওয়ালডো সংশোধন ক'রে দিয়েছেন।৩৯

৩৮ ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, রেম'-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন:

"Great plan of Pan-Asiatic against foreign imperialism. Some big men gathered around Okakura and formed a club. Later on he was taken for a *humbug. (Questions of his conduct, tobacco and drinking etc)*. But he gave a great stimulus." [*Reymond Collection*]

৩৯ ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

ওকাকুরার *The Awakening of the East* বইটিও যে নিবেদিতা কিছুটা সংশোধন করেছিলেন, তা শ্রীমতী হোরিওকা জানিয়েছেন। বইটি অপ্রকাশিত অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পড়ে ১৯৩৯ সালে টোকিও থেকে বেরোয়। টোকিওতে "কিরিহারা কালেকশনে" ঐ বইটির যে-পাণ্ডুলিপি রক্ষিত, সেটি মজঃফরপুরে বি বি কলেজের সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসের ছাত্র রামরঞ্জন দে-মজুমদার কর্তৃক লিখিত (অর্থাৎ ওকাকুরার টুকরো নোট থেকে অন্যের দ্বারা প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি)—এবং তাতে নিবেদিতার সংশোধন আছে।৪০ আমার অনুরোধে শ্রীমতী হোরিওকা উক্ত পাণ্ডুলিপির ফটোকপি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বলরামানন্দের মারফত আমার কাছে উপহার পাঠিয়েছেন। পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায়, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিদারুণ অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে নানা ঝলসানো উক্তি আছে কিন্তু পূর্ব-গ্রন্থের বৌদ্ধিক দীপ্তি নেই। নিবেদিতার চিঠিতে বইটির উল্লেখ আছে। ২৫ জুলাই, ১৯০২, তিনি লেখেন : "আমি নিগু-র ছোটখাট দ্বিতীয় একটি বস্তু সংশোধন করছি।" ২৪ অগস্ট লেখেন : "নিগু-র দ্বিতীয় বইটির উল্লেখ—নহে নহে। সেটি আমাদের সকলকে জেলে পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট। একেবারে বেপরোয়া শিশু উনি। এখন নিজেও তা বুঝেছেন।"

যাইহোক বইটির প্রকাশ সম্ভব নয় বুঝেই নিবেদিতা বেশি-কিছু সংশোধন করেন নি, এবং লোকগ্রাহ্য হবার পক্ষে প্রয়োজনীয় চিন্তাসম্পদ তাতে যুক্ত করতে এগোন নি।

যে-ওকাকুরাকে কেউ স্বচ্ছন্দভাবে ইংরাজিতে কথা বলতে শোনেন নি, যাঁকে ধারাবাহিক কিছু ইংরাজিতে লিখতেও দেখা যায়নি, তিনি কিভাবে প্রথমশ্রেণীর ইংরাজিতে বই লিখে ফেললেন, এ প্রশ্ন অবিলম্বে উঠেছিল, এবং অনেকেই বইটির ভাব-ভাষায় নিবেদিতার হস্তক্ষেপের কথা জেনে ফেলেছিলেন। ব্যাপারটিকে চাপা দেবার জন্য 'আইডিয়ালস'-এর 'প্রিফ্যাটরি নোট'-এ এই কথাগুলি লেখা হয় :

"Mr Murray wishes to point out that this book is written in English by a native of Japan."

বই যেখানে ওকাকুরার নামে প্রকাশিত সেখানে আগবাড়িয়ে ঐ বিচিত্র কথাগুলি লেখা হল কেন? এবং ঐ কথাগুলি কি নিবেদিতা প্রভৃতির অজ্ঞাতে ওকাকুরার নির্দেশে বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়? এটাই কি নিবেদিতার কাছে 'ইনটেলেকচুয়াল ডিসঅনেস্টি' বলে মনে হয়েছিল?

আমরা পুনশ্চ দেখি, 'অ্যাওকেনিং অব জাপান' গ্রন্থের প্রকাশক বইটির ১৯২২ সংস্করণের মুখবন্ধে এই মিথ্যা কথাগুলি আবার লিখেছেন :

"It is proper to state that the present work, *like The Ideals of the East, is not a translation, but is written by its Japanese author originally in English.*"

অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

"Okakura's second book *Awakening of Japan* was corrected by Miss Waldo of New York. She herself told the writer about it." (*Patriot-Prophet*, 117).

৪০ Yasuko Horioka, *Okakura and Swami Vivekananda*, *Prabuddha Bharata*, March 1975, 142.

সপ্তম অধ্যায়

"কালী দি মাদার"

'আইডিয়ালস্' বইটি সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় বলাধান করেছিল কিন্তু নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' বই বিশেষভাবে বিপ্লবীদেরই মন্ত্রপুস্তক। বইটি কোন্ অবস্থায় কিভাবে লেখা হয় সে সম্বন্ধে আগেই সংবাদ দিয়েছি। [প্রথম খণ্ডের 'মৃত্যুরূপা কালী' অধ্যায়, ২৭১-৩৯০]। এখানে কেবল এর বৈপ্লবিক বাণী-অংশের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

স্বদেশী যুগে বাংলার মুখ্য বিপ্লবী নেতারূপে পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ এই বইটির প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি যখন বাংলায় বৈপ্লবিক কর্মে লিপ্ত হননি, মানসিক প্রস্তুতিপর্ব চলেছে, তখনি তাঁর কাছে বইটি পৌঁছয় এবং তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনা বোধ করেন। তিনি বলেছেন :

"I was very much enamoured at the time [when in Baroda] of her book, *Kali the Mother*."১

পুনশ্চ :

"I had read and admired her book *Kali the Mother*.' ২

আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন :

"তাঁর [নিবেদিতার] বই 'কালী দি মাদার' উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহ-মূলক, অহিংস নয়।"৩

'কালী দি মাদার' বই তো আপাততঃ কালীপূজার উচ্চ দার্শনিক ও কাব্যিক বিশ্লেষণ—তা কিভাবে বিদ্রোহমূলক বা সহিংস? বইটির পৃষ্ঠা ওল্টালেই উত্তর মেলে। গীতা যেমন নিষ্কাম কর্মবাদের দ্বারা বিপ্লবীদের উদ্দীপিত করেছে, তেমনিভাবে কালী-দর্শনের অন্তর্নিহিত 'মৃত্যুদর্শন'ও বিপ্লবীদের সুগভীর প্রেরণার কারণ—আর তাকেই নিবেদিতা এগিয়ে দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের কাছে—সে দর্শন তিনি শিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। বিবেকানন্দের মৃত্যুদর্শনের রূপ আগে অল্পবিস্তর দেখেছি। 'কালী' গ্রন্থের 'ভয়েস অব দি মাদার' অধ্যায়টি নিবেদিতার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুরোপুরি স্বামীজীর উক্তি-সংকলন।৪ শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবত এই অধ্যায়টিকেই বলেছেন, বৈপ্লবিক। অনুবাদে তার কিছু অংশ :

---

১ *Sri Aurobindo on Himself*, 97.

২ *Ibid*, 115-16.

৩ 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা', (নীরদবরণ), ২৬৮।

৪ "From him [Swamiji] was gathered, in such moments as these, *almost every line and syllable of a certain short psalm, called the* 'Voice of the Mother', which I wrote and published about this time". [*NCW*, Vol I, 116]

"ওঠো বৎস, জাগো! বেরিয়ে পড়ো বীরের মতো। বহন করো দায় পুরুষের মতো। করণীয় কাজ সমাধা করো পূর্ণ শক্তিতে, নির্ভয়ে। ভুলো না—আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে—আমি তোমার মাতা।

"জীবন বিমর্ষ কিছু নয়। নিয়তি তোমার মায়ের খেলা ছাড়া আর কি। এসো, আমার সঙ্গে খেলো খানিক। যাই ঘটুক, স্ফূর্তিতে তার মুখোমুখি হও।

"উদ্দেশ্যের ভাবনায় উৎকণ্ঠিত তুমি? ভাবছ, যে-বলগুলি নিয়ে মা খেলছেন, তাদেরই বা প্রয়োজন কি? জানো না কি—মায়ের খেলনার নামে বজ্র, পৃথিবী গুঁড়িয়ে দেবার শক্তি তাতে আছে—হাতের এক মোচড়ে ছুঁড়ে দিলেই হল। পরিকল্পনার কথা শুধিয়ো না—জ্যা-মুক্ত তীরের কোনো পরিকল্পনা থাকে? তুমি সেই তীর। জীবন যাপন করো, তাহলেই পরিকল্পনা উন্মোচিত হবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, হে মহাকালের সন্তানেরা, কিছু জানতে চেয়ো না।

"অভ্রান্ত আমার খেলা। এ খেলায় যোগ দিতে দিনের যাত্রা শুরু করো। ভেবে নাও—আমার খুশির জন্য এ-পৃথিবীতে তুমি এসেছ। যখন রাত্রি ঘনাবে, চরিতার্থ হবে আমার আকাঙ্ক্ষা, তখন তারই খুশির টানে তোমাকে ফিরিয়ে নেব আমারই বিশ্রামে। প্রশ্ন করো না, সন্ধান করো না, পরিকল্পনা করো না। আমার ইচ্ছা প্রবাহিত হোক তোমার মধ্যে—যেমন শঙ্খের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্র।

"এইটুকু কেবল বুঝে নাও—কোনো পদক্ষেপ ব্যর্থ হবে না, একটি চেষ্টাও বিফলে যাবে না পরিণতিতে। কর্ম থেকে জন্ম হোক স্বপ্ন। এখানে-ওখানে তুচ্ছ কারণে ঘুরবে-ফিরবে তুমি, কিন্তু তোমার সকল গতায়াত শেষপর্যন্ত বিরাট পরিণতির সহায়ক হবে। তুমি অনেকের সাক্ষাৎ পাবে, কথাও বলবে তাদের সঙ্গে, কিন্তু জেনো, কেবল কয়েকজনই শুরু থেকে আমার; তাদের সঙ্গে গোপন সংকেত বিনিময় করবে, আর তারা অনুসরণ করবে তোমাকে।

"কী সে সংকেত?

"যারা আমার—তাদের হৃদয়ে লালসায় কালীর বলিদানের খড়্গ। মাতার খড়্গ-অবতারের তারা আজন্ম উপাসক। তারা মৃত্যুপ্রেমিক—জীবনলুব্ধ নয়। তারা ভালবাসে ঝড়-ঝঞ্ঝা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তারা আসবে তোমার কাছে না-জ্বলা মশাল নিয়ে—আগুনের জন্য। উপচীয়মান পৃথিবীর উপর দিয়ে আমার কণ্ঠ ডাক দিয়ে ফিরছে জীবনের জন্য—নরপতি-গণের প্রাণ ও রক্তের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে। মনে রেখো, যে-আমি চীৎকার করে ডাকছি, সেই ডাকে উত্তর কি করে দিতে হয় তাও দেখিয়ে দিয়েছি। এইটুকু জেনো, সর্বক্ষেত্রে মা-ই সর্বপ্রথম মৃত্যুতে ঝাঁপ দেন তাঁর শাবকদের রক্ষার জন্য।

"ধর্মকে যে-নামই দেওয়া হোক, তা চিরদিনই মৃত্যুপ্রেম। তার মধ্যে আজ বিশেষভাবে সেইদিন এসেছে যখন আমার হাতে জ্বলছে ত্যাগের আগুন, যা মানুষকে বিচারবুদ্ধি থেকে ছিঁড়ে এনে দগ্ধ করবে দারুণ বাসনায়। আমার চিহ্নিত মানুষেরা এখন ঝাঁপ দেবে ত্যাগে, যেমন অন্য মানুষেরা ছুটছে ভোগে। শ্রম, সেবা, পীড়ন, যন্ত্রণাকে এখন মিষ্ট লাগবে—তিক্ত নয়। মহাকালের বুকে মহান এই লগ্ন—এখন, আমি মহাকালী, সেই আমিও জাতি-সমূহের জননী।

"সংকুচিত হয়ো না পরাজয়ে, আলিঙ্গন করো নৈরাশ্যকে। সুখের থেকে ভিন্ন নয়

যন্ত্রণা—যখন উভয়কে চাই আমি। অশ্রুর জগতে এসে তাই আনন্দ করো, আর দেখো, আমি হাসছি। মানুষের সঙ্গে ওখানেই আমার মিলনকুঞ্জ—ওখানেই হৃদয়ের গভীরে আমি তাদের টেনে নিই।

"আমার বিরোধী স্বার্থের শিকড় উপড়ে ফেলো। আমি যখন কথা বলব তখন প্রেম, বন্ধুত্ব, সুখ, আশ্রয়—কোনো কিছুর স্বর যেন শোনা না যায়। প্রাসাদ ছেড়ে এসে ভয়ানকের সমুদ্রে নিমজ্জিত হও। বিলাসের কক্ষ ছেড়ে এসে জ্বলন্ত নগরীর প্রহরী হও। এই জানো যে, একটির মতো অন্যটিও মায়া। নিয়তির সামনে দাঁড়াও সহাস্য মুখে।

"নিজের জন্য করুণা চেয়ো না। তোমাকে আমি অপরের জন্য করুণাবারি বহনের আধার করে তুলব। সাহসের সঙ্গে মেনে নাও নিজের অন্ধকারকে, আর তোমার প্রদীপ উৎফুল্ল করুক বহুজনকে। নিম্নতম কাজ করো সানন্দে ; উচ্চপদ ত্যাগ করো অনাকাঙ্ক্ষায়।

"যে কঠোর কাজে তোমাকে নিয়োগ করেছি, খাড়া থাকো তাতে। বয়নের কাজ করো সযত্নে। তোমার কাছে দাবি করা হয়েছে—সে দাবির পূরণে পিছু হটো না। ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে যাও, পুরস্কারের প্রত্যাশা রেখো না। কঠিন নির্ভয় প্রতিজ্ঞায় স্থির —তুমি।

"সূর্য যখন অস্ত যাবে, খেলা যখন সাঙ্গ হবে, তখন তুমি অবশ্যই জানবে, হে বৎস আমার—

"আমি কালী, আমি পুরুষকে দিই পৌরুষ, নারীকে দিই নারীত্ব, জয় আমার মুঠিতে —আমি তোমাদেরই মাতা।"

যেসব বিপ্লবী যুবকের উপরে 'কালী দি মাদার' বইয়ের প্রভাব পড়েছিল তাদের একজন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ঐ বিষয়ে বলেছেন :

"Sister Nivedita wrote an inspiring booklet called *Kali the Mother*. That book served as an inspiration to our workers."

বাংলার বৈপ্লবিক সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' (১৯০৪)—পুলিশ বিপজ্জনক সাহিত্য মনে করে সেটিকে বাজেয়াপ্ত করেছিল—সেই পুস্তিকাটি ঐতিহাসিক ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে "খুব সম্ভবতঃ সিস্টার নিবেদিতার কাছে কোনো না কোনোভাবে ঋণী।" বিমানবিহারী এমনও বলেছেন, "ভবানী মন্দিরের বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণ অপেক্ষা ভগিনী নিবেদিতার পুস্তকের বৈপ্লবিক উত্তাপ তীব্রতর।" তিনি উভয় পুস্তকের স্টাইলের মধ্যে "অদ্ভুত ঐক্য" লক্ষ্য করেছেন। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ও নিমাইসাধন বসুও ভবানী মন্দিরে নিবেদিতার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।৫

বিমানবিহারী 'ভবানী মন্দিরে'র উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবের পরিচয় পেয়েছেন। [ঠিকভাবে বলতে গেলে, এই পুস্তিকায় অধিক প্রভাব রামকৃষ্ণের, বিশেষতঃ

৫ অমলেশ ত্রিপাঠী, 'একস্ট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ', ৬৫। নিমাইসাধন বসু 'অ্যাওকেনিং' ২৯০।

অরবিন্দ যেখানে ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতির ভাবী বিশ্ববিস্তারী রূপের কথা বলেছেন]। বস্তুতঃপক্ষে ভবানী মন্দিরের মানবদেবতা হলেন—রামকৃষ্ণ।৬

৬ অরবিন্দ ভবানী মন্দিরে লিখেছেন:

"What was the message that radiated from the personality of Bhagavan Ramakrishna Paramahamsa? What was it that formed the kernel of the eloquence with which the lion-like heart of Vivekananda sought to shake the world? It is this, that in every one of these three hundred millions of men, from Raja on his throne to the coolie at his labour, from Brahman....to the Pariah..., God LIVETH. We are all gods and creators, because the energy of God is within us and all life is creation."

অরবিন্দ আরও অগ্রসর হয়েছেন:

"It was to initiate this great work [of harmonising all religion, science, and philosophies and make mankind one soul], the greatest and most wounderful work ever given to a race, that Bhagavan Rāmakrishna came and Vivekananda preached....It was Kali, who is Bhawani, Mother of strength whom Ramakrishna worshipped and with whom he became one." [*Sri Aurobindo Works, Centenary edition,* Vol. 1 (1972), 65-66].

অষ্টম অধ্যায়

সফর, সংযোগ, সংগঠন

॥ ১ ॥ স্বামীজীর দেহান্তের পরে নিবেদিতার কার্যধারার ছক

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে শোকের প্রথম ধাক্কা সামলে নিবেদিতা যখন ভারতের উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইলেন, তখন অল্প কিছুদিন ওকাকুরার কর্মনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কিন্তু তাকে অচিরে ঝেড়ে ফেলে দিলেন, যেহেতু বুঝেছিলেন—ভারতের রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক চেতনাসঞ্চার প্রয়োজন, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সেই চেতনার পটভূমিকা ভিন্ন সংঘটিত হবে না, আর সে চেতনা আসতে পারে বিবেকানন্দের ডায়ন্যামিক ভাবধারা প্রচারের মধ্য দিয়েই। সুতরাং নিবেদিতার কাজ দাঁড়াল :

(ক) বিবেকানন্দের ভাবধারা কিভাবে দেশাত্মবোধের খাতে প্রবাহিত আছে তা দেখানো ;

(খ) সেই উদ্দেশ্যে ভারতের নানা স্থানে ব্যাপক সফর ক'রে, বক্তৃতা ও অন্যান্য উপায়ে সম্ভাব্য কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ;

(গ) একই কারণে সংঘ বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে স্থাপিত সংঘগুলিকে যথাসম্ভব ব্যবহার করা ;

(ঘ) সরকারের জনবিরোধী নীতির রূপ উদ্‌ঘাটন, এবং সম্ভব ক্ষেত্রে সরকারের দুর্বল জায়গায় আঘাত করা ;

(ঙ) ভারতবর্ষের আত্মবোধ ও সংহতির জন্য জাতীয়তাতত্ত্বকে জাতিচিত্তে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া ; সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি-বিরোধী চক্রান্তকে নষ্ট করা, যথা বিদেশী মিশনারিদের ভারতবিরোধী প্রচারের মোকাবিলা করা ;

(চ) জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক প্রতীক, পতাকা প্রস্তুত করা।

এই সমস্ত বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য আমরা পরিবেশন করব।

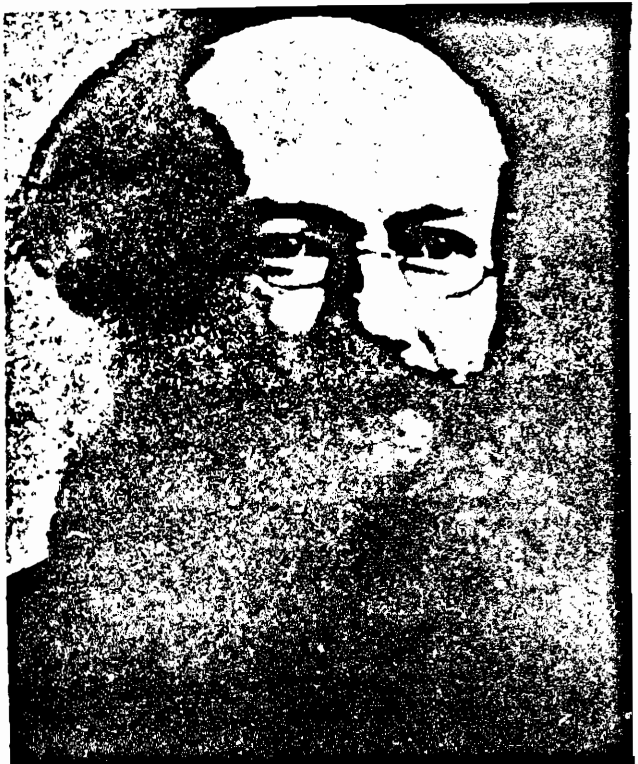
॥ ২ ॥ জাতীয়তা-মুখে বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার

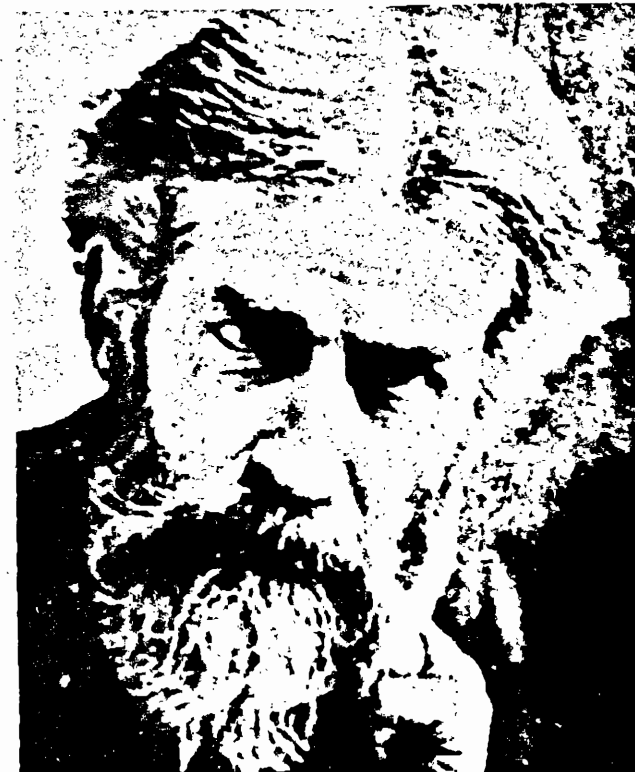
স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা যখন ভারতের 'ধর্মক্ষেত্রে' ছুটে বেড়াচ্ছিলেন তখন তাঁর হাতের পতাকায় লেখা ছিল একটি নাম—বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের মধ্যে তিনি যে-গতিশীল সংস্কারমুক্ত জাতীয়তা দেখেছিলেন তাকেই ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। স্বামীজী সম্বন্ধে প্রথমেই কয়েকটি উদ্দীপ্ত প্রবন্ধ লিখলেন ; তাদের মধ্যে 'হিন্দু'-তে প্রকাশিত লেখাটি দারুণ উন্মাদনার সৃষ্টি করল।১ ভারতের নানা পত্রিকায় সেটি পুনর্মুদ্রিত হল, এবং

---

১ Sister Nivedita, *The National significance of the life of the Swami Vivekananda.*

প্রবন্ধটির পুরো অনুবাদ আছে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৩১-৩৭)।





[বামে] নৈরাজ্যবাদী রুশ বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিন। [ডাইনে] বৈজ্ঞানিক ও সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেস।

1904
July 2/1904

THE WESTMINSTER GAZETTE.

[illegible] in human eyes is the "Union by Knowledge," which becomes a passionate apprehension of truth in the abstract. "Such are the three ways—truth, devotion, and good works—by which it is said that souls reach their goal. He who has attained and remains in life is called a Paramahamsa, or swan among men." And we learn that "many Mohammedan saints have become Paramahamsas and are equally loved and reverenced by all religions alike." Earthly life in itself offers no charm to the Indian mind. It is only the medium through which the soul works towards its final bliss. The fundamental difference between the Real and the Unreal, the Absolute and the Relative, the Idea and the Expression of it, lies at the root of all Indian belief. By this we must judge the East. To them this world is merely "the wreckage of the Unseen cast up on the shores of Time and Space." Believing in reincarnation until the last vestige of the impurity of personal desire is cleansed, what is not accomplished in this present incarnation will have to be again striven after in another. In so far as this is so, more pain and more effort will have to be undergone. What to the Catholic is Purgatory, that reincarnation is to the Easterns. The soul must be purified before it can "see God"; and if this sounds strange to Protestant ears, it nevertheless partakes of the eternal truth that "without holiness no man shall see the Lord."

We can only allude here to Miss Noble's interesting analysis of the teaching of Krishna—the Indian Christ. The Bhagavad, or "Song of the Blessed One," reads in parts strangely like our own Bible. Worshipped under many of the titles that the Christian Church has given to Christ, some of the words of Krishna remind us forcibly of the Imitation of St. Thomas à Kempis. "Fixing thy heart on Me thou shalt by My grace cross over all difficulties." "Putting aside all doctrines, come thou to Me alone for shelter—I will liberate thee from all sins; do not grieve." In this beautiful "Gospel" bodily cares are not forgotten. "They who depend upon Me, putting aside all care, whatsoever they need I Myself will carry it to them." A lovely legend has grown out of this teaching which we wish we could give, but for this and for many other delightful passages we must refer our readers to Miss Noble's pages. How far her account of Indian life and religion is a true one depends greatly on which side the picture is seen. That there are black spots in Indian life which are very black indeed to Western ideas cannot be denied. But there is a dark side to most things, and it is only through sympathy and understanding that we can ever hope to make black whiter in the fuller apprehension of Truth.

---

* "The Web of Indian Life." By the Sister Nivedita (Margaret E. Noble) of Ramakrishna-Vive Kananda. (William Heinemann.)

ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট (২-৭-১৯০৪) নিবেদিতার 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' বইয়ের সম্বন্ধে আলোচনার অংশ।

THE MOHURRUM.

by

SISTER NIVEDITA,
Of the Ramakrishna Mission.

THE advent of Islam seems curiously slow to yield itself up to Christian eyes.

If it be not true that our common conception of the Prophet is of a bold bad man (to quote a distinguished Mohammedan the other day), at least most of us will acknowledge that the name calls to mind chiefly glimpses of flashing sword-blades, charging horsemen, and the sound of Moslem war-cries in one part of the world or another. That is to say, the boundaries and antagonisms of the Faith are well defined in our thought; but of all that makes it a religion, all that it gives of Living Waters to its people, all that it offers of tenderness and consolation to the human heart,—of all, in a word, that is *positive* in it we have received no hint. Much as though our own creed should be associated only with its *auto-da-fé*, or its witch-drownings, while its call to the weary and heavy-laden, its passion for service, and its mystic Gift of Bread and Wine were all forgotten!

Even the missionaries, who have laboured so long and so among the Hindi-speaking peoples of India, have not yet come to tell us the hopes and fears, the loves and hates, by which live, although the two religions are so allied, that a Mohammedan mosque is simply a Christian Church, in a climate where the requires no roof! (The very sanctuary and baptistery are represe



"KATL-KA-RATH," OR NIGHT OF SLAUGHTER:
The scene in Dhurrumtollah Street on the last night of the Mohurrum.

Yet one would suppose that if a knowledge of French is advantageous in teaching a Frenchman English, the corresponding equipment would be even more desirable in dealing with such delicate and com adjustments as those of a national religion!

Not one of us, however, can have gone through the great cities Northern India without fretful beating of our wings against the bars our own ignorance. That magnificent rainbow of Indo-Saracen

কলকাতার সচিত্র সাহেবী পত্রিকা এমপ্রেস্‌-এ (মে, ১৮৯৯) মহরম বিষয়ে নিবেদিতার প্রবন্ধ।

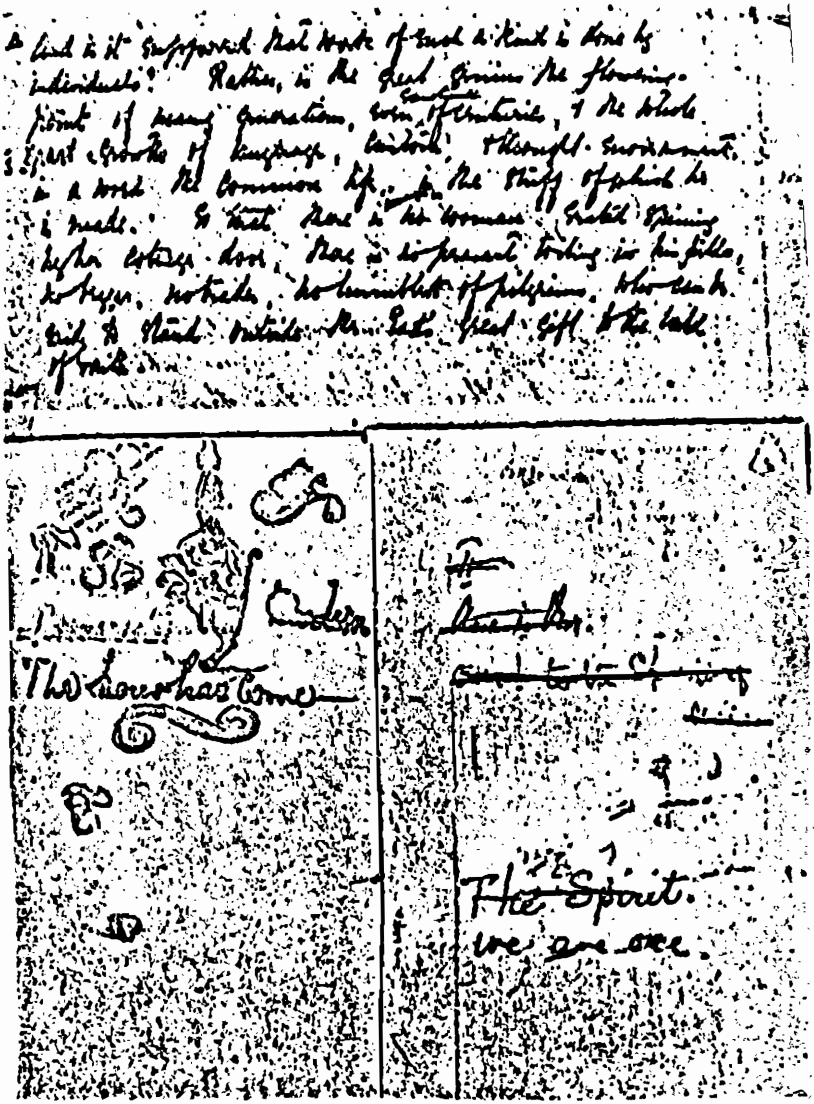


ওকাকুরা কাকুজো ।

Rasa Ranjan Dey, (Mozumdar)
2nd year class.
B.B. College / Mozaffarpur

The waters of the Bosphorus reflect
sad gloom of the Peiho. The
grasses of Manchuria convey the
same blast that sweeps the
of Rajputana. Through
moonless night the Persian
wails in vain. Have they
fallen, never to return?
flowers forever?
Brothers and Sisters of Asia
We have wandered long among
let us awaken once more
actual. We have drifted
river of apathy, let us land
more on the cruel reality.
isolated ourselves in the pride
of crystalline containedness. Let us
sounding the ocean of a common misery. The
Guilty conscience of the West has
often conjured up the ghost of a
Yellow Peril, let the tranquil gaze
of the East turn on the White
Disaster. I call you not to
violence but to manhood. I call
you not to aggression but to self-
consciousness.
The glory of Europe is the
humiliation of Asia. The march
of history is a record of the steps that
lead the West into an inevitable antagonism
to ourselves. From their very
outset, the restless maritime instinct

জাপানের 'কিরিহারা সংগ্রহে' রক্ষিত ওকাকুরার 'অ্যাওকেনিং অব দি ইস্ট' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা। রাসরঞ্জন দে নামক এক কলেজ-ছাত্র এটি কপি করেন। পাণ্ডুলিপিতে নিবেদিতার সংশোধন লক্ষণীয়।



And is it supposed that work of such a kind is done by individuals? Rather, is the great genius the flowering-point of many generations, even of centuries, of the whole great growth of language, custom & thought-environment, in a word the common life, in the stuff of which he is made. So that there is the woman, [illegible] spinning before cottage door, there is the peasant toiling in his fields, the beggar, the trader, the multitude of pilgrims, who each [illegible] with [illegible] great gift to the table of truth.

The hour has come

The Spirit. we are one

পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপিতে নিবেদিতার সংযোজন।

Cancelled

(margin: Cancelled)

We have seen that the success of alien aggression upon our home is no proof of the inferiority of our society. Rather the reverse. Ours has been the position of the scholar of the great building confronted by armed bandits. For we, throughout the ages have held the proper function of great civilisations to be the progressive humanising of the race. Hence self-realisation, not aggrandisement, has been our constant aim. This is why

(margin: Stet)

we measure our achievements not by materials but by ideals. Has not the whole world learnt its morals (however dimly) at the feet of Asia?

(margin: Cancelled.)

What is true in China would [illegible] militarily, by concentrating supplies, could make some fire of her surrounding [illegible]? [illegible] the millions [illegible] even the millionaire of the [illegible] [illegible], the rebuilt of trouble [illegible]? Would it be any [illegible] to the nation at large for the frightful [illegible] of famine?

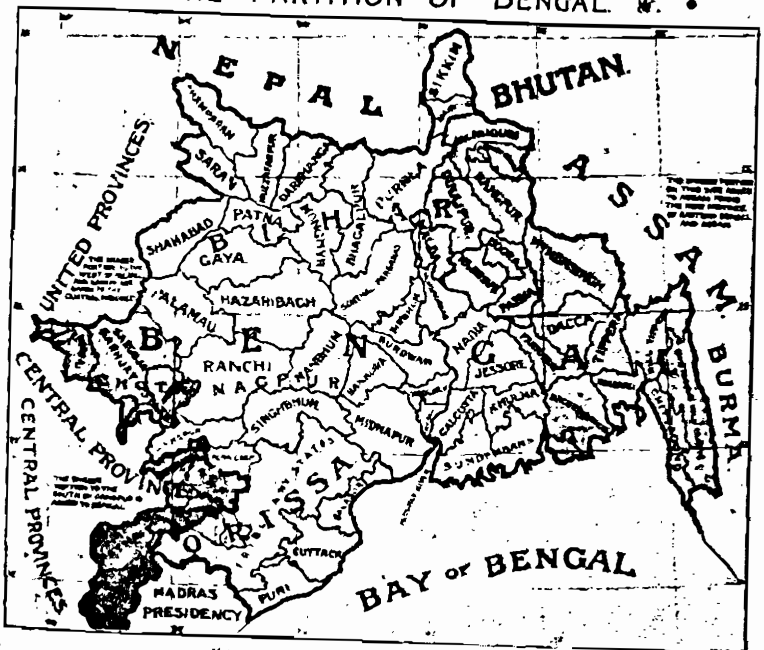
পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপিতে নিবেদিতার সংযোজন। এই লেখাটি অত্যন্ত উগ্র ও রাজদ্রোহকর মনে ক'রে এটি সমকালে প্রকাশ করা হয়নি।





[বামে] সরলা ঘোষাল (সরলাদেবী চৌধুরাণী) । [ডাইনে] সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

THE PARTITION OF BENGAL



Map showing the districts given to and taken from Bengal.



[বামে] বঙ্গবিভাগ-চিহ্নিত মানচিত্র। (এম্‌প্রেস্‌, অক্টোবর ১৯০৫)।
ডাহিনে] বঙ্গভঙ্গকারী কার্জনের জন্নাদ মূর্তি। (হিন্দী পাঞ্চ-এর কার্টুন, জুলাই ১৯০৫)।





LORD CURZON AND THE INDIAN PEOPLE.

REMARKABLE INDIGNATION MEETING IN CALCUTTA.

"RUSSIANISING THE ADMINISTRATION."

THE VICEROY'S RECORD REVIEWED.

SPEECH BY DR. RASH BEHARI GHOSE.

(By Cable, from Our Own Correspondent.)

CALCUTTA, March 13.

An immensely crowded meeting in the Town Hall here has protested against Lord Curzon's speech at the last Convocation of Calcutta University; and against his general reactionary policy, restricting local self-government, officialising higher education, fettering the Press by means of the Official Secrets Act, and the abolition of competitive tests for employment in the Subordinate Civil Service.

Dr. Rash Behari Ghose, C.I.E. (leader of the Native Bar, formerly additional member of the Supreme Legislative Council, and one of the most distinguished graduates of the Calcutta University), presided. He said that the Viceroy in his Convocation Address had framed an indictment against Asia, which had given to the world Buddha, Christ, and Mahomet. By the Municipal Act the Viceroy had reduced the elective element in the Calcutta Corporation, and he now proposed the partition of Bengal, which was opposed to patriotic sentiments and popular aspirations. The Viceroy had abolished the test of competitive examinations for the subordinate service, which, in the opinion of the highest authorities, increased the efficiency of the Public Service. The Universities Act not only injuriously affected the scope and freedom of higher education, but placed it beyond the reach of many middle-class boys.

Dr. Ghose quoted the "Englishman" to show how the Viceroy had passed the Official Secrets Act, in spite of the unanimous opposition of Europeans and Indians. The truth was the Viceroy attached no importance to the desires of the people, but was determined to carry out his own will, and almost all his measures tended to strengthen the Simla bureaucracy and to "Russianise" the Administration.

SOME OPINIONS OF THE INDIAN PRESS.

The "Indian Mirror" (Calcutta).

It would have been far better for his Excellency if he had not opened his lips at all, as we were given to understand at first that he would not. We expected to hear something edifying and encouraging from his Excellency, instead of which we were treated to some commonplace platitudes, sweeping generalisations, unwarranted inferences, and unjustifiable vilification of the entire Indian community, whose destiny he has been called upon to rule and guide. The speech, we regret to observe, is tactless and unstatesmanlike in the extreme, and, in some respects, even unworthy of the Chancellor of the first University in India . . . One thing unmistakably rings out through his Excellency's speech, and that is his intolerance of public criticism of his acts and measures. He cannot stand it, and in his anger says things which he would not say in calmer moments and more sober moods. Does not his Excellency stand accused of the same offences which are sought to be brought home against the Indian journalists? Was his Excellency justified in making sweeping and uncomplimentary remarks about the "truthfulness" of the Eastern people? Will it not create a bitter racial feeling, which it is his first and paramount duty as ruler to set at rest and pacify? The institution of such odious comparisons on subjects on which the people are naturally very sensitive can only lead to the widening of the gulf that already exists between the East and the West, and alienate the sympathies of a grateful nation. The unfortunate Ilbert Bill controversy had created much bitter [illegible]

[উপরে, বামে] লর্ড কার্জন ও লেডি কার্জন, কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে, ২৬ জানুয়ারি ১৯০৩ (এমপ্রেস, মার্চ ১৯০৩)।

[বামে, নীচে] ঢাকার নবাব সলিমুল্লা।

[উপরে, ডাইনে] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জনের কনভোকেশন বক্তৃতার বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা। ('ইণ্ডিয়া', ১৭-৩-১৯০৫)।



স্যার জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলারের কার্টুন (হিন্দী পাঞ্চ, ১৪-৬-১৯০৮) বঙ্গভঙ্গের পরে পূর্ববঙ্গের লেফটন্যান্ট গভর্নর হয়ে ফুলার অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেন। তাঁকে পদত্যাগ ক'রে চলে যেতে হয়। লণ্ডন টাইমস-এ এক চিঠিতে তিনি ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিধা, দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বলেন—প্রচণ্ড উৎপীড়নই আন্দোলন দমনের দাওয়াই। সেইসূত্রে কার্টুনটি অঙ্কিত।

BANDE MATARAM.



This famous song occurs in a Bengali novel called the *Ananda Math*. It is a work of the famous Bankim Chunder Chatterjee, in which the revolt of the Sanyasins during the time of Warren Hastings is depicted. *Ananda Math* is the name of their monastery, and the song, their war cry. It is now the shibboleth of the Bengal Swadeshis and the horror of the Bengal Civilians.

Thou with sweet springs flowing,
Thou fair fruits bestowing,
Cool with zephyrs blowing,
Green with corn crops growing,
Mother, hail!

Thou of the shivering-joyous moon-blanched night,
Thou with fair groups of flowering tree-clumps bright,
Sweetly smiling,
Speech-beguiling,
Pouring bliss and blessing,
Mother, hail!

Though now seventy million voices
Through thy mouth sonorous shout,
Though twice seventy million hands
Hold the trenchant sword-blades out,
Yet, with all this power now,
Mother, wherefore powerless thou?
Holder thou of myriad might,
I salute thee saviour bright,
Thou who dost all foes affright,
Mother, hail!

Thou our sword and wisdom art,
Thou our very mind and heart,
And the life-breath in our bodies,
Thou, as strength in arms of men,
Thou, as faith, in hearts dost reign,
And thy form from fane to fane,
Thine, O Goddess!
For, thou hast the ten-armed Durga's power
Kishen throned there in her lotus-bower
Whom thee with deity doth dower.
Mother, hail!

Lotus-throned, rivalless,
Radiant in thy spotlessness,
Thou whose fruits and waters bless,
Mother, hail!

Hail, thou, verdant, unbeguiling,
Hail, O! decked one, sweetly-smiling,
Ever bearing,
Ever rearing,
Mother, hail!

SISTER NIVEDITA AT THE TOWN HALL.

Last evening in the Town Hall Sister Nivedita delivered a lecture to a very large audience on the subject of "Dynamic Religion."

The lecturer began with a brief retrospect of the chief movements among the people of India during the last hundred years. Premising that at the present moment India stood at the dawn of a new era, she said that the movements which were related roughly to what we called the "modern consciousness," might be said to have been in progress ever since the English language touched the Indian shores; and India, since that date, had been heading for the possession of the secret, the unifying idea, which was one day to be born. It was apparent that during the last hundred years the leading minds of India had followed after many false aims. We were apt to assume that the India which the British conquered was a dead country, showing to the world no single sign of life. But if they had learned only as much of their country as it was to that day, they had learned the lesson of history very ill. We were apt, moreover, to minimise the importance of those forms of activity which had sprung into life after the coming of the English. The first result of the impact of the West upon the mind of India had been the rise of men inspired by an ideal of social reform. Then had followed a determined rush forward towards a political ideal. But to-day we saw that neither social reform nor political agitation, though both served great purposes, contained within it the promise of the real goal of India. Thirdly, there had been displayed many kinds of religious revival; but was it possible for them to say that where there was religious revival, there had always been religion? The problem of India was and would ever be a religious problem, because it was a problem of character, of activity, of work. What, then, was the idea that was to shadow forth the goal for which they were waiting? Had they not grasped the truth that this idea was to be sought in the great word Nationality? They had made many experiments; they had thrown aside many things. They had found that none of the objects upon which they had spent their strength was the one thing of which they were in search. Was it not plain to every one of them that after many failures the idea which was to re-create India, was at last manifesting itself in the conception of the Indian nation? They had been taught to believe that when, as a result of the English administration, India had been provided with the means of communication, with a postal system, with the possibility of organised knowledge, she had suddenly risen back upon the tradition of three thousand years and become more or less a united people. But the truth was that unless the principle of unity had been alive in India all through, unless India had been one in a thousand ways, fifty years would have been a thing for her to laugh at. Wherein, then, lay the unity of this people? It lay in the mind of the people, wedded to the soil; for the mind of man that is rooted in the spirit of place, is always and for ever omnipotent. But it was said: Unity is a foreign necessity for the Indian people, and yet religion makes them many. Did they believe that? Did they believe also that the religion of their country, besides making them divided elements, had also made them warring elements. That could only be true so long as they were held in bondage to a creed. For religion had never dwelt in a creed

[বামে] মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ-এ (ডিসেম্বর ১৯০৫) বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্-এর অনুবাদ। [ডাইনে] নিবেদিতার বিখ্যাত "ডায়ন্যামিক রিলিজন' বক্তৃতার রিপোর্ট স্টেটসম্যানে (২৭-২-১৯০৪)।

The People of India Anti-British.

The *Quarterly Review* discusses the unrest in India in a very gloomy vein. The writer admits that "the dominating feeling now is that of restlessness under



Fischietto.] [Turin.

John Bull's Swollen Jaw.

our administration. The [illegible] rating desire is that we [illegible] cause in the rise of Japan, the strict impartiality of British justice, the recurrence of famine, and the influence of Western education. Lord Curzon's reform of the Universities of India and the partition of Bengal have been arbitrarily used to promote sedition. "It was simply

ভারতীয় আন্দোলনের ফলে চোয়াল-কনকনানিতে অস্থির জনবুল। রিভিউ অব রিভিউজ-এ কার্টুন (অগস্ট ১৯০৮)।



বঙ্গভঙ্গ দিবসে, ১০ অক্টোবর ১৯০৬, বিডন স্কোয়্যারে বক্তৃতারত সুরেন্দ্রনাথ। (এমপ্রেস, নভেম্বর ১৯০৬)।



Nebelspalter.] [*Zurich.*

The Unrest in India.

JOHN BULL: "I am afraid the snakes have quite other intentions than to dance to my piping."

appear to many incredible, on the very eve of the Revolution, Lord Reay says that India cannot govern herself because her people are mostly illiterate.

ভারতীয় আন্দোলন-সূত্রে কার্টুন। (রিভিউ অব রিভিউজ, জুলাই ১৯০৭)।
"জনবুল : আশঙ্কা হচ্ছে, সাপগুলি [অর্থাৎ ভারতীয় আন্দোলনকারীরা] আমার বাঁশিতে আর নাচবে না ; তাদের অন্য মতলব আছে।"

তারই জন্য তাঁর বোম্বাই বক্তৃতামালার সাফল্য ঘটল। [৯.১১.১৯০২ চিঠি]। নিবেদিতা মনে করলেন তিনি তাঁর "পিতার নিজস্ব কর্মভার গ্রহণ করেছেন।" [৪.৯.১৯০২] স্বামীজী প্রচণ্ড একটা "ভাব" দিয়ে গেছেন, সেই ভাব "যখন পূর্ণরূপে উন্মোচিত হবে তখন তাঁর [স্বামীজীর] চতুর্দিকে লক্ষ-লক্ষ মানুষ সমবেত হবে।" [২৮.১.১৯০৩]। নিবেদিতা প্রার্থনা করলেন, "ঈশ্বর শক্তি দিন, যাতে মৃত্যুর পূর্বে আমি স্বামীজীর নামে নির্ভয় সত্য বাক্য উচ্চারণ করতে পারি—যে-বাণীতে তাঁর জীবন অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হবে।" [২৯.৪.১৯০৩]। "আমি কেবল চেয়েছি, তাঁর ভার বহন করতে," নিবেদিতা লিখলেন, "আমি চাই বিরাট আকারে সেবা করতে, অন্ততঃ চূড়ান্ত আকারে আত্মোৎসর্গ করতে—যাতে নিশ্চিত অনুভব করতে পারি—দিয়েছি সবকিছুই।" [২০.৫.১৯০৩]। নিবেদিতার কানে বাজতে থাকে—স্বামীজী বলে চলেছেন: "সাহসী হও মার্গট! প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করো। শুধু যদি তোমার সাহস থাকে আমি তাহলে পথ দেখিয়ে দেবোই।" [৪.৭.১৯০৪]। সাহস তাঁর ছিল কিন্তু পথে একলা চলার ক্লান্তিও এসেছে মাঝে-মাঝে। "কী ক্লান্ত আমি!...বছরের পর বছর বিশ্রাম কাকে বলে তা জানিনি।...সর্বদাই রণনির্ঘোষের মধ্যে।...যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছি তখনও সুস্থ হবার জন্য ব্যস্ত হতে হয়েছে যাতে কাজ শুরু করতে পারি।" [৬.১২.১৯০৫]। ক্লান্তির নির্মোক খসিয়ে কিন্তু বেরিয়ে এসেছে নবপ্রাণিত জীবন যা ভাবতে চেয়েছে—"আমি ছিলাম তাঁর দক্ষিণ হস্ত।...আমি চাই তিনি ভাবুন যে, 'সবকিছু মার্গটের হাতে ছেড়ে এসেছি; সে যে-ভাবেই হোক তাদের সমাধা করবে'।" [১৬.৭.১৯০৬] সগৌরবে নিবেদিতা বলেছেন: "ইতিহাসে এই প্রথম একজন [প্রত্যাদিষ্ট] পুরুষ তাঁর কর্মভার নারীর উপর অর্পণ করে গেছেন।" [এপ্রিল, ১৯০৫]। কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে একটু ভিন্নভাবে ব্যাপারটিকে দেখতে হয়েছে তাঁকে: "আমি ছদ্মবেশী পুরুষ। নিজেকে নারী বলে মনেই হয় না।" [২৪.৮.১৯০৫]।

নিবেদিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগ তাঁর চিরবিদায় নয়—"বিজয়ী প্রত্যাবর্তন।" স্বামীজীর নামকে "মিলনমন্ত্র" ক'রে তরুণ ভারত বেরিয়ে এসেছিল—সে দৃশ্য দেখার ভাগ্য নিবেদিতার হয়েছিল। [২১.৮.১৯০২]। "স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দুই জীবনই ভারতের অখণ্ডসত্তা।" [২১.১২.১৯০২]। ১৯০৭ সালের মধ্যেই নিবেদিতা দেখলেন—ভারত অবশেষে জেগেছে। "স্বামীজীর শক্তি কি বিপুল পরিমাণে না ভারতকে আত্মশক্তি ও স্ব-পথ দর্শনের ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ এই অলৌকিক কাণ্ড ঘটান নি।" [২৭.২.১৯০৭]। স্বদেশী আন্দোলনকালে দেশপ্রেমিকরা শ্রীমা সারদাদেবীর চরণ স্পর্শ করতে এসেছেন (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'স্বরাজ' পত্রিকায় খোলাখুলি তাঁর চরণ স্পর্শ করে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন২)—সেকথা নিবেদিতা একাধিক চিঠিতে লিখেছেন। "সকল বড় জাতীয়তাবাদীই এখন ঐ কাজটা করেন [মাতাঠাকুরাণীর চরণ স্পর্শ]—সকলেই স্বীকার করেন যে, স্বামীজীর কাছ থেকেই জাগরণের

২ স্বরাজ পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব লিখেছেন:
"যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও, আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশীসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।" ['সমকালীন', ১ম খণ্ড, (২য় সং) ৩৪৯]।

ডাক এসেছিল।" [৫.৮.১৯০৯]। "সকলেই এখন বলছেন, স্বামীজীই নূতন ভাবের উৎস। *তাঁরা মাতাদেবীর চরণস্পর্শ করতে আসছেন, আর সারদানন্দ কিছুতে তাঁদের ফিরিয়ে দিতে* রাজি নন।" [১.৯.১৯০৯]। [সরকারের সন্দেহলক্ষ্য দেশপ্রেমিকদের রামকৃষ্ণ সংঘে যাতায়াত রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল; সেই ঝুঁকি সত্ত্বেও স্বামী সারদানন্দ নিষেধ করেন নি, নিবেদিতা এইটাই বলতে চেয়েছেন]। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন—"বিবেকানন্দের হৃদয়ই সমস্ত কিছু নির্মাণ করেছে।" [১৮.৮.১৯১০]।

যখন ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা গেছে, যা বজ্র-বিদ্যুতে ভয়ানক রূপ ধরতে পারে—তখন নিবেদিতা সে শান্তিকে চাননি যা কবরের শান্তি ছাড়া কিছু নয়; মনে করেছেন, "এমন কি ঝঞ্ঝাও কর্তব্যের বার্তা বিস্তার করবে।" ঐকালে নিবেদিতা এই জ্বলন্ত সত্যের দ্বারা আলিঙ্গিত:

"আমি কেবল একটি বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করছি: ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে: মাতা প্রকাশ করেছেন তাঁর শক্তি; আবির্ভূত হয়েছেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকান্দ; সেই অলৌকিকের পটভূমিকায় কোনো-কিছুই অদ্ভুত বা অপ্রত্যাশিত নয়। এসো, পথে চলো।" [২৮.৪.১৯১০]।

॥ ৩ ॥ নিবেদিতার বক্তৃতা-সফর

১৯০২-১৯০৫—এর মধ্যে নিবেদিতা বেশ কয়েকবার ভারতের নানাস্থানে সফর করে বক্তৃতাদি করেছেন। এইসব সফরের বিবরণ নিবেদিতার জীবনীগুলিতে আছে। তাঁর চিঠিতেও তাদের ইতস্ততঃ উল্লেখ মেলে। ১৯০৫ সালের পরেও তিনি বক্তৃতা কম করেন নি, ভারতে ও ভারতের বাইরে, কিন্তু শেষোক্ত পর্বে তিনি মনে করেছিলেন, বক্তৃতা অপেক্ষা লেখায়, কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা, তিনি অধিক কাজ করতে পারবেন। ১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালে দু'বার গুরুতর অসুখের পরে বৃহৎ জনসভায় বক্তৃতা করার মতো শারীরিক শক্তির অভাব ঘটেছিল। (মনে রাখতে হবে, তখন 'মাইক' নামক যন্ত্রটির আবির্ভাব ঘটেনি)।

নিবেদিতা বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে র্যাটক্লিফ দুঃখ করেছেন, সেকথা আগেই বলেছি। যাইহোক, নিবেদিতার উদ্দীপক বক্তৃতার রিপোর্ট সংবাদপত্রাদিতে যথেষ্ট বেরিয়েছে। কিন্তু রিপোর্টগুলিতে আসল বা মারাত্মক কথাগুলি নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪, নিবেদিতা কলকাতা টাউন হলে 'ডায়ন্যামিক রিলিজন' নামে একটি বক্তৃতা দেন। বিপিনচন্দ্র পাল এই বক্তৃতা সম্বন্ধে বলেছেন, "ইহা ডায়ন্যামিক রিলিজন নয়—ইহা একটি ডিনামাইট।" মতিলাল রায় বলেছেন, নিবেদিতা "উত্তেজনার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"[৩] এই বক্তৃতার উল্লেখ র্যাটক্লিফও করেছেন। এই ধরনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে র্যাটক্লিফ লিখেছেন:

"আমি নিবেদিতাকে বক্তৃতা করতে শুনেছি...কলকাতার টাউন হলে, বিরাট জন-সমষ্টির সামনে—জাতীয়তা-ধর্ম নামক তাঁর প্রাণ-কাড়া বিষয়ে।...আমি তখন ভেবেছি

৩ গিরিজাশঙ্কর, 'অরবিন্দ', ৫৫৩।

এখনও তাই ভাবি যে, তাঁর বাগ্মিতাশক্তি যখন পূর্ণ প্রকাশিত হত, তাকে অতিক্রম করার তুল্য কিছু আমি কদাপি দেখিনি—সে ভাষণ অভিব্যক্তিতে এমনই নিখুঁত ও নিশ্চিত প্রত্যয়সিদ্ধ, গভীর উন্মাদনায় আলোড়িত, অপূর্ব আলোর ঝলকে এবং অব্যাহত ঐকান্তিকতায় পূর্ণ।"৪

র‍্যাটক্লিফের মতো বহুদর্শী আন্তর্জাতিক সাংবাদিকের এই প্রশস্তি অবশ্যই দুর্লভ প্রাপ্তি।

ফ্রেজার ব্লেয়ার আরও স্পষ্টভাবে উক্ত বক্তৃতার চরিত্র খুলে বলেছেন :

"ছয়-সাত বছর আগে আমি তাঁকে কলকাতা টাউন হলে একটি বক্তৃতা করতে শুনেছিলাম—কয়েক বছর পরে যদি তিনি সে বক্তৃতা করতেন তাহলে নির্ঘাত তাঁকে নির্বাসনে যেতে হত। এর নামটিই ছিল রাজদ্রোহাত্মক। তথাপি যে-মঞ্চ থেকে তিনি বক্তৃতা করছিলেন সে-মঞ্চ ইউরোপীয়দের দ্বারা পূর্ণ ছিল। আর সভাগৃহ থিক্‌থিক্‌ করছিল বাঙালী যুবকদের ভিড়ে। তিনি যেন দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ—এই অবস্থায় তাঁকে দেখে তারা তাঁর কথা শুনেছিল। বক্তৃতাটি বাগ্মিতার নৈপুণ্য ও শক্তির চূড়ান্ত রূপ। বিষয়, 'ডায়ন্যামিক রিলিজন'—ভাষান্তরে দেশপ্রেম। দেড় ঘন্টা নিবেদিতা বিশাল সভাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। বক্তৃতাকালে কোনো নোট ব্যবহার করেন নি, বলেছিলেন চড়া সুরেলা গলায়, সমস্ত কিছুর পরিণতি এই বাক্যে—'আর কথা নয়—কথা নয়—কথা নয়—। এখন কাজ—কাজ—কাজ।' যে-বীজ তিনি তখন বপন করেছিলেন তা বোধহয় তাঁর প্রত্যাশার পূর্বেই ফল প্রসব করেছিল।"৫

নিবেদিতা স্বয়ং এই বক্তৃতার সাফল্যে খুশি হয়েছিলেন : "গত শুক্রবার আমার টাউন হলের বক্তৃতা সফল হয়েছে, এমন বলা হচ্ছে। বারো শো'র মতো দর্শক, কারণ মাত্র তিন দিন প্রস্তুতির জন্য পাওয়া গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে এটা ভালই সমাবেশ। আশা করছি এখন থেকে গ্রীষ্মকালের মধ্যবর্তী সময়ে থিয়েটার-হলে বক্তৃতামালার আয়োজন করব। ইতিমধ্যে আজ রাত্রে কয়েকদিনের জন্য বুদ্ধগয়া ও বারাণসী যাচ্ছি। শেষোক্ত স্থানে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেব।" [৩.৩.১৯০৪]।

স্টেটসম্যান-এ নিবেদিতার বক্তৃতার সুন্দর রিপোর্ট বেরিয়েছিল দেখে তিনি খুশি হন; [২৯.২.১৯০৪], কিন্তু সেই রিপোর্টে কোথাও ফ্রেজার ব্লেয়ার বক্তৃতার যে-সব জ্বলন্ত কথার উল্লেখ করেছেন, তাদের সাক্ষাৎ নেই। সুতরাং অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে, নিবেদিতার বক্তব্য প্রকাশিত রিপোর্টের বাইরে বহুদূর অগ্রসর হত। তিনি চিঠিতে লিখেছেন : "এক হাতে গীতা অন্য হাতে খড়্গ নিয়ে মাতৃভূমি আবার জাগ্রতা হবেন কখন?" [২৮.১.১৯০৩] কিংবা ছটফট করতে-করতে বলেছেন—"হে ঈশ্বর!—আর কতদিন—কতদিন—!"

"How long O Lord—how long? Oh if Mother would give me 'strength like the Thunderbolt'—and words with unspoken menace in them—and weight of utterance! [4.8.1904]

---

৪ মডার্ন রিভিউ, ডিসেম্বর, ১৯১১।

৫ A.J.F. Blair, Appendix, *Select Essays of Sister Nivedita*, (Madras 1911).

—ঐ ধরনের কথা তিনি নিশ্চয় বক্তৃতাতেও বলতেন। ক্ষুধার্ত পরাধীন দেশের জন্য তিনি রুটি ও বারুদ একসঙ্গে চেয়েছেন। "হতভাগ্য দেশ! রুটি—রুটি—রুটি চাই—তা আসুক বারুদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের দেবতা শিব কি প্রলয়ের প্রভু নন?" [২৬.৩.১৯০৩]।

স্বামীজী বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ নিবেদিতার হৃদয়ে ঝঙ্কারিত হবে।" তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ হয়নি।

॥ ৪ ॥ বক্তৃতান্তে কিভাবে নিবেদিতা কর্মী-সংযোগ করতেন

প্রকাশ্য বৃহৎ জনসভায় করতালিযোগ্য চিত্তহারী বক্তৃতা করেই কি নিবেদিতা কর্তব্য সমাধা করতেন? অবশ্যই নয়। বক্তৃতা-সভাগুলি তাঁর যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগস্থান ছিল। কিভাবে তা ঘটত, কোনো-কোনো স্মৃতিকথা থেকে তা দেখতে পাই। বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো-র স্মৃতিকথা আমরা পরে উপস্থিত করব। এখানে নাগপুরের জি ভি দেশমুখের স্মৃতিকথার কিছু অংশ আনছি, যার থেকে দেখা যাবে—নিবেদিতা শরীরচর্চা ও অস্ত্র-ব্যবহারে যুবকদের কতভাবে প্ররোচিত করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। তিনি অধিকন্তু যুবকদের মধ্য থেকে যোগ্য মানুষগুলিকে খুঁজে নিতেও চেয়েছিলেন।

দেশমুখ লিখেছেন, (প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারী, ১৯৫৩), নিবেদিতা ১৯০২ সালে দশেরার সময়ে নাগপুরে উপস্থিত হন। স্থানীয় মরিস কলেজের ছাত্ররা একটি সভার আয়োজন করেন, যেখানে সভানেত্রী হিসাবে নিবেদিতা উত্তম ক্রিকেটারদের পুরস্কৃত করবেন। দিনটি ছিল দশেরার ঠিক পূর্বদিন—'অস্ত্র পূজার দিন।'

তারপর কী হল, তার বিবরণ :

"নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করলেন। কিন্তু সেই সুযোগে মরিস কলেজের ছাত্রদের ধমক লাগালেন—কেন তারা বিদেশী খেলায় গৌরব কুড়ানোর চেষ্টা করছে...অথচ স্বদেশীয় খেলাকে অবহেলা করছে! তিনি এমনও বললেন, যদি আগে-ভাগে জানতে পারতেন অনুষ্ঠানটি আসলে কী, তাহলে সভানেত্রীত্ব করতে রাজি হতেন না। অস্ত্রপূজার এই দিনে—দশেরার সময়ে—একমাত্র দেবী দুর্গার অর্চনাই বিধেয়। ভগিনী এই দেখে অতীব বিস্মিত—আমরা কিভাবে দেবী দুর্গাকে ভুলে গেলাম—তাঁর খড়্গকে—তাঁর শক্তির বাণীকে!! তিনি আশা করেছিলেন, ভোঁসলে রাজাদের এই রাজধানীতে মরাঠা-বীরত্বের কিছু চিহ্ন দেখতে পাবেন। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক নিয়ে সংগঠিত ঐ সভায় তিনি এইভাবে কঠোর তিরস্কার করতে লাগলেন।"

অধিকাংশ ছাত্র ও অধ্যাপক নিবেদিতার ধিক্কারবাণীকে উত্তম উত্তপ্ত বক্তৃতার নমুনা মনে করে যখন স্থানত্যাগে প্রস্তুত, তখন নিবেদিতা বলে বসলেন, "তিনি পরদিন তরবারি-খেলা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি সামরিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে চান।" মুশকিল হল, ঐ ধরনের প্রদর্শনী দেখাবার মতো কলেজ-ছাত্র বিশেষ ছিল না। কিন্তু অধ্যাপক 'এম' এবং লেখক ব্যাপারটিকে মর্যাদার কাছে চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে অনেক চেষ্টায় ওঁরা পরদিন একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন :

"বস্তুতঃপক্ষে এই প্রথম আমরা [দেশমুখ লিখেছেন] কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের

সামনে এই ধরনের শারীর কৌশল দেখিয়েছিলাম। যেসব যুবক আখড়ায় গিয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্র—তরবারি লাঠি ইত্যাদি চালনার অভ্যাস করত, তখনকার দিনে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা তাদের নীচু চোখে দেখতেন। এই ব্যাপারটি ছাত্র-অধ্যাপকদের সামনে ভগিনী নিবেদিতাকে বলে ফেলেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তো কলেজের ছাত্র!' আমি বললাম, 'হাঁ, কিন্তু অন্যরা [আর যেসব যুবক অস্ত্রকৌশল দেখিয়েছিল] নয়।' ভগিনী সেকথা শুনে ছাত্রদের সামনে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে এইটুকু আমার স্মরণ আছে :

"আমরা এখন বেশিরকম উচ্চশিক্ষা পাচ্ছি, অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রাজুয়েট বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বেরুচ্ছে, যারা একেবারে ভগ্নদেহ, বিপদের কালে আত্মরক্ষা করতে পারে না, নিজেদের মা-বোনের মর্যাদা রাখতে পারে না। এইসব ধ্বংসপুঞ্জ দিয়ে সমাজের কোনো উপকার নেই। দেশ চায় দেহে-মনে বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের ; দেশ চায় না সেইসব লোককে যারা বিদেশী সরকারের সেবা করে থাকে, সেইসঙ্গে স্বদেশীয়দের উপর চড়াও হয়। বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিকরাই কেবল দেশকে তুলতে পারবে। বিদেশী সরকারের দাসত্ব ক'রে, তাদের স্বৈরতন্ত্রী শাসনকে বলবৎ করার কাজ করতে তোমাদের মনে ঘৃণা আসা উচিত।"

দু'বছর পরেও নিবেদিতার বক্তৃতার চেহারা বদলায়নি। ১৯০৪ জানুয়ারি মাসে পাটনায় তিনি ছাত্রদের মধ্যে যে বক্তৃতা করেন—বিহার হেরাল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত তার বিবরণীও যথেষ্ট মারাত্মক কথায় পূর্ণ ছিল। ঐ পত্রিকায় লেখা হয় : "ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নি। ভারতবাসীরা কিভাবে জাতি হিসাবে যথার্থ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে, তারই বাস্তব উপায় তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন : 'বালকদের মুখে অপরিমেয় শান্তি দেখলে আমি দুঃখিত হব।...আমি চাই, তোমরা নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ করো, বক্সিং করো, তরবারি খেলো। শান্তশিষ্ট গোবেচারা লোক চাই না—চাই শক্তিধর মানুষ।' "

কেবল বলিষ্ঠ হওয়াই যথেষ্ট নয়, 'বীর' হতে হবে—নিবেদিতার তাই দাবি। "সেই হল বীর, যে লড়াই করে, লড়তে ভালবাসে।...লড়াই করো, লড়াই করো, কেবল লড়াই করো। কিন্তু তাতে নীচতা বা তিক্ততা যেন না থাকে।...যখন সংগ্রামের ডাক আসবে, যেন ঘুমিয়ে থেকো না।" [নিবেদিতার ইংরাজি রচনাবলী, ৫ম, ৩৩৩-৩৪]

॥ ৫ ॥ সংগঠন : বিবেকানন্দ সোসাইটি : বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউস

নিবেদিতা জাতীয়তাবাদী সংস্থা স্থাপনের চেষ্টাও করেছেন। শেষপর্যন্ত এইসব সংস্থা তাঁর অভিপ্রেত কাজ করতে পারেনি কারণ নিজের অনতিদীর্ঘ জীবনে তাঁকে বহু বিষয়ে এত বেশি পরিমাণে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে, স্থাপিত সংস্থার ভিত্তিকে দৃঢ় করার মতো যথেষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর অনুগত জি এন মুখার্জি বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপন করেন, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠান জাতীয়তাবাদের পোষক হয়েও শেষপর্যন্ত ধর্মমূলক কাজই বেশি করেছে। তিনি নতুন ধরনের মঠ তৈরীর কথা ভেবেছিলেন, যেখানে ছাত্ররা জাতীয়তাবাদের শিক্ষা পাবে। [২০.১.১৯০৩, পত্র]। স্বামী সদানন্দের সাহায্যে

সে-ধরনের চেষ্টাও করেন। দুঃসাহসিক জীবনে ছাত্রদের অভ্যস্ত করাবার জন্য, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিচয় সাধনের জন্য, ভ্রমণ-ব্যবস্থা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। [২৯.৪.১৯০৩] (রবীন্দ্রনাথের পত্র রথীন্দ্রনাথ এই ধরনের এক দুর্গম পার্বত্যভ্রমণে সদানন্দের সঙ্গে গিয়েছিলেন)। "বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউস" স্থাপনের পিছনে নিবেদিতার প্রচেষ্টা ছিল। [৮.৯.১৯০৪]।

১৯০৩ সালে স্থাপিত বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের অন্যতম আবাসিক ছাত্র প্রমথরঞ্জন পাল বেশ কয়েকটি চিঠিতে আমার কাছে ঐ বোর্ডিং হাউস ও সেইসূত্রে নিবেদিতার সান্নিধ্যের চমৎকার কথাচিত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। ঐ বহুদর্শী প্রজ্ঞাবান, নানা ভাষা ও বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন মানুষটি যখন (১৯৬৮-৭০) আমার সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন (আমি নিবেদিতা-গবেষণায় লিপ্ত জেনে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে চিঠি লেখেন), তখন তাঁর বয়স ৮৪, কিন্তু স্মৃতিশক্তি যথেষ্টই সতেজ ছিল। তিনি জানিয়েছিলেন—উল্লিখিত ছাত্রাবাস ছিল ৬৪/১ মেছোবাজার স্ট্রীটে, যার বর্তমান নাম মহেন্দ্র শ্রীমানী রোড। তার পাশেই ছিল ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল। চারদিকে মুসলমান বস্তী। বাড়িটি বিরাট, তবে ভূতের বাড়ি বলে দুর্নাম থাকায় সামান্য ভাড়ায় পাওয়া গিয়েছিল। তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন "প্রখর ব্যক্তিত্বশালী স্বামী সচ্চিদানন্দ।" প্রমথরঞ্জন যখন ভর্তি হন তখন আবাসিকের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ।

প্রমথরঞ্জন কয়েকজন আবাসিকের নাম-ধাম, ও পরবর্তী কর্মজীবনের পরিচয় দিয়েছেন, সেইসঙ্গে কোন্ কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তিদের ওখানে দেখেছেন তাও বলেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, বিপ্লবী নেতা পি মিত্র, টাকীর জমিদার যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী। ভগিনী নিবেদিতা তো নিশ্চয়ই।

তাঁর প্রথম নিবেদিতা-দর্শনের স্মৃতি এইপ্রকার :

"মুর্শিদাবাদ সিল্কের গাউন পরিহিতা ; মাথায় চূড়া-করা ঘন সোনালী রঙের চুল ; গলায় বড় রুদ্রাক্ষের মালা ; শান্ত সৌম্য সমাহিত দৃষ্টি। তাঁর দিকে তাকালে আপনা হতেই দৃষ্টি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নত হয়ে আসে। এক কথায় তাঁর হাতে একটি বীণা দিয়ে বসিয়ে দিলে সাক্ষাৎ বীণাপাণি—বেদ-বর্ণিত দেবী উষার রূপ, অথবা বেদ-প্রসিদ্ধ উষার মূর্তি।"

বোর্ডিং হাউসের ব্যবস্থাপনায় নিবেদিতার কি রকম সতর্ক দৃষ্টি ছিল তার বিবরণ প্রমথরঞ্জন দিয়েছেন। নিবেদিতার আবাসে ছাত্রদের গমন ও সেখানকার অভিজ্ঞতার কথাও বলেছেন। সে অভিজ্ঞতার কথা বলবার সময়ে তিনি আবেগে অভিভূত হয়েছেন। নিবেদিতার আবাসে তাঁরা স্বামী সারদানন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে দেখেছেন এবং তাঁদের উক্তি বা ভাষণ শুনেছেন। (গোখলের ভাষণের দীর্ঘ স্মৃতিকথা এইসূত্রে পেয়েছি)। সেসব প্রসঙ্গের প্রয়োজন এখানে নেই, তবে একটি ঘটনার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে—বোর্ডিং হাউসের ছাত্রদের সামনে নিবেদিতার অগ্নিঝলকের মতো একটি ভাষণ এবং তার শেষে আশ্চর্য এক উচ্চারণ—যা প্রমথরঞ্জনের কাছে মনে হয়েছিল ভবিষ্যতের ভেরীধ্বনি। নিবেদিতা এই ধরনের ঘটনার সৃষ্টি হয়ত অবিরাম করতেন, কিন্তু একটি তরুণের মনোজগতে তা কী অসাধারণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—ঘটনা ঘটে যাবার বহু বৎসর পরে লেখা স্মৃতিকাহিনী থেকে তা জানতে পেরে চমৎকৃত হতে হয়। এই ঘটনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না নিবেদিতা কিভাবে যুবকদের মনে আগুন জ্বালাতেন।

প্রমথরঞ্জন লিখেছেন :

"১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরের এক রবিবার, বেলা তখন প্রায় একটা, ছুটির দিন, আমরা কেহ স্নান করছি, কেহ-বা আহারে বসবার উপক্রম করছি, হঠাৎ ভগিনী উপস্থিত। আমরা তাঁকে দেখে সবাই খুশি। তিনি বললেন, কোনো বিশেষ কাজে ভবানীপুরে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। আমরা অনেকদিন কেন তাঁর কাছে যাই নাই জিজ্ঞাসা করলেন এবং ঐদিন তাঁর আবাসে বিকালে যাবার জন্য বলে গেলেন। আমরা ৬-৭ জন বন্ধু মিলে তাঁর ওখানে বেলা ৪-৩০ নাগাদ গেলে তিনি আমাদের রসনা প্রথম [বাগবাজারের] নবীন [ময়রার] রসগোল্লায় তৃপ্ত করলেন।...তারপর উপরে তাঁর বসার ঘরে সবাই কম্বলের উপর উপবেশন করলে তিনিও আমাদের পাশে বসলেন। প্রথমে আমাদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া, অভাব, অসুবিধা ইত্যাদি খুঁটিনাটির খবর নিলেন। আমরা কেন আসি নাই জিজ্ঞাসা করলে কেহ বলেন (আমিও বলি) ডন সোসাইটি ও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভা হওয়ায় ও ওসব স্থানে যাওয়ার জন্য নিয়মিত আসা সম্ভব হয় না। ডন সোসাইটির সভা হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, বললেন, উক্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তারপর ...শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দু'একটি ধর্ম উপদেশের প্রসঙ্গ উঠলে ভগিনী আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন :

"What do you mean by *DHARMA?*"

[তোমরা ধর্ম বলতে কী বোঝ?]

"আমরা পাঁচ-ছয়জন একে-একে উত্তর দিই।—

"(১) ধর্ম মানে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ এবং সকল অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্ট থাকা।

"(২) ধর্ম মানে, পিতামাতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্য করা, কেবল নিজের ভাই বোন আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসা নয়, শ্রেণী বর্ণ নির্বিশেষে সকল পাড়া-প্রতিবেশী, ও অন্য মানুষকে ভালবাসা।

"(৩) ধর্ম মানে, শাস্ত্রে যেসব বিধিবিধান আছে তাদের সযত্নে পুরোপুরি পালন করা।

"(৪) ধর্ম মানে, বাক্যে ও কর্মে সত্যসন্ধ ও বিশ্বস্ত হওয়া ; প্রত্যেকের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ভদ্র আচরণ করা।

"(৫) ধর্ম মানে, অপরের কল্যাণ করা, তাদের সাহায্য করা, এবং তা করবার সময়ে কোনো কিছুর পরোয়া না করা—তাতে যত দুঃখ, বিপদ আসে আসুক, মৃত্যুও যদি হয় হোক।

"(৬) ধর্ম মানে, মহাভারত যা বলেছে : 'ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্ম ধারয়তে প্রজাঃ। যৎ ধারণা সংযুক্তম্ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।' [উপস্থিত সংস্কৃত কলেজের এক ছাত্র শ্লোকটি ইংরাজি অনুবাদসহ বলেন]।

"ভগিনী বললেন :

> I have heard you all most patiently and I am much pleased with your views and versions and appreciate these highly.

True! that which you all have just said, is what *SANATANA DHARMA* teaches or senses.

But my dear young boys, besides all your conception or knowledge of *DHARMA* I shall now tell you something of a higher, nobler and more sacred factor in your lives which I would urge most honestly and emphatically to you all to follow or act as your sublimest and greatest *DUTY*, the first and foremost obligation.

You all are required first to know your Motherland—your great *MOTHER*!

MOTHER BHARAT BARSHA!

You must not discriminate, distinguish, or differentiate between them—Mother Country or Mother.

I would advise you to see Her, go round Her, to know Her people, their religion, culture, literature, language, customs and traditions, in one word their history thoroughly to meet them and mix with them intimately often whenever such an opportunity occurs to love them. Just as a son or a daughter behaves or mixes with his or her mother freely and intimately, so you should love Her, respect Her, serve Her, worship Her with most reverential salutations!

BANDE MATARAM

"বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করলেন সুস্পষ্ট সংস্কৃতে।

"বলার পর ভগিনী নীরব রইলেন।

"শুধু আমি নয়, অন্য সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে ঐ সময়ে লক্ষ্য করেছি; যতক্ষণ তিনি মাতৃভূমি ভারতমাতার সম্বন্ধে বলছিলেন তাঁর মুখমণ্ডল এক অনির্বাচনীয় দিব্য জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল।

"কিছু পরে তিনি বললেন,

"Go back to your Boarding, your homes, think, ponder seriously and meditate over this most sublime mantram and sacred subject and the word—*BANDE MATARAM*.

"ঘটনার কাল ১৯০৩, সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর।

"সেদিন ঐ বলে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন, এবং আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। অন্যান্য দিন আমাদের অন্য দু'চার কথা বলতেন, সেদিন ঐ 'বন্দেমাতরম্' ছিল তাঁর শেষ বাণী। আমাদের সকলের মনে কি-যেন-এক পরম পবিত্র ভাবের উদয় হল। লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি একটিবারও ভারত সম্বন্ধে 'It' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, সর্বদাই বলেছেন 'Her'—এবং আমাদের সেইভাবে নিতে বলেছিলেন।

"ফেরবার সময়ে আমরা পরস্পর কোনো আলোচনা না করে শুধু ঐ দৃশ্য বা ঘটনার চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। তাঁর উদাত্ত উক্তির মধ্য দিয়ে কি গুরুগতপ্রাণা ব্রহ্মবাদিনী ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই শোনান নি, গুরুর আত্মাই প্রিয় শিষ্যার দেহাবলম্বনে দেশমাতৃকার সেবায় শিক্ষাদান করে নি?

"সেদিন ভগিনীর 'বন্দেমাতরম্' বাণী শুনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর অবদান আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সত্যানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতির কথা স্মৃতিপথে আসে। আমি তার আগে আনন্দমঠ অভিনীত হতে দেখেছিলাম, কলকাতার স্টার থিয়েটারে এবং মেদিনীপুরের হিন্দু থিয়েটারে। কিন্তু তাদের সঙ্গে এইদিনকার সম্বন্ধ খুঁজে পাইনি।

"বোর্ডিং-এ ফিরে হাত-পা-মুখ ধুয়ে যে যার কামরায় গেলাম। আমার কেবলই মনে পড়ছিল ভগিনীর তেজোদৃপ্ত বাণী—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। বন্দেমাতরম্।

"খাবার ঘন্টা পড়লে খাবার ঘরে গেলাম। দফায়-দফায় আহার হত। আহারের পরে প্রাঙ্গণে বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হত। সেদিন কথাবার্তার সময়ে ভগিনীর বাড়িতে অপরাহ্নের ঘটনার কথা উঠল। যারা সেদিন যায় নি তারা অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে লাগল। কয়েক দফায় ঘটনার কথা বিবৃত করতে হল।

"পরদিন অপরাহ্নে কলেজ থেকে ফিরে আমরা জলখাবার নিয়ে ব্যস্ত এমন সময় একজন তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল যে, ভগিনী নিবেদিতার গাড়ি ফটকের সামনে উপস্থিত। সাধারণতঃ তিনি সেকেন্ড ক্লাস বন্ধ গাড়িতে আসতেন, তাতে রাস্তায় লোহার চাকার ঘর্ঘরধ্বনি শুনে আমরা বুঝতে পারতাম, তিনি এসেছেন। কিন্তু সেদিন এলেন ফার্স্ট-ক্লাস ফিটন গাড়িতে যা চৌরঙ্গীর ইউরোপীয়দের বাসস্থানের নিকটে ব্যবহৃত হত। ঐসব গাড়ির চাকা রবার-মোড়া বলে শব্দ হত না। আমরা বুঝলাম, তিনি চৌরঙ্গীর দিক থেকে এসেছেন।...

"ভগিনীর আগমনে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। দেখি যে তিনি দারোয়ানকে গাড়ি থেকে একটা লম্বা প্যাকেট নামাতে বললেন। খবর পেয়ে ম্যানেজার শশব্যস্ত হয়ে এলেন।... ভগিনী উপরে এলে আমরা তাঁকে অভিবাদন জানালাম। তিনি প্রতিনমস্কার করলেন। তাঁকে বাড়ির মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আনা হল। তিনি একজনকে বললেন, পরিচালক-স্বামীজী যদি অসুবিধা বোধ না করেন একবার যেন আসেন। তিনি এলে ভগিনী হাঁটু গেড়ে নত মস্তকে প্রণাম করলেন।...

"ভগিনী ম্যানেজার মহাশয়কে আগেই একটি বড় পেরেক ও হাতুড়ি আনতে বলেছিলেন। দারোয়ান সেগুলি আনলে ভগিনী স্বামীজীকে দেওয়ালে পেরেক পুঁতবার অনুমতি চাইলেন। তারপর দারোয়ানকে বললেন, প্যাকেটটি খুলতে। প্যাকেট খুললে দেখা গেল, সেটি ভারতবর্ষের একটি বিরাট মানচিত্র, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট, প্রস্থে ৫ ফুট। খোলামাত্র ভিতর থেকে ক্যাশমেমো পড়ল—ভারতবর্ষের দেওয়াল-ম্যাপ, দাম ২৫ টাকা, থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং ইত্যাদি। উপরে নীচে রোলার-দেওয়া, পিছনে কাপড়-লাগানো। বুঝলাম, কেন তিনি ফার্স্টক্লাস ফিটনে এসেছেন। মানচিত্রটি দেওয়ালে টাঙানো হল।

"ভগিনী স্বামীজী মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

"Swamiji, last evening some of your boys came to my place and

I had a very happy time with them. Casually as controversy arose when I asked them what they meant by Dharma. The interpretations were interesting. One of them said, 'It meant the observation of the moral order.' One said, 'Faith in God and his doings.' One quoted a sloka from the Mahabharata meaning 'that which holds together is Dharma.' Pal [meaning me] said, 'To help the needy and distressed even at the sacrifice of one's life is Dharma.' Their definitions impressed me much and I told them what they all said related to Sanatana Dharma, but for them, the young Indians, Dharma meant to think, treat, worship India, their Motherland as their own mother.

"Swamiji, with your kind permission I wish to address a few words to these boys. [On Swamiji's saying 'with pleasure' Sister addressed us thus :]

"My dear boys, you have all read geography in your school days. What you have read, heard, or seen was only about the physical feature of India's mountains, hills, rivers, lakes, deserts etc. The map which you see now hung in the wall before you, is not merely a vast sheet of paper in print, but this is the picture of your Mother. From Kashmir to Kumarika is a living and throbbing entity. The mountains, the hills are Mother's bones, the rivers and streams are her arteries, and veins. The vacant spaces you see are not mere heaps of clay, mud or sand but her flesh. The trees, plants are her hairs....

"এই ধরনের অনেক কথাই তিনি বলে চললেন :

"তোমাদের এই পুণ্যভূমি যুগে-যুগে মহাপুরুষদের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে, রচিত হয়েছে মহাগ্রন্থগুলি, যাদের তুলনা নেই। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা—বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বেদব্যাস, রচনা করেছেন তোমাদের সংস্কৃতির মূল ইতিহাস। মনু, যাজ্ঞবল্কের নীতিশাস্ত্র পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের মৌলিকতা ও বিচক্ষণতায় সবাই বিস্মিত ; অর্থশাস্ত্রের জগতে নূতন দিশার সন্ধান দিয়েছে তা। কুরুক্ষেত্রে উচ্চারিতা গীতা পৃথিবীতে অতুলনীয়, যে সম্পদের জন্য যুগ-যুগ ধরে ভারতবাসী গর্ব বোধ করতে পারে। কুম্ভমেলায় বিরাট উৎসব, যেখানে লক্ষ-লক্ষ মানুষের সমাবেশ, তার হোতা এই ভারতবর্ষ। পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান ক'রে ক্লেদমুক্ত হওয়ার কি সুন্দর সামাজিক উৎসব। প্রতি বারো বৎসরে ভারতের চারটি বিশিষ্ট স্থানে—উজ্জয়িনী, নাসিক, হরিদ্বার, প্রয়াগে এই উৎসব হয় স্মরণাতীত কাল থেকে।

"এই ভারতবর্ষেই শান্তিদূত গৌতম বুদ্ধের মহানির্বাণ। ধর্মগুরু আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, ও চৈতন্যদেবের বাণী ও শিক্ষা এখানে প্রচারিত হয়ে পৃথিবীকে আলোক দিয়েছে। সাধক রামপ্রসাদের ভক্তিরসের সঙ্গীতগুলি আপ্লুত করেছে এদেশবাসীকে। নবযুগের অবতার হয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ সুগম্ভীর উপ-

দেশ দেশে-দেশে আলোড়ন এনেছে। তাঁর শিষ্য ও মন্ত্রপুত্র [স্বামী বিবেকানন্দ] সর্বত্র প্রচার করেছেন এই ধর্মসত্য, তিনি পৃথিবীর কাছে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন এই ধর্মের মর্যাদা।

"রত্নগর্ভা ভারতমাতার আরও যেসব কৃতী সন্তান সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন তাঁদের উল্লেখ না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অজস্র তাঁরা। তাঁদের অগ্রণী রাজা রামমোহন রায়, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য চিরস্মরণীয়; শত শত অসহায় বিধবাকে বেঁচে থাকার অধিকার তিনি দিয়েছিলেন। তাতেও বিধবাদের চোখের জল শুকোয় নি। সমাজের নিষ্ঠুর বাধা, সমাজপতিদের বিচিত্র উন্না-সিকতার জন্য বিধবাদের জীবন সুকঠিন যন্ত্রণায় পূর্ণ। মুক্তিমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বিধবা বিবাহের প্রচলনকারী। সামাজিক প্রথার কশাঘাতে যেসব নিষ্পাপ নিরপরাধ ফুলের মতো মেয়েরা কুঁড়িতেই শুকিয়ে যেত, তাদের তিনি প্রাণভরে পৃথিবীর আলো ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। পুনার মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, ডাঃ রঘুনাথ পুরুষোত্তম বাজপেয়ী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বাংলার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়েছেন। এ ছাড়াও আরও অনেক মনীষী আছেন যাঁদের নাম তোমরা ক্রমে জানবে, বিস্মিত হবে তাঁদের গভীর জ্ঞান ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

"তোমরা অবকাশ পেলেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবে [ভগিনী বলে চললেন]—ভ্রমণের দ্বারা মাতৃভূমির স্বরূপ বুঝতে পারবে। যে প্রান্তেই যাও, সেখান-কার অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করবে। বিচিত্র জ্ঞানের সন্ধান পেতে ভ্রমণ প্রকৃষ্ট পন্থা।

"তোমরা যেমন আজ তোমাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে চলেছ, তাঁদের নির্দেশিত পথ আজ যেমন তোমাদের উপকৃত করছে, ঠিক তেমনি তোমাদের উত্তরসূরীরা যেন তোমাদের পথে চলতে পারে, এইভাবে নিজেদের গড়ে তুলবে।

"উত্তরকালে তোমরা শিক্ষা বা বাণিজ্যের জন্য কিংবা দেশভ্রমণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাবে। কিন্তু একটা কথা সব সময় স্মরণ রাখবে—যে-দেশেই যাও, ভারত-মাতার মূর্তি যেন তোমাদের মনে মলিন না হয়। তিনি যেন তোমাদের হৃদয়কেন্দ্রে বিরাজ করেন।

"Wherever you go, your Mother's portrait which you see here let occupy the centre of your heart and Her thoughts crowd your memory.

"ভাবাবেগে ভগিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তিনি নির্নিমেষ নয়নে কিছুকাল ভারত-বর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। আমরা বিভোর হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। ভগিনীর কথায় আমাদের সংবিৎ ফিরল। তিনি বললেন,

"তোমরা সকলে এবার কিছুকালের জন্য বাহ্যদৃষ্টি বন্ধ করো; মানসচক্ষে ভারত-মাতার চরণদর্শন করো; প্রণতি জানাও সেখানে। আর আমার সঙ্গে একবার কণ্ঠ মিলিয়ে বলো—বন্দেমাতরম্।

"আমাদের সমবেত উদাত্ত ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্' ছাত্রাবাসের প্রাকারে প্রতিধ্বনি তুলল —ব ন্দে মা ত র ম্।"

প্রমথরঞ্জন পালের এই স্মৃতিকথার অংশ দীর্ঘ হলেও উপস্থিত করলাম, কারণ এর দ্বারা কিছুটা বোঝা সম্ভব নিবেদিতা কোন্ প্রবল ভাবস্রোতে তরুণদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। প্রমথরঞ্জন প্রসঙ্গশেষে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"১৯০৩ সালে একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে বে-পুতে শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে মাতৃমন্ত্র তুলে এনে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন।"

নবম অধ্যায়

নিবেদিতা ও ডন সোসাইটি

॥ ১ ॥ ডন সোসাইটির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক

নিবেদিতার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি তাঁর অভিপ্রেত ভাবকে কার্যকর করতে পারেনি, একথা আগেই বলেছি। নিবেদিতা, সেজন্য আমরা লক্ষ্য করি, অন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে স্বকার্যসাধন করতে চেয়েছেন। তেমন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডন সোসাইটি।

ডন সোসাইটির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়টি তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। লিজেল রেমঁ তাঁর নিবেদিতা-জীবনীতে বলেছেন :

ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলীতে অনুপ্রাণিত ছিলেন ; [অত্যন্ত সত্য কথা ; এ-বিষয়ে প্রচুর তথ্য দিয়েছি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে] ; তিনি নিবেদিতার প্রভাবে ডন পত্রিকা-আশ্রিত ছাত্র-সংগঠনকে জোরদার করে গঠন করেন। নিবেদিতা ওখানে দার্শনিক শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক বিষয়গুলির শিক্ষায় জোর দিতে থাকেন ; তিনি সেখানে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক শিক্ষাদান করতে প্রয়াসী হন ; ডন সোসাইটির বক্তৃতাদির সময়ে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রণোদিত করেন ; বিবেকানন্দের আদর্শ নিতে বলেন ; 'জাতীয়তা' বিষয়ে শিক্ষা দেন ; তরুণদের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে চেষ্টা করেন ; তাদের বলেন, ছেড়ে দাও সরকারী চাকরি, যে-কোনো চাকরিই ছাড়ো! তাদের সামনে অশোক ও আকবরের আদর্শ তুলে ধরতেন।

রেমঁ আরও বলেছেন, "নিবেদিতা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।"১

ডন সোসাইটি বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাত হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় বিপ্লব আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা বিষয়ে লিজেল রেমঁ, এবং বহুলাংশে তাঁর অনুসারী গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ কয়েকবার করেছেন, এবং একবার ডন সোসাইটির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়ে রেমঁ-র বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অতিশয় কটু ভাষা প্রয়োগ করেছেন। [দ্রষ্টব্য, মুখোপাধ্যায়দ্বয়ের রচিত 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ,' যুগান্তর, ১৫ অক্টোবর, ১৯৬১]। এক্ষেত্রে বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে, কোন্ সুস্পষ্ট তথ্য পেয়েছি তা জানানোই শ্রেয়ঃ।

প্রথমেই একটি বিষয়ে রেমঁ-র ধারণার ভ্রান্তি জানিয়ে দিতে হয়—নিবেদিতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গুণগ্রাহী বন্ধু হতে পারেন, ক্ষেত্রবিশেষে সহযোগীও হতে পারেন—কিন্তু তিনি কদাপি সতীশ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, কারণ নিবেদিতা ছিলেন বৃটিশ শাসন ও

১ Lizelle Reymond, *The Dedicated*. 284-86.

বৃটিশ রাজতন্ত্রের ঘোর শত্রু আর সতীশচন্দ্র অত্যন্ত রাজভক্ত। বাংলায় যখন ঘোর বৈপ্লবিক আন্দোলন চলেছে, সেই সময়ও সতীশচন্দ্র ইংরাজ শাসনকে ঐশ্বরিক শাসন বলে ঘোষণা ক'রে সবিনয়ে বলেছেন—ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা এই রাজতন্ত্রের সবিশেষ ভক্ত। এটা তাঁর পক্ষে নতুন কাজ নয়, ১৯০১ সালে তিনি রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে একই কাজ করেছিলেন।২ আমরা দেখি, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ সম্বন্ধে গোড়ায় নিবেদিতার উৎসাহ থাকলেও শেষের দিকে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। ২৫ নভেম্বর, ১৯০৯, তিনি লেখেন : "ন্যাশন্যাল কলেজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির খপ্পরে এখন। উত্তেজনার তুঙ্গক্ষণে তার প্রতিষ্ঠাতা—তার জাতীয়তা শব্দমাত্র—তা না বস্তু, না ভাব ;...সংকীর্ণ রক্ষণশীলতায় উল্টে পড়া তার অবধারিত নিয়তি।"৩ ডন সোসাইটি সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায়দ্বয়কে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার যা বলেছেন তাকে অবশ্যই স্বীকার ক'রে নেব : "এটি অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জাতীয়তার সংগঠন।"

॥ ২ ॥ ডন সোসাইটি ম্যাগাজিনে নিবেদিতা সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাসূচক মন্তব্য

এতৎসত্ত্বেও সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে বলব—নিবেদিতা ডন সোসাইটির সদস্যদের কাছে

---

২ 'ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন'-এর জুন ১৯১০ সংখ্যায় সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে যে "ইন মেমোরিয়াম" বেরোয় তাতে একটি দীর্ঘ কবিতা উধৃত ছিল। সেইসঙ্গে সম্পাদকের বেদনার্ত মন্তব্য। তার অংশ :

"The Hindus, notwithstanding the process of denationalising that they are undergoing, still believe that a Sovereign is no mere secular institution and the essense of their *loyalty consequently rests on no mere* secular basis. The idea of Divine Government on earth is still with the vast majority of them, not a remnant of a bygone age, but contitutes an essential part of their creed."

এই ধরনের আরও কথা সম্পাদক ভাবাবেগে লেখেন।

কুইন ভিক্টোরিয়া মারা যাবার পরে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ ইংরেজি শোক-কবিতা লিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন, সেটির পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন ডন পত্রিকার, জানুয়ারি ১৯০১ সংখ্যায়। "মাদার ভিক্টোরিয়া" সম্বন্ধে সেই ব্যাকুল গাথার মধ্যে সতীশচন্দ্র নিজ হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়া যে ঈশ্বর-প্রসাদে ভারতশাসন করছেন, একথা সতীশচন্দ্র পুনঃপুনঃ না বলে পারেন নি। তাঁর কবিতার মাত্র কয়েক লাইন নিম্নে :

"Loved Mother! God's elect to reign on Earth....
....Thou hast borne
Supremely well the Sovereign's burthen....
Thou, a Queen on Earth
To do His high behests....
The angels bright guarded Thy steps on Earth,
The angels bright befriend Thee in Heaven."

৩ সতীশচন্দ্র অবশ্য স্বাস্থ্যের কারণে ১৯০৮-এর শেষের দিকে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ থেকে অবসর নেন। [রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'হিস্টরি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট' ২য়, ৮১]

প্রকাশ্যে উগ্র রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন এবং অপ্রকাশ্যে এখান থেকে নিজ দলের সদস্য জোগাড় করেছেন। যথা, ডন সোসাইটির ইন্দ্রনাথ নন্দী নিবেদিতার দলভুক্ত ছিলেন। [পরে অবশ্য নিবেদিতার সন্দেহ হয়, নন্দী বিশ্বস্ত নন। (১৭.২.১৯১০ পত্র)]।

কল্পনাবিলাসী বলে নিন্দিত লিজেল রেম'-র অধিকাংশ মন্তব্যের ভিত্তি যে, ডন পত্রিকা, তা পত্রিকাটির পৃষ্ঠা ওল্টালেই বোঝা যাবে। ১৯০৪-০৫ সালের ডন পত্রিকায় নিবেদিতার বেশ কিছু উল্লেখ, তৎসহ তাঁর আলোচনা বা বক্তৃতার সারসংক্ষেপ আছে। ডন পত্রিকার নব পর্যায়ের (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪) প্রারম্ভিক সম্পাদকীয় বক্তব্যে পত্রিকার প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতিসম্পন্নদের তালিকায় নিবেদিতার নাম ছিল। ডন সোসাইটি যে, নিবেদিতার সত্যই 'সক্রিয়' সমর্থন পেয়েছিল, তা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নভেম্বর, ১৯০৫ সংখ্যায় জানিয়েছেন :

"The Society cannot be too grateful to the donor [of the Vivekananda Medal, Sister Nivedita,] for the very special interest she has been taking in the welfare of the student community generally, and of our Society in particular."

১৯০৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় দেখি, ডন সোসাইটির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিবেদিতা উদ্দীপক বক্তৃতায় দ্বারা জাতীয় ভাবমূলক কর্মে ছাত্রদের প্রণোদিত করেছেন।—

"[She] spoke most eloquently for about three quarters of an hour on the importance of the national work for Indians at this the turning point of the 20th century. She also commented favourably on the spirit of work displayed by the Society—work in various directions which have but one goal, the making of its members better workers for the country."

এ রকম অন্য অনুষ্ঠানে নিবেদিতার উপস্থিতির সংবাদও আছে।

॥ ৩ ॥ "বিবেকানন্দ মেডাল" প্রসঙ্গ

ভারতীয় জাতীয়তা সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রবন্ধের জন্য নিবেদিতা "বিবেকানন্দ গোল্ড মেডাল" পুরস্কার ঘোষণা করেন। এর সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র নভেম্বর ১৯০৫ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, তার শেষাংশে বিবেকানন্দ গোল্ড মেডালের প্রতিযোগীরা কোন্-কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে পারেন তার তালিকা ছিল। ঐ তালিকার বিষয়বস্তুগুলি নিবেদিতার জাতীয়তা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানি প্রকাশ করেছে। আর এদেরই একাংশ লিজেল রেম' নিবেদিতার মুখে বসিয়েছেন (সঙ্গতভাবেই সে কাজ করেছেন)— ডন সোসাইটির ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁর বাণীরূপে।

Subjects for Theses for the Vivekananda Gold Medal:

1. That the work of the Indian Religious Teachers has always been more or less fruitful in some awakening of the national sense.

2. That great men have a passionate love for the common people.

3. That his country has a greater claim on a man than his family.

4. That all the Indian peoples together form an organic unity.

[Note. This may be taken that as the parts of the human body are all different from each other, and yet united *to form a single organism*, so there may be some such relationship among the Indian peoples]

5. That Hindu and Mohamedan life and thought are alike in many important characteristics, which distinguish them both from Western.

6. That the lives of Asoka and Akbar, taken together, prove that in India the idea of democracy is essential to nationality.

[Note. It will be understood that the word democracy carries with it the idea that everyone is free to develop himself to the utmost, regardless of his birth.][৪]

---

৪ শিব নারায়ণ নামক পাঞ্জাবের এক গ্রাজুয়েট জাতীয়তার সূত্র রচনা ক'রে বিবেকানন্দ গোল্ড মেডাল পান। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড্ পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ তারিখে, সে সম্বন্ধে যে-সংবাদ বার করে, ইংলণ্ডের রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় এপ্রিল সংখ্যায় সেটির সংকলন করা হয়। নিম্নে তা উদ্ধৃত হল।

The Nationalists of India
A Notable Credo

The *Indian World* of February publishes the following Credo of Indian nationality, which has won for its writer, a Punjab graduate, the Vivekananda gold medal, which was offered for general competition in the September number of the *Indian World*:—

1. I believe in India, one and indivisible. 2. I believe in India, beloved mother of each and all her many million children. 3. I believe in India's divine mission. 4. I believe in the saints of her birth, and the heroes of her breeding. 5. I believe in India the invincible, whom the world's loftiest and holiest mountains defend. 6. I believe in the invigorating power of the ocean, on whose lap lies my mother secure. 7. I believe in India, the beautiful;—Nature's own paradise of loveliest flowers and streams. 8. I believe in the sanctity of her every particle. 9. I believe in India's departed sons, whose ashes are mingled in the air, earth and water, that give me my food, and form my very blood. 10. I am bone of their bone and flesh of their flesh.

॥ ৪ ॥ ডন সোসাইটিতে নিবেদিতার জাতীয়তা-বিষয়ক বক্তৃতা ও তার রিপোর্ট

জাতীয়তা বিষয়ে নিবেদিতার আলোচনা বা বক্তৃতার চারটি বিস্তৃত রিপোর্ট ডন পত্রিকায় দেখেছি। তার একটি—নরওয়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তাতে ওলি বুল প্রমুখের ভূমিকার আলোচনা। মিসেস বুলের অনুরোধে নিবেদিতা ওলি বুল সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন—সেটি আমেরিকার 'সেঞ্চুরী' পত্রিকায় বেরোয়, অন্য পত্রিকাতেও তার উল্লেখ করা হয়েছিল, যথা উইলিয়ম স্টেডের রিভিউ অব রিভিউজে।৫ নিবেদিতার চিঠিতে ওলি বুল প্রবন্ধের বিষয়ে অনেক উল্লেখ আছে। [১৪.৪.১৯০৪ ; ১৪.৭.১৯০৪ ; ২৪.৪.১৯০৪ ; ১৩.১১.১৯০৪]। উক্ত প্রবন্ধের খসড়া-রূপের কিছু অংশ আমরা রেমং-সংগ্রহে পেয়েছি, এবং নিবেদিতার ইংরাজি পত্রাবলীর সঙ্গে প্রকাশও করেছি। [২৫.৮.১৯০৪ পত্রের সঙ্গে]। মিসেস বুলের দেহান্তের পরে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় জুন ১৯১১ সংখ্যায় "ইন মেমোরিয়াম : সারা চ্যাপম্যান বুল" নামে যে-প্রবন্ধ লেখেন, তার মধ্যে নরওয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওলি বুলের ভূমিকার কথা ছিল। [প্রবন্ধটির অনুবাদের জন্য এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫৬০-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

---

11. I believe in the abiding relationship of Indians of all times and all communities. 12. I believe in the brotherhood of all who belong to India's soil, be they of whatsoever caste or creed. 13. I believe in the living Indian nation, dearer to her children than aught else of earthly kinship. 14. I believe in its golden past and glorious future. 15. I believe in the righteousness, valour and patriotism of Indian manhood. 16. I believe in the tenderness, chastity and selflessness of Indian womanhood. 17. I believe in India for the Indian people to live for and to die for. 18. I believe in one land, one nation, one ideal, and one cause. 19. The service of my countrymen is the breath of my life—the be-all and end-all of my existence. 20. So help me Bharat! *Bande Mataram.*—SHIV NARAYAN

এই সূত্রে জানাই, আনন্দ কুমারস্বামী অগস্ট ১৯০৮, হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রিকায় "দি নিউ বার্থ ইন ইণ্ডিয়া : এ লিডিং মুভমেন্ট" প্রবন্ধের মধ্যে শিব নারায়ণের সূত্রগুলি উদ্ধৃত করেন।—"আনন্দ কুমারস্বামী প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, ভারতবর্ষের যথার্থ ঐক্য এবং জাতীয় আত্মচৈতন্য আছে, এবং তিনি শিব নারায়ণের মতসূত্র উদ্ধৃত করেছেন—সেগুলি নব আন্দোলনের খাঁটি প্রকাশ বলে"—রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ সংখ্যায় লেখা হয়।

৫ OLE BULL AND NORWEGIAN INDEPENDENCE

Recent events in Norway lend special interest to the article on Ole Bull as a Patriotic Force, which Miss Margaret E. Noble has contributed to the September number of the *Century Magazine*.

রিভিউ অব রিভিউজে, সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সংখ্যায় এর পরে নিবেদিতার প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ করা হয় যার মধ্যে নরওয়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মূলে ওলি বুলের বিরাট ভূমিকার কথা ছিল। নরওয়ের 'বিশুদ্ধ পতাকা', 'জাতীয় দিবস', 'জাতীয় থিয়েটার', 'জাতীয় সঙ্গীত'—ইত্যাদি সবকিছুর মূলেই ওলি বুল। এসব কথা আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সারা বুলের উপরে লিখিত নিবেদিতার প্রবন্ধে আগেই কিছু-কিছু দেখেছি।

নিবেদিতা ১৯০১ সালে নরওয়েতে ওলি বুলের প্রস্তাবিত প্রতিমূর্তির উন্মোচন উপলক্ষে মিসেস্ বুলের জন্য ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন, [৪.৪.১৯০১], তাও জেনেছি।৮

সুইডেনের পদানত নরওয়েতে জাতীয়তার সূচনা এবং পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে নিবেদিতা ভারতীয় ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যের উপর নির্ভর করে একটি লেখা বেরোয় ডন-পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সংখ্যায়। [*Topics for Discussion: The Birth of the National Idea: Or the Awakening of the National Sense in the People.*] লেখাটিতে জোর দিয়ে এই কথাটাই বলা হয়েছিল, "জাতীয় ভাব" মানে "কোনো জাতির মানুষের কাছে সেই জাতির সম্পদকে ফিরিয়ে আনা।" নরওয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনসূত্রে বলা হয় : কিভাবে সুইডেনের পতাকা থেকে নরওয়ের পতাকাকে পৃথক করার জন্য "বিশুদ্ধ পতাকা" আন্দোলন করা হয়, কিভাবে নরওয়ের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কিভাবে তার "জাতীয় দিবস," "জাতীয় সাহিত্য", "জাতীয় সঙ্গীত", "জাতীয় বাদ্য", "জাতীয় উৎসব" ইত্যাদির প্রবর্তন বা পুনরুজ্জীবন করা হয়। বারেবারে এই কথাটাই প্রত্যয়ের সঙ্গে উপস্থাপিত হয় : "সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে প্রেম ও প্রত্যাশাই হবে জাতীয়তার ভিত্তি"—আর তা কদাপি ঘটতে পারে না যতক্ষণ-না "জনগণ নিজের দেশকে সামগ্রিক রূপে দেখতে সমর্থ হচ্ছে।" ঐ দর্শনের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক—পরাধীনতা। জনগণের পক্ষে পরাধীনতার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছু নেই।—

"A people who have been subjected to a foreign domination for a long long time, have ceased to think of their country as a whole, and this, above everything else, represents the heaviest loss that can come upon an entire community or a people."

---

৮. রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় ১ মে, ১৯০১ সংখ্যায় ওলি বুল সম্বন্ধে যে-লেখাটি বেরোয় তার পিছনে নিবেদিতার হাত ছিল অনুমান করা যায়। লেখাটি হল :

The Ole Bull Commemoration: A Salute to Norway, May 17, 1901

১৮১৪ সালের ১৭ মে নরওয়ে সুইডেনের কাছে চারশো বছরের পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পায়। ঐ ১৭ মে তারিখটিকে স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান স্থপতি ওলি বুলের মূর্তি স্থাপনের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এইসূত্রে রিভিউ অব রিভিউজের দীর্ঘ লেখাটির কয়েক লাইন :

"Norsmen and citizens of Bergen, you will meet this year to do honour to the memory of the man who did this thing [i.e, 'who carried the torch from which hundreds more have caught the flame of patriotism']—for his name was *Ole Bull.*

"He it was who, more than any other, caught the prevision of Norway free, peaceful, prosperous; he it was before any other, who caught the sound of a *greater poem than those of old—the wonderful song of the Modern,* the Saga of Freedom, and of the People and of Peace. And this his vision and his listening, more than any other single force that one could name, made for your realisation of the things that he foreheard and saw."

এর পরে ওলি বুলের প্রতিভায় ও সংগ্রামে আন্দোলিত জীবনের উৎকৃষ্ট বর্ণনা বা কল্পনা আছে।

নিবেদিতার সঙ্গে রিভিউ অব রিভিউজের সম্পাদকের সম্পর্কের কথা পরে আলোচিত হবে।

এইসব আলোচনার বিবরণ লিখেছিলেন ডন সোসাইটির ছাত্রগণ। আমরা স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি, নিবেদিতার সব কথা লিখে নেওয়া সম্ভব ছিল না, এবং লিখলেও প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তবু যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে থেকেই রীতিমতো তীব্র দেশাত্মবোধক অংশ বেরিয়ে এসেছে।

১৯০৫, সেপ্টেম্বর সংখ্যাতেই "জেনারেল ট্রেনিং ক্লাসের একজন পঞ্চম বার্ষিক এম-এ ক্লাসের ছাত্র—ডন সোসাইটির সদস্যদের কাছে প্রদত্ত নিবেদিতার জাতীয়তা সম্বন্ধীয় বক্তৃতার সারাংশ" প্রকাশ করেন। বক্তৃতাটি দেওয়া হয় ১৪ অগস্ট ১৯০৪। [মাদ্রাজের ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯০৪ সংখ্যায় এটি বেরিয়ে গিয়েছিল]। এর মধ্যে দেখি, ভারতীয়গণ নিজেদের মধ্যে আক্রোশপূর্ণ মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত—তা নিয়ে নিবেদিতা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন—"সকল প্রকার সংগঠন ও আন্দোলনের সমন্বিত সক্রিয়তা" ভিন্ন জাতীয়তা-সৃষ্টি সম্ভব নয়। অত্যন্ত জোরের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ চিন্তা ও চেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উত্থাপন করেন। সেই সঙ্গে বলেন, অবিরাম কর্মই হল জাতীয় কর্মীর দায়িত্ব। স্পিরিচুয়ালিটির নামে যারা নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে কাজের সময় গা-আড়াল দেয়, তাদের ভণ্ডামীকে নিবেদিতা কঠোর আঘাত করেছিলেন।

জনৈক "চতুর্থ বর্ষের বি-এ ছাত্র-কৃত" একটি লেখার মধ্যে [*Sister Nivedita on Indian National Ideals: A Brief Statement of Some of Her Points*] জাতীয়তার তিনটি মূল সূত্রের উল্লেখ ছিল :

১. যেখানে বাস করি সেখানকার মাটিকে ও জলকে ভালবাসা ; ২. নিজস্ব-ভাবে সর্বোচ্চ আদর্শকে উপলব্ধি করা ; ৩. দেশ ও বিদেশ—সর্বত্র বিরাজিত মানবজাতির অংশ বলে নিজেকে অনুভব করা।

২০ অগস্ট, ১৯০৫ তারিখে ডন সোসাইটিতে প্রদত্ত নিবেদিতা বক্তৃতার নোট নেন বেশ কয়েকজন—এবং তাঁরা সেটি মিলিয়ে প্রকাশ করেন সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। এই দীর্ঘ রচনায় অনেক মূল্যবান কথা আছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য : ভারতবর্ষের জীবন আগে ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক, তাকে এখন হতে হবে জাতি-কেন্দ্রিক। তা না হলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি সম্ভব হবে না। মানবজাতি যখন উদ্ভাবনশীল, সৃষ্টিশীল এবং অজানার মধ্যে ঝাঁপ দেবার মতো সাহসী হয়ে ওঠে তখনই সে বিরাট। ভারতবাসী যদি এখন ঐ প্রকার বিস্তারকামনাকে ত্যাগ ক'রে নিজ পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহলে তারা জীবনের গতিরোধ করবে। ওটা মহাপাপ।

"Humanity is only great, when it is creating, inventing, when it has the courage and the spirit to plunge into the unknown... If the Indian people continue to run along the old beaten 'family' track, and refuse to grapple with questions relating to the country as a whole,... [then] they would be violating the law of growth and progress, the law by which life is developed... The family ideal has now become as henious as the sin of the body."

নিবেদিতা তারপর বললেন—ভারতবর্ষ যে কেবল পরিবার-আদর্শের পোষকতা করেছে, একথাও সত্য নয়। জাতীয় আদর্শের প্রতিভূ হিসাবে তিনি একটি মারাত্মক দৃষ্টান্ত তুললেন—সিপাহীযুদ্ধের কুমার সিং-এর দৃষ্টান্ত। কুমার সিং তখনই স্বস্তির সঙ্গে দেহত্যাগ করতে পেরেছিলেন যখন জেনেছিলেন যে, তাঁর পরিবারের নারীগণের মৃত্যু ঘটেছে শত্রুর নিষ্ঠুর আঘাতে নয়, আত্মীয়-স্বজনদের প্রেমযন্ত্রণাময় অস্ত্রাঘাতে। নিবেদিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—এই ভারতবর্ষেই বীরগণ নিজের পত্নী ও সন্তানের বুকে তরবারি বিঁধিয়ে—সেই তরবারিকে শত্রুর রক্তে সিক্ত করার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়েছে।

"But it [the preference of family-ideal to country-ideal] certainly was not so with those who put their wives and children to the sword and rushed forward with that very sword to plunge it into the enemies' heart. It certainly was not with that hero of Behar—Kunwar Sing—who would not die until he had received news from his brother that all the female members of his family have been put to death—not by the cruel hand of the enemy but by the loving hands of their own husbands and fathers, by their own brothers and uncles. It is not the truth to say that India has always, under every circumstance put the family before the country."

পরাধীন দেশে দেশ-আদর্শ গ্রহণ করার অর্থ—দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের বাসনায় ঝাঁপিয়ে পড়া। বক্তৃতাটিতে তার আহ্বান নিরন্তর ঘোষিত। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভা ও বিক্ষোভ-আয়োজনের মধ্যে নিবেদিতা জাতীয় আদর্শের জাগরণ, জনগণের ভাবানুভূতির আত্মপ্রকাশ, লক্ষ্য করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন—এই ধরনের জন-বিক্ষোভ তখনই মূল্যবান যখন তা "দেশের জন্য আত্মদানের জ্বলন্ত প্রেরণা উদ্‌বোধিত করতে পারে।" ডন সোসাইটিতে স্পিরিচুয়ালিটির চর্চা একটু বেশি হত বলেই বোধহয় নিবেদিতা পুনশ্চ শূন্যগর্ভ আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। "সংকটে ভীত, নিরাপত্তার জন্য লালায়িত আধ্যাত্মিকতা হল কপট আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশ পরে ঘৃণ্য স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানী, জীবনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মতো পলায়িত দেশ-প্রেম—সে হল কপট দেশপ্রেম।" বিদেশী শক্তিরা জাতীয় চেতনাকে রোধ করতে, তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট—তাদের বিরুদ্ধেও নিবেদিতা সতর্ক করেছেন।

"মহিমময়ী মাতার বেদীমূলে সর্বস্ব অর্পণ, সর্বস্ব ত্যাগ করার" প্রয়াসের সূচনা হিসাবে নিবেদিতা প্রথমেই সরকারী চাকরি বয়কটের আহ্বান করেছিলেন। সরকারী চাকরি মানুষের চরিত্র একেবারে নষ্ট ক'রে দেয়, তা ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার বিভেদ আনে, তা রুদ্ধ করে কর্মপ্রেরণা, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় বলে অসৎ ক'রে তোলে মানুষকে। না—না, নিজের পায়ে নিজে শিকল বেঁধো না—নিবেদিতা প্রবল কণ্ঠে দাবি করেছেন।—

"The first advice to young men...should be—At all costs shun Government service! . . . Government service has the baneful effect of degrading the national character and sowing seeds of dissen-

sion among brothers—among the Hindus and Mahomedans for instance. It fetters our activity. It makes us in many cases dishonest men, acting against the dictates of our moral sense . . . Let us make it a point not to voluntarily put chains on ourselves by accepting Government service and thus to make slaves morally as we are physically."

নিবেদিতার এই বয়কটের ডাক—নিরীহ বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ডাক নয়—এ একেবারে যুদ্ধঘোষণা।

ডন সোসাইটিতে নিবেদিতার প্রচারের রূপ নিয়ে যাঁরা লিজেল রেম‘-র রচনাকে আক্রমণ করেছেন তাঁরা বোধহয় এই রচনাগুলি দেখেন নি। বিনয়কুমার সরকার রেম‘-র ফরাসি নিবেদিতা-জীবনীর আলোচনাকালে (প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর ১৯৪৬) ঐ বইটিকে "অনবদ্য সৃষ্টি", "একটি মহান পুস্তক" ইত্যাদি কথায় অর্চনা করেও, কিছু-কিছু তথ্যগত ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—কিন্তু তিনি রেম‘-উপস্থাপিত ডন সোসাইটিতে নিবেদিতার বক্তৃতার প্রামাণিকতা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন নি, যেহেতু তিনি জানতেন, ওগুলি ডন পত্রিকায় মুদ্রিত আছে। নিবেদিতার মুখেও তিনি ওসব কথা সোসাইটিতে বসে শুনেছেন।

এইসঙ্গে আমরা যোগ করব—নিবেদিতার সঙ্গে ডন সোসাইটির সম্পর্ক ক্রমেই শিথিল হয়ে যায়, কারণ তার সেক্রেটারি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা প্রেসিডেন্ট এন এন ঘোষ ডন সোসাইটিতে নিবেদিতার ঐ ধরনের কথাবার্তার বিপজ্জনকতা বুঝেছিলেন। তাই অতঃপর হয়ত নিবেদিতাকে খোলা মঞ্চ দেওয়া (নিবেদিতার পক্ষে নেওয়াও) তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দশম অধ্যায়

নিবেদিতা-পরিকল্পিত জাতীয় উৎসব : জাতীয় পুরস্কার : জাতীয় প্রতীক : জাতীয় পতাকা

॥ ১ ॥ জাতীয় উৎসব

ইউরোপের পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জাতীয়তা আন্দোলনের কিছু শিক্ষা নিবেদিতা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। সেইসব দেশে প্রচলিত 'জাতীয় পুরস্কার', 'জাতীয় শোভাযাত্রা', 'জাতীয় দিবস', 'জাতীয় প্রতীক', 'জাতীয় পতাকা' ইত্যাদির অনুরূপ ব্যাপার তিনি এদেশে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনকালে ১৬ অক্টোবর দিনটিকে 'সর্বভারতীয় দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯০৪ সাল থেকেই নিবেদিতা এই ধরনের একটি দিবসে সমারোহপূর্ণ প্রদর্শনী ও শোভাযাত্রার (*Pageant*) কথা ভেবে আসছিলেন। মিস ম্যাকলাউড 'ওয়ারউইক পেজেন্ট' দেখে পত্রে তার উল্লেখ করায় নিবেদিতা উৎসাহের সঙ্গে ২৫ জুলাই, ১৯০৬ লেখেন :

"দু'বছর আগে সরবোন্-শোভাযাত্রা দেখার পর থেকে সেই ভাবটি আমি এখানে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। তোমার চিঠি নতুনতর প্রেরণা এনে দিল—আমি ১৬ অক্টোবর 'সর্বভারতীয় দিবস' উপলক্ষে ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত একটি নাগরিক শোভাযাত্রার কথা বলছি বা লিখছি। আশা করি ব্যাপারটি এগোবে। ওয়ারউইক পেজেন্ট্-এর সঙ্গে তুলনা করা হলে স্বীকার করতে হবে, আমাদের সামর্থ্য খুবই সামান্য, আয়োজন সাদামাটা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আসল হল প্রাণ—বহিরঙ্গ সজ্জা নয়। এখানকার গলিতে তুমি পুজো বা বিবাহের শোভাযাত্রা দেখেছ। ওগুলি হল মধ্যযুগীয় নাগরিক শোভাযাত্রা। এই সকলের দ্বারা ভারতীয় জনগণ যে-অভ্যস্ত নৈপুণ্য অর্জন করেছে—তাই দিল্লীর দরবারকে ওহেন অপূর্ব করে তুলেছিল। আ-হা, এখানকার জীবন নিজ মৌল পদার্থে কি-না সমৃদ্ধ, সুন্দর এবং মহান—শিল্প-নাটক-জাতীয়তা—সবকিছু। আহা, যদি বিরাট কেউ উঠে পড়ে এই সবকিছুকে সংগঠিত করতে পারে! আমি অবশ্য ব্যাপারটা দর্শন করতে পারছি, কিন্তু আমার কাজের ও কথার শক্তি আগের থেকে [অসুস্থতার জন্য] এত হ্রাস পেয়েছে যে, আমি যা দেখছি তার অর্ধেকও প্রকাশ করতে পারছি না।"

নিবেদিতা প্রসঙ্গটি নিয়ে অবিলম্বে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড পত্রিকায়, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯০৬ সংখ্যায় (নিবেদিতা রচনাবলী, ৫ম, ২০-২৩)—"নোট অন ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক পেজেন্ট।" লেখাটিতে নিবেদিতার অগ্রণী দৃষ্টির আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

জাতীয়তাকে সর্বাত্মক করে তুলতে ইচ্ছুক নিবেদিতা চেয়েছেন, ভারতবাসী ব্যাপক

ইতিহাসচেতনা লাভ করুক, যার দ্বারা তারা সৃষ্টিশীল ও গতিশীল ভারতীয় জীবন-ধারার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হয়ে উঠতে পারে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা : একদিকে আসবেন নতুন ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ, প্রেমে ও প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসন্ধ ইউ-রোপীয় ঐতিহাসিকদের দাসত্ব না ক'রে সত্যের সন্ধানে একান্ত শ্রমে উদ্ধার করবেন অজ্ঞাত উপাদান, এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সজীব দৃষ্টিতে করবেন ঐসব তথ্যের পর্যালোচনা। কিন্তু একইসঙ্গে স্বীকার্য, এইসকল ঐতিহাসিকের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলভোগ তো সাধারণ মানুষ করতে পারবে না—ওসব নিবদ্ধ থাকবে শিক্ষিত শ্রেণীর পাঠককে। অশিক্ষিত বা নাতিশিক্ষিত জনসাধারণকে ভারতীয় ইতিহাসের প্রবহমাণ ধারার সম্মুখীন করার উপায় কি? এই সাধারণ মানুষেরা ধর্মীয় উৎসব ও শোভাযাত্রাদির মাধ্যমে ভারতের ধর্মধারার রূপ সম্বন্ধে অবহিত। নিবেদিতা চাইলেন—ঐ ধরনের মাধ্যমগুলি ব্যবহার করা হোক জাতীয় চেতনাসৃষ্টির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে অগ্রণী চিন্তাবিৎ তিনি। পূর্বেই অবশ্য এই প্রকার প্রয়োজন অনুভব ক'রে তিলক পুনায় গণপতি উৎসব ও শিবাজি উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। ওর প্রথম উৎসবটি ছিল সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মীয়, দ্বিতীয়টি ঐতি-হাসিক হলেও মুসলমানদের সন্দেহলক্ষ্য। নিবেদিতা ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার প্রস্তাব করার সময়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন, যাতে এই অনুষ্ঠান ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক হয়ে না ওঠে। তাছাড়া ব্যবহারিক অন্য অসুবিধার কথাও তিনি জানতেন। দরিদ্র পরাধীন দেশ, সংকুচিত তার সামর্থ্য, জনগণও নানা বিষয়ে আবদ্ধদৃষ্টি। সেসব মনে রেখেই তিনি তাঁর পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন। সেখানে তাঁর এই ব্যাকুল কামনাই উন্মোচিত হয়েছিল—প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠুক তার দেশ ও তার মানুষ।

প্রবন্ধটির গোড়ায় ছিল ওয়ারউইক পেজ্যন্ট-এর মনোহারী বর্ণনা। পশ্চাদ্‌পটে অ্যাভন নদী, মুক্ত আকাশ, বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর। হাজার-হাজার মানুষের শোভা-যাত্রা, প্রাচীনকালের সাজে-পোশাকে, অনুকৃত ভঙ্গিতে। হাজার-হাজার দর্শক, তাদের আনন্দধ্বনি সর্বাধিক উত্তাল হয়েছে যখন সবশেষে দেখা গিয়েছিল—অ্যাভন নদীতে রাজ-তরণীতে আসীনা কুইন এলিজাবেথকে।

নিবেদিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন : "কখন আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ঐভাবে প্রদর্শিত দেখতে পাব?" "হাঁ, এইপ্রকারের শোভাযাত্রাই ভারত-ইতিহাসের বিপুল ধারাকে বাস্তব রূপদান করতে সমর্থ"—নিবেদিতা লিখেছেন। ইতিহাস কাকে বলে? "জাতীর চৈতন্যই আত্মপ্রকাশিত হয় ইতিহাসের মধ্যে, যেমন মানুষের আত্মবোধ ঘটে নিজ জীবনের স্মৃতি ও অনুষঙ্গের মধ্যে।" স্বদেশী যুগে ভারতীয়দের মধ্যে ইতিহাসচেতনার স্ফুরণ নিবেদিতা লক্ষ্য করেছিলেন। সানন্দে তিনি লিখেছেন : "ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঐতিহাসিক নাটকের আগমন ঘটছে; আমাদের এই শহর অনুভব করছে যে, থিয়েটারগুলি জগৎ-পরিবর্তনকারী ভাবসমূহের দর্শন ও বিস্তারের সর্বোচ্চ ও সর্ব-মহৎ কর্তব্য গ্রহণ করতে পারে।"

নিবেদিতা ভারতের ঐতিহাসিক নগরীগুলির ট্যাব্‌লো-র পরিকল্পনাও উপস্থিত করেছিলেন। দিল্লী, চিতোর, বারাণসী, অমৃতসর, পুনা প্রভৃতি নগরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এক-একটি মূক অভিনেতা-দল। তাদের সাজপোশাক হবে বর্ণময়—নাটকীয় বাস্তবতা

সৃষ্টির ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব সবিশেষ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে যেসব নগরী প্রাধান্য পেয়েছে তারা আসবে ক্রমান্বয়ে, কিন্তু কেন্দ্রে অবশ্যই থাকবে দিল্লী।

এইসকলের তুলনায়, নিবেদিতা বললেন, ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা ভারতের ক্ষেত্রে সহজতর ব্যাপার। কারণ সামাজিক ও ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অভ্যস্ত এই দেশ। বিবাহ, পূজো প্রভৃতির সময়ে মুহুর্মুহু শোভাযাত্রা। এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বলবৎ রয়েছে যে-প্রেরণা ও শিক্ষা—তাকে প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত করতে হবে জাতীয়তার খাতে। সমস্যাও আছে। এই ধরনের শোভাযাত্রায় নারীর উপস্থিতি অতীব প্রয়োজন, অথচ ভারতীয় মন ঐক্ষেত্রে নারীকে দেখতে অনিচ্ছুক। নিবেদিতা বললেন, বিতর্কে শক্তিক্ষয় করার প্রয়োজন নেই। অ্যাসকাইলাস ও শেক্সপীয়ারের কালে তাদের নাটকে তো নারীর ভূমিকা বালকেরা নিত। এখানেও তেমন হতে পারে।

দৈন্য আছে অবশ্যই, উৎকৃষ্ট সাজসজ্জার সঙ্গতি নেই, কিন্তু হতাশ হবার কারণও নেই। "সাজপোশাক, দৃশ্যপটের দ্বারা নাটক মহৎ হয় না, তা মহৎ হয় ভাবময়তার প্রকাশে। ধরা যাক, গ্রামে, গোলাবাড়িতে অভিনয় হচ্ছে, সেখানে যদি কোনো প্রতিভাবান অভিনেতা থাকেন তাহলে সেই নাটক লণ্ডন বা প্যারিসের নাট্যাভিনয়ের চেয়ে অনেক বেশী সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে।"

এখনি আরম্ভ করে দাও ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা, যে-অবস্থায় আছো সেখান থেকেই—নিবেদিতা আহ্বান জানালেন। জনগণ ক্রমে যতই ঐতিহাসিক ভাবাবহের সান্নিধ্য লাভ করবে ততই উন্নত হয়ে উঠবে এই প্রদর্শনী। গ্রামে-গ্রামে, বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে, হাটে-বাটে-খেলার মাঠে—সর্বত্র হোক এর অনুষ্ঠান। "আমরা চাই শিশুরা, অশিক্ষিতরা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোট বেঁধে এইসব ভূমিকায় অংশ নিক, যাতে তারা স্বদেশের ইতিহাসচেতনা লাভ করে। এটা তাদের কাছে হয়ে উঠুক প্রবল বাসনার ধন—যেমন পঞ্জাবের শিশু ও কৃষকদের কাছে রামলীলা-উৎসব, উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিয়াদের কাছে মহরম, হিন্দু দেশীয় রাজ্যসমূহের বীরাষ্টমী শোভাযাত্রা, ঢাকায় জন্মাষ্টমী। তেমন বাসনা যদি জাগে তাহলে আমরা আশা করতে পারব—নিজেদের মহা শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিত করবার জন্য যারা মাতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের হৃদয়-মন এখন উদ্বেলিত হয়েছে সক্রিয় জাতি-চৈতন্যে। জাতীয়তাকে বাস্তব রূপে দিতে গেলে সকল শিশুসন্তানের কাছে তার দেশের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ ভাব-মাধ্যম করে তোলা অত্যাবশ্যক।"

নিবেদিতা তাই প্রস্তাব করলেন, পরবর্তী (১৯০৬) ১৬ অক্টোবরের 'জাতীয় দিবসে' ছাত্ররা যেন রাখীবন্ধনের ধর্মীয় উৎসবের (লক্ষণীয়, নিবেদিতা রাখীবন্ধনকে ধর্মীয় উৎসবরূপে চিহ্নিত করেছেন) অতিরিক্ত হিসাবে ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা পথে-পথে সংগঠন করে। বারো থেকে কুড়িটি 'দৃশ্য' গাড়ি ক'রে অগ্রসর হবে, সামনে শঙ্খবাদকেরা, পিছনে যন্ত্রসঙ্গীত, সঙ্গে ধ্বজপতাকা। সর্বশেষ দৃশ্যটিতে দেখা যাবে আধুনিক ভারত, শোকাভিভূত আকারে। শোভাযাত্রা দিবসকালেও হতে পারে, কিন্তু রাত্রেই সুন্দর—সার সার জ্বলন্ত মশাল, মাঝে মাঝে তাতে ইন্ধন নিক্ষেপ, আর উচ্ছ্বসিত অগ্নিঝলক।

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা বিশেষ জোর দিয়েছিলেন 'ঐতিহাসিক' কথাটিতে—'ধর্মীয়' নয়। রামায়ণ মহাভারতকে যদি শোভাযাত্রায় আনা হয়—ইতিহাসের অংশ হিসাবেই আনা

হবে। মুসলিম যুগের গৌরবোজ্জ্বল অংশও আনা যায়। স্থানীয় ইতিহাসের উল্লেখ-যোগ্য অংশও।

নিবেদিতা শেষ করলেন এই বলে :

"স্পষ্টই দেখা গেল, এখানে আমরা কেবল আমোদ-আহ্লাদের বস্তু সরবরাহ করতেই চাইনি—চেয়েছি সংস্কৃতির এক নতুন মহান বাহনকে হাজির করতে। এই উপলক্ষে দেশীয় ভাষায় অনুষ্ঠানসূচী মুদ্রিত করে বিতরণ করা হোক—তাতে থাক প্রতিটি দৃশ্যের নাম, ও সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাত্মক বিবরণ। গৃহছাত, বারান্দা, ফুটপাত হোক দর্শক-আসন। কেবল মহিলা আছেন এমন প্রতিটি বাড়িতে কিছু পুরুষ উপস্থিত থাকবেন অভিভাবক হিসাবে, তাঁরা প্রতিটি উৎসুক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ব্যাপারটিকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলবেন। এইভাবে, শোভাযাত্রার সময়টিতে, সমস্ত শহরটি যেন একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, সে এমন বিদ্যালয় যার আছে হৃদয়—সেইসঙ্গে মস্তিষ্ক।"

জনমুখী অসাধারণ একটি পরিকল্পনা, যার মধ্যে অতীতকে বর্তমানের মধ্যে আহ্বান ক'রে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করার অভিপ্রায় ঘোষিত—এবং এই প্রণালীর প্রতিটি অংশে গতি ও প্রগতির প্রাণাবেগ সংযোজিত।

॥ ২ ॥ জাতীয় পুরস্কার : বিবেকানন্দ মেডাল

অন্যতম জাতীয় পুরস্কার হিসাবে নিবেদিতা 'বিবেকানন্দ গোল্ড মেডাল' প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। ডন পত্রিকায় তার বিজ্ঞপ্তি এবং রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় তার প্রথম বছরের প্রাপকের নাম ও রচনার বিবরণ আগে দিয়ে এসেছি।

বিবেকানন্দ মেডালের আকার নিয়ে নিবেদিতা বিখ্যাত ফরাসি এনগ্রেভার মঁসিয়ে লালীক-এর সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছেন। মেডাল ব্যাপারটির একটা অনুষঙ্গ আছে, যা-তা ভাবে তাকে তৈরী করা যায় না, সেটি ভাববহ এবং শিল্পসম্মত হবে—এসব দিকে তাঁর বিশেষ সচেতনতা ছিল। মিস ম্যাকলাউডকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬, লেখেন, তিনি যেন মঁসিয়ে লালীকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে নিবেদিতার হয়ে কয়েকটি কথা জেনে নেন—মেডালকে গোল হতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে কিনা, মেডালে এনগ্রেভ না রিলিফ কোন্‌টি করা উচিত, যোদ্ধার ঢালের আকারে সেটি তৈরী করলে কেমন হয়, কিংবা গলার পেনডেন্ট-এর আকারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নিবেদিতা পত্রের সঙ্গে মেডালের প্রস্তাবিত বিভিন্ন আকার স্কেচ করে পাঠিয়েছিলেন। লালীকের অভিমত তিনি জেনেছিলেন—মেডালকে অবশ্যই গোলাকার হতে হবে এবং তাতে অনুচ্চ রিলিফ থাকবে। [২.৫.১৯০৬]। লালীককে তিনি আরও প্রশ্ন ক'রে পাঠিয়েছিলেন মেডালের বিষয়ে। মেডাল-বিজয়ীর নাম মেডালে মুদ্রিত থাকাকে তিনি আবশ্যিক মনে করেছিলেন, এবং টাকশালে অথবা কোনো ইঞ্জি-নীয়ারিং ফার্মে সেটি কিভাবে করিয়ে নিতে পারবেন, তার চিন্তাও করেছেন। [২৫.৭.১৯০৬]

বিবেকানন্দ মেডাল এবং জাতীয় প্রতীকের আলোচনা নিবেদিতা অনেক সময়ে একত্রে করেছেন। জাতীয় প্রতীকচিহ্ন অবশ্য কেবল বিবেকানন্দ মেডালে নয়, অন্যত্রও থাকবে, যেমন জাতীয় পতাকায়। বিবেকানন্দ মেডাল-সূত্রে লিখেছেন : "মেডালে আড়াআড়িভাবে

বজ্রচিহ্ন স্থাপন করব। আমরা বজ্রকে ভারতের জাতীয় প্রতীক বলে গ্রহণ করছি।... জাতীয়তা নামক ভাবটিকে আমি সর্বপ্রকারে জনপ্রিয় করতে চাইছি। সুতরাং আমি নিশ্চিত যে, মসিয়ে লালীক আমাকে উপদেশাদি দেবেন। আমি চেয়েছি, সর্বদাই চেয়েছি কিন্তু সফল হইনি—বিবেকানন্দের প্রতীকরূপে একটি মশাল তৈরী করতে যাতে শিখাগুলি পার্শ্বে ও ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত। জানি না তার সঙ্গে ভারতীয় ত্রিশূলকে যুক্ত করে দেওয়া যাবে কিনা, বোধহয় না। যদি বাঙালী নারীকে মেডাল দিতাম তাহলে ত্রিশূলটিকে একটি তারকাযুক্ত করতাম, সেইসঙ্গে বাংলা বা সংস্কৃত বাণী—'ধ্রুবতারকা দেখো।'—কারণ ঐ কথাগুলি শিব বিবাহকালে উমাকে বলেছিলেন।...ইউরোপীয়রা সাধারণতঃ যেভাবে মশাল আঁকে—ছাগশৃঙ্গের আকারে নির্মিত পাত্রে এলোমেলো পুষ্পসজ্জা—ও-জিনিসটিকে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। অপরপক্ষে প্রাচ্যে নানাধরনের মশালের আকার সর্বদা দেখা যায়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হল যথেচ্ছ-বাঁধা আঁটি কিংবা পাকানো দড়ির আকার। মসিয়ে লালীক যাতে কিছু উপদেশ-নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, তাকে অবশ্যই সে অনুরোধ করো। তাঁকে বলো, আমি নিতান্ত অজ্ঞ, আঁকতে জানি না, তবু কখনো-কখনো সুন্দর চিন্তা মাথায় আসে, আর আমি কোনো বিষয়ে অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে ঘৃণা করি।" [২৮.২ ১৯০৬]

বিবেকানন্দ মেডালের আকার নিয়ে আর একটি চিঠিতে [২.৫.১৯০৬] আলোচনার পরে নিবেদিতা লিখলেন: "আমি এখন বুঝতে পেরেছি, ঠিক মেডালের সঙ্গে ভুল মেডালের পার্থক্য কোথায়। সেক্ষেত্রে মনে হচ্ছে, গোল্ড মেডাল অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ জিনিস, নয় কি? সেদিন বিবেকানন্দ মেডাল দিয়েছি জাতীয়তা-তত্ত্বের জন্য—একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায়। কিন্তু সেটি দীন ব্যাপার—আর মেডালই নয়। যদি মসিয়ে লালীক অথবা কোনো ইউরোপীয় শিল্পীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়, মসিয়ে লালীকই অবশ্য সর্বোচ্চ অথরিটি—তাহলে তাঁকে অনেক প্রশ্নই করব। দু'বছর পরে আমাকে আর একটি মেডাল দিতে হবে—ঘোষিত ৬-৭টি বিষয়ের উপরে প্রবন্ধের জন্য—সেটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতাই হবে—এবং পুনশ্চ বিবেকানন্দ মেডাল।"

বিবেকানন্দ মেডালের গায়ে নিবেদিতা বজ্রচিহ্ন ছাড়াও উৎকীর্ণ করতে চেয়েছিলেন দুটি অনুশাসন দেবনাগরী অক্ষরে: "'বন্দেমাতরম্'—যা এখন হয়ে উঠেছে রণধ্বনি এবং 'ওয়া গুরু কি ফতে'—যে-ধ্বনি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।" [২৫.৭.১৯০৬]।

॥ ৩ ॥ জাতীয় প্রতীক

ভারতের জাতীয় প্রতীকের চিন্তা নিবেদিতার মনকে অত্যন্ত অধিকার করেছিল। ১৯০৪ সালে বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণকালে তিনি বজ্রচিহ্নকে দেখেন (সঙ্গে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি) এবং উদ্দীপ্ত হয়ে অবিলম্বে তাকে জাতীয় প্রতীক করতে চান। ১ ডিসেম্বর, ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন: "আমরা বজ্রকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছি। ফরাসিরা যেমন নেপোলিয়ান বোঝাতে কেবল *L 'homme* [The man] বলে, তেমনি পুরনোকালে বুদ্ধ না লিখে বজ্র বললেই চলে যেত। এ-বিষয়ে অনেক কাহিনী আছে, যেগুলি এখন বলে উঠতে

পারব না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় স্মরণ করতে পারবে, স্বামীজী মাঝেমাঝে নিজেকে বজ্র বলতেন।"

বজ্র-প্রতীকের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি ২৫ জুলাই, ১৯০৬ লিখেছিলেন :

"আমি বজ্রকে ভারতের প্রতীক করতে চাই, তা তুমি জানো। ওটি যুদ্ধের চিহ্ন। ওটি শিবের ত্রিশূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বামীজী নিজেকে বজ্র বলতেন। তদুপরি এটি 'প্রতিমা' নয়, সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। দুর্গা বজ্রকে তাঁর এক হস্তে ধারণ করেন।"

এই বজ্র-তত্ত্বকে তিনি পতাকা প্রসঙ্গে আরও ব্যাখ্যা করেছেন।

॥ ৪ ॥ জাতীয় পতাকা

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় পতাকার সবিশেষ গুরুত্ব। স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা পর্যায়ে নানা প্রকার জাতীয় পতাকা প্রস্তাবিত হয়েছে। সেই সকল পতাকার রূপ ও ভাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আমরা দেখেছি। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে নিবেদিতা-কৃত জাতীয় পতাকার উল্লেখ দেখা যায় না, যদিও মডার্ন রিভিউ-এর মতো বিখ্যাত পত্রিকায় নভেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় তিনি ঐ বিষয়ে বহু চিত্র-সংবলিত একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ছদ্মনামে লিখেছিলেন—*The Vajra as a National Flag*—এবং তাতে পতাকার যে-ছবি দিয়েছিলেন সেটি রূপসৌন্দর্যে অনবদ্য—আর তার ব্যাখ্যা একেবারে প্রথম শ্রেণীর। কোনো পরিকল্পিত ভারতীয় পতাকা সম্বন্ধে সমতুল ব্যাখ্যা এখনো আমাদের চোখে পড়েনি।

উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের বেশ কয়েক বৎসর আগে থেকেই নিবেদিতা জাতীয় পতাকা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন, এবং পতাকা প্রস্তুত ক'রে রাজনৈতিক মহলে তাকে দেখিয়েছেন। ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫, চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

"আমরা জাতীয় পতাকার জন্য একটা ডিজাইন বেছেছি—বজ্র—এবং তা দিয়ে ইতিমধ্যে পতাকা তৈরী করেছি। দুঃখের বিষয়, আমি চীনা যুদ্ধপতাকাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম—রক্তপ্রচ্ছদের উপরে কৃষ্ণবর্ণ নক্সা। ভারতের মনে এটা সাড়া জাগায়নি—সুতরাং পরেরটা হবে লালের উপর পীত নক্সা।"

পতাকা কিভাবে প্রস্তুত করবেন, তার সম্বন্ধে আরও কিছু কথা এই চিঠিতে আছে।

প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখেছেন :

"নিবেদিতা আর একটি পতাকা তাঁর ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত করান— লাল হলুদে মিশিয়ে, এবং সেটি ১৯০৬ কংগ্রেস প্রদর্শনীতে রাখেন।"১

তারিখের দিক থেকে নিবেদিতার পরিকল্পিত পতাকা যদিও সর্বাগ্রণী, তবু ঐতিহাসিকরা সে-বিষয়ে সযত্নে উদাসীন থেকেছেন। মাদাম কামা-র বহুকথিত জাতীয়

১ Atmaprana, *Sister Nivedita*, 189.

পতাকা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে অগস্ট ১৯০৭—নিবেদিতার পতাকা প্রদর্শিত হবার প্রায় বছরখানেক পরে।২

মডার্ন রিভিউ-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে নিবেদিতা জানিয়েছেন, "পত্রপত্রিকায় ভারতের জাতীয় পতাকা উদ্‌ভাবনের বিষয়টি যেহেতু আলোচিত হতে আরম্ভ করেছে," তাই তিনি বজ্র-চিহ্নিত পতাকাটির প্রস্তাব উত্থাপন করছেন। নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন, জাতীয় পতাকাকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না ; "তা কেবল একটি জাতির প্রাণ ও ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হতে পারে।" "পতাকা—আশীর্বাদ ও উৎসর্গের আহ্বান নিয়ে জন্মলাভ করবে জাতির আত্মলোকে।" প্রস্তাবিত পতাকার বজ্রচিহ্নকে ইতিমধ্যেই জাতীয় প্রতীক হিসাবে বহু মানুষ গ্রহণ করেছেন, ব্যবহারও করছেন [যাঁদের অন্যতম জগদীশচন্দ্র বসু] —এমন ঘটবার কারণ, এই চিহ্নের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের সুচিরকালের সংযোগ, এবং পৃথিবীর অন্যত্রও এই চিহ্নটি বিভিন্ন সময়ে স্বীকৃত।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে নিবেদিতা গ্রীক ও রোমানদের ব্যবহৃত বজ্রের রূপ দেখিয়েছেন। "গ্রীকদের জিউস, রোমানদের জুপিটার, এবং ভারতের আর্যদের ইন্দ্র—বজ্রধারী। ঐসকল বজ্র দেবতার ধ্বংসাস্ত্র।" মহাভারতে আছে, ঋষি দধীচি লোকরক্ষার জন্য বজ্র-

---

২. চিন্মোহন সেহানবিশ তাঁর "রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী" (১৯৭৩) গ্রন্থে জাতীয় পতাকার উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ-লিখিত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর একটি জীবনী থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী জানিয়েছেন : শচীন্দ্রপ্রসাদ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে একটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেন যেটি ৭ অগস্ট ১৯০৬, গ্রীয়ার পার্কে বয়কট দিবসে উত্তোলন করা হয় এবং নরেন্দ্রনাথ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ চৌধুরী, স্যার আবদুল হালিম গজনবী প্রমুখ মডারেট নেতারা সেটি অনুমোদন করেন। পতাকাটি নাকি ১৯০৬ কলকাতা কংগ্রেসে সভা-মণ্ডপের উপরে ওড়ানো হয়েছিল। এই পতাকা মডারেটদের সমর্থন পেলেও একস্‌ট্রিমিস্টদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়, যদিও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তর পত্রিকায় তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মডারেট গোষ্ঠীর পতাকা কিভাবে বিপ্লবীগোষ্ঠীর একাংশের সমর্থন পেল, তার গোপন কথা সুকুমার মিত্র খুলে বলেছিলেন। বাইরে পতাকার ত্রিবর্ণের অন্য ব্যাখ্যা দিলেও ভিতরে-ভিতরে তাঁরা ফরাসি বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকার অনুকরণই করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে মডারেটীয় শীতল আচ্ছাদনের নীচে বৈপ্লবিক উত্তাপ গা-ঢাকা দিয়ে অবস্থিত ছিল। সেহানবিশ এই আলো-ছায়াঘন সংবাদ দেবার পরে, নানা যুক্তির দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন—এই পতাকাই হাজির হয়েছিল মাদাম কামা-র কাছে, যা তিনি ঈষৎ রূপান্তরে ১৯০৭ স্টুটগার্টে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন।

সেহানবিশ-রচিত এই কাহিনী পড়বার আনন্দের সঙ্গে দুঃখ এই—এঁদের কাছে নিবেদিতার পতাকা কালানুচিত মর্যাদা পেল না, যদিও প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার ইংরাজিতে লেখা নিবেদিতা-জীবনী এঁর গবেষণার আগেই ১৯৬১ সালে বেরিয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে নিবেদিতার ১৯০৬ পতাকার উপর সচিত্র বিবরণ ছিল—এবং তারও দু'বছর আগে মুক্তিপ্রাণার বাংলায় নিবেদিতা-জীবনী বেরিয়েছে, একই সংবাদসহ।

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের ধারাবাহিক প্রবন্ধের উপর আলোচনাসূত্রে শ্রীশেখর চক্রবর্তী জানিয়েছেন (দেশ ৩০.১০.১৯৮২), ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (১৯৩১) ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাসকথায় নিবেদিতার প্রস্তাবিত পতাকার উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, পতাকা-চর্চার বিশ্বসংস্থায় নিবেদিতার অবদান নথিভুক্ত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নির্মাণে নিজের অস্থি স্বেচ্ছায় দান করেছিলেন। "তাই স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র।" "বৌদ্ধ-যুগে বজ্র হল বুদ্ধের প্রতীক।" শিবের ত্রিশূল এবং দুর্গার বজ্রের কথাও নিবেদিতা বলেছেন। ভারতীয় বজ্রের সঙ্গে পাশ্চাত্য বজ্রের শিল্পরূপের তুলনাও করেছেন। তাঁর মতে. "রোমক বজ্র স্থূলে বাস্তবতার নিদর্শন ; ভারতীয় বজ্র শুরু থেকেই রূপময় এবং কাব্যে পূর্ণ।"

রক্তবর্ণ প্রচ্ছদে স্বর্ণবর্ণ বজ্র-আঁকা পতাকা প্রস্তুত ক'রে নিবেদিতা তার উদ্দেশ্যে লিখেছেন :

"এর রক্ত-রূপ অনূদিত হবে সংগ্রামের ভাষায় ; স্বর্ণ-বর্ণ—আরব্ধ বিজয়ে ; শ্বেত-অংশ পবিত্রতায়, এবং স্বদেশে ও স্বজাতির প্রতি প্রেমাবেগে।"

ভারতের পতাকা মানে ভারতবর্ষ।

"এ হল ভারত—তার কোটি-কোটি সন্তান নিয়ে।...ভারত—ভ্রাতৃত্বের শক্তিতে স্ফুরিত ; ভারত—ঐক্যে আবদ্ধ ; ভারত—সমষ্টিরূপে সংহত। সে ভারতকে গভীরে, আরো গভীরে, আরো গভীরে অবতরণ করতে হবে, যার দ্বারা সে পূর্ণ শক্তির শিখরে উত্থিত হতে পারে এবং দৃষ্টিপাত্ত করতে পারে কামনার মোক্ষধামের দিকে।"

নিবেদিতা কল্পনায় দেখলেন, পাশ্চাত্যে যেমন ঘটে থাকে তেমনি ভারতেও ঘটবে : বীরের রক্তস্রোতে সিক্ত পতাকাকে রণক্ষেত্র থেকে বন্দুকের গুলিতে শতছিন্ন আকারে ফিরিয়ে এনে স্থাপন করা হয়েছে দেশমাতৃকার পূজাবেদীতে।

"পতাকা একই সঙ্গে আশীর্বাদ ও সতর্কতার ঘোষণা ; আত্মোৎসর্গ এবং যুদ্ধ-ধ্বনি। এ সেই বেদী-প্রস্তর, যার মূলদেশে—আক্রমণ বা আত্মরক্ষা, যে-কোনো কারণেই হোক—মানুষের জীবন স্বচ্ছন্দে অর্পিত।"৩

৩ দেশ পত্রিকায় নিবেদিতার পতাকা বিষয়ে আমার রচনার উপর আলোচনাকালে শ্রীমতী রত্নাবলী রায় মূল্যবান সংযোজনী সংবাদ দিয়েছেন (৩০.১০.১৯৮২)। তিনি বজ্র প্রসঙ্গে নিবেদিতার বক্তব্যের সমর্থনে তথ্যসহ জানিয়েছেন : 'বৌদ্ধ শিল্পে বুদ্ধকে বোঝাতে চক্র প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে,' 'বুদ্ধের সঙ্গে ইন্দ্রের যোগাযোগ সাহিত্যে ও শিল্পে প্রাধান্য পেয়েছে,' 'বজ্রযান বৌদ্ধতন্ত্রে আদিবুদ্ধ বজ্রধর অথবা বজ্রসত্ত্ব,' 'বুদ্ধ ও বজ্র সমসংজ্ঞক,' 'শিবের ত্রিশূলের সঙ্গে বৌদ্ধ বজ্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।' বজ্র যে প্রতীক হিসাবে এখনও স্থানে-স্থানে গৃহীত হয় বা হয়েছে তার প্রসঙ্গে বলেছেন, আমাদের জাতীয় পতাকায় বজ্র না থাকলেও বৌদ্ধ চক্র আছে, আর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক বজ্রই, যার রচনা করেছেন শান্তিনিকেতনের সুরেন্দ্রনাথ কর। শ্রীমতী রায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বজ্র প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন :

"শিবের ত্রিশূলে ও ইন্দ্রের বজ্রের সংযোগ একেবারে অযৌক্তিক নয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় তা ধরা পড়েছিল। 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতায় রয়েছে, 'দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে/সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।' অথবা 'রাজা' নাটকের সেই পতাকাটির কথা ভোলা উচিত হবে না যাতে 'পদ্মের মাঝখানে বজ্র' আঁকা রয়েছে। এই কল্পনার মূলে কি নিবেদিতার কোনো ভূমিকা ছিল?"

একাদশ অধ্যায়

নিবেদিতার জাতীয়তা-দর্শন

॥ ১ ॥ জাতীয়তা-দর্শন উপস্থাপনের প্রাসঙ্গিকতা

জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে, আমাদের ধারণায়, নিবেদিতার সবচেয়ে বড় দান—জাতীয়তা-দর্শন। তাঁর রচনাদির সাক্ষ্য অনুযায়ী পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি—এক্ষেত্রে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে। এইকালে অন্যান্য লেখকদের রচনার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয়ের পরেই একথা বলছি। নিবেদিতাই যে, এই দর্শন প্রথম সুসংগঠিত আকারে দান করেছেন, সে-বিষয়ে ভারতে ও ইংলন্ডে সচেতনতা ছিলই।১

নিবেদিতা সক্রিয় সূচীমুখ আঘাতের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন, তাতে সাহায্যও করেছেন, কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের স্থায়ী প্রয়োজনরূপে উপস্থিত করেছিলেন জাতীয়তা তত্ত্বকে।

ভারতের ইতিহাস অনুশীলন ক'রে, এই জাতির শক্তি ও দুর্বলতা কোথায়, তা তিনি বুঝেছিলেন। বহু ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশ বলে ভারতের অখণ্ডতাকে ইউরোপীয়রা, এবং তাদের অনুসরণে কিছু ভারতীয়, কিভাবে অস্বীকার করেছেন, তা তিনি দেখেছেন। ভারতের সমাজজীবনকে বহিঃদৃষ্টিতে দেখে কি প্রকার নিঃসংশয় নিন্দায় লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাও তাঁর চোখের সামনে ছিল। এখন, ভারতকে যদি স্বাধীনতা ও জীবনগতি লাভ করতে হয় তাহলে একদিকে তাকে নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, যে-শক্তি তার ছিল কিন্তু এখন স্তিমিত তাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, অন্যদিকে লাভ করতে হবে আধুনিক পৃথিবীর গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার মতো নবচেতনার অঙ্গীকার। ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন ধরে একাগ্র নিষ্ঠায় ধর্মসাধনা করেছে, সেজন্য অসীম ত্যাগস্বীকার করেছে—সেই সাধনার স্রোতকে তিনি জাতীয়তা-সাধনার দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—ভারতীয় জনগণ যেন ধর্মীয় আবেগে জাতীয়তাকে গ্রহণ করে—তা যেন হয়ে ওঠে নবধর্ম।

জাতীয়তার উপর নিবেদিতা অজস্র বক্তৃতা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, গ্রন্থও। "ন্যাশন্যালিজম্"—এই নাম দিয়ে একটি বই লেখার ইচ্ছা ছিল তাঁর। সে ইচ্ছা পূর্ণ না

---

১ নমুনা হিসাবে নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে ইংলন্ডের ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেটে প্রকাশিত ২৬ অক্টোবর ১৯১১ তারিখের শোকরচনার এই অংশ উপস্থিত করা যায় :

"[Miss Noble] addressed large audiences in various cities on Indian ideals, ancient and modern; and *there are many who think that her voice was the first to give definite and challenging form to the religion of nationalism.* She wrote as she spoke—with a strong and vivid power of expression, and an almost fierce sincerity... In India, *it* is no exaggeration to say, her name was held in almost universal reverence." [Reymond Collection].

হলেও, তাঁর দেহান্তের পরে তাঁর কিছু প্রবন্ধ সংকলন করে ১৯১১ সালে উদ্বোধন থেকে "সিভিক অ্যান্ড ন্যাশন্যাল আইডিয়ালস" নামে একটি বই বেরোয়। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত নিবেদিতার ইংরাজি রচনাবলীতে চতুর্থ খণ্ডে "সিভিক আইডিয়াল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশ-ন্যালিটি" পর্যায়ে পূর্বোক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির অতিরিক্ত কিছু প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে। রচনা-বলীর পঞ্চম খণ্ডেও অনুরূপ চরিত্রের আরও প্রবন্ধ আছে। কিন্তু এসকলের দ্বারাও নিবে-দিতার এই বিষয়ের রচনার ব্যাপকতা বোঝানো যায় না—কারণ তাঁর অন্যান্য রচনার বৃহৎ অংশ জাতীয়তার বক্তব্যবাহী।

নিবেদিতার জাতীয়তা-বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে আমরা একদিকে যেমন পাই বাসনা-ব্যাকুল আহ্বান, অন্যদিকে দৃঢ়গম্ভীর চিন্তাভিত্তি। নিবেদিতা তাঁর ইতিহাসজ্ঞান, সমাজ-বোধ, সমাজবৈজ্ঞানিকতা, বাস্তব চেতনা, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর ভারতপ্রেমকে সম্মিলিত করেছিলেন এই জাতীয়তা-তত্ত্ব রচনায়। এতে কাব্য আছে যতখানি, ইতিহাস তার থেকে কম নয়; আবেগ প্রচণ্ড কিন্তু কোথাও চিন্তাবিযুক্ত নয়। মহৎ চিন্তা ও অনুভূতিতে পূর্ণ এমন সব বাক্য পেয়েছি যেগুলি সত্যই সাহিত্যের গৌরব।

নিবেদিতা সচেতনভাবেই ভারতবর্ষকে জাতীয়তা-দর্শন দিতে চেয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি, ১৪ এপ্রিল, ১৯০০, লিখে-ছেন:

"এখন ভারতবর্ষকে জাতীয়তা শব্দটিকে তার সর্ববিধ ব্যাপকতা ও তাৎপর্যসহ ধরিয়ে দেওয়াই মূল কাজ। বাকি কাজ আপনা থেকেই হয়ে যাবে। ভারতবর্ষকে ওই বিরাট বোধের আলোকে অবশ্যই দর্শন করতে হবে। হিন্দু ও মুসলমানদের অবশ্যই তার অঙ্গী-ভূত হতে হবে—পরস্পরের সম্বন্ধে আবেগব্যাকুল শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে।"

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লিখলেন:

"আমার লাঙলের ফলা ভারতের উপর দিয়ে কেটে এগিয়ে যাক—গভীরে, আরো গভীরে—চলার সময়ে ঢুকে যাক একেবারে কেন্দ্রে।" [২৫.৮.১৯০৩]।

পুনশ্চ লিখলেন:

"জাতীয়তার ধারণা হয়ে উঠবে ভারতের খড়্গ।" [৬.১১.১৯০৪]।

বললেন: "আমার জীবনোদ্দেশ্য—মনুষ্য নির্মাণ নয়—জাতি নির্মাণ।" [৮.৯.১৯০৪]।

১৯০৫ সালের মধ্যেই নিজের তদবধি-কৃত রচনা ও ভাবী রচনার সম্বন্ধে বিস্ময়-কর অবিনয়ের সঙ্গে বললেন:

"আমার অমর রচনাগুলি।" [১.১১.১৯০৫]।২

---

২ ভারতবর্ষে বহু প্রকার ধর্ম, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য আছে বলে নিবেদিতা ভারতের ভৌগোলিক সংস্থানকেই জাতীয়তার দেহ করতে চেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর অনবদ্য রচনা আছে। লাজপত রায় মুক্তভাবে নিবেদিতার এই বিষয়ের চিন্তার উল্লেখ করেছেন। [কিছু পরে সে প্রসঙ্গ আসবে] সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতার পক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৌল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বিবেকানন্দের কাছে প্রাপ্ত শিক্ষা তাঁকে এ-বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন—"প্রাচ্যের মানুষ মানবজাতি-তত্ত্বের দিক দিয়ে সবকিছু দেখে।"

॥ ২ ॥ জাতীয়তা-দর্শনের সর্বোচ্চ গ্রন্থ—'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' : স্বামীজীর প্রেরণা

জাতীয়তা-বিষয়ে নিবেদিতার সর্বোচ্চ রচনা—"দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ।" ভারতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যারূপে সমকালে এটি অদ্বিতীয়, বর্তমানেও অংশতঃ অনতিক্রান্ত।

১৯০১ সালে নিবেদিতা যখন ইংলণ্ডে আছেন তখনি বইটির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসে গেছে; সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁকে প্রণোদিত করেছেন। [১৫.৩.১৯০১]। কয়েকমাসের মধ্যে তিনি বইটির কয়েকটি অধ্যায় লিখে ফেলেন। পাশ্চাত্যে থাকাকালেই বইটি শেষ করে ফেলার ইচ্ছা তাঁর ছিল কিন্তু ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে ভারতে ফেরার জন্য তা করা সম্ভব হয়নি। তার পরে ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক কার্যাদি, ওকাকুরার "আইডিয়ালস" বই লেখার সর্বাত্মক সাহায্য, স্বামীজীর দেহত্যাগ, পরবর্তী ভারত সফর—এইসব কারণে বইটির লেখা বাধা-গ্রস্ত হয়। ১৯০৩ সাল থেকে পুনশ্চ তাতে মনোযোগ দেন। এ-বছরের এপ্রিলের মধ্যে তা প্রায় শেষ করে ফেলেন, নামকরণও হয়ে যায়। [১৪.৪.১৯০৩]। সম্পূর্ণ শেষ করেন ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। [৯.৯.১৯০৩]। তিনি মনে করেছিলেন—এই বই তাঁর মধ্য দিয়ে স্বামীজীরই রচনা। একাধিকবার সেকথা বলেছেন। "প্রিয় য়ুম [মিস ম্যাকলাউড], তুমি যেভাবে বুঝবে সেভাবে আর কেউ বুঝবে না যে, এ বই মোটেই আমার বই নয়—স্বামীজীর বই। এখানে এই আশাই কেবল করতে প্যারি—তাঁর পছন্দমতো ক'রে আমি বলতে পারছি।" [৯.৯.১৯০৩]। "তুমি জানো যে, আমার বই বেরিয়েছে। আমার বিশ্বাস, তুমি অনুভব

তাদের কাছে জাতি বা 'রেস্'-ই সবকিছুর নিয়ামক। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রাচ্যের মানুষ উদার মানবিকতার গভীরতা অর্জন করেছে; পৃথিবীর সকল মানুষকে সম-উৎস থেকে আবির্ভূত ভাবতে পেরেছে। কিন্তু একই কারণে তারা রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে পারেনি, কেননা একটি দেশ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ বিচিত্র ধরনের জনসমষ্টিকে সমচেতনায় আবিষ্ট করতে না পারলে জাতীয়তার জন্ম হয় না। তাই নিবেদিতা বললেন, "প্রাচ্যের মানুষকে 'এথ্নলজিক্যালি' নয়, 'হিস্টরিক্যালি' চিন্তা করতে শেখাতে হবে। 'রেস'-এর পরিবর্তে 'নেশন'।" [র‍্যাটক্লিফকে, ১৪.৯.১৯১১]। অর্থাৎ নিবেদিতা সচেতনভাবে ভারতীয়দের চিন্তাধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চাইছিলেন, যাতে জাতীয়তার জন্ম হয়, যা না ঘটলে স্বাধীনতা সম্ভব নয়। অথচ তিনি এই প্রকার চিন্তার সীমাবদ্ধতার কথাও জানতেন। স্বামীজীর জাতি-বিষয়ক চিন্তার উত্তরাধিকার তো ছিলই, গেডেসও তাঁকে "রাজনৈতিক ভূগোলের" সংকীর্ণতার কথা বুঝিয়েছিলেন। গেডেসের ছিল সাংস্কৃতিক ভূগোল। নিবেদিতা একই চিঠিতে প্রাচ্যবাসীর মধ্যে ঐতিহাসিক ভূগোলের ধারণা সঞ্চারে নিজ অভিপ্রায়ের কথা বলার পরেই লিখেছেন: "অথচ কি বিচিত্র, গেডেস আমাকে এমন নতুন ছাঁচে ঢালাই করেছেন যে, আমি রাজনৈতিক ভূগোলকে সহ্য করতে পারি না। ওটা মস্ত তুচ্ছ ব্যাপার। আর হারভার্ড ইউনিভার্সিটি কিনা উইলিয়াম হান্টারের লাইব্রেরি কিনে নিয়ে রাজনৈতিক ভারতের নথিপত্র ঘর বোঝাই করল—যা কোনো ভারতবর্ষই নয়—তার ছদ্ম খোলস মাত্র।"

জাতি-বিষয়ক ধারণার মধ্যে লালিত ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য-অর্থে ন্যাশন্যালিজম্-এর ধারণা করা কত দুরূহ তা নিবেদিতা বুঝেছিলেন, এবং সেইজন্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে যখন ফার্স্ট ইউনি-ভার্সাল রেসেস কংগ্রেসে 'নেশন' বিষয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছিল, তিনি তা পছন্দ করেন নি। প্রসঙ্গটি আগেই উত্থাপিত হয়েছে।

করবে—বইটি বাস্তবিকপক্ষে তাঁর [স্বামীজীর] লেখা—এবং এটিই তাঁর শেষ লেখা হবে না।...তুমি শুধু বলো যে, এটিকে তাঁর বলেই চিনতে পেরেছ। বলো যে, এটি তাঁকে খুশি করছে, তিনি একে আশীর্বাদ করছেন। তার বেশি আমি আর কিছু চাই না। কিন্তু তিনি সত্যই আশীর্বাদ করেছেন, নচেৎ জিনিসগুলো যে-অসাধারণ গতিতে ঘটে গেল তার কোন্ ব্যাখ্যা সম্ভব? সত্যই তিনি আশীর্বাদ করেছেন। [৩০.৬.১৯০৪]।

স্বামীজী কিভাবে বাণীবীজ নিক্ষেপ করেছিলেন তারই আবেগতপ্ত বর্ণনা ২৬ জুলাই, ১৯০৪, মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে:

"যদি তুমি বইটির গভীরে প্রবেশ ক'রে স্বামীজীকে দর্শন করতে পারো তাহলে আমি বিপুল আনন্দবোধ করব। অন্যের জন্য যখন কাজ করেছি তখন কেবল হস্তরূপে বা যন্ত্ররূপে কাজ করেছি, কিন্তু কেবল তিনিই [স্বামীজী] আমার হৃদয়, মন, সমগ্র অস্তিত্বকে দাবি করেছিলেন, আর সেইসব বস্তুকে রেখে গেছেন তাঁরই কাজে ব্যবহারের জন্য। সব রকমের কাজই বৃহৎ ও উত্তম কিন্তু স্বামীজীর কাজ সর্বাধিক—কারণ সে-কাজ পূর্ণ বিশ্বস্ততা সূচিত করে।

"অথচ কত সামান্য সময় তিনি আমার শিক্ষাদানে ব্যয় করেছিলেন! বেলুড়ের চত্বরে তাঁর উক্তি মনে পড়ে?—এবং তাঁর এই উক্তি—'এই ভ্রমণে চলো—তুমি এক আছো, তোমাকে বিশ করে দেবো!' এখন বুঝতে পারছি, তিনি কোনো একজনকে পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন যার মধ্যে তিনি নিজের সমস্ত মন ও চিন্তা ঢেলে দিতে পারবেন। তারে এক কণাও প্রত্যাখ্যান করার মতো কাঠিন্য যেন আমার মধ্যে কদাপি না আসে। রিজলিতে শেষ হয়েছিল শিক্ষাদান—তারপর—আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পৃথিবীর ক্ষেত্রে। সব জড়িয়ে প্রায় দু'বছর, তার বেশি নয়। অথচ এখন আমি তাঁর বিষয়ে, কিংবা তাঁর চিন্তার বিষয়ে, কোন্ ধারণা করব সে সম্বন্ধে অন্য কেউ প্রশ্ন করবে, তা পর্যন্ত সহ্য করতে প্রস্তুত নই। সেখানে আমার স্বাধীনতা চাই, যেমন পাখির চাই খোলা বাতাস। যখন আমি পুরো পাখা মেলতে পারব, যখন কেউ সমালোচনা করতে, নির্দেশ দিতে, বা কুৎসা করতে (অন্ততঃ আমার শ্রুতিগোচরে) থাকবে না, তখন আমি জানি, তুমিও জানো প্রিয় মাতা যুম—সকলই স্বামীজী। সকলই স্বামীজী। সকলই স্বামীজী। তাঁর বাইরে আমার কিছুই নেই।

"ধরা যাক, ঐ সময়ে তিনি লণ্ডনে আসেন নি। জীবন তখন মুণ্ডহীন কবন্ধ হয়ে যেত—কারণ আমি সর্বদাই জানতাম যে, কোনো একটা কিছুর জন্য আমি প্রতীক্ষারত। আমি সর্বদাই বলেছি—আহ্বান আসবেই। আহ্বান এসেছিল।...এখন বইটির দিকে তাকাচ্ছি আর বলছি—'যদি তিনি না আসতেন!'—কারণ আমার মধ্যে সর্বদাই এই জ্বলন্ত কণ্ঠ ছিল—ছিল না উচ্চারণ। কতবার—বার বার—কলম হাতে নিয়ে বসেছি কিছু বলবার জন্য—কিন্তু বাণী শূন্য! আর এখন তার কোনো শেষ নেই। আমি যেমন সুনিশ্চিতভাবে পৃথিবীর যোগ্য, তেমনি সেই পৃথিবীর প্রয়োজন আছে আমাকে—সে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। ধন্যতে তাঁর তার নিজ স্থান খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু যদি তিনি না আসতেন—যদি তিনি হিমালয়ের শিখরে বসে ধ্যান করতেন, প্রাজ্ঞ ক্যাপ্টেন সেভিয়ার তাঁকে যে-রূপে চেয়েছেন—তাহলে আমি অন্ততঃ কখনো এখানে আসতাম না।"

বইটি নিবেদিতা স্বামীজীকেই উৎসর্গ করেন। তবে উৎসর্গপত্রে স্বামীজীর নাম

ছিল না, কেবল লেখা ছিল—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।' উৎসর্গ বাক্যটি নিবেদিতার হয়ে জগদীশচন্দ্র বসু নিজ হস্তে লেখেন। [৭. ১. ১৯০৪]। ঐ পাণ্ডুলিপি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে রক্ষিত। ভূমিকায় বইটির রচনার ব্যাপারে নিবেদিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত ও প্যাট্রিক গেডেসের কাছে ঋণস্বীকার করেছেন।

প্রকাশমাত্রে বইটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে এর প্রচুর রিভিউ হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিশনারি ও সংস্কারবাদীদের কল্যাণে, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় যেসব ধারণা এদেশে-বিদেশে প্রচলিত ছিল, তাদের বিপরীত রূপে এই গ্রন্থে এমন *প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে উদ্ঘাটিত ছিল যে সমালোচকদের পক্ষে একে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি*—প্রবলভাবে প্রশংসা কিংবা প্রবলভাবে নিন্দা তাঁদের করতে হয়েছিল। যোগ্য লেখকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে নিবেদিতা স্বতঃই খুশি হয়েছিলেন। "সানডে সান" পত্রিকা তাঁর কাছে কেউ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার মতো প্রশংসা ছিল। [৭.৭.১৯০৪]। তিনি জেনেছিলেন, বইটির প্রকাশক মিসেস বুলকে লিখে পাঠিয়েছেন: "রাডিয়ার্ড কিপলিং এবং এফ এ স্টীল বইটির বিষয়ে অনুরাগে উত্তপ্ত।" [২৬.৭.১৯০৪]

কিন্তু নিবেদিতা সচেতন ছিলেন—প্রশংসা অপেক্ষা আক্রমণই তাঁকে বেশি করা হবে। "সত্যকার আক্রমণের আশা করছি, [নিবেদিতা লেখেন পত্রে] যখন মিশনারিরা বইটির মোকাবিলা করতে চাইবে। তারা এটাকে চিরতরে এড়িয়ে যেতে পারবে, এমনও মনে করি না। সেইসঙ্গে রাজনৈতিকগণ ও সমাজসংস্কারগণও আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন।" [৭.৭. ১৯০৪]

তাঁর 'আশা' পূরণ হয়েছিল। *গাড়ি-গাড়ি নিন্দা এনে স্তূপাকার করা হয়েছিল*। মিশনারিদের রোষ ও আক্রোশ এবং সংস্কারপন্থীদের ক্ষুব্ধ বিরক্তিতে ভরা রচনার বেশ কিছু অংশ আমাদের সংগ্রহে আছে। আমরা দেখেছি, তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করতে মিশনারি পক্ষে মিস কারমাইকেল নাম্নী মহিলা গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছিলেন—*Things As They Are*.

উল্টো চিত্রও ছিল। এক ভারতীয় সম্পাদক বইটির সম্বন্ধে বলেছিলেন—"স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য গমনের তুল্যই বিরাট ব্যাপার এই বইটি।" [২৮.৭.১৯০৪]। কিংবা লেডি হেনরি সমারসেট বলেছিলেন: "বইটি যুগসৃষ্টিকারী।" [৩১.৮.১৯০৪]।

তথাপি নিবেদিতা মনে করেছিলেন, (২৮.৭.১৯০৪ চিঠিতে লিখেছেন): "এ-পর্যন্ত কোনো একজন আলোচকও বইটিকে বুঝতে পারেন নি।" কোথায় আছে "বইটির প্রাণপাখি" —কয়েকটি চিঠিতে তা তিনি বলার চেষ্টা করেন। প্রকাশের ঠিক আগে, ২৭ মার্চ, ১৯০৪, বইয়ের মূল কথা নিজেই লিখে জানিয়েছেন:

"এই বইয়ে ভগিনী নিবেদিতা—ভারতবর্ষে বর্তমানে যে জাতীয় ভাব উদ্ভিন্নমান রূপে তিনি মনে করেন—তাদের মূলগত কিছু বস্তুকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।...বর্তমান যুগ ভারতবর্ষের উপর যেন জাতীয় চিন্তামাত্র বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেছে। ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় ও পুরোহিততান্ত্রিক ভিত্তিসমূহকে বিকাশশীল নবসংগঠনের পথে কিভাবে ত্বরান্বিত-গতি করা যায়—সে সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার মতামত চিত্তাকর্ষক মনে হবে। অপর চিন্তাশীল লেখকেরা এই বিষয়ে লেখার সময়ে [নববিকাশের]

অসম্ভাব্যতার কথাই সর্বদা ঘোষণা করেছেন। অপরপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের একজন শিষ্যার পক্ষে নব সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন করাই উপযুক্ত কার্য।"

সমালোচকেরা আসল বস্তু ধরতে না পারায় ক্ষুণ্ন নিবেদিতা পুনশ্চ বইটির যথার্থ চরিত্রব্যাখ্যায় সচেষ্ট হয়েছেন।—"এই বই প্রাচ্যের আচার ব্যবহারের নিছক উচ্ছ্বাসপূর্ণ গাথা নয়। এতে আচার-ব্যবহারকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে সমন্বিত ক'রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্মকে বর্ণনা করা হয়েছে ঐক্যঘোষক-রূপে।" নিবেদিতা বললেন, বইটির আসল বক্তব্য আছে—"বিরাট একটি জাতিনির্মাণের পদ্ধতি প্রদর্শন" এবং "জাতি-সৃষ্টিকারী জাতীয় চেতনা সৃষ্টির মধ্যে।" বইটির মেসেজ:

"নিজেদের আঙ্গিক সমবায়ে বিশ্বাসী হও। এমন জীবনের ধারণা করো যেখানে সকলে সমস্বার্থে, সমপ্রয়োজনে এবং পারস্পরিক সহায়তার কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ।" [২৮.৭.১৯০৪]।

এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের কথা এসে গিয়েছিল। সে সম্পর্কে নিবেদিতার গ্রন্থভুক্ত বক্তব্য এই:

"হিন্দু ও মুসলমানেরা শত্রুভাবাপন্ন—একথা লেখিকা মানতে গররাজি। তিনি সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন—উভয় সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন আছে এবং তারা পরস্পরের পরিপূরক। [২৮.৭.১৯০৪]।

নিবেদিতার এই বই পড়ে এক মুসলমান ভদ্রলোক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। "বোম্বাইয়ের এক মুসলমান ভদ্রলোক গত রবিবার এসেছিলেন ধন্যবাদ জানাতে, [নিবেদিতা লিখেছেন] কেননা আমি সুস্পষ্টভাবে জানাতে পেরেছি, নিজ জননীর জন্য ভারতীয়দের অনুভূতির রূপ কি, এবং (লজ্জা-সংকুচিত কণ্ঠে উনি বললেন) স্বামীর জন্য ভারতীয় নারীর অনুভূতি কি প্রকার।"

অনুভূতি-জগতে হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবাপন্ন দেখে উৎসাহিত নিবেদিতা লিখেছেন:

"আমার বইয়ের আসল বিষয়বস্তু—হিন্দু ও মুসলমানের মূলগত ঐক্য—এবং তাদের বিরাট ঐক্যবদ্ধ ভবিষ্যৎ।" [১১.৮.১৯০৪]

॥ ৩ ॥ মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে নিবেদিতা

হিন্দু-জীবন ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে স্বীকৃত নিবেদিতার মুসলমান-জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, সে সম্বন্ধে অল্প সংবাদ এখানে দেওয়া যায়।

নিবেদিতা যে মুসলমানদের প্রতি গভীর প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, তা তাঁর পরিচিতজনদের খুবই জানা ছিল।৩ এই প্রীতি তিনি কার্যতঃ স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে উত্ত-

---

৩ লখনৌ অ্যাডভোকেট এ-সম্পর্কে লিখেছিল:
"There were few Indians who were more devoted to the idea of Hindu and Mohammedan unity than Sister Nivedita." [Quoted in *PB*, Nov. 1911].

রাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বিস্তারিত তথ্যের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, স্বামীজী মুসলমানদের অপরিসীম ভালবাসতেন। স্বামীজী-বিষয়ক দুটি গ্রন্থে ["দি মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম" এবং "নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিংস উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ"] নিবেদিতা স্বামীজীর মুসলমানপ্রীতির কিছু পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীজীর মুখে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম-সাধনার কথা বিশেষভাবে শুনেছেন। নৈনিতালে তিনি স্বামীজীর অনুরাগী এক মুসলমান ভদ্রলোককে বলতে শুনেছেন, "স্বামীজী! যদি ভবিষ্যতে কেউ আপনাকে অবতার বলে দাবি করে তাহলে মনে রাখবেন, আমি মুসলমান হয়েও প্রথম সেকথা বলেছি।" ৪ সেকালের হিন্দুসন্ন্যাসীর পক্ষে (বোধহয় ঐতিহ্যবাদী যে-কোনো সামাজিক হিন্দুর পক্ষে) কল্পনাতীত কাজ স্বামীজীকে করতে নিবেদিতা দেখেছেন : "পাঞ্জাবে প্রবেশ করে...স্বামীজী মুসলমান মিষ্টান্ন-বিক্রেতাকে ডেকে, তার হাত থেকে মুসলমানী খাদ্য কিনে খেয়েছিলেন।"৫ এ-ধরনের কাজ তিনি সারাজীবন করেছেন। স্বামীজীর আকবর ও শাজাহান-প্রীতির পরিচয় নিবেদিতা যথেষ্ট পেয়েছেন। কাশ্মীরে জনৈক মহিলাকে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মা, আপনার ধর্ম কি?"—গভীর আনন্দের সঙ্গে তাঁর মুখে "গর্ব ও উল্লাসপূর্ণ উত্তর" শুনেছিলেন: "ঈশ্বরের কৃপায় আমি মুসলমান।"৬ নিবেদিতা চমৎকৃত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছিলেন, "স্বামীজী [কাশ্মীরে] তাঁর নৌকার মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাটিকে উমারূপে পুজো করেছেন।"৭

নিবেদিতা "দি মাস্টার" গ্রন্থে স্বামীজীর ইসলাম সম্বন্ধীয় মনোভাবের প্রসঙ্গে একটি উপ-অধ্যায় লিখেছেন: "ইসলামের প্রতি ভালবাসা।"৮

স্বামীজীর সূত্র ধরেই নিবেদিতা তাঁর ইসলাম-সমাদরের ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন।

ভারতে আসার বছর দেড়েক পরে নিবেদিতা কলকাতার 'এমপ্রেস' পত্রিকায় মহরম সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ লেখেন, (যেটি কিছুদিন পরে একই পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়) —সে সম্বন্ধে চিঠিতে পূর্বাহ্নে বলেছেন : "এই সপ্তাহে আমি এমপ্রেস পত্রিকায় মহরম বিষয়ে প্রবন্ধের মোড়কে ইসলাম সম্বন্ধে প্রচণ্ড সমাদরের লেখা লিখব। সেজন্য আজ আমি

ফ্রেজার ব্লেয়ার বলেছিলেন :

"Hinduism and its problems were perhaps her chief concern; but she had a keen appreciation of the strength and value of Islam." [Quoted in *PB*, May 1912].

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন :

"Though she usually moved in an atmosphere of Hinduism, she was not wanting in an appreciation of the good points of Islam and Islamic civilization." [*Modern Review*, Nov. 1911].

৪ *NCW*, *I*, *266*.

৫ NCW, I, 72.

৬ NCW, I, 73.

৭ NCW, I, 354.

৮ NCW, I, 166-67.

'ইসলাম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ' বিষয়ে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি 'সমকালীন'-এর পঞ্চম খণ্ডে (৩৭৯-৪০২), অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখে নিতে পারেন।

প্রিন্স জাহান্দার মির্জা ও আরও দু'তিন জনের সঙ্গে চা-পানের আসরে মিলিত হতে যাচ্ছি।" [২১.৫.১৮৯৯]।

নিবেদিতার 'ওয়েব' গ্রন্থ ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতির কথায় পূর্ণ। তা বিশেষভাবে রয়েছে "দি সিনথিসিস্ অব ইণ্ডিয়ান থট্," এবং "ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া" অধ্যায় দুটিতে। নিবেদিতা-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচ্য বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ আছে, "ইসলাম ইন এশিয়া" এবং "বিউটিজ্ অব ইসলাম।" রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে অবনীন্দ্রনাথের দুটি ছবির উপর আলোচনা সংকলিত—"শাজাহান ড্রিমিং অব দি তাজ" এবং "দি পাসিং অব শাজাহান"—দুটিরই মর্মকেন্দ্রে ইসলামী সংস্কৃতির স্পন্দন। রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে "স্টাডি অব বেনারস" প্রবন্ধের মধ্যে বারাণসীতে ইসলামী শিক্ষার পরিচয় দিতে নিবেদিতা ভোলেন নি। ঐ খণ্ডের "সিভিক এলিমেন্টস্ ইন ইণ্ডিয়ান লাইফ" প্রবন্ধে ইসলামের ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিষয়ে প্রচুর কথা আছে। "প্রেজেণ্ট পজিশন অব উইমেন" নামক পেপারটির একাংশ হল—"দি ফ্যামিলি ইন ইসলাম।" "দি মডার্ন ইপক্ অ্যাণ্ড দি ন্যাশন্যাল আইডিয়া" প্রবন্ধে নিবেদিতা বৌদ্ধদের পরে মুসলমানেরা কিভাবে জাতীয়তা দান করেছে, তার আলোচনা করেছেন। একই খণ্ডে পাই নিবেদিতার বিখ্যাত প্রবন্ধ "ইউনিটি অব লাইফ অ্যাণ্ড টাইপ ইন ইণ্ডিয়া"—যার মধ্যে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুরা কোন্ ভিত্তিতে মিলিত হবে তার উৎকৃষ্ট আলোচনা আছে। সে বস্তু রয়েছে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিটি, এ মোড্ অব থট" প্রবন্ধের মধ্যেও। জাতীয়তার ক্ষেত্রে "স্থান"-এর ভূমিকার বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধটিতে নিবেদিতার অনবদ্য রচনা লাজপত রায় প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েছিল।৯ তার অংশ এই:

"কোনো দেশ যদি ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট আকারসম্পন্ন হয়, [নিবেদিতা লিখেছিলেন] তাহলে জাতীয়তার লালনভূমি হবার ক্ষমতা তার থাকবে। জাতীয় ঐক্য 'স্থান'-এর [*place*] উপর নির্ভরশীল। মানবসমাজে কোনো জাতির স্থান তার দেহাংশগুলির জটিল বহুত্ব এবং সম্ভাবনাশক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তার কোনো একটি অংশ অতীতে যাকে অর্জন করেছে, জাতি সে-বস্তুকে ভবিষ্যতে সামগ্রিকভাবে অর্জনের প্রত্যাশা করতে পারে। উপাদানসমূহের মিশ্র জটিলতাকে যথাযথভাবে 'স্থান'-এর জাতীয়করণ-প্রভাবের অন্তর্বর্তী করতে পারলে তা জাতির পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে শক্তির উৎস, দুর্বলতার হেতু নয়।"১০

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে ['ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিটি : এ মোড্ অব থট্'] ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবনের কথা বলার পরে, তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা

---

৯ নিবেদিতার "ফুটফল্স্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি" বইয়ের আলোচনাকালে লাজপত রায় লেখেন:

"....Sister Nivedita refers to the 'geographical synthesis.' This is a theme of absorbing interest to all Indians interested in the future of their country, because it is absolutely necessary to realise that 'the whole of India is necessary to the explanation of the history of each one of its parts..... India is at once the occasion and the explanation of the web of Indian thought'." [*Modern Review*, Sep. 1915].

১০ *NCW*, IV, 264.

তিনি তুলেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সরকারী উস্কানিতে সে দাঙ্গা হয়েছিল, যার ফলে নেতৃগণ পর্যন্ত কিছুসময়ের জন্য জাতীয়তার কথা ভুলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফাঁদে ধরা দিয়েছিলেন। সেইসময় নিবেদিতার এই আর্ত রচনা:

"নিজেদের যখনই আমরা জাতি বলে স্বীকার করি তখনই আমরা জাতি। কি?—একটা গ্রামের দাঙ্গা গোটা রাষ্ট্রের ব্যাপারে এতই গুরুত্বপূর্ণ?...সাহস চাই বন্ধুগণ, সাহস! তুচ্ছ বস্তু তার নিজের আকার নিয়েই থাকুক।...আমরা যেন নতজানু হয়ে সর্বজনীন মাতাকে অর্চনা করি।...আর একবার প্রকাশিত হোক এই সত্য: আমরা যে-আকারে বর্তমান—তা আমাদের চিন্তারই রূপ। আমাদের চিন্তার ভিত্তিতে আমরা স্থাপিত, আমাদের চিন্তার ভিত্তিতে আমরা নির্মিত।১১"

১৯০৬-০৭ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সূত্রে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ-এ ডিসেম্বর ১৯০৭ সংখ্যায় লিখেছিলেন—"আওয়ার ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি।"১২ তারও আগে কুমিল্লা দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখেন, "এ কুমিল্লা লেসন্।"১৩ দাঙ্গার জন্য দায়ী সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সরাসরি আক্রমণ না ক'রে তিনি আক্রান্তদের উৎসাহিত করেছিলেন আত্মরক্ষার অস্ত্রব্যবহারের জন্য। আর সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন শাসক ইংরাজদের—যারা প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষায় অসমর্থ। শাসকদের উপহার "শান্তি ও শৃঙ্খলার" শান্তিকে— "মরীচিকা ও নির্বোধের স্বর্গ" নামে অভিহিত ক'রে তিনি বললেন:

"এই শান্তির কালে, উনবিংশ শতাব্দীতে সওয়া তিনকোটি ভারতীয় দুর্ভিক্ষে মরেছে। আরও কত কোটি ম্যালেরিয়ায় মরেছে আমরা জানি না। গত এক দশকে চল্লিশ লক্ষ মরেছে প্লেগে। ঠিক এখনই প্রতি সপ্তাহে ঐ মহামারীতে মরছে সত্তর হাজারেরও বেশি লোক। শান্তিকালীন এই মৃত্যু-শিকার।...যুদ্ধের সময়ে মানুষ মরে মানুষের মতো, শান্তির সময়ে মরে পোকামাকড়ের মতো।"

যে-সরকার দেশের মানুষের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে, সেই সরকার কিন্তু নিরস্ত্র প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষায় অসমর্থ বা অনিচ্ছুক—এই কথার সঙ্গে, নিবেদিতা অকরুণ ভাষায় ইংরাজের লুণ্ঠনের চেহারাটা খুলে ধরলেন:

"সম্পত্তির নিরাপত্তা? নাদির শা, ল্যাংড়া তৈমুর বা অন্য লুণ্ঠকেরা কদাপি ভারত থেকে এই পরিমাণ সম্পদ কেড়ে নেননি—যা বছরের পর বছর ধরে, নিঃশব্দে, বিনা রক্তপাতে, আইনের সাহায্যে, ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাজির হচ্ছে বিদেশের তটভূমিতে—সেখানকার মানুষদের সম্পন্ন করতে, একই সঙ্গে দুর্ভিক্ষে ও প্লেগে পরোক্ষভাবে ভারতীয় শিশুদের মৃত্যুকে টেনে আনতে।"১৪

শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয়পুষ্ট মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা যে, স্বদেশী যুগে দাঙ্গার জন্য দায়ী, নিবেদিতা অবশ্যই জানতেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ সম্ভব, তিনি এমন মনে করতে পারেন নি। মহৎ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্য থেকে

১১ *NCW*, IV, 293-94.
১২ *NCW*, V, 158-59.
১৩ *NCW*, V, 241-42.
১৪ *NCW*, V, 241-42.

তিনি আশার আলো দেখতে চেয়েছিলেন, যাঁদের একজন মৌলবী লিয়াকত হোসেন, "সহৃদয়, উন্নত ন্যায়বান, আপসহীন সৎ, প্রাচীন বাইবেলের চরিত্রের মতো।" [২০.৭.১৯১১]। এঁদেরই মধ্যে নিবেদিতা ভারতীয় জাতীয়তার ফল-পরিণতিকে দেখতে আগ্রহী। নিবেদিতার দ্বারা উদ্দীপ্ত ওয়াহেদ হোসেন নিবেদিতার স্মৃতিসভায় দাঁড়িয়ে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন:

"ভগিনী নিবেদিতা যথার্থ ভগিনীর ভালবাসা নিয়ে আমাদের মধ্যে বাস করেছেন—এই দেশের জন্য কাজ করেছেন—জাতি ধর্ম বর্ণের পার্থক্য করেন নি।...তিনি আমাদের কাছে নারীত্বের বিরল নমুনা—তিনি মিস মার্গারেট নোবেল—'মহিমার শুভ্র পদ্ম,'—এক আচ্ছন্ন আলোকের দেশের উদ্যানে আধ্যাত্মিক মধুরতা নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিলেন। মহিমা ও পবিত্রতার একেবারে প্রতিমা তিনি।...তাঁর জীবনাদর্শ দার্শনিক তত্ত্বকথার কচকচিতে আবদ্ধ ছিল না, সে জীবন দরিদ্র ও দুঃখীর দুঃখমোচনে, মানবজাতির যন্ত্রণা নিবারণের ঐকান্তিক প্রয়াসে নিবেদিত।"১৫

॥ ৪ ॥ বইটির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ

'ওয়েব' গ্রন্থের আসল তাৎপর্য সম্পূর্ণ ধরা পড়েনি—নিবেদিতার এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তা প্রয়োজনীয় পরিমাণে অন্তত ধরা পড়েছিল ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক, উভয় সাম্রাজ্যবাদীদের কাছেই। 'ভারতীয় জীবনজাল' সম্বন্ধে নিবেদিতার আলোকিত রচনাকে ছিন্ন করতে পূর্বোক্ত মিস কারমাইকেল যেসব কালো আঁচড় কেটেছিলেন—তাদের বিষয়ে সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ মেল পর্যন্ত না লিখে পারেনি : "আমরা বরং সিস্টার নিবেদিতার আশাবাদ পছন্দ করব—মিস অ্যানী কারমাইকেলের নৈরাশ্যকে নয়।"

মিস কারমাইকেলের বিষাক্ত রচনার চরিত-কথন এদেশের কাগজপত্র করেছিলই। মরাঠা পত্রিকায় ২৯ জানুয়ারি ১৯০৫ তারিখে নিবেদিতার 'স্মরণীয় গ্রন্থের' বিরুদ্ধে 'জনৈক লেডি মিশনারি' মিস কারমাইকেলের রচিত বই নিয়ে একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়, 'হিন্দু ধর্মের এক নারী-কুৎসাকারী।' মরাঠা সমালোচনার জন্য বইটি পায়নি, কিন্তু মাদ্রাজ মেল তা পেয়েছিল। মরাঠা-সম্পাদক দেখে খুশি হয়েছিলেন, মাদ্রাজ মেলের ইংরাজ সম্পাদক পর্যন্ত মিস কারমাইকেলের বইয়ে 'ইচ্ছাকৃত তথ্যবিকৃতি, ঘোর বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যাচারের বিস্তার' ভিন্ন আর কিছু দেখতে পাননি। বইটির অধ্যায়-নামগুলি চমকপ্রদ। যথা : "A Look into Hell." "Coils of the Snake." "The Brand of Hell" ইত্যাদি। মরাঠা-সম্পাদক বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন—কোনো নারী-মিশনারি এইপ্রকার ময়লা লেখায় হাত নোংরা করতে পারেন !! "খুবেই দুঃখের বিষয়, ভারতে স্বল্পকালীন অবস্থানে এক নারী-মিশনারি কেবল পাপ ও দুঃখের আস্তানায় উঁকি দিতে পারলেন—একেবারেই দেখতে পেলেন না, নিবেদিতা-চিত্রিত লোকজীবনের মর্মস্পর্শী দৃশ্যকে!" নিবেদিতার বইয়ের বিরুদ্ধে তথ্যযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ অবশ্যই স্বাগত, কিন্তু "মিস কারমাইকেল কেবল কাদা ও গোবরগাদার মধ্য দিয়ে এগোতে চেয়েছেন, এবং 'গ্রন্থ' শব্দটিকে ব্যঙ্গ করবে এমন বস্তু

---

১৫ বেঙ্গলী। প্রবুদ্ধ ভারতে উদ্ধৃত, মে, ১৯১২।

নিজ নামে প্রকাশিত হতে দেবার রীতিগর্হিত ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন—এর দায় তাঁরই। এরকম দুঃখজনক আবর্জনার জননী মিস কারমাইকেল আমাদের কৃপার পাত্রী।"

অমৃতবাজার পত্রিকা মিস কারমাইকেলের বইয়ের বিষয়ে যা লিখেছিল, মরাঠা একই তারিখে তা উদ্ধৃত করে। অমৃতবাজারও মাদ্রাজ মেলের পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়ের উল্লেখ করে। পত্রিকা লেখে, মানুষ নিজের মাপেই অন্যের বিচার করে, "মিস কারমাইকেল পাণ্ডু-রোগগ্রস্ত, তদনুযায়ী ব্যভিচার ছাড়া হিন্দুনারীদের মধ্যে আর কিছু দেখতে পাননি।" পত্রিকা আরও লেখে : নিবেদিতা অপরপক্ষে হিন্দুনারীর সতীত্বের গুণগান করেছেন। "যদি মিস কারমাইকেল হিন্দুজীবনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করাকে 'নরকের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা' মনে করেন, তাহলে বলতে হবে, দুর্ভাগ্য তাঁর যিনি 'নরকের কালিমা', 'সর্পের কুণ্ডলী' ইত্যাদি দেখার নিয়তি নিয়েই এসেছেন। যদি স্বর্গেও তিনি থাকেন তবু ঐসব জিনিস তাঁর উপভোগের বস্তু। পবিত্রহৃদয় মিস নোবল হিন্দু গৃহজীবনের স্নেহ-প্রেম, সৌন্দর্য ও স্বর্গীয় সুষমা দেখেন, মিস কারমাইকেলের মতো নরক দেখেন না, যদিও তিনি [মিস নোবল] তিন বছরেরও বেশি সময় একাদিক্রমে হিন্দুদের মধ্যে রয়েছেন।" বিষের ঔষধ বিষ, এই চিকিৎসানীতিতে বিশ্বাসী অমৃতবাজার প্রশ্ন করেছিল, "শকুনি আকাশে ওড়ে কেন?" উত্তরও দিয়েছিলেন : "না, আকাশের সৌন্দর্য দেখতে নয়, পচা মড়া খুঁজতে।" তাই বিস্ময়ের কিছু থাকে না যদি দেখা যায়, মাদ্রাজের মন্দিরের নর্তকীরা, যারা অনেক সময়ই দেহপসারিণী, মিস কারমাইকেলের মন কেড়ে নিয়েছে। যদি তিনি যেদিকে চোখ ফেরান সেইদিকেই হিন্দুদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি দেখতে পান সেটা তাঁরই চোখের দোষ, হিন্দুদের নয়। পাঠকরা অবশ্য শুনে বিস্মিত হবেন যে, পুনার এক মিশনারি—নাম, রেভাঃ নিকল ম্যাকনিকর; এম-এ বইটিকে 'অসামান্য' বিবেচনা করেছেন।" অমৃতবাজার বক্তব্য শেষ করল এই বলে : "মিস কারমাইকেলের বই একটা সৎকর্ম করেছে।...নিবেদিতার 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' বইটির দীপ্তি উনি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন ওঁর 'থিংস্ অ্যাজ দে আর' বইয়ের দ্বারা। চন্দ্রের নিজস্ব আলোক আছেই, কিন্তু অন্ধকারের পটভূমিকাতেই তা সুন্দরতর দেখায়। যেখানে মিস কারমাইকেলের বই 'শয়তানের কার্যাবলী,' 'দেবভাবারোপিত শয়তানীতে' পূর্ণ, সেখানে নিবেদিতার বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা দিব্যভাবে উজ্জ্বল, পবিত্রতা ও মাধুর্য যার থেকে নিরন্তর বিকীর্ণ।"

নিবেদিতার গ্রন্থ ধর্ম-সাম্রাজ্যবাদীদের মতো রুষ্ট করেছিল রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীদেরও। বইটির বক্তব্য ও তার মারাত্মক প্রভাবের বিপজ্জনকতা যে শাসকশ্রেণীর কাছে ঠিকই ধরা পড়েছিল—দুঁদে সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা পায়োনীয়ারের কটু সমালোচনা তা দেখিয়ে দেয়। "তিন কলম ব্যাপী তিক্ত আক্রমণের" পরে পায়োনীয়ার সিদ্ধান্ত করেছিল, "বইটি ছদ্মবেশী রাজনৈতিক প্যামফ্লেট ছাড়া কিছু নয়।" [পরবর্তীকালে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট নিবেদিতার সম্বন্ধে গোপন ফাইলে মন্তব্য করার কালে পায়োনীয়ারের ঐ মন্তব্য উদ্ধৃত করেন।][১৬] নিবেদিতা এক চিঠিতে এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। [*Letters*, Vol. II, 723].

---

১৬ "Her [Sister Nivedita's] second work was *The Web of Indian Life*. . . . The *Pioneer* in their review of the book on 12.5.05, pointed out

পূর্বোক্ত সূত্রে নিবেদিতা আরও বলেছিলেন, 'জাতীয় ভাব নির্মাণ করো ; অতীত ছিল ডায়ন্যামিক—এই কথাগুলিতে রয়েছে বর্তমান প্রচারের সারাংশ। যতদিন না সকল তরুণ এই ভাবটি ধারণ করছে, তারপর তাকে অন্য প্রভাবগুলির ঘাঁটিতে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, এবং প্রতিটি দুর্গকে ভিতর থেকে ঘা মেরে অধিকার করে নিচ্ছে—ততদিন আমি শান্ত হব না।" [মে, ১৯০৫]

নিবেদিতা পায়োনীয়ারের যে-সমালোচনার উল্লেখ করেছেন সেটি বেরিয়েছিল ১২ মে, ১৯০৫—যখন স্বদেশী আন্দোলন পুরোপুরি আরম্ভ হয়নি কিন্তু সরকারের বঙ্গবিভাগের ইচ্ছা ঘোষিত হওয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত। সেই পরিস্থিতিতে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের উপর সুদীর্ঘ আলোচনা বেরুল প্রধান সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজি কাগজে—ব্যাপারটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এই লেখাটি দেখিয়ে দেয়, সাম্রাজ্যবাদী মহলের বুদ্ধিজীবীরা উগ্র উত্তেজনাবহুল রচনার চেয়ে কম বিপজ্জনক মনে করেন নি সেইপ্রকার রচনাকে যা জাতিচিত্তের গভীরে প্রবেশ করে বোধ-পরিবর্তন ঘটাতে পারে। জাতীয়তা-সৃষ্টির প্রয়াসে অবতীর্ণ নিবেদিতা দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাকে মূল্যদান করেছেন এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষে ঐক্যবিষয়ক কতকগুলি শক্তি সক্রিয় আছে কিন্তু সে সম্পর্কে ভারতবাসীর সচেতনতা নেই। এই গ্রন্থে নিবেদিতা প্রথমতঃ ভারতবাসীর মধ্যে সে-বিষয়ে সজ্ঞানতা আনতে চেয়েছেন, দ্বিতীয়তঃ ইংরাজিভাষী মানুষদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি ও মহিমার উৎকৃষ্ট বিবরণ দান ক'রে, এহেন উচ্চ সংস্কৃতির দেশের স্বাধিকারলাভের প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। দুটোই মারাত্মক কাজ—সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে। এই কাজ যিনি করেছেন, অবশ্যই তাঁর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে—পায়োনীয়ারের লেখক তা মনে না করে পারেন নি। এবং তীক্ষ্ণভাবে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

লেখাটির গোড়ায় নিবেদিতার গ্রন্থের প্রভূত ইংলণ্ডীয় প্রশংসার উল্লেখ আছে। 'হোম'-এর লেখকেরা এমন মন্দ বইয়ের এত প্রশংসা করবেন, তার দ্বারা সরলচিত্ত পাঠক গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়গুলিকে সত্য বিবেচনা করবে—অতি বিপজ্জনক ব্যাপার। আর প্রশংসা বলে প্রশংসা! "সিস্টার নিবেদিতার গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের ধারণালোকে বিপ্লব এনে দেবে" [হোম-এর পত্রিকায় লেখা হয়েছিল]; "অসামান্য শক্তিশালী এই বই—ইংরাজি ভাষায় ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে অবশ্যই সেই শ্রেণীভুক্ত।" "বইটি বিশুদ্ধ মানবতার সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রশস্ত ভাবরাজিতে পূর্ণ ; এখানে আছে সেই বৃহৎ উদার কৌতূহল যার কাছে মানবপ্রকৃতির কোনো প্রকাশই বিদেশী বলে বিবেচিত হয় না—তেমনই উদারতার আলোকে এর প্রতিটি পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

that it was nothing but a political pamphlet in disguise, the object of which was 'the demonstration that India is a single nation and not a congeries of divided races and religions and an appeal to that nation to realise its destiny by becoming independent family. Its leading characteristic is cunning and its content mischievous'." [Freedom Movement Papers, Paper No. 45. State Archives, West Bengal.]

শিশির করের কাছ থেকে প্রাপ্ত

পুস্তকটির সম্বন্ধে মানবতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদারতার দাবি সমালোচকের কাছে অসহ্য। ওর মধ্যে পরাধীন একটি জাতির ধারাবাহিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনযাত্রার রূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, তা করেছেন শাসকজাতির এক মানুষ—এটা কি ক'রে মানবতা বা উদারতা বলে গৃহীত হতে পারে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে—যারা কুৎসা-লক্ষ্য ঐ পরাধীন লোকগুলির নোংরা বোঝাটাকে শ্বেতমনুষ্যের দায় বলে বহন করছে!! সুতরাং লেখিকার অবশ্যই রাজনৈতিক মতলব আছে।

["As a matter of fact, the papers which have reviewed her book in such flattering terms, and with the papers no doubt the home public must be included, have been gulled by *what is neither more nor less than a political pamphlet in disguise.*"]

পায়োনীয়ারের সমালোচনায় অতঃপর নিবেদিতার বইয়ের অধ্যায় ধরে-ধরে আক্রমণ। নিবেদিতা ভারতীয় জীবনযাত্রার যেসব রূপ এঁকেছিলেন, তাদের সাহিত্যগুণের প্রশংসা অবশ্যই সমালোচককে করতে হয়েছিল। কিন্তু যখন নিবেদিতা বলেন যে, এদেশে কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত মানুষ শেক্সপীয়ার বা শেলীর কাব্যালোচনা করে, সেখানে এই সমালোচক নিরেটভাবে না জানিয়ে পারেন না—ইংরেজ অধ্যাপকরা বলেন, ভারতীয় ছাত্রদের মাথায় শেক্সপীয়ার ঢোকানো যায় না। এইপ্রকারে ভারতীদের গঙ্গাপূজা, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদের মুখে ধর্মকথা, ভারতের মাতা ও পত্নী এবং ভারতীয় বিধবাদের অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে নিবেদিতার বক্তব্যকে আগাপাশতলা প্রহারের পরে, সমালোচক এই ভীতি প্রকাশ করেছেন, হায়, হায়, লেখিকার কলমের যাদু এমনই যে পাঠকরা হয়ত মিথ্যাকেই সত্য বলে ধরে নেবে। "যৎকিঞ্চিৎ চিন্তাকে আবৃত করে আছে যে-ভাষা তার এমনই কুহকমায়া, তথ্যদৈন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখার এমনই সুচারু কৌশল যে, দ্বিতীয়বার পড়বার আগে পাঠক বুঝতেই পারে না, সে পড়ছে—অপদার্থ বস্তু।"

সমালোচক বললেন, চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত লেখিকার রাজনৈতিক মতলব ঢাকা ছিল, যদিও তৎকৃত ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির একপেশে প্রশংসা উদ্দেশ্যযুক্তই—কিন্তু *পঞ্চম* অধ্যায় থেকেই লেখিকার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। পঞ্চমোত্তর অধ্যায়গুলিতে তিনি কী করেছেন? তিনি এই অত্যন্ত অনুচিত কথাটা বলেছেন, ভারতবর্ষে অখণ্ড জাতীয় চেতনা আছে, এবং ভারতবর্ষ যেন নিজ ভাগ্যকে নিজে নির্ধারণ করবার অধিকারলাভ করে। ইংরাজ শাসকরা বহু বৎসর ধরে তো এর বিরোধী কথাই প্রচার করে আসছে। কী স্পর্ধা—তার উল্টোকথা বলা! সমালোচকের আক্রোশ থেকে দুটি জিনিস বোঝা যায়—এক, ভারতের ভেদ-বৈষম্যের প্রচার সরকারের তরফে রাজনৈতিকভাবেই করা হত ; দুই, নিবেদিতাই প্রথম রচনার মধ্য দিয়ে যথার্থ শক্তির সঙ্গে ঐ প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন—অন্তত তিনি সেই গণ্যলেখক যাঁর লেখা প্রথমে এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

["So far the political intention of the book has been successfully kept in the background. The first four chapters deal or rather shuffle with Indian life after the fashion we have described, without a hint of political motive, other than that supplied by the strangely

one-sided character of their contents. In the fifth chapter, however, the authoress feels her way to what presently reveals itself as the real object of the book—the demonstration that India is a single nation and not a congeries of divided races and religions, and an appeal to that nation to realise its destiny by becoming independent.

"Of course these sentiments are not as plainly stated in the book as they are here. The conception of national unity is skilfully blended with verbiage about the synthesis of Indian thought, the study of caste and other miscellaneous matters which serve in succession as the objects nominally under discussion, while the appeal to India to throw off the British yoke, though often implied, is nowhere openly expressed."]

এর পরে সমালোচক নিবেদিতার বইয়ের নানা অংশ উদ্ধৃত করে উপরিউক্ত বক্তব্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি নিবেদিতার লেখা থেকে, বাঙালীরা ভবিষ্যতে যুদ্ধ-জয়ী জাতিতে পরিণত হতে পারে, এমন ইঙ্গিত আবিষ্কারে পর্যন্ত উদ্যোগী হয়েছেন। এঁর কাছে, নিবেদিতা যে ভারতীয় আন্দোলনের স্বার্থে, নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে 'গতিশীল রক্ষণশীলতার' পক্ষে প্ররোচনা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত অনুচিত মনে হয়েছিল। এবং তা একেবারেই গর্হিত—ভারতে ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণ সম্বন্ধে নিবেদিতার এই বক্তব্য : "হায়, আজ তাঁতীর পেটে অন্ন নেই।...আজ ভারতীয় নারীর পরনের সাধারণ শাড়ি পর্যন্ত তৈরী হয় সুদূর ম্যাঞ্চেস্টার ও গ্লাসগোর যন্ত্রে।...এর অর্থ, এই দেশ রাশি-রাশি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরূপী পরগাছার আশ্রয়।"

এই সাম্রাজ্যবাদী সমালোচকের স্বার্থের নগ্ন দাঁতালো মুখ দেখা গেছে যখন তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নানা ধরনের ঐক্যের সমর্থনে নিবেদিতার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আক্রোশপূর্ণ প্রতিবাদ করেছেন। এঁর মতে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান সারাক্ষণ হিংস্র লড়াই করে গেছে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। এমন লেখক অবশ্যই জাতিপ্রথার বিষয়ে নিবেদিতার সমাজবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণের মূল্য স্বীকার করতে পারেন না, কারণ আপাতভাবে এক-ধর্মাবলম্বী হিন্দুসমাজ পর্যন্ত কতভাবে বিভক্ত দেখাতে পারলে শাসনকার্যের অধিকতর সুবিধা হয়।

নিবেদিতার গ্রন্থে কোথাও খোলাখুলি রাজনৈতিক প্রচারণা নেই—এইটাই সমালোচকের কাছে সবচেয়ে অসহ্য লেগেছে। সে-বস্তু থাকলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার দাওয়াই ইনি বাতলাতে পারতেন। পরিচিত ক্রুদ্ধ রাজনৈতিক চীৎকারে বইটির পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ নয়, তার বদলে এতে ভিতর থেকে উত্থানের পথনির্দেশ ও প্রেরণা দান করা হয়েছে—নিবেদিতার ঐ পদ্ধতির মারাত্মক পরিণতি কী হতে পারে তা বুঝবার ক্ষমতা লেখকের ছিল অথচ গ্রন্থকর্ত্রীকে হাতে-নাতে ধরবার উপায়ও ছিল না। সমালোচক সেই রাগে কেবলই গরগর করেছেন, আর বলেছেন—খোলাখুলি না বলে আবৃতভাষায় কথা বলার এই ছলনা জঘন্য—জঘন্য। কেবল তাই নয়, তিনি দেখেছেন, শ্বেতদ্বীপের দেশোয়ালী ভাইবোনদের

মনে ভ্রান্ত ধারণা জাগাতে সমর্থ বইটি। সত্যই তো, ভারতবর্ষ সভ্য দেশ, তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত—এই ধারণা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা কী থাকতে পারে? দেশোয়ালীদের মনশ্চরিত্র রক্ষায় দায়বদ্ধ এই সমালোচক বললেন—তাই বলে বইটিকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না—কেননা এটি একই সংগে নিরতিশয় বদ।

[The work is, however, adapted to create a false impression on the English public. Persons ignorant of India, and more specially women, will be apt to take the writer at her own valuation, which is high, and to think that they are acquiring information, because she tells them so. Incidentally they will imbibe the idea that India is a united and highly civilised country, to which autonomy may, and should be entrusted. Had the book been merely silly—the gush of a writer whose flow of language exceeds her power of connected *thought, the reviewer would have fulfilled his duty when he had* glanced at it, and cast it aside in favour of something deserving of *serious criticism. It is not, however, merely silly*; on the contrary, its leading characteristic is cunning and its contents are mischievous."]

সমালোচক উদার মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বললেন, বাঙালীদের খোলাখুলি রাজনৈতিক অধিকার দাবিকে তিনি তারিফ করতে প্রস্তুত (অর্থাৎ কাদের গলায় দড়ি পরানো দরকার তা জেনে নিতে প্রস্তুত), কিন্তু কি নিন্দনীয় এই তলে-তলে চক্রান্ত! অ্যাঁ, জোয়ান অব আর্কের সংগে ঝাঁসীর রাণীর তুলনা ক'রে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা? সমালোচক, মার্শম্যানের বাইবেলতুল্য ভারতীয় ইতিহাস থেকে অংশ উৎকলন ক'রে দেখালেন, ঝাঁসীর রাণী কতখানি হিংস্র নিষ্ঠুর ছিলেন, যিনি লর্ড ডালহৌসি যে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন সেকথাটা ভুলতে পারার মতো বৈরাগ্য না দেখিয়ে, মিউটিনির সুযোগ নিয়ে, ইংরেজ নারী পুরুষকে কোতল করেছিলেন।

নিবেদিতা যে, লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছিলেন, তা এই সমালোচকের সুদীর্ঘ আক্রমণ থেকেই *বোঝা যায়। মিউটিনি সম্বন্ধে ইংরাজ শাসকদের* স্পর্শকাতরতা সুবিদিত। সেই মিউটিনির নায়িকা ঝাঁসির রাণীর বর্ণোজ্জ্বল চরিত্রাঙ্কন করা হয়েছে—সেই অসৎ কার্যকে সহ্য *করা এই সমালোচকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঝাঁসির রাণী সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখার* যে-উদ্ধৃতি সমালোচক দিয়েছিলেন, তার অনুবাদ দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করব:

"জোয়ান অব আর্ক পর্যন্ত চাঁদবিবি অথবা অপরূপা ঝাঁসির রাণীর অপেক্ষা অধিক দেশপ্রেমিকা ছিলেন না। ঝাঁসির রাণী ১৮৫৭ সালে বৃটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র-ধারণ করে যুদ্ধ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের সন্তানেরা এখনো একটি দৃশ্যের বিষয়ে বলা-বলি করে থাকে: নগর-প্রাচীরের অনেক উচ্চে দেখা যাচ্ছিল ফাঁসিকাঠে ঝোলা একটি মানুষকে—লোকটি আর কেউ নয় রাণীরই পিতা—রাণীর আদেশেই তার ফাঁসি, কেননা সে দুর্গের চাবি ইংরাজদের হাতে তুলে দেবার অপরাধ করেছিল। ওরা আরও বলাবলি করে: দ্বিপ্রহরে ঝিমন্ত শিবিরশ্রেণীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎবেগে রাণী সৈন্যদল নিয়ে ছুটে গেছেন,

তাঁর পিঙ্গল ঘোটকীর প্রতিটি পেশীতে দীর্ঘ তীব্র টান, হাতে উদ্যত বর্শা, এখনি যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবে। সাঁ-সাঁ করে ঝড়ের বেগে সেই আক্রমণ এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, সম্মোহিত শ্বেতসৈনাদের দু' একজনই মাত্র সংবিৎ ফিরে পেয়ে অন্তর্হিত অশ্বারোহী সৈন্যদলের দিকে দু'একটি গুলি ছোড়ার উপস্থিতবুদ্ধি দেখাতে পেরেছিল। প্রাচীন মানুষেরা এখনো অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রাণীর জয়গান করেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

প্যাট্রিক গেডেস ও নিবেদিতা

॥ ১ ॥ গেডেসের জীবনকথা : ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও কর্মের যোগ : তাঁর উপরে বিবেকানন্দের প্রভাব

'ওয়েব' রচনার ব্যাপারে নিবেদিতা বারেবারে প্যাট্রিক গেডেসের কাছে ঋণস্বীকার করেছেন। গেডেস বিখ্যাত সোসিওলজিস্ট। সমাজবিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে অন্যতম অগ্রণী পুরুষ হিসাবে তাঁর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হয়।

'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (৫ম) গ্রন্থে আমি গেডেসের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় এবং গেডেসের উপর স্বামীজীর প্রভাবের অনেক সংবাদ দিয়েছি। সেখানে গেডেসের জীবনীকার ফিলিপ বোর্ডম্যানের রচনা থেকে, অন্য সূত্র থেকেও, বিজ্ঞানী হিসাবে গেডে-সের খ্যাতির সংবাদ দেওয়া আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে : জীববিজ্ঞানী টমাস হাক্সলি গেডেসের শিক্ষক ; এমন প্রতিশ্রুতিময় তাঁর শিক্ষাজীবন যে, অনেকে আশা করেছিলেন তিনি দ্বিতীয় ডারউইন হবেন। গেডেস যদিও নিজেকে জীববিজ্ঞানের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেন নি তথাপি জীবনের শেষ পর্যায়ে আর্থার টমসনের সঙ্গে যৌথভাবে তাঁর 'লাইফ, আউটলাইনস্ অব জেনারেল বায়োলজি' প্রকাশিত হলে জুলিয়ান হাক্সলি তার বিষয়ে বলে-ছিলেন 'অভ্রভেদী কাণ্ড'। গেডেস জীববিজ্ঞান থেকে অন্য শিক্ষাধারাপথে অগ্রসর হয়ে-ছেন, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারায় ; সেসব ক্ষেত্রে যে-চিন্তা তিনি রেখে গেছেন তা নতুন বিশ্বসভ্যতার ভিত্তিপত্তনের কাজ করবে, এমন বলা হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, জিভন্স্, মার্শাল প্রভৃতি প্রাচীনতর অর্থনীতিকদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যে-চিন্তার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন তা অর্থনীতিকে মানবকল্যাণের খাতে চালিত করার প্রয়াসী। গেডেস তাঁর বিরাট প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও প্রচারকে অবজ্ঞা করতেন, গ্রন্থসমুদ্রে ডুবে থাকাই পছন্দ করতেন, স্পেশালাইজেশনের যুগে সিনথিসিসের অনুরাগী ছিলেন। লুইস মামফোর্ড গেডেস সম্বন্ধে বলেছেন, "গত শতাব্দীর যথার্থ মৌলিক এক মনের অধিকারী প্যাট্রিক গেডেস ; তিনি সেই দার্শনিক যাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অ্যারিস্টটল বা লাইব্‌নিৎস-এর পর্যায়ে তাঁকে উত্তোলন করেছে।"

ভারতবর্ষের সঙ্গে গেডেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল : তিনি দু'বার ভারতে এসেছেন, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন, জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী লিখে-ছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল—এসকলের মূলে ছিল বিবেকানন্দের প্রভাব ; বিবেকানন্দই গেডেসের সামনে ভারতবর্ষের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। বোর্ডম্যান বলেছেন, ১৮৯৩ সালে [?] চিকাগোয় তরুণ বিবেকানন্দের সঙ্গে গেডেসের পরিচয় হয় ; অবিলম্বে তিনি স্বামীজীর প্রভাবাধীন হন। নিবেদিতা ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গেও গেডেসের বিশেষ পরিচয় হয়। নিবেদিতা ১৮৯৮ সালে কলকাতায় মিস ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন, "যদি

কখনো প্যাট্রিক গেডেস বলে কারো সম্মুখীন হও তাকে অনুসরণ করো ; শিষ্যদল সৃষ্টি করার মতো মানুষ তিনি।" মিস ম্যাক্লাউডের সঙ্গে গেডেস-দম্পতির পরিচয়ের ফলে, বোর্ডম্যান জানিয়েছেন, "তাঁদের মধ্যে সুদীর্ঘ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়।"

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস এগজিবিশনে স্বামীজীর সঙ্গে গেডেসের পুনশ্চ সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। এর ফলে গেডেস সপরিবারে স্বামীজীর কাছে রাজযোগ শিক্ষা নেন। গেডেসের তখন অনুগত শিক্ষার্থীর ভূমিকা। গেডেস পরবর্তীকালে স্বামীজীর রাজযোগের ফরাসি সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন। বোর্ডম্যান লিখেছেন : "গেডেস একদা শিশুদের উপর সিস্টার নিবেদিতার প্রভাবের বিষয়ে যা লিখেছিলেন, সেকথা বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ও তাঁর উপরে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধেও বলা যায়। নিবেদিতা-প্রসঙ্গে গেডেস লিখেছেন : 'নিবেদিতা শিশুদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ধারে মেঝের উপর বসতেন—তাদের শোনাতেন হিন্দুধর্মের শিশুকাহিনী। এমন মোহিনী শক্তির সঙ্গে সেসব বলতেন যে, তা ছাপিয়ে যেত তাঁরই সৃষ্ট ঐসব বস্তুর উচ্চাঙ্গের লিখিত রূপকেও। এইভাবে তিনি উৎসুক তরুণ মনগুলিকে এমনভাবে ছুঁয়ে যেতেন যে তারা তাঁকে অনুসরণ ক'রে সুদূর প্রাচ্যভূমিতে উপস্থিত হবার স্বপ্ন দেখত।' "

॥ ২ ॥ নিবেদিতার পত্রে গেডেস-সংবাদ

নিবেদিতার পত্রাবলীতে গেডেস-প্রসঙ্গ প্রচুর। নিবেদিতা তাঁর চিন্তাভঙ্গির উপরে গেডেসের প্রভাব সদাসর্বদা স্বীকার করেছেন। অপরপক্ষে গেডেসকে ভারতবর্ষের ব্যাপারে আগ্রহী করার পিছনে নিবেদিতার ভূমিকা কম নয়।

নিবেদিতার পত্রাবলীতে গেডেসের প্রথম উল্লেখ পাই ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০, মিসেস বুলকে লেখা চিঠিতে : "অধ্যাপক গেডেস সম্বন্ধে তোমার চিঠি পেলাম। ঐ লোকটির বিষয়ে আমি সর্বদাই মন্দভাগ্য! নরম্যান উইলড্ ওঁর বিষয়ে আমাকে সর্বদা যা বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন, তুমি তাঁকে সেইরূপেই দেখতে পেয়েছ বলে আমি খুশি।" ১৩ মার্চ, ১৯০০, নিবেদিতা স্বামীজীকে সুদীর্ঘ গেডেস-প্রশস্তি লিখে পাঠান। ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে তাঁর সঙ্গে গেডেসের পরিচয় হয়েছে। "ঐ প্রখ্যাত [স্কট] সমাজবিজ্ঞানী, [লুই বার্ক তাঁর 'সেকেন্ড ভিজিট' গ্রন্থে (৬৫৮) লিখেছেন] যাঁর বয়স ছেচল্লিশ, বর্ণময় আলোক বিচ্ছুরণকারী রোমান ক্যাণ্ডল্-এর মতো ভাববিচ্ছুরণকারী যাঁর মন—তরুণী নারীটির [নিবেদিতার] মধ্যে বুদ্ধিমতী, উৎসুক, ঐকান্তিক এক শ্রোত্রীকে পেয়েছিলেন, বুভুক্ষু মন নিয়ে যিনি অধ্যাপক গেডেস কর্তৃক যথেচ্ছ-বিতরিত বিদ্যাবুদ্ধির আহার্য গ্রাস করছিলেন।"

স্বামীজীকে লেখা নিবেদিতার ১৩ মার্চের পূর্বোক্ত পত্রটিকে গেডেস সম্বন্ধে চমৎকার এক সমাদরমূলক রচনা বলা চলে। নরম্যান উইলড্ নিবেদিতাকে বলেছিলেন, যদি অধ্যাপক গেডেসের সাক্ষাৎ পাও দেখবে তোমার আত্মার পরিত্রাণ হয়ে গেছে, আর জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি চিরতরে নির্ধারিত। "গেডেস হলেন স্পেনসারের পরে প্রথম সমাজবিজ্ঞানী যিনি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত সমাজসম্বন্ধীয় নূতন জীবন্ত তত্ত্বের উদ্ভাবন করতে পেরেছেন।" গেডেসের চরিত্রের পাশ্চাত্ত্য-সুলভ "আকর্ষণী মধুরতা এবং ধৈর্যশীল সন্ধানী মনোভাবের" কথা নিবেদিতা বলেছিলেন। গেডেস উদ্ভিদবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী,

সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী। গেডেসের মতবাদের যথাসম্ভব ব্যাখ্যার চেষ্টাও নিবেদিতা ঐ পত্রে করেন।

কয়েকমাস পরে (৯.৬.১৯০০) নিবেদিতা লিখলেন, তিনি গেডেসের সঙ্গে কাজ করতে পারেন—গেডেসের বিষয়ে বই লিখতেও পারেন।

ঐ 'কাজ' ব্যাপারটি হল : ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক গেডেস প্যারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে "বিজ্ঞান, কলা, শিক্ষা ইত্যাদির অগ্রগতির জন্য আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত" হয়েছিলেন—সে-বিষয়ে সহায়তা করার জন্য তিনি নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে নিবেদিতা ঐ বছরের জুলাই মাসে প্যারিসে হাজির হন। মোটামুটি সেক্রেটারির কাজই নিবেদিতার করণীয়। কিন্তু গেডেসের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে নিবেদিতা শোচনীয় নৈরাশ্যের সম্মুখীন হলেন। যে-নিবেদিতা সর্বদাই সৃষ্টিশীল, অপরের ভাবকে গ্রহণ করলেও তার উপরে নিজ ব্যক্তিত্বের ছাপ না এঁকে পারেন না—তিনি দেখলেন, গেডেসের সঙ্গে কাজ করা মানে ক্যাটালগ-করা, ইনডেক্স-করা, বক্তৃতা রিপোর্ট-করা, রিপোর্ট তৈরী করা। দেখলেন, গেডেস চান তাঁর কণ্ঠস্বরের হুবহু প্রতিধ্বনি তোলার মতো কণ্ঠস্বর। এই ভূমিকায় নিবেদিতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। "তাঁর ইচ্ছাপূরণে নিতান্ত ব্যর্থ হয়েছি আমি।...আমি একেবারে ছিন্নভিন্ন"—নিবেদিতা লিখলেন। [১.৭.১৯০০]। গেডেস পরিষ্কার জানালেন, নিবেদিতা যা করেছেন, তা তাঁর কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নিবেদিতার বাগাড়ম্বরের সমালোচনা করলেন তিনি। [১৩.৮.১৯০০]। কাজের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার অভাব নিবেদিতার অসহ্য লাগল। ভাবাপ্লুত হৃদয়ে তিনি স্মরণ করলেন—স্বামীজী তাঁকে কত না স্বাধীনতা দিয়েছেন। তথাপি নিবেদিতা, যখন ব্যর্থতায় মর্মপীড়িত, তখনো গেডেসের স্বভাব-মাধুর্যের প্রশংসা করেছেন।

বিচিত্র ব্যাপার হল—অনুগত সেক্রেটারি হিসাবে নিবেদিতাকে গেডেস যখন ব্যর্থ মনে করছেন, ঠিক তখনি তিনি নিবেদিতার মধ্যে দেখছেন—ভাব ও চিন্তা আত্মসাৎ-করণে অসাধারণ পটু এক শিক্ষার্থীকে—মৌলিক চিন্তায় সমর্থ এক সৃষ্টিশীল চরিত্রকে। কিছুদিনের মধ্যে নিবেদিতা লিখলেন, "[গেডেস] আমার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, আরও কাজ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।" [১.৩.১৯০১]। "মিঃ গেডেস, সাহিত্যে আমার অধিকার সম্বন্ধে দুটি দারুণ পরিচয়পত্র দিয়েছেন, যার মধ্যে বলেছেন—স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন থেকে লাফকাডিস হার্ন পর্যন্ত আমার যাতায়াত।" [১৫.৩.১৯০১]। এর পরে গেডেস ক্রমান্বয়ে নিবেদিতাকে তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য তাগিদ দিয়ে গেছেন, যদিও নিবেদিতা রাজি হতে পারেন নি।

নিবেদিতা কিন্তু গেডেসের কাছে তাঁর বিরাট ঋণ অকুণ্ঠে স্বীকার করেছেন। "গেডেসের কাজ আমাকে কত সাহায্য করেছে তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।" [১১.৭.১৯০১]। "অধ্যাপক গেডেস আমাকে এমন একটি যন্ত্র দিয়েছিলেন যার মূল্যনিরূপণ সম্ভব নয়। আমি সে যন্ত্র যেভাবে ব্যবহার করেছি তাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন, কিন্তু তাকে এখন আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।" [২৩.৪.১৯০০]। "অধ্যাপক গেডেস ধন্য, তিনি আমাকে 'স্থান' অনুশীলনের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন।" [৩.২.১৯০৪]। "যখনি আমার [ওয়েব] বইটি খুলি তখনি ক্রমেই অধিকতর বুঝি যে, তাঁর কাছে আমার ঋণ কতখানি।" [৪.২.১৯০৫]। "মিঃ গেডেসের কাছে অন্যান্যদের ঋণের

তুলনায় আমার ঋণের পরিমাণ বেশি। [২.৫.১৯০৬]। 'ওয়েব' গ্রন্থের মুখবন্ধে নিবেদিতা লিখেছিলেন, অধ্যাপক গেডেস "ইউরোপকে বুঝবার কিছু শিক্ষা দেবার সময়ে এমন একটি পদ্ধতি দান করেছিলেন যার দ্বারা পরোক্ষভাবে ভারতীয় অভিজ্ঞতা অনুধাবন করতে পেরেছি।"১

গেডেসের শিক্ষার গুরুমূল্য সম্বন্ধে সচেতন নিবেদিতা ভারতবর্ষের পক্ষে ঐ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। "মিঃ গেডেস! তাঁর কাছে আমার কত না ঋণ!—আর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কাছে ভারতবর্ষকে ঋণী করাতে আমার কত না বাসনা।" [১৩.১২.১৯০৬]। এই প্রকার ইচ্ছা নিবেদিতা ১৯০১, এপ্রিল মাস থেকেই বোধ করছেন। তার প্রায় চার বছর পরেও লিখেছেন : "যদি কেবল মিঃ গেডেসকে বহন করে আনতে পারতাম।" [১৪.২.১৯০৫]। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে গেডেসের ঘনিষ্ঠতা নিবেদিতার সূত্রেই হয়েছিল। [২.৫.১৯০৬]। জগদীশচন্দ্রের জীবনী রচনার জন্য নিবেদিতার রেখে যাওয়া টাকা গেডেস পেয়েছিলেন। গোখলের সঙ্গে গেডেসের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে নিবেদিতা উৎসুক ছিলেন, কেননা সেক্ষেত্রে গেডেস গোখলের অর্থনীতির দুর্বল অংশগুলি অবিলম্বে দেখিয়ে দিতে পারবেন। গোখলে নিজের অর্থনীতিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, কিন্তু বহু পঠন সত্ত্বেও তাঁর চিন্তায় মৌলিকতা নেই ; গেডেসের মনের সাহচর্য তাই তাঁর পক্ষে উপকারী হবে। [২২.৩. ১৯০৬] বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ যখন সংকীর্ণতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন নিবেদিতা চেয়েছেন, গেডেস এসে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করুন। এ-ব্যাপারে প্রচুর আলাপ-আলোচনা তিনি করেছেন, গেডেসকে আনাবার জন্য অন্যদের প্রণোদিত করেছেন ; গেডেস ভারতে এলে কিভাবে ভারতীয় পরিবেশের মধ্যে অসুবিধা বোধ না ক'রে বাস করতে পারবেন তার বিচার-বিবেচনা করেছেন—এসকলই করেছেন যেহেতু তাঁর মতে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষে "গেডেস সঠিক মানুষ।" আমরা আরও দেখি, নিবেদিতা অনেক আগেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার ব্যাপারে গেডেসকে আগ্রহী করে তুলতে পেরেছিলেন। পটভূমিকায় ছিল টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা টাটা কর্তৃক প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয়। লর্ড কার্জনের উচ্চশিক্ষা সংকোচনীতির প্রতিরোধ করতে জামসেদজী টাটা বহু লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করেন, যার দ্বারা বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। সরকারী মহল সেই প্রস্তাবে অত্যন্ত বিরূপতাবোধ করেছিল ; আর নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থনে টাটার প্রস্তাবের পক্ষে লড়াই শুরু করেন।২ এইসূত্রে নিবেদিতা ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পাশ্চাত্ত্য-মনীষীদের কাছে মতামত চেয়ে পত্র লেখেন। গেডেস

১ সমাজনীতি ও অর্থনীতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতার উপরে গেডেসের প্রভাবের বিষয়ে ফিলিপ বোর্ডম্যান লিখেছেন :

নিবেদিতা চেয়েছেন, গেডেস এসে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করুন। এ-ব্যাপারে প্রচুর

"According to a famous Austrian economist and sociologist, the two scholars who have contributed most to a real understanding of the Indian economic life in its proper social and cultural setting, are Sister Nivedita and Dr. Radhakamal Mukerjee, both students of Geddes and indebted to him for their new approach and methods." [Patrick Geddes and Swami Vivekananda', *Prabuddha Bharata*, May 1948].

২ বিষয়টি 'সমকালীন' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে [২৩৯-৬৬] বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

তার উত্তরে দীর্ঘ পত্র-প্রবন্ধ পাঠান—সেগুলি ভারতীয় সংবাদপত্রে সমকালে প্রকাশিতও হয়। যেমন মাদ্রাজ মেলে ১৬, ১৭ অগস্ট ১৯০১ তারিখে, মরাঠা পত্রিকায় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০১। নিবেদিতার দেহান্তের বহুদিন পরে প্রবুদ্ধ ভারতের এপ্রিল ১৯৪৮ সংখ্যায় "এ নিউ ইউনিভার্সিটি ফর ইণ্ডিয়া" বলে গেডেসের একটা বৃহৎ প্রবন্ধ বেরোয়; প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক জানান—প্রবন্ধটি নিবেদিতার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল, এবং সেটি নিবেদিতাকে লেখা গেডেসের একটি দীর্ঘ পত্র ছাড়া কিছু নয়।

গেডেস বৈজ্ঞানিক, তথাপি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারবেন—কেন, তা নিবেদিতা জানিয়েছেন :

"গেডেসই একমাত্র বিজ্ঞানের মানুষ...যিনি জানেন বিজ্ঞানও নৈতিক জগৎকে সেবা করে—সেবা করা তার উচিত—তা করতে হবেই তাকে। গেডেস জানেন, আমরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সামাজিক সহানুভূতিযুক্ত নৈতিক মনুষ্য, আদর্শের জন্য ক্ষুধাতুর—রুটির ক্ষুধার মতই তা বাস্তব।" [৩.৮.১৯১১]।

যে-সকল তথ্য উপস্থিত করলাম তাদের থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, পরবর্তীকালে গেডেস যদি ভারতে এসে থাকেন, তার আদি কারণ বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় কারণ নিবেদিতা, তৎসহ মিস ম্যাকলাউড, যিনি গেডেসের সঙ্গে পরিচয়ের সূচনাপর্বেই ১৯০১, ৩০ অক্টোবর লিখেছিলেন :

"গেডেসরা! ওঁরা আমাদেরই!...ওঁদের একদিন না একদিন প্রাচ্যে চাই।" [মিসেস বুলকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের পত্র]।

॥ ৩ ॥ গেডেস-মতের ব্যাখ্যায় নিবেদিতা

নিবেদিতার রচনাবলীতে গেডেসের মতের উল্লেখ প্রচুর। তিনি কেবল গেডেসের উল্লেখ করেন নি, কয়েক ক্ষেত্রে যথেষ্ট জায়গা নিয়ে গেডেসের মতবাদের ব্যাখ্যাও করেছেন। সমাজবিজ্ঞানের উচ্চ ও গভীর তত্ত্বে পূর্ণ সেইসকল রচনার বস্তু-পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, কেবল এই ক্ষোভ এইসূত্রে প্রকাশ করতে পারি—সমাজবিদ্যা নিয়ে উগ্র আগ্রহের এই কালে ভারতীয় বিষয়ে প্রধান সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতার প্রাসঙ্গিক রচনার উপরে আলোচনা দেখাই যায় না। সমাজবিষয়ে আলোচকদের অতি অসামাজিক এই ঔদাসীন্য।

নিবেদিতা রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত তিনটি রচনায় গেডেসের উল্লেখ বা চিন্তাপ্রসঙ্গ বিস্তারিত :

1. The Relation Between Famine And Population.
[Notes of lectures heard in Paris at the International School of Science, 1900].
2. Indian Thought.
3. The Sociological Method In History.

প্রথম রচনাটি দীর্ঘ। গেডেসের সহকারী হিসাবে নিবেদিতা ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের প্যারিস কংগ্রেসের বিজ্ঞান-অধিবেশনে কাজ করেছিলেন—সেকথা আগেই বলেছি। সেখানে নিবেদিতা যেসকল নোট করেছিলেন, তাদের মধ্যে তৎকালের ভারতবর্ষের পক্ষে মর্মান্তিকভাবে প্রাসঙ্গিক দুর্ভিক্ষ ও জনসংখ্যার সম্পর্কের বিষয়টি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেন।

অর্থনীতি ও সমাজনীতির নানা তত্ত্ব ও তথ্যে পূর্ণ লেখাটিতে যদিও বলা হয়েছে, উক্ত বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত একদল সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ এখানে সংকলিত, তথাপি একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়, এর মধ্যে প্রধানতঃ গেডেসের মতেরই উপস্থাপনা। নিবেদিতা এইসঙ্গে ব্যাখ্যাত্মক মন্তব্যও করেছেন।

নিবেদিতা রচনাটি শেষ করেছেন এই বলে :

"পাশ্চাত্ত্যদেশে খ্যাতিসম্পন্ন একদল সমাজবিজ্ঞানীর কাছে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আমি যা শুনেছিলাম, তার বিবরণ দিতে আমি দায়বদ্ধ। তাঁদের মত যেভাবে বুঝেছি সেইভাবেই লিখেছি। তবে পাঠকদের উপকারার্থে আমাকে বলতে হচ্ছে—পণ্ডিতদের পক্ষে পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। ভারতীয় তরুণদের কাছে—আলজিরিয়ায় ফ্রান্স কী করল, ভারতে ইংরাজ কী করল—এটাই প্রশ্ন হওয়া উচিত নয়। প্রশ্ন হল—তারা নিজেদের দেশের জন্য নিজেরা কী করতে প্রস্তুত? শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি মৌলিক নীতি বিদেশীয় সংগঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় : শিক্ষার্থী নিজে যে কাজ ক'রে নিতে পারে সে-কাজ তার হয়ে করে দিলে আমরা তার অতীব ক্ষতি করি; তার মঙ্গল করছি, এমন দম্ভ করা সেখানে সাজে না।"

উল্লিখিত দ্বিতীয় রচনাটি বস্তুতঃপক্ষে লন্ডনে ১৯০৮ সালে ইউটোপিয়ানদের সভায় প্রদত্ত নিবেদিতার ভাষণের অনুলিখন। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন গেডেস—তিনি নিবেদিতা সম্বন্ধে কী বলেছিলেন তা আগেই উপস্থিত করেছি। নিবেদিতা এখানে গেডেস-মতবাদের বিষয়ে কিছু বলেন নি। তিনি প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনুসরণে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার অনন্যত্ব ফুটিয়ে তোলেন—পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনামুখে। অনবদ্য নিবেদিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। প্রথমেই তিনি খ্রীস্টান জগতের পক্ষে চমকপ্রদ একটি ভারতীয় ধর্মীয় ধারণার উপস্থাপনা করেন—ভারতবর্ষে মহাদেবকে প্রভু নয়, পিতা নয়, ভিক্ষুরূপে ধারণা করা হয়েছে। এই ধারণার মধ্যে 'অতুলনীয় কাব্যসৌন্দর্য এবং গভীরতা।' এইসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যে অপরিচিত কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচলিত ঈশ্বর-বিষয়ক আর একটি ধারণার কথাও বলেন—'ঈশ্বর সমদর্শী।' ভারতবাসীরা কিভাবে এইসকল ধারণায় উপনীত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে সকল অভিজ্ঞতার পরিণামী অদ্বৈতবোধের কথা তোলেন। বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেন, ইন্দ্রিয়পথে 'বহু' বলে প্রতীয়মান বস্তুগুলি মনোলোকে অভেদ বলে গৃহীত হয়—পাশ্চাত্ত্যবাসীর কাছেও। তিনি আরও বলেন, ভারতবাসী কেবল তাত্ত্বিকভাবে অভেদ-কে স্বীকার করেনি—তাকে উপলব্ধিও করতে চেয়েছে। সত্যকার অদ্বৈতের উপলব্ধির সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-র পার্থক্যবোধ বিলুপ্ত, সে অভিজ্ঞতা বাক্যমনাতীত, তখন 'সমাধি।' এই সমাধির অনুরূপ কিছু প্রোটেস্টান্টদের ধর্মতত্ত্বে না থাকলেও ক্যাথলিকদের 'বীটিফিক ভিশন'-এর মধ্যে তার কিছু অনুরূপতা আছে, অবশ্য পার্থক্যও যথেষ্ট। ক্যাথলিকদের কাছে মরণোত্তর শুদ্ধির পরেই ঐ অবস্থালাভ সম্ভব, আর হিন্দু সে-বস্তু চায় প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের অস্তিত্বে।

সমাজবিজ্ঞানীদের সভায় উপস্থিত নিবেদিতা সম্ভাব্য উদ্যত প্রশ্নের উত্তর দিতে অতঃপর চেষ্টা করেছেন। দিব্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিভাবে সামাজিক কর্তব্যকর্মে যুক্ত হবে? এখানে ভারতবর্ষের যে-উত্তর তাকে নিবেদিতা "ভারতীয়গণের গৌরববস্তু" বলে চিহ্নিত

করেছেন। তিনি বলেছেন—সমাধিলব্ধ মানুষ হয়ে যায় 'মুক্ত পুরুষ,' অনন্ত তাঁর স্বাধীনতা, তিনি দ্রষ্টা ও সাক্ষীপুরুষ, কর্তব্যে নিযুক্ত কিন্তু নির্লিপ্ত; সুখ দুঃখ, শুভ অশুভকে একই শক্তির বিভিন্নমুখী বিকাশ বলে জানেন। এই কারণেই ভারতবর্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক বিশেষণ প্রযুক্ত হয়—তিনি মধুরের মধ্যে মধুর, ভীষণের মধ্যে ভীষণ। সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে কেবল বাহির্গত বস্তু-উপাদানই বিবেচ্য নয়, জনজীবনের অন্তর্গত অনুভূতি ও প্রত্যয়ের বিচার-বিশ্লেষণও করতে হয়, সেই ধারণায় উত্থিত নিবেদিতা—গেডেস ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের সামনে ভারতীয় জীবনসত্যের গভীরতম একটি দিককে উদ্ঘাটিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। [গেডেস অবশ্য স্বয়ং বিবেকানন্দের কাছ থেকেই এইসকল তত্ত্ব জেনেছিলেন]।

নিবেদিতার পূর্বে উল্লিখিত তৃতীয় প্রবন্ধটি পুরোপুরি গেডেস ও তাঁর মতবাদের উপরে লিখিত। প্রবন্ধের নামটিই প্ররোচক, 'ইতিহাস রচনায় সমাজবিদ্যার প্রয়োগ।' ইদানীং ইতিহাসে সমাজবিদ্যার 'বিস্তর' প্রয়োগে আগ্রহী ঐতিহাসিকদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করব, তাঁদের ঔদাসীন্যে পরিত্যক্ত নিবেদিতা এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতেও ভারতবর্ষে অগ্রণী।

প্রবন্ধের গোড়াতেই নিবেদিতা বলেছেন: গেডেসকে আমরা ভারতবর্ষে চাই, যাতে তাঁর পদ্ধতি শিক্ষা ক'রে ভারতীয়রা তাকে ভারতীয় সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করতে পারে। তারপরেই নিবেদিতা বলেছেন, না, ভারতীয়দের পক্ষে পাশ্চাত্যে গিয়ে গেডেসের কাছে শিক্ষা নেওয়াই ভালো, কারণ তাতে পদ্ধতির বিশুদ্ধ রূপটি তারা পেতে পারবে। গেডেস ভারতে এলে, ভারতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে হয়ত ব্যক্তিগত পক্ষপাত এসে যেতে পারে, কে জানে!

গেডেসের মতবাদের আলোচনার সূচনায় নিবেদিতা গেডেসের উপরে ফরাসি-প্রভাবের, বিশেষতঃ লা প্লে ও কোমত্-এর মতবাদের প্রভাবের কথা বলেছেন। গেডেস কতখানি উক্ত ফরাসি চিন্তাবিদ্দের দ্বারা প্রভাবিত আর কোন্ অংশে তিনি মৌলিক, সেই বিচারের অসামর্থ্য জানিয়েও নিবেদিতা নানা দৃষ্টান্তে গেডেসের মৌলিকতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গেডেসের 'ঘটনা-পরম্পরা-পদ্ধতির' বিশ্লেষণ নিবেদিতা করেছেন। গেডেস পূর্বাপর ঘটনাধারাকে সাক্ষী রূপেই দেখেন। তিনি সমস্যার সমাধান করেন—ব্যাপারটি কিভাবে ঘটল এবং পরে কি ঘটতে যাচ্ছে, তার ক্রম দেখিয়ে।

নিবেদিতা জানিয়েছেন, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে নিউইয়র্কে গেডেসের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। গেডেস, এক সভায় প্যারিস নগরীর ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার গভীরতা নিবেদিতাকে মোহিত করে। কলকাতা শহরের উপরে ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে অবিলম্বে তার বিশ্লেষণ করতে তিনি চেয়েছেন। হিন্দু কলকাতা, মুসলমান কলকাতা, ইংরাজ কলকাতা—এই তিন কলকাতা আছেই তার বিশেষ রীতি নীতি ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে। কিন্তু চতুর্থ একটি কলকাতা আছে 'পৌর কলকাতা', বা 'জাতীয় কলকাতা।' এই কলকাতা সকলের। এই কলকাতা সেই নগরী, যাকে আমরা যেভাবে সৃষ্টি করতে চাইব সে তারই চরিত্র গ্রহণ করবে।

অবিরাম নব নব মৌলিক চিন্তায় সমৃদ্ধ গেডেসকে নিবেদিতা শহর সম্বন্ধে এই

প্রকার বক্তব্য প্রকাশ করতে আর দেখেন নি—গেডেস একই চিন্তার পুনর্ঘোষণা ক্রমই করতেন। কিন্তু একটি জায়গায় তিনি অবিরাম প্রদক্ষিণ করেছেন, যা ছিল, নিবেদিতার ভাষায়, তাঁর 'চিন্তার বেদ।' সেই 'বেদ' হল—"মানবসমাজে স্থানের প্রভাব সম্বন্ধীয় মতবাদ।" গেডেসের এই মতবাদের আলোচনার মধ্যে নিবেদিতা লা প্লে-র মতের উপস্থাপনা করেছেন। লা প্লে ৬টি মৌলিক সভ্যতা-তত্ত্বকে উপস্থিত করেছিলেন। চারণভূমি—পশু-পালকদের সৃষ্টি করে; উর্বর উপত্যকা—কৃষকদের; নদী ও সমুদ্রতট—মৎস্যজীবীর; অরণ্য—শিকারী ও বনবাসীর; এবং খনিজসমৃদ্ধ অনুর্বর পর্বত—খনিজীবীর। গেডেস এই মতকে কতখানি নিয়েছেন, আরও কতখানি এগিয়ে দিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা দেবার পরে, নিবেদিতা কিছু কিছু সংযোজনী মন্তব্যও করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সভ্যতায় নারীর স্থানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আদিম সমাজ মাতৃতান্ত্রিক, মাতার পরিচয়েই সন্তানের পরিচয়, এই বিষয়টি নিবেদিতা ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম-জবালা কাহিনীর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষে মাতৃতান্ত্রিকতা বহুলাংশে বিদ্যমান বলে এই বিশেষ বিষয়টি সম্বন্ধে গবেষণা করতে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের তিনি আহ্বান করেছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ভারতীয় ইতিহাসের রূপ সম্বন্ধে বলেছেন :

"আমি দীর্ঘকাল ধরে আশা পোষণ করেছি, এই প্রকার ইতিহাসের সূচনা হবে মানবসমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত-সহ ; তারপর তা অগ্রসর হবে এশিয়ার অধিত্যকার উপর দিয়ে মানব জাতি-গোষ্ঠীর গমনাগমনের পুনর্গঠিত বিবরণ দিয়ে ; তারপর তা তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে, আসল পর্যায়ে পৌঁছবে—ভারতবর্ষ ও জনগণের জীবন বিকাশের কাহিনী দিয়ে।"

গেডেসের কাছে নিবেদিতার অসীম কৃতজ্ঞতা, যা তিনি প্রায়ই প্রকাশ করেছেন—গেডেস এই চূড়ান্ত আদর্শবাদী নারীকে এই জ্ঞানে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, চরম আত্মোৎসর্গ একটা খাপছাড়া খ্যাপামির ব্যাপার নয়—সেটা মানবসমাজের মৌল প্রাণাবেগের মধ্যেই আছে। নিবেদিতা এই পৃথিবীতে উদ্ভট অদ্ভুত কিছু হতে চাননি—প্রতি মুহূর্তে মানুষের জন্য রক্তদান করেও তিনি স্বাভাবিক মানুষ থাকতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা কৃতজ্ঞচিত্তে বলেছেন, মানবসমাজকে যথারূপে দর্শন করতে সচেষ্ট গেডেস 'ন্যায় ও বিবেককে' সমাজ-বিজ্ঞানগত উপাদান-বস্তু মনে করেন। "মানুষের আকৃতিসমূহের মধ্যে নৈতিকতা যে, কেবল সর্বাধিক মহৎ বস্তু তাই নয়, তা একই সঙ্গে সর্বাধিক স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রতাপান্বিত—এইটি আমার কাছে গেডেসের মৌলিক স্বীকৃতিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান বলে প্রতীয়মান"—নিবেদিতা লিখেছেন। আরও বলেছেন:

"সমাজবিজ্ঞানগত তথ্যের মধ্যে নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি—আমাদের মধ্যে এমন তৃষ্ণা আছে যা আমাদের আত্মসংরক্ষণের প্রয়াসগুলিকে ক্ষেত্রবিশেষে বাতিল ক'রে দিয়ে, অপরের রক্ষায় কিংবা আদর্শের অনুসরণে চূড়ান্ত আত্মবলিদানে প্রণোদিত করে।"

॥ ৪ ॥ নিবেদিতার চরিত্র ও প্রতিভা সম্বন্ধে গেডেসের প্রশস্তি

ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে নিবেদিতা সম্বন্ধে গেডেসের গভীর শ্রদ্ধা জেগেছিল—তার অল্প-বিস্তর পরিচয় আমরা পেয়েছি। নিবেদিতার আদর্শবাদিতা সম্বন্ধে গেডেস লেখেন : "আমি

নিবেদিতার তুল্য এমন আর কাউকে দেখিনি যিনি ঐ প্রকার দ্রুতবেগে, গভীর ঐকান্তিকতার সঙ্গে, আদর্শকে গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং তার সর্বপ্রকার রূপায়ণে আনন্দলাভ করেছেন।"৩

নিবেদিতার মনস্বিতার বিষয়ে গেডেসের স্বীকৃতি :

"এইসকল বিবর্তনবাদী পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত ক'রে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাদের প্রয়োগ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে, তিনি আমাদের বাড়ির উপরতলার চিলে-ঘরে আশ্রয় নিলেন। ঘরটি তাঁর সমুচ্চ ও বিস্তারিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে তাপসী-সুলভ অনাড়ম্বর মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হল। আমার সম্বন্ধে বলতে পারি, আমি তাঁর তীক্ষ্ন-গভীর পর্যবেক্ষণ এবং ততোধিক মর্মগ্রাসী আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিকে স্বীকার করতে বিলম্ব করিনি, যাদের দ্বারা তিনি ভারতীয় জীবনজালের তলবর্তী, জীবনের বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভরশীল, সহজ সরল বুননের উপরিভাগের বিচিত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপের তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই সূত্রটি তাঁর সঙ্গে বহুবিধ আলাপ আলোচনার দ্বারা গোড়াতেই তাঁর হাতে ধরিয়ে দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।"৪

"স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইসটার্ন হোম" নামক নিবেদিতার মরণোত্তর পুস্তকের পরিশিষ্টে অন্যান্যের সঙ্গে গেডেস-রচিত নিবেদিতার চরিত-চিত্রণ আছে, যার থেকে উপরের অংশ উৎকলন করেছি। কিন্তু গেডেস নিবেদিতার জীবনকালেই প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করেছিলেন। ডরোথি হ্যালিনস্-সম্পাদিত *"ইউটোপিয়ান পেপারস"* নামক গ্রন্থে (১৯০৮) পাই—লণ্ডনে ইউটোপিয়ানদের সমাবেশে নিবেদিতা "ভারতীয় চিন্তা" বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন—বক্তৃতার আগে নিবেদিতাকে পরিচায়িত করতে গিয়ে গেডেস বলেন :

"I have much pleasure in introducing Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda, who has been *a student of social matters*, first in Europe and now in India. In India she has found that the great problems of Indian life turn on nature and occupations and natural conditions of all kinds; turn on the family, and largely on Indian thought, primarily on Indian religion; and steeped as she has been in this great world of idealism, she is peculiarly welcome to us in bringing an interpretation of the East which is still uncommon among us. We have heard vague and mysterious presentments of Indian thought, and it is something to have a reverent and sympathetic student who still keeps grip of science and the relations of the world."

আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই বক্তব্য। সমকালের প্রধান সমাজবিজ্ঞানী গেডেস, নিবেদিতার সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশেষজ্ঞতার এই-যে পরিচয় দিলেন, তার দ্বারা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিবেদিতার অধিকার ঘোষিত হল। বৈজ্ঞানিক

---

৩ *Studies From An Eastern Home*, Appendix

৪ ঐ।

জ্ঞানসম্পন্ন নিবেদিতা পৃথিবীর নানা দেশ ও জাতির মনুষ্যগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, সেই সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে তিনি ভারতীয় ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন—স্বয়ং প্যাট্রিক গেডেসের মুখ থেকে এই স্বীকৃতির মূল্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যায় পারদর্শীরা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন।

গেডেস বলেছেন, নিবেদিতার মধ্যে "সায়েন্স ও সিম্বলের মেলবন্ধন হয়েছিল, যারা অন্যত্র সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।" গেডেস আরও বলেছেন:

"নিবেদিতা বস্তুসত্য এবং ভাবসত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য এবং দার্শনিক সত্য—সমস্ত কিছুর দিকেই তাঁর মনকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর মনে সর্বদাই অগণ্য ভাবের তরঙ্গ-লীলা চলত। তাতে ছিল তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণের দ্যুতি, সহাস্য বা কাব্যিক ব্যাখ্যা, কিংবা মাণিক্য-বিচ্ছুরণতুল্য অধ্যাত্মরহস্য, বা নৈতিক অগ্নির আলোকশিখা। এই সমস্ত-কিছু তাঁর কথাবার্তা বা বক্তৃতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মোচিত হত। কখনো তাতে থাকত নম্র প্ররোচনা, যা ভারতীয় জীবনের কোনো-কোনো দিক সম্বন্ধে [বিদেশী] শ্রোতাদের মধ্যে সহানুভূতিপূর্ণ বোধের মনোভাব উদ্দীপ্ত করত, এমনকি সমর্থনও আদায় ক'রে নিত, যদিও সেইসব দিক এতাবৎ তাদের কাছে অজানিত বা বিতৃষ্ণাকর ছিল; কিংবা কখনো তিনি রোষে জ্বলে উঠতেন ও বজ্রবৎ ফেটে পড়তেন—আমাদের আত্মতৃপ্ত, অহংকৃত নিরেট বৃটিশ মূঢ়তার উপরে।"

সাধারণতঃ গেডেসকে কবিস্বভাবে দেখা যেত না। তিনি যে, নিবেদিতার বাগ্‌বাহুল্যের সমালোচনা করেছেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। "গেডেসের ভাষা অদ্ভুতরকম অর্থ-গূঢ়।" সহজে তার অর্থবোধ হয় না। [২১.৬.১৯০৫]। সেই তাঁর উপরে যেন এক কবি ভর করেছিল—নিবেদিতার ছবি আঁকার সময়ে। নিবেদিতাকে রহস্যসুন্দর পটে স্থাপন ক'রে তিনি দেখেছেন:

"আমাদের স্মৃতিচিত্রের মধ্যে তাঁর থেকে স্পষ্টোজ্জ্বল চিত্র আর কারো নয়। দেখছি যেন, শরতের আচ্ছন্ন সন্ধ্যালোকে, উদ্যান-অগ্নির নির্বাপিতপ্রায় অঙ্গারের স্বর্ণপ্রভার সামনে বসে, তিনি কখনো সকরুণ বিলম্বিত সুরে, কখনো ঝঙ্কারিত মন্দ্ররবে, অগ্নিস্তোত্র পাঠ করছেন। বিচিত্র শব্দগুলি, তবু যেন তার ধুয়া এখনো কাণে বাজে। সে হল প্রতীচ্যের কর্ণে প্রাচ্যের শব্দ ও সঙ্গীত, প্রকৃতির বুকে আত্মার ধ্বনি—সেই মুখে, সেই কন্ঠে, যা প্রাণোচ্ছ্বাসে প্রভান্বিত, রাত্রি-সঙ্গে গভীর শান্ত।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিবেদিতার বৈপ্লবিক সম্পর্ক ও প্রয়াস

॥ ১ ॥ নিবেদিতার বৈপ্লবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ

চেতনার অগ্নিস্রোতে দেশকে প্লাবিত করাই ছিল নিবেদিতার অভিপ্রায়। আলোচ্য-কালের জন্য সে চেতনার নাম "জাতীয়তা"। "জাতীয়তা জননী আমার।" এই চেতনার বন্যা ছাড়া মনের কূল ভাঙবে না, নববিধানের নব জনপদ গড়ে উঠবে না, যেখানে থাকে সৃষ্টির নূতন মাত্রা। কিন্তু নিবেদিতা একইসঙ্গে নির্দিষ্ট আঘাতও করতে চেয়েছেন। তারই কিছু তথ্য এবার পরিবেশন করা যেতে পারে।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতা ও অরবিন্দের প্রথম সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎ-পর্যপূর্ণ বলে স্বীকৃত—সেই সাক্ষাৎকার এই পর্বের গোড়ার দিকে হয়—১৯০২, অক্টোবর মাসে, নিবেদিতা যখন বক্তৃতার উদ্দেশ্যে বরোদায় গিয়েছিলেন। এই সময়ে বরোদা থেকে লেখা নিবেদিতার একটি মাত্র চিঠিই পেয়েছি, তাতে কিন্তু অরবিন্দের কথা নেই। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এই সাক্ষাৎপ্রসঙ্গে 'পবিত্র'-কে লেখা একটি পত্রে বলেছেন :

"ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বরোদায়, যখন তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে, ও তারপর তাঁর বাসস্থানরূপে নির্ধারিত বাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দেবার জন্য স্টেশনে গিয়েছিলাম। বরোদার মহারাজার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন।...এই কালেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়।"১

"শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ্" গ্রন্থে [পৃ. ৯৭] এ-সম্বন্ধে পাই :

"ঐকালে আমি তাঁর [নিবেদিতার] 'কালী দি মাদার' গ্রন্থ পড়ে মোহিত। আমার মনে হয়, বইটির বিষয়ে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। তিনি বলেন, তিনি শুনেছেন যে, আমি শক্তি-উপাসক। তার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আমি তাঁরই মতো গুপ্ত বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত। বরোদার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে তিনি তাঁকে গুপ্ত বিপ্লবে সাহায্য করবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন—সেইসময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি মহা-রাজাকে বলেন, তিনি আমার মারফত তাঁর [নিবেদিতার] সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। সয়াজীরাও যথেষ্টই চতুর ছিলেন, এইরকম মারাত্মক কাজে ঝাঁপ দেবার পাত্র ছিলেন না, তিনি এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলেন নি।"

আত্মপ্রাণা বরোদার মহারাজার সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যে-সংবাদ দিয়েছেন তাতে উভয়ের একাধিক সাক্ষাৎকারের কথা আছে। আত্মপ্রাণা-প্রদত্ত নিবেদিতার ডায়েরি-প্রাপ্ত সংবাদ এই :

---

১ রেমঁ সংগ্রহে পবিত্রকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের এই পত্রের একটি কপি আছে।

"The Gaekwar invited Nivedita to her once. From her diary we come to know that she received a letter on the 23rd from the Gaekwar about which she was quite upset. Next day she saw the Gaekwar again."২

নিবেদিতাকে পাঠানো গায়কোয়াড়ের চিঠিতে কী ছিল যে, নিবেদিতা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, সে রহস্য এখনো পর্যন্ত অনুদ্‌ঘাটিত। তবে একথা স্পষ্ট যে, অরবিন্দ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগের বিষয়ে হয় সবকিছু জানতেন না, বা পরবর্তীকালে তার সবটা স্মরণ করতে পারেন নি।

নিবেদিতার বৈপ্লবিক চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রামাণিক আরও বক্তব্য :

"বিপ্লবী নেতাদের তিনি [নিবেদিতা] ছিলেন অন্যতম। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ ; বিপ্লবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাঢুকি ছিল না তাঁর মাঝে [এটা আংশিক সত্য মাত্র]। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই—তাঁর খাঁটি স্বরূপ—বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হত। যোগ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল কাজ যেন এটা। একেই বলে আগুন। তাঁর বই, 'কালী দি মাদার' উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহমূলক, অহিংস নয়। রাজপুতনায় ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতেন।৩ [শ্রুতলিপি লেখক-নির্দেশে]।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় তাঁর প্রথম পর্যায়ের বৈপ্লবিক কার্যাবলীর প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য গোপন দূতদের তিনি পাঠিয়েছিলেন, তারপর নিজেও আসেন। "তিনি [বাংলার তৎকালীন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকে] একটি সংগঠনের মধ্যে একত্রবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন, ব্যারিস্টার পি মিত্র হবেন বঙ্গীয় বিপ্লবের নেতা, এবং পাঁচ জনের একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হবে যার অন্যতম নিবেদিতা।"৪

এই কেন্দ্রীয় পরিষদ দীর্ঘদিন কাজ করেনি, বাংলার প্রাথমিক বিপ্লবচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার দায়িত্ব কার—অরবিন্দ, বারীন্দ্র বা যতীন্দ্রনাথের—সেসব নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। কিন্তু উক্ত বিপ্লব-পরিষদের সঙ্গে পরবর্তীকালে নিবেদিতার যোগ না থাকাটা কারো-কারো কাছে বিপ্লবের সঙ্গে নিবেদিতার যোগ না থাকার প্রমাণ বলে মনে হয়েছে—তার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দের দু'একটি মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেগুলি ঐসকল সতর্ক সমালোচকদের তীক্ষ্ণ চোখ কিভাবে এড়িয়ে গেল জানি না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আমরা একটু আগে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে থেকেই নিবেদিতা গুপ্ত বিপ্লবী। তিনি আরও বলেছেন :

"তাঁর সঙ্গে আমার সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে গোপন বৈপ্লবিক ক্ষেত্রেই। আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, তিনি তাঁর কাজ নিয়ে, এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার বা একত্রে সিদ্ধান্ত করার কোনো ঘটনা ঘটেনি।"

---

২ আত্মপ্রাণা, ১৪৭।
৩ কথাবার্তা, ২৬৮।
৪ *On Himself*, 115-16.

এই কথাগুলির মধ্যে নিবেদিতার বৈপ্লবিক ভূমিকার স্বীকৃতি যেমন আছে তেমনি স্বতোবিরোধ আছে বলেও মনে হয়। একটু চিন্তা করলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। শ্রীঅরবিন্দের কথার অর্থ—নিবেদিতার নিজস্ব দল ছিল, যার কার্যাবলীর ও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তাঁর নিজেরই, অরবিন্দের দলের সঙ্গে তাঁর যোগ পারস্পরিক সাহায্যের যোগ ছাড়া কিছু নয়। এই কারণেই, অরবিন্দ-দলভুক্ত কেউ-কেউ বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগের বিষয়ে নিজেদের অজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় বিপ্লব পরিষদের ব্যাপারে নিবেদিতার উৎসাহহীনতার একটা ব্যাখ্যা পেয়েছি নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত স্বামী অভয়ানন্দের (বেলুড় মঠের ভরত মহারাজ) সঙ্গে কথা বলে। তিনি বলেছেন: নিবেদিতা এই ধরনের কেন্দ্রভুক্ত বৈপ্লবিক সংগঠনকে অদূরদর্শিতার কাজ বলে মনে করতেন; কেননা ওক্ষেত্রে একজন কেউ ধরা পড়লে সেই সূত্রে বাকি অনেকের ধরা পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, কলমির একটা ডগাকে টানলে যেমন কলমির ঝাড় চলে আসে। ভরত মহারাজ নিবেদিতার মুখেই একথা শুনেছেন।

॥ ২ ॥ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ঐ বিষয়ক বিবরণ

বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের গোড়ার দিকের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর চরিত্র অরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—নিবেদিতার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের বিষয়ে কিছু সংবাদ দিয়েছেন।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে (২৪৩) লিখেছেন, বারীন্দ্রকুমার তাঁকে বলেছিলেন—"নিবেদিতা তাঁর বরোদা-ভ্রমণের সময় থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত।" গিরিজাশঙ্কর বারীন্দ্রের "বোমার কাহিনী", (স্বদেশ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) থেকে যে-অংশ এই সম্পর্কে উৎকলন করেছেন, সেই বস্তুই ঈষৎ বিস্তৃত আকারে বারীন্দ্র "অগ্নিযুগ" গ্রন্থে (১ম খণ্ড; ১৩৩৫) লিখেছেন। তার মধ্যে তিনি বলেছেন, "ভগিনী নিবেদিতা চরমপন্থী নেতারূপে শ্রীঅরবিন্দের অগ্রগামী।" [পৃ. ১৪৫]। এইসঙ্গে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের বিষয়ে নিম্নের সংবাদ দিয়েছেন:

"সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরির জাতীয়তা-বিষয়ক প্রায় দেড়শ-দুইশ বই নিঃস্বত্ব হয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ রিপাবলিক, গ্যারিবলডি ও ম্যাটসিনির জীবনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, টডের রাজস্থান, টমকাকার কুটীর, মহাভারত, রামায়ণ, দাদাভাই নৌরজি, রমেশ দত্ত ও উইলিয়ম ডিগবি-র বৃটিশ অর্থনীতির বই (*Economic History of British India; Un-British Rule in British India*), ভারতের ইতিহাস, য়ুরোপের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ক্রমওয়েলের জীবনী, ব্লক-এর *War Made Impossible*, একখানি আধুনিক ব্যাপক ধ্বংসমূলক বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের বিবরণ-সংবলিত বই, ব্যারন ওকাকুরার বই—এমনই প্রায় দেড়শ উল্লেখযোগ্য সুপাঠ্য পুস্তক।

"নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আগে পূর্ব-জীবনে রাশিয়ার নিহিলিস্ট নামক বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে যুক্ত ছিলেন। এই রজোগুণী তেজস্বিনী নারী পরমার্থ পথে এলেও স্বভাবে ছিলেন কর্মী, ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে

দুঃসাহসী যোদ্ধা।...১৯০১ সালে [বস্তুতঃ ১৯০২ সালে] আমরা যখন বাংলায় বিপ্লব-কর্মের প্রথম পর্বের সূচনার জন্য বরোদায় প্রস্তুত হচ্ছি—তখন নিবেদিতা মহারাজার দ্বারা নিমন্ত্রিতা হয়ে [?] সেখানে যান। বিপ্লবী অরবিন্দর সঙ্গে এই-যে এই তেজস্বিনী অগ্নিমুখী নারীর যোগাযোগ হল ১৯০১ [১৯০২] থেকে, তাঁর [নিবেদিতার] মৃত্যু অবধি তা অবিচ্ছিন্ন ছিল। তাঁর অনুরোধেই ধর্ম ও কর্মযোগিনের কাজ অসমাপ্ত রেখে অরবিন্দ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য চন্দননগরের পথে পাঁন্ডচেরী গিয়েছিলেন। নিবেদিতা বাংলার গুপ্ত-চক্রের সঙ্গে ছিলেন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। একাধিকবার তাঁর কাছে গুপ্তচক্রের কাজে গিয়ে বাগবাজারের স্কুল-বাড়িতে দেখা করেছি।...নিবেদিতার প্রদত্ত লাইব্রেরিই ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের চক্রের ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎসমূল। তাঁর সঙ্গে যতীনদার কথাই ছিল, এই বইগুলি অবলম্বনে সেখানে রাজনীতি শেখাবার ও কর্মী গড়বার স্কুল করতে হবে। সেই স্কুলে বা স্টাডি-সার্কেলে বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস, জীবনী, অর্থ-নীতি, ধর্ম, সমাজ ও জাতির উত্থান-পতনের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়া হবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রচারক হয়ে ভারতের নবজাগরণের চারণ হয়ে নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে বিপ্লবের বীজ বপন ক'রে দেশকে অসংখ্য বিপ্লবী কেন্দ্রে ছেয়ে ফেলবে।... নিবেদিতা আমার বাংলায় আসার আগেই ১০৮ সার্কুলার রোডের গুপ্ত কেন্দ্রকে তাঁর পুস্তকাগার দিয়ে ফেলেছিলেন। আমিই হলাম সার্কুলার রোডের এই রাজনীতির স্কুলের প্রথম ছাত্র। তারপর ক্রমে জুটল এসে দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ইন্দ্র-নাথ নন্দী, এই ধরনের অনেক ভাবোন্মাদ মানুষ।...মাসের পর মাস সিস্টার নিবেদিতার সংগৃহীত অপূর্ব তথ্যপূর্ণ বইগুলি পড়ে-পড়ে আমি তখন ক্রমশঃ হয়ে উঠেছি যুক্তিতর্কে একরকম অপরাজেয়।...আমাদের দলে বহু শিক্ষিত লোক ছিলেন বলে—অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি চিন্তাশীল দেশব্রতীর নির্দেশ ও গভীর চিন্তা আমাদের পিছনে থাকায়—আমাদেরই মধ্যে বাংলায় প্রথম একটি সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী পরি-কল্পনা ধরে চলবার অনুপ্রেরণা জেগেছিল। তাই আমরা একে-একে যতীনদা ও পরে পি মিত্র-মশাইয়ের ঢিমে-তেতালা গতির বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম।"৫ [স্থূললিপি লেখক-নির্দেশে]

বহু প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ এই মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ ছাড়াও রেমঁ-সংগ্রহে বারীন্দ্র-প্রদত্ত তিনটি বিবরণ আছে। তার প্রথমটি, ১৮.৮.৩৯ তারিখে লেখা বারীন্দ্রকুমারের স্বাক্ষরিত পত্র; দ্বিতীয়টি বারীন্দ্রের স্বহস্ত-লিখিত নোট; তৃতীয়টি ৪.৫.১৯৫২ তারিখে লেখা বারীন্দ্রের আর একটি চিঠি। এই তিনটি বিবরণে অংশবিশেষে লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। স্বাধীনতার আগেকার চিঠিতে বারীন্দ্র যতখানি রেখে-ঢেকে বলেছেন, পরবর্তী বিবরণে তা করেন নি। প্রথম পত্রে বলেছেন, তিনি নিবেদিতার বিষয়ে কমই জানেন। "আমরা কেবল মাঝে-মধ্যে মিলিত হতাম; তিনি বাইরে খোলা আন্দোলনের সঙ্গে অধিক জড়িত, আর আমি গোপন আন্দোলনের সঙ্গে।" নিবেদিতার বৈপ্লবিক চেষ্টা সম্বন্ধে ঐ পত্রে তাঁর বক্তব্য: "তিনি এখানে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি স্থাপনের কয়েকটি প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ ব্যারন ওকাকুরার দ্বারা স্থাপিত সমিতির সঙ্গে, যেগুলি ব্যর্থ হয়। আমাদের

৫ শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, "অগ্নিযুগ (১ম খণ্ড) (১৩৫৫), ৬৫-৬৮, ৭৬, ৯৪।

সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন—বাস্তব কর্মী হিসাবে নয়, উৎসাহী সমর্থক হিসাবে।" নিবেদিতার "কালী দি মাদার" বই সম্বন্ধে একই পত্রে বারীন্দ্র বলেছেন, "সিস্টার নিবেদিতা 'কালী দি মাদার' নামে একটি প্রেরণাদায়ী পুস্তিকা লিখেছিলেন। বইটি আমাদের কর্মীদের কাছে উদ্দীপনার কারণ হয়েছিল।"

বারীন্দ্র-প্রদত্ত ঐ পত্রের আরও সংবাদ :

"হাঁ, আমি আমার ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে একাধিকবার গিয়েছি। আমার অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতর সংযোগ।...যখন আমি প্রায় কোনো তহবিল ছাড়া কলকাতায় কেন্দ্র চালাচ্ছিলাম, তিনি আমাকে বলেন, এইরকম মহৎ উদ্দেশ্যেও অর্থ ভিক্ষা করবে না, অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করবে।"

নিবেদিতার ব্যক্তিত্বের প্রতি বারীন্দ্রের এই শ্রদ্ধা :

"বিরল ব্যক্তিত্ব তাঁর ; বিশুদ্ধ আত্মিক অগ্নির সঙ্গে যোদ্ধ্রীর যন্ত্রগতির সমন্বয়। ভারত অপেক্ষা ইউরোপই এই ধরনের চরিত্র উৎপাদনে অধিক সমর্থ।"

বারীন্দ্রের নোট-এর মধ্যে নিবেদিতার রাজনৈতিক ভূমিকার সুষ্ঠু মূল্যায়ন আছে :

"১৯০২ অগস্ট থেকে ১৯০৬ অগস্ট—এই পুরো চার বৎসর ভগিনী নিবেদিতা বাংলা ও ভারতে কাজ করেছেন—বক্তৃতা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, রচনা এবং নানাবিধ কার্যাবলীর দ্বারা তরুণদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করেছেন। বৈপ্লবিক ভারতের যথার্থ নেতা শ্রীঅরবিন্দ চিত্রে আবির্ভূত হবার পূর্বে এইসকল ঘটেছে। এমন কি ১৯০২-এর আগেই তিনি তরুণ ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারের মারফত পি মিত্র ও সি আর দাশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এইসময়ে ওকাকুরা ভারতে আসেন—তিনি ভারতীয় বিপ্লবের তরুণ প্রবর্তকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সিস্টার নিবেদিতা এই দলেরই ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে—যিনি পরে বারীন্দ্রের দলের অন্যতম নেতা হয়ে ওঠেন—বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের দ্বারা সম্পাদিত 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকা ১৯০১ ডিসেম্বরের কিছু আগে বেরোয়, ১৯০৭ পর্যন্ত চলে—নিবেদিতা সেই পত্রিকায় প্রায়ই লিখেছেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রবর্তিত ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা জাতীয়তা, জাতীয় শিক্ষা, বিপ্লব ও অনুরূপ বিষয়ে বক্তৃতাদি করেছেন।"

বারীন্দ্রের ৪.৫.১৯৫২, চিঠিতে পাই :

"আমাদের বিপ্লবী যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন—তিনি সেখানেও প্রেরণার উৎস।...বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলি পরবর্তী বিরাট জাগরণ এবং বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রবল প্রভাব।"

বারীন্দ্রের লেখাগুলি থেকে কোন্-কোন দরকারী বিষয় পাচ্ছি তা আর একবার স্মরণ করা যাক। বারীন্দ্র-গোষ্ঠীর সঙ্গে হাতে-কলমে কাজের কথা যদিও বারীন্দ্র বলেন নি, কিন্তু নিবেদিতা যে ওকাকুরার বৈপ্লবিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি যে বারীন্দ্র-গোষ্ঠীর সাহায্যকারী ও প্রেরণাদাত্রী, (যাঁর গ্রন্থাগার বিপ্লবীদের মনোগঠন করেছিল), তাঁর রচনা, বক্তৃতা ও প্রচেষ্টা যে পরবর্তী বৈপ্লবিক উত্থানের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রেরণা হয়েছিল, অরবিন্দের পূর্বেই তিনি যে বৈপ্লবিক অগ্নিশিখাকে জ্বলন্ত রেখেছিলেন—বারীন্দ্র এসকল কথা পরিষ্কার জানিয়েছেন।

॥ ৩ ॥ নিবেদিতার বৈপ্লবিক সম্পর্ক বিষয়ে হেমচন্দ্র কানুনগো-র চমকপ্রদ বিবরণ

নিবেদিতা সারাদেশ ঘুরে বেড়িয়ে দলে রিক্রুট করতেন, একথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন। নিবেদিতা নিজেই ২ মে, ১৯০৬, মুসৌরি থেকে লিখেছেন: "সেন্ট সারা [মিসেস বুল]...অবিলম্বে ইউরোপ যেতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু প্রিয় যুম, তা আমি পারব না, আর যাবার দরকারও নেই, কারণ এখানে তিন সপ্তাহ ধরে রিক্রুট করছি, এবং কয়েকদিনের মধ্যে কাজ আরম্ভ করার আশা রাখি। সে কাজ ৬ কি ৭ সপ্তাহ লাগা উচিত ; কাজ শেষ হবার পরে পুনরারম্ভ করা প্রয়োজন হয় অবিলম্বে, না হয় তা করতে হয় কলকাতায় পৌঁছেই।" নিবেদিতার কথাগুলি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে এইজন্য যে, একই তারিখে তিনি মিসেস বুলকে লিখেছেন, "আমি এমনকি হানাহানির মধ্যে বরিশালেও যেতে চাই না।" স্মরণ করানো উচিত, ১৯০৬ সালে বরিশালে বিখ্যাত প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল, যেখানে নরম ও চরম পন্থীদের সংঘর্ষ সম্ভাবিত ছিল।

নিবেদিতা কিভাবে রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন, তার একটা মোটামুটি বিবরণ পেয়েছি ইতিমধ্যে উদ্ধৃত নাগপুরের সি ইউ দেশমুখের লেখায়। এখন মেদিনীপুরে নিবেদিতার গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ ও কর্মী-সংগ্রহ চেষ্টার উল্লেখ করব। কিভাবে ও কেন বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস থেকে নিবেদিতার নাম প্রায় মুছে গেছে, তার একটা দিশা এখানে মিলবে।

নিবেদিতা ২০ মে, ১৯০১ লিখেছেন, "আমি [মেদিনীপুরে] পাঁচ দিনে বারো কি তের বার বক্তৃতা করেছি।" তাঁর ইংরাজি বক্তৃতার পূর্ণ তাৎপর্য সকলের কাছে পুরো বোধগম্য হয়নি, সেজন্য কিছু ক্ষুণ্ণ ছিলেন। "শুনলাম ছেলেরা আমার বক্তৃতা তেমন বুঝতে পারেনি। কথাগুলো তাদের জ্ঞানবুদ্ধির উপর দিয়ে ভেসে গেছে। সকল রকম পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করলাম, কিন্তু পরিষ্কার দেখলাম—আমি জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ করতে পারি না, অন্যের মারফত কথা বলতে হয়—অন্য প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাবার জন্য ভাবগুলি অবিকৃত থাকে না।" অথচ নিবেদিতা আত্মপ্রকাশের জন্য ছটফট করেছেন : "এমন প্রচণ্ড জীবনকে আমি নিজের মধ্যে অনুভব করছি যাতে মনে হচ্ছে—পৃথিবী উল্টে দিতে পারি, কিন্তু হায়, কেবল বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছি দীর্ণ স্বর—বাতাসই কেবল আমার আর্তনাদের প্রতিধ্বনি বইছে।"

তথাপি নিবেদিতা লিখেছেন, "মনে হয়, মেদিনীপুরে কাজের কিছুটা ফল হয়েছে।"
কী সে ফল?

সে উত্তর দেবার আগে বলে নিই, মেদিনীপুর এদেশকে অনেকগুলি সেরা বিপ্লবী দিয়েছিল এই পর্বেই—জ্ঞান বসু, নিরাপদ রায়, সতোন বসু, ক্ষুদিরাম বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি। হেমচন্দ্র কানুনগোই নিবেদিতার মেদিনীপুর কার্যাবলীর চমৎকার কথাচিত্র দিয়েছেন—মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর "বাংলার বিপ্লব কাহিনী"-র মধ্যে। খুবই বিস্ময়ের কথা, তিনি লেখাটিকে যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ["বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা"] তখন কোনো অজ্ঞাত কারণে নিবেদিতা-সংক্রান্ত অংশটি বাদ দেন, ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে—নিবেদিতার আচ্ছন্ন ভূমিকাকে যে-সামান্য দু একটি আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর করেছিল, তার একটি যেন অপহৃত হল! লক্ষণীয় এই, লেখাটির

বক্তব্য কিন্তু যথাস্থানে পোঁছেছিল। সরকারের তরফে তৈরী রামকৃষ্ণ মিশনের উপর গোয়েন্দা-রিপোর্টের একটিতে নিবেদিতার সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়।৬

সে যাই হোক, মাসিক বসুমতীর পৌষ ১৯২৯ সংখ্যায় হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখায় নিম্নের অংশ আছে:

"১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে, বোধহয় জুন মাসে, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ভগিনী নিবেদিতা অ-বাবুর চেষ্টায় মেদিনীপুরে এসেছিলেন।...তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মেদিনীপুর স্টেশনে সমিতির সভ্যগণ প্রায় সকলে ও অন্যান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। গাড়ি স্টেশনে থামলে তাঁকে দেখে অনেকে হিপ্-হিপ্-হুর্রে বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। এই না শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন এবং নিষেধসূচক হাত নেড়ে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। আমরা নিশ্চয় অবাক হয়েছিলাম। তখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, হিপ্-হিপ্-হুর্রে ইংরাজ জাতির জাতীয় উল্লাসধ্বনি, ভারতবাসীর উল্লাসধ্বনি ইহা হওয়া উচিত নহে। তখনও 'বন্দেমাতরম্' ব্যবহৃত হয়নি। যখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, আমাদের তেমন কিছুই নাই, তখন তিনি নিজে হাত তুলে উচ্চস্বরে তিনবার বলেছিলেন—'ওয়া গুরুজী কি ফতে, বোল্ বাবুজী কি খাল্সা।' আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। [প্রমথরঞ্জন পালের স্মৃতিকথায় দেখেছি, নিবেদিতা ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে ছাত্রদের কাছে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুলেছিলেন। যদি ঐ বিবরণ ঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে, নিবেদিতা জাতীয় ধ্বনির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 'বন্দেমাতরম'কে গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর মেদিনীপুর ভ্রমণের কিছুদিন পরেই]।...একজন ওহেন ইংরাজ মহিলাকে, আমরা এই ইংরাজ তাড়াবার ব্যাপারে সহায় পেলাম মনে করে, অন্ততঃ আমাদের মিইয়ে যাওয়া উদ্যম ও আগ্রহ আবার তাজা হয়ে উঠল।

"সেই অসাধারণ করুণাময়ী ভগিনীর বিষয়ে এখানে কিছু না বলে পারলাম না।... তখন মেদিনীপুরে ভীষণ গ্রীষ্ম। যে-ঘরটিতে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, বেলা একটার সময় তাতে ঢুকে সমস্ত দরজা জানালা খুলে দিলেন। খাটের উপর থেকে পরিষ্কার গদীটি সরিয়ে দিয়ে নিজের ছোট্ট মাদুর ও পাতলা কাঁথাখানি পাতলেন। অবাক হয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন—সংযম অভ্যাস করছেন। আর আমরা যে-কাজে ব্রতী, তাতে এ-ধরনের সংযম অভ্যাস করা উচিত।

"তিনি এখানে পাঁচদিন ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে

---

৬ "She [Nivedita] was a staunch advocate of Swadeshi movement, adopted *Bandemataram* as national cry. She toured several parts of Bengal and lectured on Swadeshi movement. In 1909 [1903] she went to Midnapore, delivered lectures on politics through the medium of religion continually for five days attracting thereby increasing number of audience. She encouraged the society by personal demonstration of sword play and other athletic exercises, presented the works of Mazzini and Prince Kropotkin." (Account of revolutionary movement in Bengal, H. Kanagoo).

[Ramakrishna Mission. Paper No. 45. Freedom Movement Papers.]

শিশির করের কাছ থেকে প্রাপ্ত।

বক্তৃতা দিতেন ; সকালে সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রথম দিনের বক্তৃতায় অনেক লোক এসেছিল, বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বে অনেকে সরে পড়েছিল। সেজন্য স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত একজন উচ্চ কর্মচারী তাঁকে বলেছিলেন— 'আপনার বক্তৃতায় রাজনীতির তীব্রতা বেশি ছিল বলে অনেকে সরে পড়েছিলেন। পরের বক্তৃতায় হয়ত লোক হবে না।' ইহার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি আমায় ভয় দেখাবেন না। আমার শিরাতে স্বাধীন জাতির রক্ত এখনো প্রবাহিত। যারা ভয় পায়, আমার বক্তৃতা তাদের জন্য নহে।' সত্যসত্যই পরের বক্তৃতায় ভালো লোক হয়নি। তিনি কিন্তু সমান আগ্রহে পাঁচদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁকে দিয়েই আমাদের আখড়ার উদ্বোধনকার্য সমাধা হয়েছিল। তাতে তিনি যেরূপ আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন, তা মনে হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রাণ উথলে ওঠে।...আমাদের গুপ্ত সমিতির সভ্য ছাড়া আখড়ার পৃষ্ঠপোষক ও অন্য লোক এই উদ্বোধনের ব্যাপারের গূঢ় রহস্য জানতেন না। তাঁরা ভগিনীর ভাব দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন।...ভগিনী নিজে তলোয়ার খেলে, মুগুর ভেঁজে, লাঠি ঘুরিয়ে, ও অন্যান্য কসরত করে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে দিয়েছিলেন।

"আর একদিন তিনি স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রমহিলাদের সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু'একজন স্ত্রীলোককে বন্দুক ছুঁড়তেও শিখিয়েছিলেন।

"ভগিনী আমাদের পড়বার জন্য কতকগুলি বইয়ের নাম করেছিলেন, আর কতকগুলি বই নিজে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ম্যাজিনির কয়েকখানি, আর প্রিন্স ক্রোপটকিনের একখানি বই ছিল।

"ভগিনীর আগমনব্যাপার আমাদের মরাগাঙে আবার বান ডাকিয়ে দিল। কলকাতা থেকে স-বাবুকে মাসে ১৫ টাকা মাহিনাতে ঘুসাঘুসির বক্সিং মাস্টার করে আনা হল। তিনি পরে এক অনুশীলন সমিতির প্রধান কর্মীরূপে স্বনামধন্য হয়েছিলেন।" [স্থূললিপি লেখক-নির্দেশে]।

[নিবেদিতার সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের এই অকুণ্ঠ প্রশস্তি বিস্ময়কর বটে। কারণ তাঁর "বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা" (১ম সং ১৯২৮) অনর্গল তিক্ততার উদ্‌গিরণ ছাড়া কিছু নয়। বইটি পড়লেই বোঝা যায়, সেটি ভগ্নমোহ বীতশ্রদ্ধ এক ব্যক্তির লেখা। বইটির এক চতুর্থাংশে সংবাদ, বাকি অংশে কটু সমালোচনা, বলা উচিত অফুরন্ত গালাগালি। হেমচন্দ্রের বিবেচনায় এদেশের সবকিছু খারাপ—কর্মী, নেতা, ধর্ম, সংস্কৃতি। রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশের কঠোর সমালোচনা তিনি করেছেন, বিশেষতঃ সে ধর্ম যখন হিন্দুধর্ম। [এই বিশেষ কারণটির জন্য কোনো-কোনো আধুনিক ইতিহাস-লেখকের কাছে এই বই সদ্‌গ্রন্থ।]। হিন্দুধর্মের মধ্যে কোনো রকম ভালো নেই, থাকা সম্ভব নয়, এঁর মতে। এই ধর্মই যত গণ্ডগোলের মূল।

ধর্ম প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের বক্তব্যে যুক্তিহীনতার সীমা নেই। যথেষ্ট জেনে সমালোচনা করার ধৈর্য তিনি দেখান নি। একদিকে তিনি হিন্দুর বাসনাত্যাগ-নীতির, বৈরাগ্যনীতির, সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে জয়ধ্বনি দিয়েছেন বুদ্ধদেবের যিনি উক্ত বাসনাত্যাগের বিরাট প্রচারক, স্বয়ং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের প্রবর্তক। লেখক এদেশের লোকের অহিংসার কাঁদুনি ও বৈষ্ণবী ভাবের নিন্দা করেছেন, অথচ চৈতন্যের প্রশংসায় ব্যাকুল, যিনি প্রেমতত্ত্বের প্রচারক এবং এবং যাঁর কাছে কৃষ্ণ বিনা আর কোনো সত্য ছিল না।

আরও দেখা যায়, তিনি একদিকে অভিযোগ করেছেন, আমাদের জাতীয়তার মূলে নিছক ইংরেজবিদ্বেষ ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু পরক্ষণে এখানে যথেষ্ট বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা নেই বলে এই জাতির মানুষদের ধিক্কার দিয়েছেন। রামমোহন সংস্কার-আন্দোলন করেছিলেন বলে

এ'র কাছে উত্তম, কিন্তু রামমোহন যে ইংরেজশাসনকে শুভকর মনে করেছেন, সে-বিষয়ে ইনি অসচেতন। স্বদেশী আন্দোলনকালে অতিরিক্ত জাতীয় গৌরবগান করার নিন্দা ক'রে, পাশ্চাত্যদেশের প্রভূত প্রশংসা ইনি করেছেন, কিন্তু সেসব দেশের জাতীয় সঙ্গীতাদিতে কি পরিমাণে স্বজাতির ও স্বদেশের অতিকায় গৌরবগান, তৎসহ অহংকৃত প্রলাপ আছে—তার উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। বস্তুতঃ এ'র ইতিহাসবোধ একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। সমস্ত লেখাটির মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও আশাভঙ্গের জ্বালা—জীবনের সেরা দিনগুলি আন্দামানে কাটাতে হয়েছে, সেই ক্ষতের যন্ত্রণা। ফলে তাঁর গ্রন্থ মনে কোনো মহৎ অনুভূতি জাগায় না। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনাপাঠের তৃপ্তিও এর থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, যেহেতু বুদ্ধিবাদের জয়ধ্বনি করার সঙ্গে ইনি যে-বস্তু পরিবেশন করেছেন তার থেকে মনে হয়—বুদ্ধির অর্থ এ'র কাছে নেতিবুদ্ধি। এর পাশে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা রাখা যায়। বাংলার বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বভ্রমণ ক'রে, *বিশ্বইতিহাস ও সংস্কৃতির* পাঠ গ্রহণ ক'রে, বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সংকীর্ণতার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন (অবশ্য উক্ত উদ্দেশ্যকে *সংকীর্ণ বলা যাবে কিনা সন্দেহ*, কারণ স্বাধীনতালাভ সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হতে পারে না)। উপযুক্ত দার্শনিক ভিত্তিতে বাংলার আন্দোলন স্থাপিত ছিল না, সেজন্য অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারেনা, এসব কথা তিনি যথেষ্টই বলেছেন; বিপ্লবীদলের উপর উকিল ব্যারিস্টারদের মুড়ুলি বা 'রাজতন্ত্রবাদী' অরবিন্দের ফাঁপানো প্রচারের সমালোচনাও করেছেন; কিন্তু তিনিই লিখেছেন: "বিপ্লবপন্থীর দল কেবল কতকগুলো 'বকাটে' বা অর্ধশিক্ষিত ছেলের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হয় নাই।...শারীরিক ব্যায়াম, বিদ্যাচর্চা, নৈতিক সংযম জীবনের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। আদর্শ অতি উচ্চ করিয়া ধরা হইয়াছিল *বলিয়াই অনেক ভালো ছেলে দলভুক্ত* হইয়াছিল। ইঁহাদের আত্মত্যাগ, সাহস, চতুরতা, চরিত্রের নির্মলতা ও স্বার্থত্যাগ জগতে অতুলনীয়।...ইঁহাদের আত্মত্যাগের জীবনী—ইটালি, রুশ বা অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিকদের জীবনীর সহিত তুলনীয়।" "বিপ্লববাদের প্রথম যুগের কর্মীরা সকলেই নিজেদের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারিত ও প্রপীড়িত হইয়াছিল এবং কেহ-বা কারাগারে বন্ধ, কেহ-বা ফাঁসিকাষ্ঠে নষ্টপ্রাণ, কেহ-বা নির্বাসিত হইয়াছেন।" "বঙ্গপ্রদেশের বৈপ্লবিক কি প্রকারের জীব, লোকে এখনও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।...১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত কোন্ সাহসিক কর্ম না ইঁহারা করিয়াছেন। বিপ্লববাদ প্রচার করা, বোমা প্রস্তুত করা, ও তাহার ব্যবহার করা, *বিদেশী সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করা, গোয়েন্দার বিপক্ষে* গোয়েন্দাগিরি করা, স্বীয় প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়া, লাঠির বদলে গুলি *চালানো, গুলির উপর গুলি* চালানো, অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করা, মরুভূমিতে গিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করা, দেশী সিপাইদের মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য সুয়েজ কানালের নিকট কান্তারার মরুভূমিতে শত্রু-গুলি উপেক্ষা করিয়া কার্য করা, মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া রাত্রিতে সুয়েজ কানালে সাঁতারের উদ্যম, আরও অনেক প্রকারের সাহসিকতা প্রদর্শন ভীরুতা-আপবাদগ্রস্ত, বঙ্গভাষীয় যুবকবৃন্দের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল।" ['অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (১৯২৬), পৃ. ১৫, ২০, ৯৪]

অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের বিরুদ্ধে হেমচন্দ্রের অন্তহীন বিতৃষ্ণা। অরবিন্দ তাঁর কাছে ভ্রাতা বারীন্দ্রের বিষয়ে স্নেহান্ধ এবং অপরের সম্বন্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ নেতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সংকটকালে নেতারা কিভাবে কর্মত্যাগ করেছেন তা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার পরে ইনি বলেছেন: "দীক্ষাদাতা গুরু নিজে যদি এই ব্রত লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁর কি দণ্ডের ব্যবস্থা হবে, বা কে ব্যবস্থা করবে, একথা দুর্ভাগ্যবশতঃ কারো মনে এসেছিল বলে শুনিনি।" হেমচন্দ্র অবশ্য পাঠকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন: "মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁদের [অরবিন্দ ও বারীন্দ্র প্রভৃতির] দেশসেবার সমালোচনা করেছি। 'ক'-বাবু [অরবিন্দ] ও বারীনের প্রকৃত স্বরূপ যা, তা থেকে তাঁরা একটুও ছোট বা হীন হবেন না।"

হেমচন্দ্রের বইটির উপর আমাদের এই সকল মন্তব্যের বিশেষ কারণ—ইদানীং বইটি যতটা সত্য নির্ণয়ের জন্য, ততোধিক নবসত্য প্রণয়নের সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বলে আমরা কিন্তু বারীন্দ্রের আচরণের প্রশস্তি করছি না। বরং এই পর্বে ক্ষেত্রবিশেষে, এবং পরবর্তীকালে সর্বাংশে, তাঁর অক্ষমণীয় আচরণের রূপ দুঃখের সঙ্গে আমাদের উদ্ঘাটিত করতে হবে।]





[উপরে] বঙ্গভঙ্গ দিবসে কলকাতায় বক্তৃতারত অরবিন্দ। রিভিউ অব রিভিউজ-এ ডিসেম্বর ১৯০৯, প্রকাশিত। [নীচে] বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিপ্লবী অবস্থায়।

BOMB THROWING IN INDIA.
A NEW CRIME





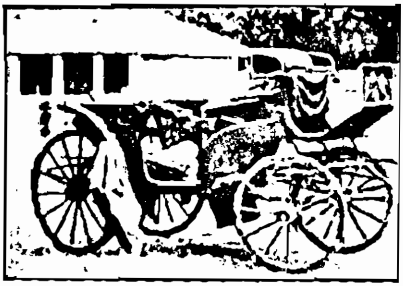


[উপরে, বাসে] স্যার আনড্রু হেণ্ডারসন লেইথ ফ্রেজার, বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নর, "৫-৬ ডিসেম্বর ১৯০৭, রাত্রে, যাঁর ট্রেন [বোমায়] ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় ।"

[ডাইনে] ডগলাস হোলিনস্হেড কেনেডি, মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট, "গত ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় যাঁকে বোমার দ্বারা হত্যা করার অভিপ্রায় ছিল ।"

[নীচে] কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে সেন্ট জেমস চার্চ, "গত রবিবার সকালে (১৭ মে) যার গোড়ায় বোমা রাখা হয়েছিল ।" [এমপ্রেস, জুন ১৯০৮]

whether mercantile or political which has attracted public interest that (like a successful play that is run until it ceases to attract), induces the Bench to allow the case to go on until forensic gymnastics are exhausted. It seems only too probable that, in some of the lengthy proceedings that take place, "Father Time" will step in and close the proceedings by marching off the prisoner or necessitate the whole case being heard *de novo* by taking one or other of those vital to its hearing.



THE KENNEDY'S CARRIAGE: SHOWING THE DAMAGE DONE BY THE EXPLOSION.

With regard to Press prosecutions, we do not think the sentencing of mere nobodies to imprisonment of any avail. They look forward to that happy time when they are to be garlanded and made much of. In the meantime, they have probably been well paid for their sinecure appointment. If the press and all its materials were confiscated, the so-called proprietor, editor and printer might be turned into the street to find other occupation; why burden the country with the cost of keeping them? No imprisonment, no martyrdom—for the nobodies; and we fancy those in the background have too much consideration for their pockets to go on supplying fresh material with the certainty of its confiscation staring them in the face.

On the 13th instant, the proprietor of a printing press, to wit, the Samal Printing Works, where the notorious *Yugantar* newspaper was printed, appeared before the Chief Presidency Magistrate of Calcutta, to obtain release of the material the police had seized. However, after several prosecutions, Mr. Hume, the Public Prosecutor, had struck a "bright." He submitted that the above articles would come within the meaning of "property which has been used for the commission of an offence," and under these circumstances the Court has power to make such order as it thinks fit for the disposal of the property under the section, even to the extent of confiscation!

If this holds water, there was not much necessity for the new Press Act?



KHUDIRAM BOSE IN THE HANDS OF THE POLICE.

Babu Manoj Mohan Bose, in reply, expressed his surprise that Mr. Hume should put forward such *dubious* arguments, and went on to tell the Court: "In the search warrants issued the Police are generally authorised to seize whatever would help them in proving their case. Armed with such vague and general authority they raid the printing presses and carry away whatever they can lay their hands on.

"I don't know if your Honour has any idea of these searches, but I can assure you, Sir, that they are much worse than an ordinary dacoity (laughter). Of these articles carried away they produce only the articles they require for their case and the remainder they silently confiscate. Can they do that, Sir, without a magisterial order?"

On the Magistrate about to pass orders, the pleader was horrified.

The pleader: I pray, Sir, that this matter may be referred to High Court under section 435.

The Magistrate: Yes, I can do that. But why do you not go to the High Court?

The pleader: Because we are so poor. Let us rather get the property and let the Government go there. But somehow I don't like that place much.

The Magistrate: I think I shall have to make an order adverse to you and leave you to go there. I think I shall confiscate the types only and return you the remaining things.

The pleader: The types are valued at about Rs. 2,000.

Superintendent Ellis: Oh, no! Only Rs. 300.

We can well imagine the attitude struck by the pleader when pleading the poverty of his client, and the sly look of personal satisfaction on his face when he made his home thrust with reference to the Government and the High Court. However, it seems to have been very effective; and the Magistrate showed a leniency that we think was misplaced. It is something like taking away the cartridges and leaving the revolver—one is certainly not much good without the other, but why not confiscate the greater if there is to be any diffidence about confiscating the lot?

Since writing the foregoing, Khudiram Bose, the young man who threw the bomb that killed Mrs. and Miss Kennedy, was, on the 13th instant, sentenced, by the Additional Sessions Judge of Mozufferpore, Mr. Corndufl, to be hanged. Khudiram Bose hails from the Midnapore district. His only living relative is a sister, whose husband is a gentleman named Amrita Lal Ray, head clerk in the Judge's Court at Midnapore, and with whom he resided and was supported by. He studied up to the 2nd standard at the Midnapore High School, but, on seditious writings and boycott getting into full swing, joined the ranks of those lads that were at the beck and call of the Extremist section of agitators. We understand his proceedings were looked upon with ill favour by his brother-in-law and he frequently absented himself for days together, when, it is reasonable to presume, he drew his support from those who made use of him. When captured, he was only too anxious to make a thorough confession and get all the credit for the crime, and disputed with Mr. Kennedy's coachman, during the hearing of the case, the exact manner in which he delivered the bomb. After sentence of death was pronounced, he was anxious to explain to the Court exactly how the bomb was constructed! He has, of course, appealed to the High Court.



KHUDIRAM BOSE BEFORE THE COURT

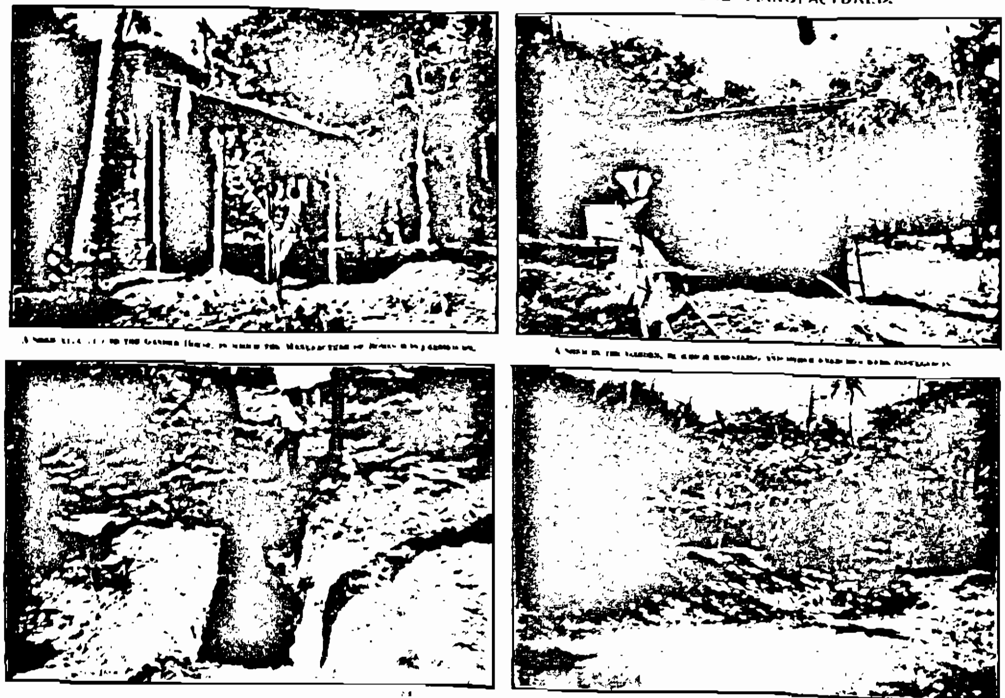
It remains an open question how many Manicktolla bombs have been distributed?

A suggestion was made that the Government might run one or more papers in the vernacular, contradicting, in detail, the false news and lying stories of that section of the Indian press that have devoted their energies to poisoning the mind of the semi-ignorant public while, at the same time, lining their pockets with their ill-gotten gains; or devoting them to other nefarious ends. Or, that they might subsidise certain vernacular papers for that purpose. We have no belief in any such measures being of any good. In the first place, the contradiction can never overtake the lie, and in the second the papers would have to be run on highly sensational lines, or they would not be read by the class of readers for whom they were intended.

What is it the Government have been, and still appear to be, afraid of? To our mind it resolves itself into one of two forces—the agitation of the Extremist section in India, or the vulgar opinion of the uneducated classes in England. Of the two, we must conclude it is the latter. That force lies in its voting power and it is through such men as Keir Hardy that it has been brought to bear on the Secretary of State, and through him on this country. It is wretchedly poor business. How long the loyal Indians and—the European community, will acquiesce in this state of things is a matter worth some consideration by those who, while asseverating they are acting in the best interests of the country—are doing their best to bring it into a state of chaos.

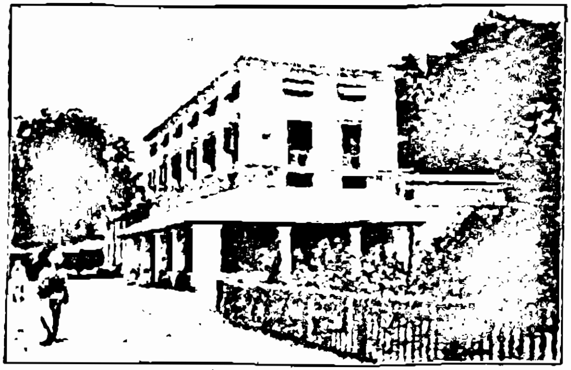
উপরে, বামে ; কেনেডির গাড়ি, বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত। [বামে, নীচে] পুলিশ পাহারায় ক্ষুদিরাম বসু।
[ডাইনে, মধ্যে] কোর্টে ক্ষুদিরাম। [ঐ]

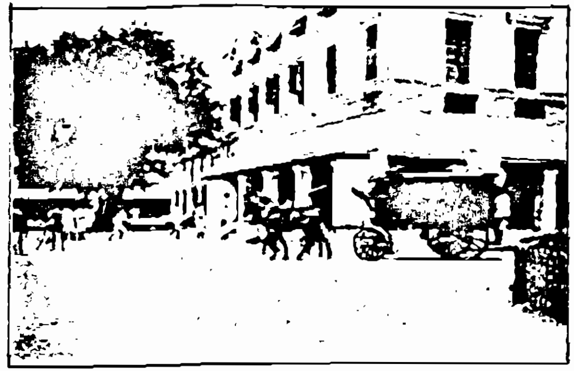
SCENES IN THE GARDEN AT MANICKTOLA WHERE BOMBS WERE MANUFACTURED.



মানিকতলা বাগানবাড়ির বিভিন্ন স্থান, যেখানে বোমা তৈরী হত, অথবা অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হত। [ঐ]

SCENES AT THE MAGISTRATE'S COURT ALIPORE, CALCUTTA.



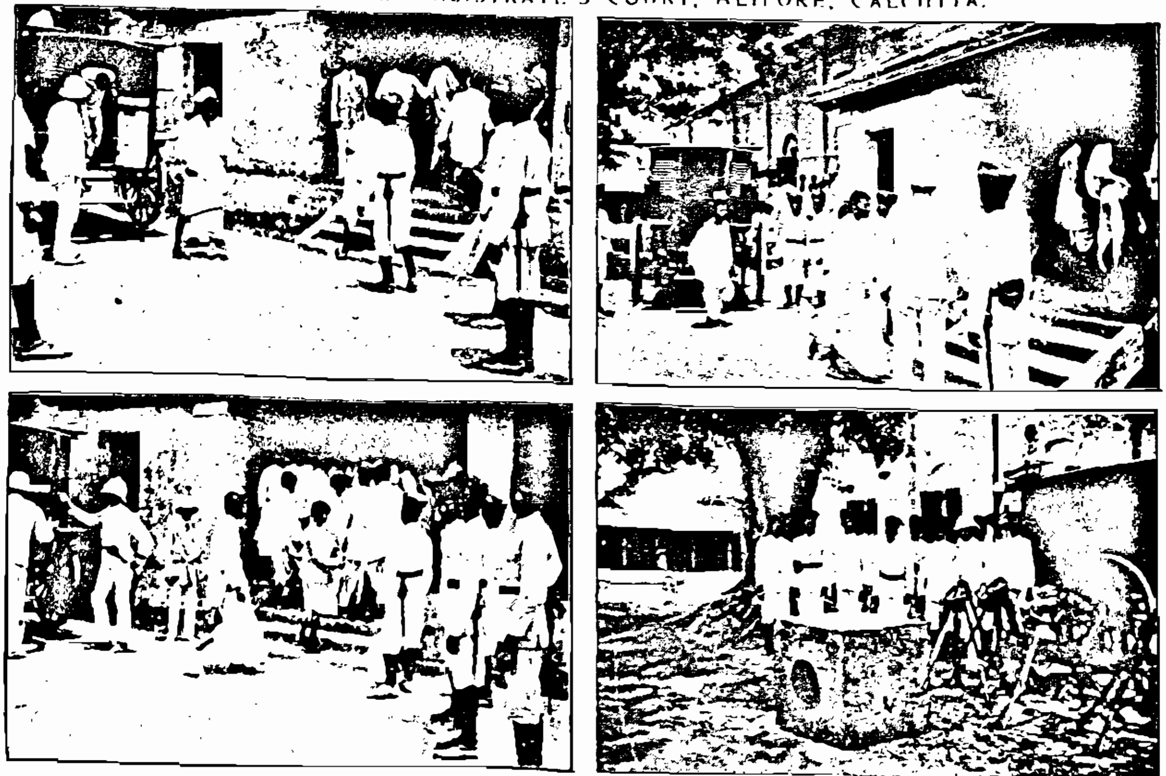




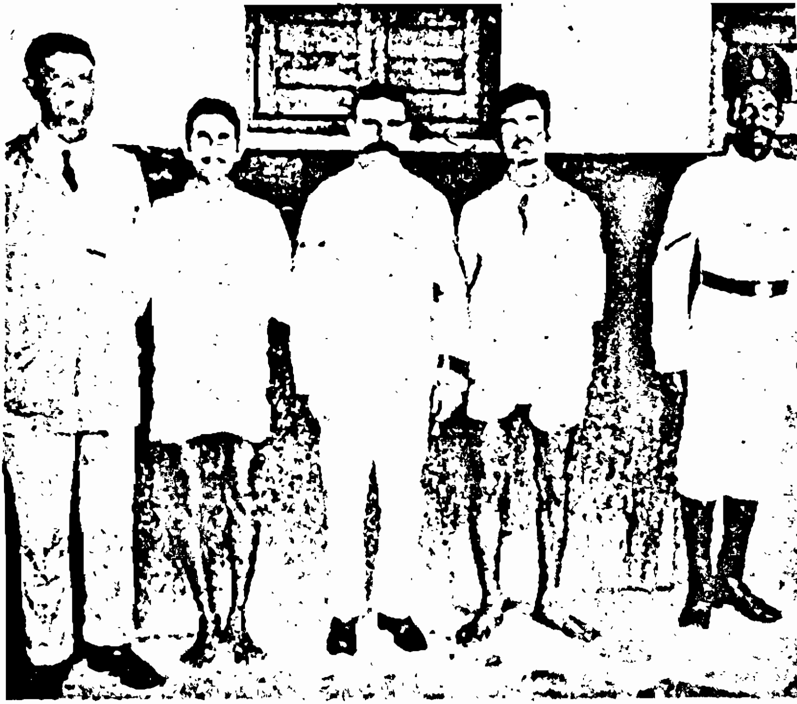


আলিপুর কোর্টে বোমার মামলা। [উপরে, বামে] ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্ট। [উপরে, ডাইনে] গাড়িতে বন্দীদের আগমন। [বামে, নীচে] একদল বন্দী। [নীচে ডাইনে] ফরিয়াদী পক্ষে অবতীর্ণ (বাম দিক থেকে) ; টি ডবলিউ বার্টন, আর ক্লার্ক (২৪ পরগণার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট) ইয়ার্ডলে নর্টন, টি ই টি আপটন। [ঐ]

SCENES AT THE MAGISTRATE'S COURT, ALIPORE, CALCUTTA.



[উপরে, বামে] বন্দীদের আগমন । [উপরে, ডাইনে] বন্দীরা । [নীচে, বামে] বন্দীরা । [নীচে, ডাইনে] পুলিশগণ । পুলিশদের সামনে লোহার ট্যাঙ্ক, মানিকতলা বাগানে যার মধ্যে বোমার মশলা ও অস্ত্র লুকানো ছিল । [ঐ] ।





[উপরে] পুলিশ পাহারায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত। [এমপ্রেস, সেপ্টেম্বর ১৯০৮]।
[নীচে] পুলিশ পাহারায় কানাইলাল।

[illegible] wished to undo, so far as he could, the damage that had been [illegible] he considered the "unrest" was altogether detrimental to [illegible] country's interests, and was willing to take on all the risk and [illegible] that his action would involve, and in fact—was enthusiastic [illegible] endeavouring to help the Government to the best of his power.



MR. ASHUTOSH BISWAS, WHO CONDUCTED THE PROSECUTION ON BEHALF OF THE GOVERNMENT IN THE ALIPORE JAIL TRAGEDY

[illegible] course, there are many to decry this, especially among the unculti[illegible]; they can see nothing in this man's conduct but an endeavour [illegible] "save his own skin" at the expense of others. On the other hand, [illegible] knew that by holding his tongue, he was not likely to get more than [illegible] years' imprisonment, for his share in the conspiracy, while by [illegible] King's evidence he would earn the resentment of not only [illegible] accused, but the large circle of their friends and fellow conspirators still at large; and knew that, from the time of his release, his life was not safe for a moment. We think the man chose the better part, and [illegible] think he chose it because it was the *right path*, and for no such [illegible] motive as "saving his own skin." His father tells us he was [illegible], one day when he went to the court, to hear his son as [illegible] "approver," "of which he had no notice," giving an account of [illegible] intended looting expeditions in which he had taken part; that he [illegible] away disgusted, and with the intention of disinheriting him,—that [illegible] thought his wickedness deserved hanging. That, some days after, [illegible] induced to see his son, and that his son told him, he felt he [illegible] disgraced his family and brought ill to the country; he could do [illegible] less than clear his soul of all.

If these men had had any just aim and any hopes of fulfilment of [illegible] instead of being the low down rascally lot of cut-throats they were, [illegible] might think it unmanly of any member of the conspiracy to turn approver; but, as the association had for its object the assassination of [illegible]viduals, and the looting of their own countrymen for the purpose of obtaining the wherewithal to carry out their ghoulish object, we are of quite the other opinion, and of the three principal actors in the [illegible] tragedy, we think the approver is the only one deserving of any [illegible]; and the only bright spot that can be discerned in the whole wretched business is the, what might well be termed, self-sacrifice of a repentant man.

While matters as regards the various accused in Calcutta are in abeyance until after the Pujah holidays, the Police have not been idle; [illegible] number of houses in Calcutta have been searched, for reasons best known to the authorities, and, perhaps, to the parties concerned. [illegible] definite has leaked out as to the "bag." The convict, Linton, [illegible] been released, the remaining six, of his 12 months' sentence, having [illegible] commuted on account of his gallantry in the tragedy episode. [illegible] regard to Higgins, he is still in the Jail Hospital suffering [illegible] the effect of his wound. The daily papers have, however, not [illegible] at a loss for sensational "Copy." Twenty-five men of all [illegible] and of a better class have been arrested at Midnapore, and the [illegible] for bail, both at the local Court, and at the High Court in Calcutta, has been very keen. A certain Raja is implicated, and he, [illegible] order of the High Court, has been allowed to reside in his own [illegible] residence under special provision of efficient guard and heavy [illegible]. All the rest have been refused bail and spend the holidays in durance vile." These applications for bail had, apparently, for their [illegible] object the forcing the prosecution to hand up a list of the witnesses they intended to bring forward, as the offences which the accused were charged with are non-bailable. The prosecution, after the late episode in Calcutta, were not at all disposed to oblige, and successfully resisted the forceful pleadings. "The proceedings in this case will be watched with special interest as several of the accused are of some position. That sedition, in some form, has permeated the whole middle class of Bengal Society is pretty evident. The tram cars of Calcutta are chock full of it everyday as any European or Eurasian understanding the language, who takes advantage of these vehicles, can testify to. In some cases they don't mind speaking English for the special purpose of irritating the passenger—if he is unaccompanied; and many of these gentry are working in Government offices in the expectation of obtaining pension."

A well planned dacoity has also quite recently taken place, which shows the serpent, though scotched, is still very much alive. A party of six young Bengalees proceeded to a Bengalee gentleman's house on the night of the 13th inst. The house was situated at Boghati, a village about six miles from Serampore. They pretended they had come with a search warrant and so imposed on Babu Kissory Mohun Roy, the occupant, that he allowed them to ransack the place—they were all armed with revolvers. Of these enterprising young gentlemen two have been captured; they all belong to respectable Hindu families and are well educated, one being an under graduate of the Calcutta University!



THE LATE NARENDRA NATH GOSWAMI, KILLED IN THE ALIPORE JAIL. (*Empire*, Calcutta)

Two or three stories have been investigated of bombs being thrown at or applied to trains (by way of experiment it would appear) without any definite finding, except in one sensational case where it was ascertained that an open carriage door had been struck by a passing train and given rise to the report.

Leading Indian gentlemen have been addressed by Governors and Lieutenant-Governors, and asked to do something more than express their loyalty and issue circulars. But what tangible measures they can take we are at a loss to conceive? They appear to us in a worse plight than the Government—standing, as they do, between two stools,—unable to coerce the seditious, and unable to get the Government to apply sufficiently drastic measures—according to their idea. At any rate, this much can be said for them, none of those arrested appear to have been in the employ of any of them.

As a specimen of the general fitness of the Bengalee for further advancement on the administrative ladder we give the following:—

At a meeting of the Bengal Legislative Council on the 10th inst. the Hon. Babu Radha Charan Pal asked—"Has the attention of the Government been drawn to a report of the *Amrita Bazar Patrika* of the 6th September, that a Police Sub-Inspector had brought back the Raja of Narajole from the door of the Court room, touching his neck from behind; and is this a fact? And, is it a fact that Amrito Das, who, it is said, had been suffering from sinus in the hand, was arrested by Police who were in plain clothes, without a warrant, and handled so violently that his piteous cries compelled his mother to come to the protection of her son when she was seriously injured by the Police?"

This is quite up to Sir Henry J. S. Cotton and Company's form, when at their best, in the House of Commons. But surely, our future would-be Governors and Lieutenant-Governors might rise superior to such pestering.

Had the Honourable Member first ascertained that such excess of zeal had actually taken place and that on complaint to the local authorities the injured innocents had been pooh-poohed and refused a hearing, he might be excused for troubling His Honour the Lieutenant-Governor in Council with a reference to such misdoings. But to trouble His Honour and the Council with "fairy tales" from such sources is to show that the Honourable Member does not apprehend the honourable position he has attained to or he would be more careful of so belittling it.

[উপরে, বামে] আশুতোষ বিশ্বাস—সরকারপক্ষে নরেন গোঁসাই হত্যা মামলার পরিচালক। [ডাইনে মধ্যে] নিহত নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই। [ঐ]।



The Hind Punch.]

Lord Curzon at the Durbar.

দিল্লী দরবারে কার্জন, স্ফূর্তিতে নাচছেন। (হিন্দী পাঞ্চ-এর কার্টুন)।

Review of Reviews 548
1909 Oct

FREEDOM OF THE PRESS IN INDIA.

A TYPICAL INSTANCE OF REPRESSION.

MR. A. H. S. ASTON—that is his name—is Chief Presidency Magistrate of Bombay. Hitherto it has been unknown outside the Presidency and the circle of his friends and fellow-officials. Now it is entitled to a world-wide fame. For Mr. A. H. S. Aston happens to be the unfortunate wight whom the Fates appear to have selected for the purpose of demonstrating to Lord Morley, and to the civilised world behind Lord Morley, the fantastic outrages on the liberty of the Press which may be committed under the shelter of Section 124A of the Indian Penal Code when wisdom is lacking on the judgement seat and the magistrate is Mr. A. H. S. Aston. The case which is to immortalise Mr. A. H. S. Aston arose out of the publication in the *Swaraj*, the organ of Indian nationalism published in London, of a very admirably written article entitled "The Ætiology of the Bomb in India." It is an article the usefulness of which to all those who are anxious for the maintenance of law and order in India can hardly be exaggerated. If Mr. Chandra Pal, who has given proofs of *his detestation of the whole evil system of terrorism*, had not written this article of his own motion, Lord Morley could hardly have spent a thousand rupees more profitably for the Indian Government than by paying Mr. Chandra Pal a fee to make so careful, so judicious, and so well-informed a study of the causes which led to the apparition of the bomb in India.

But when this masterly diagnosis of the causes of a deadly social and political disease was brought before Mr. A. H. S. Aston, Chief Presidency Magistrate of Bombay, this sapient Solon at once declared, with the dogmatic authority of a Dogberry, that it is an article calculated to excite disaffection. It is the old, old fallacy. Disaffection exists, finding expression in crime. Comes along a shrewd observer and points out how the disaffection originated, whereupon Dogberry orders Verges to apprehend this miscreant as if he were exciting the disaffection the cause of which he was searching out.

Poor Lord Morley! The heart is wrung with sympathy and compassion at the spectacle of the former editor of the *Pall Mall Gazette*, who was *always writing papers on the Ætiology of Crime in Ireland*, confronted by the judicial utterance of his subordinate, Mr. A. H. S. Aston, Chief Magistrate of Bombay, which was followed by the suppression of the *Swaraj* by the summary process of seizing all copies of the magazine at the port of entry.

I do not hesitate to characterise this as an unwarrantable outrage upon the most elementary principles of a free Press, and I justify my assertion by carefully reprinting the strongest passages from the incriminating article, leaving it to Mr. A. H. S. Aston to apply to the REVIEW OF REVIEWS, if he pleases, Article 124A of the *Indian Penal Code*. And in order to facilitate his action and that of the prosecuting authority, I say frankly that I publish it for the purpose of exciting discontent with his administration of the Press Law in order to obtain either a reform in the law or an improvement in its administration. Man ought never to be content to sit down under wrong, and the good citizen when subjected to injustice is rightly in a chronic state of disaffection.

"THE ÆTIOLOGY OF THE BOMB."

(From the *Swaraj*.)

From the ethical point of view the bomb had no justification in Bengal, any more than it has in Russia. But *every disease, whether physical or moral, has an ætiology*. The bomb-disease cannot be said to have none. And its pathology cannot be fully determined without an adequate consideration of its ætiology. . . . The bomb is a system of assassination. It is the worst and the most diabolical of all forms of assassinations. It injures the innocent along with the guilty. But it has, however, the same general ætiology as all other forms of assassination. It implies the utter helplessness of the assassin in relation to his opponent. It implies a denial to him, whether real or fancied, of all open and legitimate methods of defending his own against those whom he considers [illegible] enemies.

This is the general psychology of the bomb every[illegible] is no moral [illegible] for it. The [illegible] ethical value of human conduct consists not in succumbing to, but in manfully resisting the psychological forces that make for wrong-doing. Hunger is the psychological reason for many an act of ordinary theft. But to suffer hunger, and, indeed, even to prefer death from starvation to taking what is not one's own, is universally considered as the supreme ethical demand. . . .

The psychology of the bomb in Bengal therefore, is a subject of supreme importance to those who, whether as leaders of the people or rulers of the land, have to solve the complex issues involved in it. . . .

However much strongly we may condemn the fatal folly of the people who adopted these outlandish methods of political propaganda, we cannot shut our eyes to the ugly fact that the real responsibility of it lies far more with the quack statesmanship with which the irritating issues that arose out of the Partition of Bengal was handled by the Government than with these impatient and inexperienced young men, who have been the victims of a mad impulse.

ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত বিপিন পালের 'স্বরাজ' পত্রিকার একটি সংখ্যা (যাতে 'বোমার নিদান' প্রবন্ধ ছিল)—বোম্বাইরে বাজেয়াপ্ত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় এই অনুচিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রিভিউ অব রিভিউজ-এর সম্পাদক উইলিয়ম স্টেড প্রতিবাদ করেন এবং বিপিন পালের প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করেন (অক্টোবর ১৯০৯)।

The Review of Reviews.

EDITED BY W. T. STEAD.

TELEPHONE № 5547.
TELEGRAMS "VATICAN, LONDON."

Mowbray House,
Norfolk Street, Strand
London, W.C.

Dec.8.1902.

My dear Miss Noble,

I am so glad to find from your letter that you are not displeased at the way in which I handled your MSS. I did it with fear and trembling, not knowing what vials of wrath might not be emptied on my head. I enclose you a cheque for your article, for which accept my best thanks.

I am going to put you into the Review in another shape. I am going to have a short story written describing the Durbar at Delhi, and I am going to put you in as a kind of prophetess to whom all this magnificence and splendor seem like a whited sepulchre over the dead men's bones of our administration in India. I think you would be a very good figure in our story, in which I will put you with your adopted name.

Yours Sincerely,

W T Stead

1.1.03.

Sister Nivedita.

Dear Miss Noble,

I got your telegram just as I was writing the story in which I had put you in nobly as sister Noverabita. I had taken you to the Durbar, where you had captivated the heart of Sir George Gordon. But, of course, when I got your telegram, I promptly changed your name, and made you into plain sister Rose and also divested you of the hindoo costume which might have enabled some people to recognise who was the original of my heroine. You cannot complain of my putting the character in the story whose salient features resembled you. In fact I think it ought to give an added interest to the tale. I will, however take good care not to say anything that would lead people to identify you. I wonder whether what you would think about the Durbar is what I make sister Rose say about it, and I hope I may count upon your valuable assistance to make the story lifelike. But I am going to marry you to Sir George Gordon in the end, and Sir George Gordon is a very nice man both in the story and in real life.

Wishing you all success.

I am,

Yours Sincerely,

W T Stead

Margaret's heart & right were vivid!

নিবেদিতাকে লেখা উইলিয়ম স্টেডের দুটি চিঠি। (৮-১২-১৯০২ এবং ১-১-১৯০৩)। এদের মধ্যে নিবেদিতাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের নায়িকা ক'রে গল্প লেখার পরিকল্পনার কথা আছে। প্রসঙ্গ : কার্জন-আয়োজিত দিল্লীর দরবার।

THE NATIONAL REVIVAL IN BENGAL.

WHAT THE SWADESHI MOVEMENT MEANS.

SISTER NIVEDITA contributes to the *Indian Review* for March a glowing defence of the Swadeshi movement in Bengal. The Swadeshi movement is the name for the popular protest against the partition of Bengal, which led the patriots to band themselves together to refuse to purchase any goods not made in Bengal. The movement has already achieved great results, and Sister Nivedita, who is an Irish Nationalist, Miss Noble by name, sees in it the beginning of the resurrection of India.

THE DAWN OF THE NEW DAY.

Sister Nivedita says:—

All India is watching to-day the struggle that is going on in Eastern Bengal. Scarcely a word appears in the papers, yet the knowledge is everywhere. The air is tense with expectation, with sympathy, with pride, in those grim heroic people and their silent struggle to the death, for their Swadeshi trade. Quietly, all India is calculating their power. Are they not a tremendous people engaged in a warfare which is none the less real for being fought with spiritual weapons? But let him who stands in the path of right, beware! We cannot fail—and we shall not fail; for all the forces of the future are with us. The Swadeshi movement has come to stay, and to grow, and to drive back for ever in modern India the tides of inaction and despair.

RESULTS ALREADY ACHIEVED.

Already no small results have been achieved—the promise of greater things to come:—

Of Calcutta, it may be said that in all directions small industries have sprung up like flowers amongst us. Here are whole households engaged in making matches. Somewhere else it is ink, tooth-powder, soap, note-paper, or what not. There, again, is a scheme for pottery or glass on a more ambitious scale. And this, without mentioning the very staple of the country, its cotton weaving. Where before were only despair and starvation, we see to-day glad faces and feel an atmosphere of hope.

SACRILEGE!

The boycott of foreign-made goods is enforced by the solemn sanctions of religion:—

Is the Swadeshi movement actually an integral part of the National Righteousness? The Mother-Church, at least, has spoken with no uncertain voice. Like a trumpet-call has gone forth the Renewal of Vows at the Kalighat, in Calcutta. Throughout the whole country has been heard the fiat issued at Puri. Henceforth it will be held sacrilege to offer foreign items in worship.

CO-OPERATION FOR SELF-SACRIFICE.

Miss Noble, by a very effective analogy, disposes of the usual assumption that the Bengali will never subject himself voluntarily to the discomfort of paying more for worse wares when he can get better goods at a lower price:—

If we are told that no people will voluntarily buy in a dear market when they might buy in a cheap, we answer: this may be true of Western peoples, educated in a system of competition for self-interest, and, at the same time, it may be untrue of the Indian nation, educated in a system of co-operation for self-sacrifice. Hindus once upon a time craved no cat beef. They were accustomed to the food, and liked it. It was convenient to kill cattle and feed a household by them cheaply. But an idea of mercy and tenderness [illegible] economic interests of the [illegible] to-day, where is the Hindu who [illegible] Swadeshi [illegible]

movement is the ever-protecting movement of the present age. There will yet come a time in India when the man who buys from a foreigner what his own countrymen could by any means supply, will be regarded as on a level with the killer of cows to-day. For assuredly the two offences are morally identical.

Now that the purchase of English goods is declared to be even as the sin of killing the sacred cow, let Manchester and Mr. Morley look out for storms.

UTTERANCES OF THE DAY.

MR. A. M. BOSE ON "THE BENGAL FEDERATION."

My beloved friends, Mahommedan and Hindu fellow citizens of one and indivisible Bengal! [illegible]

A Rishi of old [illegible] the gods that he had lived to see the day when the divine sage of Kapilavastu was ushered into the world. I am not a Rishi nor worthy to touch the feet of one, but yet I bless our Father in Heaven, who is the common Father and Judge of the Englishman and the Indian alike, that I have lived to see this day which marks, I think I may say, the birth of a nation. I come amongst you as one almost risen from the dead to see this moment of a national upheaval and of national awakening. Drawn from my sick-bed, where I have been secluded from the world, by serious illness for nearly a year, I have come to express my grateful thanks to you for the honour and the signal privilege you have conferred on me by associating me with yourselves on this great and historic occasion, which will live in the annals of Bengal and mark an epoch in its history. I am around me after a long time the faces of many true friends and comrades, who have been in the front of the fight. I salute them and salute you all on this day of solemn recollections and solemn resolves.



It is, indeed, a day of mourning to us, when the province has been rendered by official fiat, and the glorious spirit of union and the community of interest which had been growing stronger day by day, runs the danger of being wrecked, and disastrous and many other evils into which this is [illegible] are likely to follow in its wake. And yet in the dispensation of Providence not unoften out of evil cometh good, and the dark and threatening cloud is, to us, fringed with [illegible] and [illegible] with the [illegible] almost as a day of rejoicing. Yes, as our glorious poet has sung in one of his many noble and inspiring utterances—Mora Ganger Ban Asheche—the [illegible] and swampy river has felt the full force and fury of the flood, and is swelling in its depths. Have we not all heard the booming of that national call and its solemn summons to our hearts? Let our souls mount forth in gladness to the throne of the Most High at this sacred natal hour of the new and united Bengali nation. Let us bear in mind as a writer in the *Patrika* has said, that from dark cloud [illegible]

[বামে] রিভিউ অব রিভিউজ-এ (মে ১৯০৬)
নিবেদিতার প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ।
এটি ইণ্ডিয়ান রিভিউ-এ (মার্চ ১৯০৬)
বেরোয়। বিষয়, স্বদেশী আন্দোলন।
[ডাইনে] ফেডারেশন-হলের ভিত্তিস্থাপনের কালে
আনন্দমোহন বসুর বক্তৃতা। (ইণ্ডিয়ান রিভিউ,
অক্টোবর ১৯০৫)।





[উপরে] তিলকের কার্টুন, মডারেট মতবাদী হিন্দী পাঞ্চ-এ (জানুয়ারি ১৯০৮)। তিলকের পাগড়িতে লেখা, 'Irresponsible Extremism' ; দূরের লাঠিতে, 'Hooliganism' ও 'Rowdism' ; দূরের বইয়ে, 'Extremist Venom.'
[নীচে] কার্টুনের ক্যাপশনে আছে : তিলক অ্যাণ্ড অরবিন্দ কোম্পানীকে বাংলার বাঘ সুরেন্দ্রনাথ, দক্ষিণী চিতা গোখলে, বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র-সিংহ ছিঁড়ে-কুটে ফেলছেন।





[উপরে] সুরাট কংগ্রেস-ভঙ্গের কার্টুন। কংগ্রেস ভঙ্গের জন্য তিলক প্রভৃতিকে দায়ী করা হয়েছে। লাঠিহাতে তাঁদের উদ্দাম নৃত্য। লাঠির নীচে সুরেন্দ্রনাথ। (হিন্দী পাঞ্চ, ৫ জানুয়ারি, ১৯০৮)।

[নীচে] সুরাট কংগ্রেস-ভঙ্গের পরবর্তী অবস্থা। জলে ভাসছে 'Bengali Extremism' ; তিলক ভাসমান। ভাসমান রাসবিহারী, ধরে আছেন 'Convention' ; ঢেউ—'Hooliganism, Rowdism' ; লাইফবোট—'Constitution, Convention'—তাতে আশ্রিত মডারেট নেতারা। [ঐ]।





[উপরে] অরবিন্দের কার্টুন। তাঁর হাতে-ধরা ফলের উপর লেখা, 'Boycott Anniversary.' ক্যাপশনের বক্তব্য, বাঙালী বাবু বলছেন, ফলটা এখন যদি মিষ্টি লাগে তাহলে পরে কি রকম লাগবে, কে তার পরোয়া করে ?

[নীচে] চরমপন্থীদের একজনের গায়ে লেখা, 'Punjab Extremist,' আর একজনের গায়ে, 'Irresponsible Extremist.' অরবিন্দের গায়ে, 'Bengal Extremist.' ফিরোজ শা মেটা—সিংহ। লাহোর কংগ্রেসে তাঁর প্রস্তাবিত সভাপতিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরমপন্থীদের বিষয়ে এই কার্টুন। (হিন্দী পাঞ্চ, আগস্ট ১৯০৯)।





[উপরে] বয়কটের পক্ষে প্রচাররত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও অম্বিকাচরণ মজুমদার। ক্যাপশনের বক্তব্য : উৎপীড়ক সরকারী ব্যবস্থা সত্ত্বেও নবগঠিত পূর্ববঙ্গে এঁদের নেতৃত্বে প্রচুর উদ্দীপনায় বয়কট আন্দোলন চলছে। (হিন্দী পাঞ্চ, ১৮-৮-১৯০৭)।

[নীচে] কার্জন-কার্টুন। (মারাঠি পাঞ্চ)।

॥ ৪ ॥ নিবেদিতার প্রভাবাধীন কয়েকজন বিপ্লবী : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ও অন্যান্যরা

১৯০৪ জানুয়ারি মাসে নিবেদিতা পাটনায় ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা করেন। বিহার হেরল্ড পত্রিকায় সে সম্পর্কে বলা হয়, "তিনি হিন্দুধর্মের সূক্ষ্ম-জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নি। ভারতবাসীরা কিভাবে জাতিহিসাবে যথার্থ প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে তারই বাস্তব উপায় নির্দেশ করতে তিনি চেয়েছিলেন।" নিবেদিতা ঐ সভায় বলেন, "বালকদের মুখে অপরিমেয় শান্তি দেখলে আমি দুঃখিত হব।...আমি চাই তোমরা নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ করো, বক্সিং করো তরবারি খেলো। শান্তশিষ্ট গোবেচারা লোক চাই না—চাই শক্তিধর পুরুষ।"

কেবল বলিষ্ঠ হওয়াই যথেষ্ট নয়, "বীর" হতে হবে। নিবেদিতার তাই দাবি।—

"সেই হল বীর যে লড়াই করে, লড়তে ভালবাসে।...লড়াই করো, লড়াই করো, কেবল লড়াই করো—কিন্তু তাতে নীচতা বা তিক্ততা যেন না থাকে।...যখন সংগ্রামের ডাক আসবে, যেন ঘুমিয়ে থেকো না।" [নিবেদিতা-রচনাবলী, ৫ম, ৩৩৩-৩৪]

নিবেদিতার নিজস্ব দল ছিল—কিন্তু কারা তার অন্তর্ভুক্ত সে সম্বন্ধে প্রায় কোনো সংবাদ পাই না। তবে ইন্দ্রনাথ নন্দী যে একসময়ে তাঁর দলের ছিলেন, সেকথা নিবেদিতার চিঠিতে আছে। স্বামী সদানন্দের ভাগিনেয় অমূল্যচন্দ্র গুপ্ত, পরে স্বামী শঙ্করানন্দ, তাঁর দলভুক্ত হিসাবেই জাপানে গিয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "অমূল্যচন্দ্রই...বিখ্যাত বৈপ্লবিক জাতীয় সঙ্গীত 'আও মর্দানো, হিন্দ জওয়ানো, জলদি তোলো হাতিয়ার, ফৌজ করো তৈয়ার' জাপান থেকে আনেন। গানটি প্রসাদ নামে লখনৌ-এর একটি ছাত্র লেখে; সে তখন জাপানে অবস্থান করছিল। গানটি ব্যাপক প্রচারলাভ করে, আলিপুর মামলার সময়ে ভারতীয় লা মার্সাই হিসাবে এটিকে বন্দীরা গাইত।"৭

[স্বামী শঙ্করানন্দ অবশ্য, আত্মপ্রাণার রচনা অনুযায়ী, বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের ব্যাপারটি প্রায় অস্বীকার করেছেন।]

বিপ্লব-সমিতিতে প্রচুর রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক বই নিবেদিতা উপহার দিয়েছিলেন—এই সংবাদ বারীন্দ্র ও অন্যান্যের স্মৃতিকথা থেকে ইতিমধ্যে জেনে গেছি। সেই গ্রন্থগুলির ব্যবহার ও পরবর্তী গতি সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"ভগিনী জোসেফ ম্যাৎসিনীর আত্মজীবনীর প্রথম ভাগ বিপ্লবীদলে দান করেছিলেন। সারা দেশে বইটির প্রচার হয়েছিল। এর মধ্যে গেরিলাযুদ্ধের কৌশল ও পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ ছিল। এইসকল বই আমি আমাদের এক সহকর্মী কেশবচন্দ্র গুপ্তের কাছে (যিনি বেলুড় মঠের স্বামী সদানন্দের ভাগিনেয় স্বামী শঙ্করানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) গচ্ছিত রেখেছিলাম।...কেশব আলিপুর মামলার কালে গা-ঢাকা দেবার আগে অন্যদের কাছে

৭ পেট্রিয়ট-প্রফেট, ১১৯।

বইগুলি রেখে যায়। সারা দেশে পুলিশী তল্লাসের কালে বইগুলি একে-একে বেরিয়ে পড়ে। নিবেদিতা প্রায়ই বলতেন, 'আমার বইগুলি এক-এক করে আবির্ভূত হচ্ছে।"৮

অরবিন্দর পরে বাংলার প্রধান বিপ্লবী নেতা, অতুলনীয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন নামে সমধিক পরিচিত) ১৮৯৯ সাল থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন। পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (অক্টোবর ১৯৬৬) নানা সূত্র থেকে স্বামীজী ও নিবেদিতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। তার থেকে দেখতে পাই, কলকাতায় প্লেগ-শুশ্রূষার ব্যাপারে নিবেদিতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল, যা অব্যাহত ছিল।—"যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামীজী ও নিবেদিতার পরিচয় প্রসঙ্গে বহু কথা শোনা যায় যতীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীতেজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখে। ১৯৫৬, ৭ জুলাই,...শ্রীভূপতি মজুমদার [পত্রে বলেন]...'বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, প্রমথনাথ মিত্র, সতীশ মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব, সকলেরই সঙ্গে তিনি [যতীন্দ্রনাথ] গোপনে মিলিত হন।'...যতীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীতেজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ভূপতিবাবু দৃঢ়তার সঙ্গে লেখেন,...'দাদা [যতীন্দ্রনাথ] স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, পি. মিত্র, সতীশ মুখার্জি, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [স্বামী নিরালম্ব] ইঁহাদের সহিত নিয়মিত সম্পর্ক রাখিতেন।'...যতীন্দ্রনাথের আর এক স্নেহধন্য বিপ্লবী শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত [ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নন] লেখেন (৩১.৮.১৯৬১), 'স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দাদার [যতীন্দ্রনাথের] পরিচয় ছিল।...আমি তখন পলাতক। পলাতক বন্ধু কুন্তল চক্রবর্তীর বাসা ছিল চন্দননগর গোন্দলপাড়ায়। সেখানে অমরদার [অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়] কাছে এক-একদিন শুনি স্বামীজীর এবং সিস্টার নিবেদিতার কাছে দাদার যাওয়া-আসার কথা।...সিস্টার নিবেদিতা এমনই রেস্টলেস্ স্পিরিট-এর মহিলা ছিলেন যে, একটু মনুষ্যত্বের পরিচয় যার ভিতর পেতেন—দেশের স্বাধীনতা সাধনায়, ইংরেজবিরোধী প্রেরণায় তাকেই উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন।'...যতীন্দ্রনাথের প্রথম বিপ্লবী শিষ্যদের অন্যতম ভবভূষণ মিত্র।...ভবভূষণবাবুকে বলতে শোনা যায় যে, বাঘ মারবার আগে এবং পরেও যতীন্দ্রনাথকে তিনি নিবেদিতার কাছে রাজনৈতিক কাজে যাতায়াত করতে দেখেছেন। বাঘমারা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিবেদিতার কাছে দমদমে আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে ভবভূষণবাবুরাও গিয়েছেন বার কয়েকই। [১৯০৬ এপ্রিল মাসে যতীন্দ্রনাথ একটি ছোট ছোরা দিয়ে একটি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলতে পারেন, যার থেকে তাঁর নাম হয় বাঘা যতীন]।"৯

গোয়েন্দা রিপোর্টে পাওয়া যায়, ভবভূষণ মিত্র ছাড়াও যতীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য শিষ্য

---

৮ পেট্রিয়ট প্রফেট, ১১৯।

৯ নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে, ২য় খণ্ড (সম্পাদক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ) পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ "বিপ্লব আন্দোলন : স্বামীজী, নিবেদিতা, যতীন মুখার্জি"। পৃ. ৫—১৭।

কুঞ্জলাল সাহা (মাণিকতলা বোমার মামলায় ধৃত) এবং সতীশ মজুমদার (চণ্ডী) বেলুড় মঠে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।১০

স্বামীজী ও নিবেদিতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথা অন্য সূত্রে থেকেও পেয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী শঙ্কর বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব বিষয়ে প্রবীণ বিপ্লবীদের যেসব স্মৃতিকথা সংগ্রহ করেছেন, তাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ও সহকর্মী নলিনীকান্ত কর বলেছেন : "জ্যোতিন্দ্রনাথ...ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন।" বিপ্লবী অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী বলেছেন, তিনি যদিও নিবেদিতাকে নিকট থেকে চেনবার সুযোগ পাননি কিন্তু ১৯০৮ সালে যখন তিনি বারাণসী ও উড়িষ্যার বাশপুরে বিপ্লবীদল সংগঠন করেন তখন "রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন ব্রহ্মচারী এ-ব্যাপারে এবং সবরকম বিপ্লব প্রয়াসেই" তাঁকে উপদেশ দেন। [এখানে স্মর্তব্য, গণেন্দ্রনাথ নিবেদিতার দলভুক্ত ছিলেন ; তিনি নিবেদিতার বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অনেক খবর জিজেল রেম'-কে দিয়েছিলেন।]।

আমাদের অনুমান, দৃঢ় ধারণা বলাই ঠিক, যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার কেবল সাধারণ পরিচয় ছিল না, ঘনিষ্ঠ বৈপ্লবিক যোগাযোগও ছিল। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, বিপ্লবী-নিধনে উৎসাহী পুলিশ কর্মচারী সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ড হয়—সে সম্পর্কে নিবেদিতার চিঠিতে যে-রকম মন্তব্য আছে তার থেকে মনে হতে পারে, এ-ব্যাপারটির সঙ্গে নিবেদিতা মানসিকভাবে বা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। [নিবেদিতার এই বিষয়ক পত্রাংশ পরে উপস্থিত করব।]। যতীন্দ্রনাথ সামসুল আলমকে মারবার জন্য দুজনকে পাঠিয়েছিলেন—বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত এবং সতীশ সরকার—এঁদের মধ্যে সতীশ সরকার যতীন্দ্রনাথের দূতরূপে নিবেদিতার কাছে যাতায়াত করতেন বলে পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত প্রবন্ধে জানিয়েছেন। [সতীশ সরকারের নিবেদিতা-স্মৃতি পরে উদ্ধৃত হবে]।

তারকনাথ দাস নিবেদিতার দলভুক্ত, অনুমান করি।

বিপ্লবী জি এন মুখার্জি যে নিবেদিতার দলে ছিলেন তা নিবেদিতার চিঠিতেই আছে। নিবেদিতা রাজনৈতিক কারণে এঁকে একবার জাপানে পাঠিয়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা ৩ মার্চ, ১৯০৩ লেখেন : "আমার হাতের ছেলে জি এন মুখার্জি—হয়ত তোমাকে জাপান থেকে চিঠি লিখতে পারে। সে তোমাকে কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন করবে তা জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চিত জানি যে, ঠিক বিষয়েই লিখবে। এই ছেলেটিই একান্ত ভক্তিতে এখানে বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছে।"

জি এন মুখার্জি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইউরোপ আমেরিকাও গেছেন। নিবেদিতা ৩ অগস্ট, ১৯০৫, আমেরিকায় মিসেস বুলকে যা লিখেছেন তার থেকে বোঝা যায়, এঁর বিষয়ে বিশেষ ভরসা করতেন বলে এঁকে তৈরী করে দেবার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি লিখেছেন :

---

১০ Freedom Movement Papers, No. 45, State Archives, W. Bengal. [Information received through Dr. Sisir Kar.].

"যদি জি এন মুখার্জি এখনো বস্টনে থাকে, এবং যদি তার সঙ্গে তুমি—মীডদের এবং মিঃ লয়েডের পরিচয় করিয়ে দাও, সেইসঙ্গে যদি ইহুদীদের বিশ্ব-সংগঠন সম্বন্ধে [অর্থাৎ ইহুদীদের বিশ্বব্যাপক ধনতন্ত্রী সংগঠনের বিষয়ে] তার বিমূঢ় প্রশ্ন ওঁদের সামনে উপস্থিত করতে বলো—তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব। মীডরা তাকে নিউইয়র্কের সিম্কোভিচদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতেও পারবেন। 'ইনটারন্যাশন্যাল' পত্রিকার এই যে সংখ্যাটি তুমি পাঠিয়েছ, তাতে প্রকাশিত মঁসিয়ে সিম্কোভিচের 'রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদ' সম্বন্ধে প্রবন্ধটি আমাদের সকলকে এমনই মোহিত করেছে যে, বলে বোঝানো যাবে না। খোকা [ডাঃ বসু] এটিকে বিশেষভাবে পছন্দ করেছে। আমার ধারণা, জি এন মুখার্জি তার আদর্শ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, ঠিক নয় কি? সেইসঙ্গে অবশ্য আমি সঠিক বলতে পারব না, সে অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ কিনা। তা যদি হয়, তাহলে অধিকতর বাস্তবতাবোধ ও খুঁটিনাটি জিনিস সম্বন্ধে তাকে বেশি নজর দিতে তাগিদ দেওয়া, বা অধিকতর মননক্ষমতার বিস্তারের দিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কিনা বিবেচ্য। শেষোক্ত বিষয়ে আমি গোড়া থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি স্বতঃই চেয়েছিলাম—[তার মতো] কেউ ভাবটাকে আয়ত্ত করুক। এক্ষেত্রে [তার ক্ষমতা বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে] আমার ধারণা ভুল হতে পারে। আর তা যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে যে বলেছিলাম, ফেরবার পথে ইউরোপে কিছুসময় কাটিয়ে গেডেস, ক্রপটকিন এবং হাইন্ডম্যানের কাছে শিক্ষা নিতে —সেটা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে উত্তম হবে—শিল্পবাণিজ্য, ও তার বিজ্ঞান, তৎসহ যে-বিশেষ বিষয়টি সে অনুশীলন করছে, [সেই বিশেষ বিষয়টি কি অনুল্লিখিত থাকল]—এদের সকলের বিষয়ে মনঃসংযোগ করা এবং আবার জাপান ও চীন ঘুরে আসা।

"আমি তাকে জাতীয় ভাবের প্রতিনিধি করে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম—চেয়েছিলাম, তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সে সম্পন্ন হয়ে উঠুক।. মতলব করে এটা করেছি তা অবশ্য নয়। আমার মনে হয়, মঁসিয়ে সিম্কোভিচের মতো দু'একজন রুশ রিফিউজি [অর্থাৎ জারতন্ত্রের হাত এড়িয়ে অন্যদেশে পলাতক রাজনৈতিক কর্মী] তাকে খুব সাহায্য করতে পারবেন : কোন্ অবস্থায় শক্তির বিস্ফোরণ প্রয়োজন আর কোন্ অবস্থায় অন্য উপায়ের দ্বারা অধিক ফললাভ সম্ভব—সেই উভয় পরিস্থিতির পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, মুখার্জি জাপানী চরিত্রের ইনসিন্সিয়ারিটির কথা জানে। সেটা সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।"

জি এন মুখার্জি সম্বন্ধে টেগার্টের গোয়েন্দা-রিপোর্ট পাই :

"In 1908 [when] she [Sister Nivedita] went to England..the well-known revolutionary Girindra Nath Mukherjee was reported to be living with her in London."১১

১৯০২ অগস্ট থেকে ১৯০৫ জুলাই পর্যন্ত তিন বৎসরকে 'নিবেদিতা পর্ব' রূপে চিহ্নিত করেছি (অতি সরলতায় অবশ্যই!)—তার কারণরূপে বেশকিছু তথ্য দিলাম। এর

১১ শিশির কর প্রদত্ত।

সঙ্গে ক্যালগতভাবে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আনা চলত, যাদের কথা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে হাজির করব। সংক্ষেপে তা হল—স্বয়ং বিপ্লবপন্থী হয়েও নিবেদিতা দেশের চরমপন্থী, মধ্যপন্থী, নরমপন্থী—সকলের সঙ্গে সংযোগ রেখে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাবার তাগিদ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে দরকারী সংবাদ জোগাড়ের চেষ্টা করেছেন। কলকাতার প্রধান সাহেবী কাগজ স্টেটসম্যানের সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা এবং তাঁকে প্রভাবিত করে স্টেটসম্যানকে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে ব্যবহার করা, নিবেদিতার অসামান্য কৃতিত্বের কাজ। এসব প্রসঙ্গ আমরা দ্বিতীয় পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব—যার সূচনা সুবিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলন দিয়ে।

তৃতীয় পর্ব

নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রয়াসের তৃতীয় পর্যায় (এক)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চতুর্দশ অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন

॥ ১ ॥ বঙ্গভঙ্গ : প্রতিবাদ : বাংলায় সর্বাত্মক জাগরণ

যে-অগ্নির ইন্ধন তিনি হতে চেয়েছিলেন—সেই অগ্নি 'স্বদেশী আন্দোলন' নাম নিয়ে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠল—নিবেদিতা তীব্র উল্লাসে দেখলেন। প্রকাশ্য নেতৃত্ব করতে তিনি কোনোদিনই চাননি—এখন নিজেকে আরও অন্তরালে সরিয়ে নিলেন—কারণ ভারতবর্ষে আন্দোলনের নেতৃত্ব করবে ভারতবাসী—বিবেকানন্দের এই নীতিতে তাঁর পুরো সমর্থন ছিল। (ওকাকুরা-সংশ্লিষ্ট ঘটনার কয়েক মাস এর ব্যতিক্রম)। নিবেদিতা মনে করেছিলেন —তাঁর কাজ ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, সেবা, সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া, এবং এমন সব স্থানে সক্রিয় থাকা যেখানে অন্যের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।

১৯০৫-এর শেষভাগ থেকে ১৯১১-এর শেষভাগ পর্যন্ত নিবেদিতার অত্যন্ত ব্যস্ত রাজনৈতিক জীবনের (১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালে গুরুতর অসুস্থতার জন্য তাঁকে কিছু-দিন নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়েছিল, সেই সময়কাল হিসাব থেকে বাদ যাবে) সবকথা উপস্থিত করা কঠিন, তা বহুলাংশে আবৃতও বটে। আমরা কয়েকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করব, বিশেষ ক'রে যাদের তথ্যসূত্র পেয়েছি তাঁর পত্রাবলী থেকে।

স্বদেশী আন্দোলনের আদি পর্ব সম্বন্ধে খুব বেশি সংবাদ পত্রাবলীতে নেই, কারণ প্রথমতঃ কাগজে-কলমে তা লেখা নিরাপদ ছিল না, দ্বিতীয়তঃ যে-র‍্যাটক্লিফকে তিনি চিঠিতে রাজনৈতিক সংবাদ বেশি দিয়েছেন, তিনি তখন ভারতবর্ষেই ছিলেন।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের বিরাট গৌরবময় ইতিহাস এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। বহির্গতভাবে বলতে গেলে, সরকার কর্তৃক বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা এবং তাকে কার্যকর করা থেকেই এই আন্দোলনের উদ্ভব ও বিস্তার। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন তখন বিরাট ; তার মধ্যে এখনকার 'পশ্চিমবঙ্গ' ও 'বাংলা দেশ' ছাড়াও বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত ছিল—লোকসংখ্যা প্রায় আট কোটি। উপযুক্তভাবে এই প্রদেশ শাসন করা শক্ত হচ্ছিল বলে অনেক-দিন ধরেই প্রদেশটিকে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে বিভক্ত করার কথা উঠেছিল। সে বিভাগে বাঙালীদের আপত্তি ছিল না—যদি হিন্দীভাষী বিহার ও ওড়িয়াভাষী উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে দিয়ে, আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে নিয়ে এসে, পুরো বাংলাভাষী একটি প্রদেশ গঠন করা হত। সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু-কিছু ইংরেজ শাসকের সে অভিপ্রায় থাকলেও, কার্জন বা আনড্রু ফ্রেজার-জাতীয় শাসকদের সে বাসনা একেবারেই ছিল না। বাঙালী বাবুদের রাজনৈতিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপদ স্থায়িত্ব-

সংরক্ষণে আগ্রহী শাসকগণ 'শাসনতান্ত্রিক কারণে' যতখানি, ততোধিক 'রাজনৈতিক কারণে' (অর্থাৎ বাঙালীদের সংহতি ভেঙে দুর্বল করার ইচ্ছায়) চালিত হয়ে যে, বাংলা বিভাগের মতলব করেছিলেন, তা ঐতিহাসিক উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন।১ ১৯০৩ সালের শেষদিকে কার্জন-সরকারের পার্টিশান-অভিপ্রায় ঘোষিত হয়। তখন নানাদিকে প্রতিবাদ ওঠে। হিন্দু-মুসলমান, জমিদার-প্রজা, দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী, অর্থাৎ সমাজের সচেতন সব শ্রেণীর মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কার্জন ১৯০৪ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ ক'রে, বাঙালী জাতীয়তার শক্তি খানিকটা বুঝে নিয়ে, ব্যাপারটা সমাধা ক'রে ফেলতে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শত-শত সভা হয়, শত-শত পত্র, পুস্তিকা লেখা হয়, ১৯০৩ এবং ১৯০৪ কংগ্রেস অধিবেশনে তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়। ইংরাজের ন্যায়বোধে বিশ্বাসী শিক্ষিত ভারতবাসী মনে করেছিলেন—এত বাক্য-পত্র-প্রস্তাব বৃথা যাবে না। কিন্তু সরকার নিজ মতলব বাইরে আঁচ করতে দেয়নি। দেড় বছর মোটামুটি চুপচাপ থাকার পর, ১৯০৫ সালে ৬ জুলাই থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে নানা দফায় সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা গেল : বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভক্ত হয়ে দুটি প্রদেশ তৈরী হচ্ছে—একটির নাম "ইসটার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম", যাতে থাকবে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ও রাজসাহী ডিভিসন এবং পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদা ও আসাম। বাকি প্রদেশের নাম "বেঙ্গল" —যা বিহার, উড়িষ্যা এবং অবশিষ্ট বঙ্গদেশ নিয়ে গঠিত হবে।২

জনমতের এবং জনগণের অনুভূতির উপরে কল্পনাতীত এই অত্যাচার। ফলে প্রচন্ড উত্তেজনা, বিশাল-বিশাল সভা, হাজার-হাজার লোকের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র—যার বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন : "বস্তুতপক্ষে কোনো সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এর চেয়ে অধিক ঐক্যবদ্ধ এবং নাছোড় বিরোধিতা ধারণা করা শক্ত। ভারতে বৃটিশ শাসনকালে যে, এর কোনো পূর্বনজির ছিল না তা অবশ্যই বলা চলে।"৩

সরকার অবিচলিত থাকল। বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্তকে 'স্থির ব্যাপার' করে তোলার জন্য অদ্ভুত ক্ষিপ্র তৎপরতায় বিভক্তি-দিবস স্থির হয়ে গেল—১৬ অক্টোবর, ১৯০৫। নতুন প্রদেশের গভর্নর হলেন জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার।

কাগজে-পত্রে-মুখে যতখানি প্রতিবাদ করা যায় ততখানি করার পরে বাঙালীরা দেখল —শাসকেরা কথায় বিশ্বাস করে না। তখন বাঙালী কাজের পথে নামল। "শীঘ্রই নিছক মৌখিক প্রতিবাদ না থেকে তা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও বৃটিশ জনগণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের চরিত্র গ্রহণ করল। ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসে এই প্রথম ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতীয়রা আবেদনের ভিক্ষানীতি ত্যাগ ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হল—নবজাতীয়তার খাঁটি প্রেরণায়।"৪

---

১ ত্রিপাঠী, ৮৫-১০২।

২ মজুমদার, ২য়, ৮।

৩ ঐ, ৮।

৪ ঐ, ১২।

বাঙালীর সক্রিয় প্রতিবাদের নাম—'স্বদেশী' ও 'বয়কট'। 'বয়কটে'র অর্থ—বিদেশী পণ্য বয়কট ; উদ্দেশ্য—বণিক-শাসক ইংরাজের বাণিজ্যিক স্বার্থকে আঘাত করা। আর 'স্বদেশী'-র অর্থ—স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্য, তা যে-মানেরই হোক, আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করা। ['মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।']। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রশ্ন জড়িত ছিল—আত্মনির্ভরতার প্রশ্নও। গোটা ব্যাপারটা আপাততঃ অর্থনৈতিক, কিন্তু পিছনের তাগিদ প্রচণ্ডভাবে রাজনৈতিক।

পার্টিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পরে ৭ অগাস্ট ১৯০৫, টাউনহলে বিরাট ঐতিহাসিক সভায় জাতীয় পর্যায়ে বয়কট-প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার আগে তিন সপ্তাহ ধরে কলকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন সভাসমিতিতে বয়কট-প্রস্তাব সমর্থিত হয়েছে। তারপর যখন ১৬ অক্টোবর পার্টিশানকে শাসনতান্ত্রিকভাবে বলবৎ করা হল তখন সেইদিনটিতে উভয় বঙ্গের অবিভাজ্যতার ঘোষণারূপে ফেডারেশন-হলের ভিত্তিস্থাপনা হল—সে-কাজ করলেন আনন্দমোহন বসু, রোগশয্যা থেকে বাহিত হয়ে এসে। মিলনের রাখীবন্ধন করাও হল। দিনটি পরবর্তীকালে স্বীকৃত হল 'জাতীয় দিবস'রূপে।

সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদয় যে, এর দ্বারা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, এটা-যে সাধারণ ধরনের, কিংবা কিছু ব্যাপক আকারের রাজনৈতিক আন্দোলনমাত্র ছিল না—তা বোঝা যায়, এই আন্দোলনে ছাত্রদের বিপুল অংশগ্রহণে। [তখনকার দিনে 'অধ্যয়নই তপস্যা'—এই নীতিবাক্যে ছাত্রদের অবিচলিত আস্থা ; 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে'—এই বাক্যেও]। বস্তুতঃপক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের শক্তির মূলে ছিল ছাত্রদের জীবনাবেগ—তারা প্রবল বন্যাতরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ে আন্দোলনকে গতিশীল এবং নূতন পথবর্তী করেছিল, যে-পথে পূর্বে হিসেবী রাজনীতি অগ্রসর হয়নি।

বাঙালী জাতির প্রাণস্রোত কেবল আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হয়নি—তা সাহিত্যে সঙ্গীতে নাটকে অভিনয়ে কলাশিল্পে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। লোকসংস্কৃতির জীবনীশক্তিকে প্রকাশ করেছিলেন মুকুন্দদাস তাঁর স্বদেশী যাত্রায় ; আবার পরিমার্জিত সুরসঙ্গীত অধ্যারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেনের রচনায়। রবীন্দ্রনাথই রাখীবন্ধনের অমর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রাণদাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ বার্ধক্যেও নেমে এসেছিলেন মঞ্চে—সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজীর মতো জাতীয়তাবাদী নাটক নিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীগণ জাতির আত্মাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন রঙে রেখায়। ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন—ভারতবর্ষের জীবন ও ইতিহাসের সত্যরূপকে উদ্ঘাটন করা তাঁদের কাছে ব্রত ছাড়া কিছু নয়। বিজ্ঞানেও যে ভারতবর্ষের কিছু দান করার আছে তা পূর্বের বেশ কয়েক বৎসর ধরে প্রমাণ করছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু—এই পর্যায়ে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা 'জাতীয় বিজ্ঞানসাধনা' বলে বন্দিত হয়েছিল।[৫] তাঁর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল

---

৫ জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রবল জাতীয়তাবাদী প্রেরণা ছিল, আর তাতে ইন্ধন ছিলেন নিবেদিতা। মিসেস ওলি বুলকে জগদীশচন্দ্র ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫, লিখেছিলেন : "এই রাখী আপনার কাছে

বিজ্ঞানতপস্বী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন চলেছিল, যা কেবল তাত্ত্বিক ব্যাপারে আবদ্ধ না থেকে নানাপ্রকার কারিগরি শিক্ষার দিকে প্রসারিত ছিল। জাতীয় আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশে অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছিল ইংরেজি ও বাংলা পত্র-পত্রিকা (যাদের কতক পূর্বেই স্থাপিত, কতক সদ্য-স্থাপিত)। সংবাদপত্রের রচনার মধ্যে যেমন দারুণ উত্তেজক, দাহকর রচনাদি বেরিয়েছিল তেমনি অপরদিকে এমন সকল বস্তু প্রকাশের সৌভাগ্য তাদের হয়েছিল, যাদের মধ্যে ছিল মহৎ সাহিত্যের গুণ, সেইসঙ্গে সমুচ্চ সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা যা অদ্যাপি বহুলাংশে অনতিক্রান্ত। তা হতেই পারে কারণ লেখকদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ—এবং নিবেদিতা, যিনি অবশ্য জন্মে বাঙালী নন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরে বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল। এরই ফলে কংগ্রেসে চরমপন্থী দলের সূচনা হয়, তাতে যোগ দিয়েছিলেন পঞ্জাবের লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের তিলক, খাপার্দে। বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল সারা ভারতে, ভারতের বাইরেও। বিবেকানন্দকে লক্ষ্য করে অরবিন্দ যা বলেছিলেন তা যেন এই পর্বে জ্বলন্ত বাস্তবের আকার ধরেছিল : "এই হল পৃথিবীর উদ্দেশ্যে প্রথম প্রকাশিত সংকেত—ভারত জেগেছে—কেবল বাঁচতে নয়, জয় করতে।"

॥ ২ ॥ বাঙালীর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সম্বন্ধে সমকালীন স্বীকৃতি

স্বদেশী আন্দোলনই যে ভারতবর্ষে প্রথম ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার মর্যাদাকে সর্বভারতীয় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল (অবশ্য ধর্মান্দোলন, সংস্কার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহে বাংলার সে নেতৃত্ব আগেই স্বীকৃত ; বাংলা 'ভারতের এথেন্স' বলে চিহ্নিত হয়েছিল)—সে বিষয়ে সমকালীন কিছু সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যায়।

এই পর্বেও কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনসূত্রে বাংলার সাংস্কৃতিক সৃষ্টির আকারই অনেকের মনোহরণ করেছিল, যাঁরা অপরপক্ষে এখানকার চরমপন্থী রাজনীতিকে শিরোপা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইংলন্ডের শ্রমিকনেতা রামজে ম্যাকডোনাল্ড এইসময়ে ভারতভ্রমণ করেছিলেন (সে প্রসঙ্গ পরে আসবে) এবং নিজ অভিজ্ঞতার কথা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে লেখেন।

পাঠাবার সময়টুকু পেয়েছি—সেটি আমি বেঁধে দিচ্ছি আপনার হাতে। আইনের দ্বারা ওরা আমাদের বিভক্ত করেছে কিন্তু আমরা, সমগ্র ভারতবাসী, এই [রাখীর] প্রতীক-বন্ধনের দ্বারা নিজেদের বেঁধে ফেলছি, যাতে আমরা চিরকালের জন্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে, যাই আসুক না কেন, তার সম্মুখীন হতে পারি। এই হল আমাদের যথার্থ মিলন। আজ থেকে নূতন জাতীয় জীবনের সূচনা। আর বহিরাগতদের উপর নির্ভরতা নয়—এখন আমরা ভারতের, আমরা আমাদেরই।"

জগদীশচন্দ্র ১৬ অক্টোবর, ১৯০৮ নিবেদিতাকে লেখেন : "আজ হল দেশমাতৃকার জন্য আত্মোৎসর্গের মহাদিন। আমরা যেন সকলে মাতৃসেবায় আত্মবলি দিতে পারি।"

[ইংরেজিতে লেখা পত্র দুটির প্রতিলিপি বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৫৯২-৫৯৩ পৃষ্ঠার মধ্যে দেওয়া আছে]।

ডেইলি ক্রনিকল পত্রিকায় বাংলার সাংস্কৃতিক সৃষ্টিপ্রতিভা সম্বন্ধে লেখেন : (ইংলন্ডের 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ২৬ আগস্ট ১৯১০, উৎকলিত—"দি জিনিয়াস্ অব বেঙ্গল" ; মডার্ন রিভিউ-এ অক্টোবর ১৯১০ তা অংশতঃ বেরোয়—"অ্যান এম-পি অন দি ইনফ্লুয়েনস্ অব বেঙ্গল" নামে) : "যে-মুহূর্তে ভারতে পদার্পণ করলাম, তখনি বাতাস আমার কাণে কানাকানি করতে লাগল—বাবুদের বিষয়ে সাবধান! বাবুদের বিষয়ে সাবধান!" এই বাবু পদার্থটি, রামজে ম্যাকডোনাল্ড লিখেছেন, "বৃটিশ কর্মচারীদের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর।" বাবুদের রাজনৈতিক 'এজিটেশন' সৃষ্টির ক্ষমতার কথা স্বীকার করেও ইনি বলেছেন, "বাংলায় ভালো রাজনৈতিক নেতা নেই।" "বাংলার রাজনীতি...অসম্ভবের পশ্চাদ্ধাবক চরমপন্থার সঙ্গে সুযোগসন্ধানী নরমপন্থার অনিশ্চিত মিশ্রণ।" যে বাঙালীরা "ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণাদাতা"—সে বাঙালী, রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, রাজনীতিতে রোমান্টিক, যেখানে পঞ্জাব 'ডগ্‌ম্যাটিক' এবং বোম্বাই 'ডিপ্লোম্যাটিক।' বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব, এঁর মতে, ভাব ও চেতনাসৃষ্টির শক্তিতে—শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে নব-জাগরণ ঘটানোয়। "বাঙালীরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে প্রেরণাদান করেছে।...বাংলায় জাতীয়তাবাদীর মধ্যে আছে সজীব কল্পনা ; তাঁরা গোটা ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করেন ; তাঁদের জাতীয়তা কেবল রাজনীতিতে নয়, সর্বপ্রকার মননগত কার্যাবলীতে প্রকাশিত।... বাংলা সম্ভবতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে উচ্চতর বস্তু ঘটাচ্ছে। সে ভারতবর্ষকে আদর্শায়িত করছে। জাতীয়তাকে সে ধর্মে, সঙ্গীতে, কবিতায়, চিত্রে, সাহিত্যে রূপায়িত করছে।...ভারতবর্ষকে সে নির্মাণ করছে গীতে ও বন্দনায়, ভারতবর্ষকে সে ভূষিত করছে রাণীর বেশে।"৬

রামজে ম্যাকডোনাল্ড-কথিত বাঙালীর "অসম্ভবের পশ্চাদ্ধাবক চরম পন্থা" কিন্তু অপরপক্ষে মহারাষ্ট্রের চরমপন্থীদের মনোহরণ করেছিল। সহসা বিস্ফোরিত দুঃসাহসিকতায় বাঙালীর নব পরিচয় উন্মোচিত হয়েছিল—তা দেখে মরাঠাদের সবিস্ময় সম্ভ্রমের রূপ আমরা পরে, তিলকের নির্বাসন প্রসঙ্গে লক্ষ্য করব।

---

৬ বাংলার সংস্কৃতি-জীবনের ঐশ্বর্যে রামজে ম্যাকডোনাল্ড সত্যই মোহিত হয়েছিলেন। ২১ মে, ১৯১০, তিনি লিসেস্টার-এর বেলগ্রেভ হলে "ভারত ও তার সমস্যা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :

"Of the cultured Hindu of Bengal—'The earnest, impulsive, spiritually-minded man who ponders over his beautiful book of Hindu religion'—Mr. MacDonald spoke with peculiar appreciation. The modern revival of poetry, of music, of art in India was of Bengal. The modern folk-song of India, the modern Indian novel were Bengalee productions. There one got the spirit of Bengal—High Church in its expressions, revolutionary in its sentiments and literary in its mode of action and thought." [*India*, June 3, 1910].

বাংলার স্বদেশী ও বয়কট কিভাবে সর্বভারতে বিস্তারিত হয় সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "ফ্রিডম মুভমেন্ট" (২য় খণ্ড) গ্রন্থে দিয়েছেন। "বাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট...পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় যে, 'বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন এমনকি ১৯০৫ সালের শেষেই সর্বভারতীয় চরিত্র পেয়ে গিয়েছিল'।" "পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এক রিপোর্টে আছে : 'স্বদেশী আন্দোলন বর্তমানে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের সাধারণ আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে'।" গান্ধীজীর উক্তি এক্ষেত্রে অতীব মূল্যবান। তিনি বলেছিলেন : "ভারতের যথার্থ জাগরণ বঙ্গবিভাগের পরেই আরম্ভ হয়।... বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভঙ্গের দিন হিসাবে গণ্য করা যায়।" মাদ্রাজের প্রখ্যাত নেতা জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার বলেছেন : "কংগ্রেস শিক্ষিত মানুষদের দেশপ্রেমের উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে ;...কিন্তু বিরাট জনগণের মনে জাতীয় আত্মচেতনার বীজ বপন করছে স্বদেশী আন্দোলনই। স্বদেশী আন্দোলন—ভারতীয় জনগণকে নিজেদের জীবনযাত্রার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে, সাধারণ অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হতে, এবং কিভাবে সম্মিলিত পন্থায় আত্মোৎসর্গের দ্বারা প্রতিকার করা যায় তার পথসন্ধান করতে শিখিয়েছে।"

গোপালকৃষ্ণ গোখলে বারবার মুক্তকণ্ঠে বাংলার কাছে সারাভারতের ঋণের কথা বলেছেন। "পার্টিশনের ফলস্বরূপ বাংলায় জনচেতনার প্রবল উত্থান...[গোখলে বলেছেন]—আমাদের জাতীয় অগ্রগতির ইতিহাসে তা বিরাট ঘটনা। বৃটিশ শাসন আরম্ভ হবার পরে এই প্রথম সর্বশ্রেণীর ভারতীয়...একটি সর্বজনীন অন্যায়ের প্রতিরোধে সমষ্টিগতভাবে সক্রিয় হবার মতো সর্বাত্মক ভাবাবেগ বোধ করেছিল।...বাংলার বীরোচিত আচরণ...সমগ্র ভারতবর্ষকে বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ করেছে, এবং বাংলার দুঃখ ও যন্ত্রণাসহন দেশের সকল অংশকে সহানু-ভূতিতে ও উচ্চাদর্শে নিকটতর হবার ব্যাপারে সাহায্য করেছে।"৭

সিমলায় ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে "সিডিশাস মিটিংস বিল"-এর উপর বক্তৃতায় গোখলে অতি উচ্চ ভাষায় বাঙালী চরিত্রের গুণগান করেছিলেন : "সরকার এখন এইসকল প্রচণ্ড দমন-অধিকার গ্রহণ করলেন! আমি সবিনয়ে লর্ড বাহাদুরকে বলতে চাই —এইসকল ক্ষমতাকে তুলে রাখুন, এখনি তার ব্যাপক ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না, বাংলাকে ঠাণ্ডা করুন। গণ্ডগোলের মূল ওখানেই। পার্টিশানের ব্যাপারে বাংলা যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হচ্ছে ততক্ষণ যথার্থ শান্তি আসবে না—কেবল বাংলায় নয়, ভারতের অপরাপর প্রদেশেও। এদেশের জনজীবনের সকল ধারাই বাংলার পার্টিশান থেকে উদ্ভূত তিক্ততার দ্বারা বিষাক্ত হয়ে গেছে। আমি বাঙালী নই, তাই কিছুটা খোলাখুলিই এসব কথা বলতে পারছি, আমার কথা ভুল বোঝার সম্ভাবনাও কম। সারা ভারতের সবচেয়ে ভাবপ্রবণ মানুষ বাঙালীরা, তারা ঐহিক ব্যাপারে ক্ষতি শীঘ্র ভুলে যায়—কিন্তু অনুভূতির উপর আঘাতকে ভোলে না। এখন এই পার্টিশান-ব্যাপারটি—যার ভালো-মন্দ দিক নিয়ে এখানে কথা তুলতে

৭ R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. II, 88, 111, 131, 133, 136-37.

আগ্রহী নই—নিঃসন্দেহে বাঙালীর গভীর অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারা অনুভব করছে, তাদের পদদলিত করা হয়েছে—আর যতক্ষণ তারা এইরকম ভাববে ততক্ষণ শান্তি আসবে না। ইতিমধ্যেই সরকারের সঙ্গে তাদের বিশেষরকম শত্রুতার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, প্রতিদিন অবস্থার অবনতি ঘটছে, সাম্প্রতিক গণ্ডগোলের সময়ে ভুক্তভোগীরা মিঃ ওয়াটসনের কাছে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছে—বাংলায় যে-পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সরকার দমননীতির দ্বারা এই পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে চান। বাঙালীদের আমি যতটুকু জানি তদনুযায়ী এই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি—পাশব বলে তাদের নত করা যাবে না।

"বাঙালীরা নানা দিক দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে অসাধারণ জাতি। তাদের দোষের কথা সহজেই বলা যায়, সেগুলি তো উপরেই ভাসমান। কিন্তু তাদের আছে বিরাট গুণাবলী যেগুলি কখনো-কখনো অগোচর থেকে যায়। ভারতীয়দের সামনে যে-সকল পথ উন্মুক্ত আছে, বাঙালীরা সে-সকল ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। সাম্প্রতিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকদের অনেকে বাঙালীদের মধ্য থেকে এসেছেন। সর্বাধিক উচ্ছলশক্তি বাগ্মী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিকদের অনেকে বাঙালী। এঁদের বিষয়ে এই সমাবেশে [ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে] কিছু বলব না কারণ এখানে ওঁরা হীন-মূল্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞান কিংবা আইন কিংবা সাহিত্যের কথা ধরা যায়—সারা ভারতে কোথায় মিলবে ডাঃ জে সি বোস, ডাঃ পি সি রায়ের তুল্য বৈজ্ঞানিক, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের তুল্য আইনজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুল্য কবি? এই ধরনের সর্বোচ্চ সৃষ্টিতে বাঙালী জাতি সদা সমর্থ—আর এইপ্রকার সামর্থ্যযুক্ত জাতিকে, আমি পুনশ্চ বলছি, বলপ্রয়োগে দমন করা যায় না। তাদের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ—শারীরিক সাহস তাদের নেই। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার থেকে তারা মুক্ত। ঐ নিন্দাকে বাংলার তরুণেরা এমন আঁতে নিয়েছে যে, কোনো-কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রের কথা বিশ্বাস করতে হলে বলব, তারা শারীরিক সংঘর্ষ থেকে সরে তো যায়ই না বরং তাকে খুঁজে বেড়ায়।

"সরকার ও বাঙালীদের মধ্যে যদি বর্তমান বিভেদ-সম্পর্কে বজায় থাকতে দেওয়া হয়, তাহলে ঐ প্রদেশে হাজার লোকের মধ্যে একজনের মনেও ইংরাজদের সম্বন্ধে সহৃদয় মনোভাব থাকবে না। সরকার সেক্ষেত্রে প্রচণ্ডরকম সমস্যার সম্মুখীন হবে কারণ বাঙালীর সংখ্যা তিন কোটি তিরিশ লক্ষ, [নবগঠিত 'বেঙ্গল'-এর জনসংখ্যা], আর এই জনসমষ্টির মনে অসন্তোষকে প্রোথিত করার অবিবেচনা ও বিপজ্জনকতা তখন স্বতঃস্পষ্ট হয়ে উঠবে।"৮

ইংলন্ডের ডেইলি নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক লেখক—"ঘৃণিত বাঙালী" নামক লেখায় বাঙালীদের সম্বন্ধে ইংরাজমহলে প্রচলিত ঘৃণা-মনোভাবের কিছু পরিচয় উদ্ধার করেছিলেন। তারপর তিনি বলেন, সে মনোভাব সংস্কারের প্রয়োজন আছে। ইংরাজের সাধারণ ধারণায় বাঙালী "শান্তশিষ্ট, জড়, কিংবা বাচাল, অগভীর, উৎসাহশূন্য, ইচ্ছাশক্তি-শূন্য, রসবোধশূন্য ; তার কৃতজ্ঞতা নেই, দয়ামায়া নেই ; সে বিচিত্র নীতিবোধের দাস, সত্য-

৮ ইন্ডিয়া, ৬ ডিসেম্বর, ১৯০৭।

দর্শন বা সত্য-কথনের অসীম অসামর্থ্যে পূর্ণ পদার্থ।" বাঙালীদের হীনচতুরতা সম্বন্ধে মেকলের মধুবচনের উল্লেখ ইনি করেছিলেন : "লম্বা প্রতিশ্রুতি, পিচ্ছিল সাফাই, যথাস্থানে মিথ্যার বুনন, ছল-চাতুরী, জাল-জুয়াচুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য—এই সকলই নিম্নবঙ্গের লোকজনের আক্রমণ বা আত্মরক্ষার অস্ত্র।" এর উপরে ছিল বাঙালীর কাপুরুষতা সম্বন্ধে মেকলের ঘৃণাপূর্ণ উক্তি—যার প্রতিধ্বনি পরবর্তী ইংরাজ লেখকেরা দীর্ঘদিন ধরে করে গেছেন।

ডেইলি নিউজের ন্যায়পর লেখক বাঙালীর সম্বন্ধে ইংরাজমহলে প্রচলিত ঐসকল ধারণার পরিবর্তনে আগ্রহী হয়ে বলেছিলেন—কেবল বাজার, আদালত বা মার্চেন্ট অফিসের মানুষদের দেখে গোটা জাতির বিচার করা উচিত নয়। তাছাড়া যে-বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে বাঙালী বহুলাংশে ইংরাজদের শাসননীতি ও শিক্ষানীতির উৎপাদন। সুতরাং ইংরাজরা ঐসব বাঙালীর সৃষ্টিগৌরব অস্বীকার করবেন কিভাবে। উক্ত লেখকের মতে, "বস্তুতঃপক্ষে বাঙালীরা ভারতবর্ষে কোনো-কোনো দিকে সর্বাপেক্ষা মননশীল মানুষ, সর্বাপেক্ষা স্বীকরণ-ক্ষমতাসম্পন্ন।...বৃটিশ ভারত—বাঙালী ছাড়া কল্পনাতীত।"

কিন্তু বৃটিশ ভারতের শাসনযন্ত্রের দক্ষ শ্রমিক হিসাবে বাঙালীরা তৎকালে মনোযোগের বস্তু হয়নি। "বাঙালীরা নবভারতের নির্মাতা। তাই যে-কেউ সাম্প্রতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতে চাইবেন, তাঁকে প্রথমেই আলোকপাত করতে হবে বাঙালীর উপরে।" সেই প্রয়োজনীয় কাজ করার কিছুটা পরে, ডেইলি নিউজের লেখক বাঙালীর নিম্নোক্ত চেহারা তুলে ধরেছিলেন :

"বঙ্গদেশ প্রায়শঃই বিরাট-বিরাট আন্দোলনের জন্মভূমি, বিরাট পুরুষদের বাসভূমি, যদিও কোনো-কোনো দিকে সে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত থেকে পেছিয়ে আছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসের একটি অধ্যায় এখনো রচিত হয়নি যার মধ্যে লেখা থাকবে—ভারতীয় জাতির জন্য ভারতীয়রা কী করেছে। [এর তাৎপর্য, সেকালের সমস্ত লেখারই লক্ষ্য ছিল এই দেখানো—ভারতীয় জাতির জন্য সাহেবগণ কী করেছেন] আর সেই ইতিহাসের সিংহভাগ বাঙালীরাই অধিকার করে নেবে। যেখানে ঘটনা এই, সেখানে ভারতস্থ ইংরাজদের বদ্ধমূল ধারণা সত্যই বিচিত্র যে, বাঙালীরা নৈরাশ্যজনকভাবে অধঃপতিত। সদ্য-শেষ শতাব্দী থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে দেওয়া যাবে। রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে অতিসাহসী ধর্মসংস্কারকের নমুনা পেয়েছি। বিদ্যাসাগরে পেয়েছি প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষাবিৎ। আটলান্টিকের উভয় দিকেই বাগ্মিতার জন্য বিখ্যাত বিবেকানন্দের মধ্যে দেখা গেছে নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বিগ্রহকে। সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার সাহিত্য-ঐশ্বর্য যেমন উদ্ঘাটন করেছেন, তেমনি ডাঃ পি সি রায় ও ডাঃ জে সি বসুর অনন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা ইউরোপের প্রতিটি গবেষণাগারে উচ্চ প্রশংসিত। এদেশের জনজীবনের উপর ছাপ রেখে গেছেন এরকম বাঙালীর দীর্ঘ নাম-তালিকা মিলবে—আর সে তালিকার শেষ নেই।"[১]

---

১ *The Despised Bengali : Some Facts about A 'Degenerate' Race. Daily News*, Dec. 13. 1907. Quoted in *India*, Dec, 20, 1907.

॥ ৩ ॥ আন্দোলন দমনে সরকারী চেষ্টা

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র বয়কট—আবেদন-নীতি থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পদক্ষেপ। বয়কটেরই বিস্তারিত রূপ বিপিন পাল ও অরবিন্দের পরি-কল্পিত 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ', যাতে সর্বপ্রকার সরকারী সংস্রব ত্যাগের আহ্বান ছিল। ঐ তত্ত্ব উত্থাপিত হবার আগেই নিবেদিতা ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছিলেন—সরকারী চাকরি ছাড়ো, ওর মতো চরিত্র-নাশক বস্তু আর নেই। [আগেই উল্লিখিত]।

বাঙালী অচিরে বয়কটের ফললাভ করল। ছাত্ররা যেহেতু আন্দোলনের প্রাণশক্তি, তাই তাতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর সার্কুলার জারি করলেন (১০ অক্টোবর) তৎকালীন বাংলার 'অফিসিয়েটিং চীফ সেক্রেটারি' আর ডবলিউ কার্লাইল। কুখ্যাত এই কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে ২৪ অক্টোবর আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে কলকাতার এক সভায় স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব নেওয়া হল। কার্লাইল সার্কুলারের অনুরূপ সার্কুলার পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে জারি করলেন সেখানকার চীফ সেক্রেটারি পি সি লায়ন। এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নানাভাবে নির্যাতিত হলেন ছাত্র ও শিক্ষকগণ। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ হল—যা অগ্রাহ্য করে বরিশাল কনফারেন্সের সময়ে পুলিশের হাতে প্রচণ্ড মার খেলেন কিশোর চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

আসল সংঘর্ষ অন্যক্ষেত্রে। বিদেশী দ্রব্য বয়কটের চেষ্টা কিছুটা সফল হল, আর তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, বৃটিশ ব্যবসায়ীরা, যাদের একাংশ ইতিপূর্বে ঐ ব্যবসায়িক স্বার্থেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের শক্তির রূপ দেখে সরকারও সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে ধ্বংসের জন্য শক্তিনিয়োগ করল। অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে যেহেতু বয়কট সর্বাধিক সফল হয়েছিল ('পুণো বিশাল বরিশাল'), তাই সেখানে অত্যাচারের মার হল কঠিনতম, অন্য জেলাগুলিও অব্যাহতি পায়নি। পূর্ববঙ্গের লেফটন্যান্ট গভর্নর ফুলার পুলিশকর্তার ভূমিকা নিয়ে বরিশালের উপর লেলিয়ে দিলেন বর্বর গুর্খা সৈন্য। অকথ্য উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হলেন বয়কট সমর্থকরা—বিশেষতঃ ছাত্রগণ। সৈন্য-দলের অত্যাচার অন্যত্রও হল।

কিন্তু কেবল অত্যাচারে যে আন্দোলনকে পুরো দমন করা যায় না, তা বুঝবার মতো বুদ্ধি বৃটিশ শাসকদের ছিল। দুর্বল করতে হয়—ভিতরে ভেদসৃষ্টি ক'রে। তাই শাসকরা সুপরিচিত ভেদনীতি প্রয়োগ করলেন, আংশিক সফলও হলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে কার্জন জয় করতে পারলেন—পূর্ববঙ্গ নামক নবগঠিত প্রদেশটি হিন্দু-আধিপত্য থেকে মুসলমানদের অব্যাহতি দেবে এই সাম্প্রদায়িক যুক্তিতে যেমন, তেমনি ১৪ লক্ষ টাকা নিতান্ত অল্প সুদে ধার দেওয়ার অর্থনৈতিক যুক্তিতেও বটে। সলিমুল্লা ১৪ লক্ষ টাকা পেলেন, এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের নরকের ঢাকনা খুলে দেওয়ার নেতৃত্ব করলেন, পূর্ববঙ্গে। সলিমুল্লা ও তাঁর মোল্লারা মুসলিম ধর্মান্ধতায় উস্কানি দিতে আরও সফল হলেন এইজন্য যে, হিন্দু জমিদারদের দ্বারা পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রজারা অনেক সময়ই উৎপীড়িত হয়েছে, যদিচ একই অন্ধতার কারণে মুসলমান কৃষকেরা দেখতে পায়নি—

সলিমুল্লারা একইপ্রকার উৎপীড়ক সামন্ত। কুমিল্লা ও জামালপুরের দাঙ্গায় হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে দারুণ উৎপীড়িত হল, পূর্ববঙ্গের সরকারী শাসন পরিষ্কারভাবে অত্যাচারী গুন্ডাদের প্রশ্রয় দিল, কারণ ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গের লেফটান্যান্ট গভর্নর ফুলারের হিসেবী কামবাসনায় মুসলমানেরা সুয়োরাণী এবং হিন্দুরা দুয়োরাণী। কালো ছায়া নেমে এল হিন্দু-মুসলমান-মিলিত জাতীয়তার উপরে। ১৯০৬ ডিসেম্বরে মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি দাঁড়াল : বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যেমন আঘাত করতে পেরেছিল, তেমনি সে আঘাত ফিরিয়েও দিতে সমর্থ হল কূটবুদ্ধিযুক্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্যশাসন।

॥ ৪ ॥ নিবেদিতার পত্রে স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গ

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বে নিবেদিতা মিসেস বুলকে ১৭ অগস্ট, ১৯০৫, লিখেছিলেন : "এখানকার বিরাট স্বদেশী আন্দোলনের কথা কি তোমাকে বলেছি—সেইসঙ্গে বিলেতী দ্রব্য বয়কটের সহসা সংকল্প?" পুনশ্চ ১৩ সেপ্টেম্বর লিখলেন :

"এখন সারা ভারত যেন জেগে উঠছে। কার্জনী দুঃস্বপ্নের আকারটা সরে গেছে। তুমি অবশ্যই বয়কটের কথা শুনেছ। কেউ জানে না কোথায় এর সমাপ্তি, কারণ, জনগণ নিজেদের শক্তি অনুভব করতে শুরু করেছে। কার্জন বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে দিয়েছে।"

জাতীয় উত্থান যাতে কেবল উন্মাদনার স্রোতে কূলহারা না হয়, সে-বিষয়ে, নিবেদিতা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। বন্ধু গোখলে কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করলে নিবেদিতা তাঁকে কংগ্রেসের দ্বারা একটি নূতন সংগঠন তৈরী করতে প্ররোচিত করেছিলেন—সে সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন। এক্ষেত্রে নিবেদিতার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। গোখলেকে তিনি ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখেন :

"তুমি কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করেছ জেনে বাস্তবিক আনন্দিত। মনে হয়, এই বৎসর থেকে সাংগঠনিক নীতি নূতন সম্ভাবনার রূপ গ্রহণ করবে। ধরা যাক, ভারতের সকল গ্রাজুয়েটকে একটি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হল, কিংবা কলকাতার সকল হিন্দু ও মুসলমান কেরানীকে নিয়ে একই কাজ করা হল। শেষোক্ত সংগঠনের সামনে মালিকদের কোনো সংগঠনই দাঁড়াতে পারবে না। শুনেছ কি, এখানকার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বার্ন অ্যান্ড কোং-এর ৩০০ জন কেরানী কিভাবে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে?

"আমাদের মতো পর্যবেক্ষকদের কাছে সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনা হল—স্বদেশী প্রত্যঙ্গের প্রতি ভারতীয় জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য, যারা এই ধরনের ব্যাপারে একেবারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত এবং অভিজ্ঞতাহীন। শোনা গেছে, এমনকি মাদ্রাজেও এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানটি কেরানী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। উত্থানে বা পতনে তারা ঐক্যবদ্ধ। এরই নাম সত্যকার একতা।"

বয়কটের সাফল্যে উৎসাহিত নিবেদিতা আরও লিখলেন :

"বয়কট এমনকি নারী, পুরোহিতদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে—আত্মত্যাগের পরিমাণ

সত্যই অসাধারণ। অজানা সব মানুষ, সামাজিক চেতনার প্রবল প্রভাবের অধীন হয়ে যে-সব বিচিত্র অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ করে যাচ্ছে, আমার সর্বদাই মনে হয়, তার দ্বারাই কোনো জাতির শক্তিসম্ভাবনার যথার্থ পরিমাপ করা সম্ভবপর।। রাশিয়ার মানুষদের মধ্যে প্রকাশিত এই শক্তিই নেপোলিয়ানের মস্কো অভিযানকে বিপর্যস্ত করেছিল। ফরাসিদের মধ্যে এই শক্তির প্রকাশেই নেপোলিয়ানের সৈনাবাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। এর দ্বারাই স্বাধীনতা পেয়েছিল আমেরিকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কয়েক মাস আগেও এই শক্তি আমাদের মধ্যে ছিল না, আর আজ সর্বদিকেই তা প্রকাশিত। এখানেই আশার ভিত্তি, যা অন্য সকল কিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় খরিদ্দাররা বিদেশী দ্রব্য কিনতে চাইলে ছোট-ছোট দোকানদার পর্যন্ত আপত্তি জানাচ্ছে।

"আমরা ভেবেছিলাম, পূর্বে প্রদত্ত শিক্ষাগুলি বধির কর্ণে পড়েছিল।' এখন দেখছি, সে সকলই উঠে আসছে। দেখছি, তারা মরেনি, কেবল সুপ্ত ছিল। অত্যন্ত অপমান-গুলিকে নতুন চোখে দেখা হচ্ছে। তার চেহারা দেখলে অবাক হয়ে যাবে।"

নিবেদিতা উল্লাসে লিখলেন : "য়ুম, আমি দুঃখিত যে, [অ্যালবার্টাকে] চিঠির উত্তর লিখে উঠতে পারলুম না। আমাদের সেরা একটি মানুষ এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে জাতীয়তার কথা বলতে অনেকখানি সময় গেল।...তুমি খুব খুশি হবে যদি শোনো, কিভাবে সমগ্র জাতি জাতীয়তাকে বরণ করে নিয়েছে।"

স্বদেশী আন্দোলন কয়েক বৎসর চলার পরে নিবেদিতা এই আন্দোলনের কাহিনী কিভাবে লিখতে হবে তার সংকেত র‍্যাটক্লিফকে দিয়েছিলেন ২৭ ডিসেম্বর ১৯০৭ চিঠিতে :

"আমার মত তুমি জানো : [কার্জনের] এডুকেশন বিল মূলে কাজটা আরম্ভ করেছে —তাঁর কনভোকেশন-বক্তৃতা চেতনা জাগিয়েছে—পার্টিশন যুদ্ধঘোষণা করিয়েছে—এবং পার্টিশন বলবৎ করার ক্ষেত্রে কার্জনের নিপুণ কৌশল পরিষ্কার করে দিয়েছে যুদ্ধের পথ।"

স্বদেশী আন্দোলনের সামাজিক ও আত্মিক দিক সম্বন্ধে কিভাবে লেখা উচিত তা একই ব্যক্তিকে অনবদ্যভাবে জানিয়েছেন ১০ অগাস্ট, ১৯১০ :

"অবশ্যই তুমি জাতীয়তার বিরাট আদর্শ সম্বন্ধে লিখবে। জনগণের মধ্যে এই সমষ্টি-গত দায়িত্ববোধ এসেছে : অগ্রসর না-হওরা মানে পশ্চাদঅপসরণ ; আমাদের দেশ, ধর্ম, সভ্যতার মূল্য জগৎসংসারে আছে, এবং জগতের প্রতি আমাদের কর্তব্যও আছে ; ইতিহাস সর্বদাই সজীব ও গতিশীল ; সর্বোপরি, ভারত অখণ্ড, আর ভারতকে নিজ ঐক্য উপলব্ধি করতে হবে।"

নিবেদিতাকে শেষপর্যন্ত কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছিল। প্রচণ্ড আশাবাদী তিনি, স্বদেশী আন্দোলনের প্রাপ্তির হিসেব নিয়ে আশ্বাস বোধ করতে চেয়েছেন—কিন্তু তাঁর বড় ভালবাসার ভারতীর মানুষগুলির যন্ত্রণা যেন তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০ লিখেছিলেন :

"এই মুহূর্তে কিন্তু অবস্থা ক্রমেই মন্দ থেকে মন্দতর। জনগণের শিক্ষার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। সাংবাদিকতা বিচূর্ণ। স্বদেশী তচনচ। দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। অবস্থা খারাপ—ক্রমেই অধিক খারাপ। যারা সাহসী তারা এখনও বলছে, অবস্থা আগের থেকে

ভালই—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারার নামই তো জীবন—দশ বছর আগে না-জীবন, না-মৃত্যু, কেবল পতন আর মোহনিদ্রা, কিন্তু এখন আর্ট-এর সূচনা হয়েছে, সাহিত্য চলমান, এক ধরনের সাহস ও ঐক্য এসেছে। আমার তো মনে হয়, কেবল অত্যন্ত সাহসীরাই একথা বলতে সমর্থ।...কিন্তু আমার মন-প্রাণ দমে গেছে—অবস্থা যে ভয়ঙ্কর!!! দারিদ্র্য—দেখে যন্ত্রণা হয়—আর তা বাড়ছে। এর মধ্যে সত্যই কি কোনো আশা আছে? আহা, এই লোক-গুলি শিশু। নেকড়ের কাছে মেষ এরা।"

এর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে (১৮.৮.১৯১০) নিবেদিতা লিখেছিলেন :

"জাতীয়তা ও জাতি-নির্মাণের রণধ্বনিতে হিন্দুর মতো মুসলমানও সম্মিলিত। এটা অতীতের পুনরুদ্ধারের আন্দোলন নয়।...আদর্শের ভিতর থেকে নূতন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির এই আন্দোলন—অতীতে নির্মিত কোনো আকারের পুনঃস্থাপনা নয়। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ আর নয়।...ব্যক্তির জন্য এই নবযুগে ক্ষত্রিয়ই আদর্শ।...আমাদের আছে বিশ্বাস—আমাদের আছে সেই দুঃসাহস, পর্বতশিখর থেকে লাফ দিতে যা প্রস্তুত।"

॥ ৫ ॥ তিলকের পত্র-পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গ ; মজঃফরপুরে বোমা-বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধের জন্য তিলকের কঠোর শাস্তি : তিলক-নিবেদিতা

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও প্রবলতা সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোড়িত করেছিল—সমকালীন সকল তথ্যসূত্র থেকেই তা জানা যায়। পূর্ববর্তী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বাংলার অগ্রবর্তিতা ছিল। তার দ্বারা ভারতবর্ষের অন্যত্র বাঙালীরা সাধারণ সম্ভ্রমের পাত্র ছিল। কিন্তু ঐসকল আন্দোলন একই সঙ্গে বাগ্মিতা ও প্রার্থনাকাতরতায় পূর্ণ ছিল বলে যাকে বলা যায় সংগ্রামী চেতনা, তা সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ সেই সংগ্রামের ডাক অল্পদিনের মধ্যে এসে গিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। বঙ্গবিভাগ রূঢ় আঘাত করে বাঙালীকে জাগিয়ে দিল ঐ সংগ্রামের ডাকে সাড়া দেবার জন্য। ভারতবর্ষ জানল, বুদ্ধিমান বাচাল বাঙালী, ঐকাবদ্ধ প্রতিবাদী বাঙালীও হতে পারে। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রসারিত মুখে এল বোমার গর্জন। মুহূর্তে বাঙালী সম্বন্ধে গোটা ভারতবর্ষের ধারণাজগতে যেন বিপ্লব ঘটে গেল। তাহলে বাঙালী কাপুরুষ নয়! তাহলে বাঙালী কেবল কথা বলে না কাজও করে—যা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে দুর্দান্ত দুঃসাহসী বলে কথিত ইংরাজদের মনেও!! সমকালের ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় বাঙালী সম্বন্ধে এইপ্রকার পরিবর্তিত মনোভাবের প্রচুর পরিচয় লক্ষ্য করেছি।

স্বদেশী আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র দেবার ব্যাপারে বঙ্গেতর দুটি প্রদেশ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল—পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র। পঞ্জাবে লাজপত রায় প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 'পঞ্জাবী' পত্রিকা এইকালে যথেষ্ট অনল উদ্‌গিরণ করেছে। পঞ্জাবে প্রবর্তিত ঐকালের একটি দুষ্ট শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আন্দোলন সংগঠনের সহায়ক হয়। সরকার সেখানে ভূমিরাজস্ব বিশেষ রকম বৃদ্ধি করে, এবং জলকর এমন পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় যা কণ্ঠপেষণ করে রসনিষ্কাশন করা ছাড়া কিছু নয়। তার ফলে পঞ্জাবে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ঘটে—এবং সেই বিক্ষোভকে জাতীয় আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত করতে উদ্যোগী হন লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ—এক্ষেত্রে তাঁরা সফলও হন। শাসকদের বুদ্ধিমান অংশ 'ক্যানাল-কর' বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবলম্বিত নির্বোধ ঐ ব্যবস্থার অসমীচীনতা উপলব্ধি করে তা বরবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু একইসঙ্গে প্রেসূ্টিজের

ঠাট রাখতে লাজপত রায় ও অজিত সিং-কে নির্বাসনেও পাঠায়—বাংলার সঙ্গে তাঁদের যোগসাজসের ছুতো করে। [প্রসঙ্গটি নিবেদিতা আলোচনা করেছেন, পরে দেখব]।

প্রধানতঃ তিলকের প্রভাবেই পার্টিশন নামক বাংলার স্থানীয় ব্যাপার মহারাষ্ট্রে সমর্থক-আন্দোলনের কারণ হয়। তিলকের জীবনীকার প্রধান ও ভগবত লিখেছেন : "অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তিলক বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলার আন্দোলন জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় খুলে দিচ্ছে। তিনি জানতেন, পার্টিশন কেবল বাংলার কাছেই চ্যালেঞ্জ নয়, অবশিষ্ট ভারতের কাছেও চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে মাথা নামিয়ে তাকে মেনে নিলে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর মৃত্যুঘণ্টা বাজবে। বাংলার অসন্তোষের মধ্যে তিনি নবতর রাজনৈতিক সংঘাতের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন।" [পৃ. ১৮০]। এইজন্যই তিলক বাংলার প্রশ্নটিকে কংগ্রেসে বৃহৎ আকারে উত্থাপন করেন এবং অন্যান্য চরমপন্থী নেতার সহযোগিতায় বয়কট-প্রস্তাবকে রণধ্বনি করে তুলতে উদ্যোগী হন।

তিলকের মরাঠি পত্রিকা কেশরীতে এইসূত্রে তিলক কোন্ ধরনের কথা লিখেছিলেন তার কিছু নমুনা তিলকের উল্লিখিত জীবনীকারদ্বয় উপস্থিত করেছেন। তিলকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইংরাজি সাপ্তাহিক 'মরাঠা' সন্ধান করে আমরা প্রচুর প্রাসঙ্গিক রচনা সংগ্রহ করেছি। এইসূত্রে সেইসকল স্থান থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠকদের গোচর করব—বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া দেখাতে। এই লেখাগুলির মধ্যে শিবাজি উৎসবের বিষয়ে অনেক কথাই আছে—মহারাষ্ট্রের শিবাজি ও শিবাজি উৎসব বাংলায় কি-প্রকার উদ্দীপনার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ। কলকাতায় শিবাজি উৎসবে তিলক ও খার্পাদের যোগদান, তিলকের বিপুল সংবর্ধনা, অনুশীলন সমিতি, ভবানীপুর সন্তান সম্প্রদায়, বন্দেমাতরম সম্প্রদায়, জাতীয় ব্যায়াম বিদ্যালয়, অ্যান্টি পার্টিশন পার্টি কর্তৃক সেখানে সামরিকপ্রথায় অভিনন্দন জ্ঞাপন, বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক শিবাজির অসাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, শিবাজি-উৎসবের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আপত্তি নিরাকরণের চেষ্টা, এই উৎসবের মধ্য দিয়ে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মিলন ইত্যাদি ইত্যাদি। [মরাঠা ২১মে, ১৯০৫ ; ১০ জুন, ১৯০৬]। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতা টাউন হলে বিশাল সভা হয়, যাতে কেবল ছাত্র বা সাধারণ মানুষ নয়, অভিজাত ব্যক্তিরাও শাসকদের চোখ রাঙানি অগ্রাহ্য করে যোগদান করেছিল। ঐসভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রাম করবে। এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কতখানি ফলপ্রদ হবে সে-বিষয়ে মরাঠা কাগজে সন্দেহও করা হয়। [ঐ, ১৩ অগস্ট, ১৯০৫]। গৃহীত বয়কট প্রস্তাবের ব্যবহারিক ও নৈতিক ঔচিত্য নিয়েও পত্রিকাটি দীর্ঘ আলোচনা করে। চীন—আমেরিকার পণ্যকে, আমেরিকা—বৃটিশ পণ্যকে বয়কট করেছে—এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়, বয়কটের দ্বারাই ইউরোপকে শায়েস্তা করা সম্ভব ; ভারত থেকে প্রবাহিত অর্থস্রোত বন্ধ হলেই তার সংবিৎ ফিরবে। শাসকরা কেন পার্টিশন করেছে তার বিশ্লেষণে বলা হয় : (ক) কলকাতার রাজনৈতিক প্রাধান্য দূর করা ; (খ) বাঙালী জাতির মারাত্মক ঐক্য নাশ করা ; (গ) হিন্দু ও মুসলমানে ভেদ আনা ; (ঘ) হাইকোর্টের মর্যাদা সংকুচিত করা ; (ঙ) শিক্ষা সংকুচিত করা। বাংলার প্রতি সারা ভারতের সহানুভূতি রয়েছে, একথা বলার পরে প্রশ্ন করা হয়, বাংলার বয়কট কি সারা ভারতে ছড়াবে? স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়—পূর্বে গোটা ভারতবর্ষকে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত করেছিল যে-সিপাহী যুদ্ধ, তার সূত্রপাত বাংলা থেকেই। [ঐ, ২০ অগস্ট, ১৯০৫]। পার্টিশন কার্যকর হবার দিন ১৬ অক্টোবর—'জাতীয় দিবস' রূপে ঘোষিত হয়। সেই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয় : একটি সর্বভারতীয় দিবসের প্রয়োজন ছিল, কার্জন সেটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই দিনটি 'ভারত দিবস' হয়ে দাঁড়াবে। বাংলার ব্যাপার কেবল বাংলারই নয় ইত্যাদি। জাতীয়তা-তত্ত্ব ব্যাখ্যার এবং জাতীয় দিবস সম্বন্ধে অধিকতর ভাবাবেগ

প্রকাশের পরে, বলা হয়, জাতির ঘুমন্ত ঐক্যবোধ এখন আবার জাগরণমুখী। [ঐ, ১৫ অক্টোবর, ১৯০৫]। জাতীয় দিবসে রাখীবন্ধন [২২ অক্টোবর, ১৯০৫], ফেডারেশন-হলের ভিত্তিস্থাপন প্রসঙ্গ এসেছিল। [২২ অক্টোবর, ১৯০৫]। শেষোক্ত সম্পাদকীয়তে স্বদেশী আন্দোলনের আনন্দ-দায়ক বিস্তারের সংবাদ ছিল। বলা হয়েছিল—আমরাও বয়কট কাকে বলে জানি। ইংলণ্ড কিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পসমৃদ্ধ ভারতের বস্ত্র বয়কট করেছিল স্বদেশীয় শিল্পের স্বার্থে, তার উল্লেখ এই রচনায় ছিল। বাংলায় বয়কটের সাফল্য বিষয়ে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার এই স্বীকৃতি পত্রিকাটি উদ্ধৃত করেছিল :

"We do not seel to minimise the reality of the boycott. In magnitude *and cohesion it has reached dimensions which we had not anticipated* and which we had hardly considered possible a few weeks ago. It cannot be *denied that it affords distinct evidence of some amount of* genuine though mistaken feeling."

লাজপত রায় "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম" বিষয়ে হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রিকায় যা লেখেন তার শেষাংশ পরবর্তী এক সংখ্যায় উৎকলিত হয়। স্বাধীনতার জন্য ত্যাগস্বীকারে লাজপত রায় আহ্বান করেছিলেন, এক্ষেত্রে পোলিটিক্যাল সন্ন্যাসী চেয়েছিলেন। বক্তা ও লেখক সৃষ্টির জন্য বিখ্যাত বাংলাদেশ থেকে যেন আত্মোৎসর্গের মানুষ বেরিয়ে আসেন। প্রয়োজনে লেখকরা সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করুন। লাজপত আরও বলেছিলেন : "কিভাবে আন্দোলন করতে হয় তা বাংলা পথ দেখিয়েছে পার্টিশন-বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা। বাংলা যা করেছে, ভারতের প্রতিটি প্রদেশের তা করা উচিত—অসন্তোষ জ্ঞাপনের জন্য।...সারা ভারতবর্ষ বাংলার বয়কটকে গ্রহণ করুক।" [ঐ, ২৬ নভেম্বর, ১৯০৫]। ইংরেজমহল থেকে বন্দেমতরম্ ধ্বনি ও সংগীতের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি উঠেছিল ; ডাঃ গ্রীয়ার্সন লণ্ডন টাইমসে বলেছিলেন, এর মধ্যে ধ্বংসের দেবীর আবাহন করা হয়েছে—সেইসকল আপত্তির উপযুক্ত খণ্ডন করেন ভি জি আপ্তে। তিনি বলেন, "বাংলার এই দেশাত্মবোধক গানটি আবালবৃদ্ধদের মুখেমুখে। ডাঃ গ্রীয়ার্সন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের কাছ থেকে ভূরিভূরি সমালোচনা এই সংগীতটি লাভ করছে—সন্দেহ নেই সেই অগ্নিপরীক্ষা সে উত্তীর্ণ হতে পারবে।" [২৮ অক্টোবর, ১৯০৬]। যুগান্তর মামলায় অভিযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবৃতিকে 'অভূতপূর্ব' বলে চিহ্নিত ক'রে, তার সঙ্গে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আইরিশ জাতীয়তা-বাদীদের মহান উক্তিসমূহের তুলনা করা হয়। বলা হয়, অসামান্য পৌরুষের অধিকারী ভূপেন্দ্রনাথ অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। [২৮ জুলাই, ১৯০৭]। ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের পরে এই পত্রিকা অন্য একটি পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করে, যার মধ্যে ছিল ছত্রে-ছত্রে চাপা ব্যঙ্গ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। [৪ অগস্ট, ১৯০৭]। ১৯০৮ জানুয়ারি মাসে অরবিন্দের পুণা-ভ্রমণ ও বক্তৃতার দীর্ঘ বিবরণ বেরোয় এই পত্রিকায়। অরবিন্দ বলেন, বাংলার নবভাবনা প্রবেশ করেছে, পূর্বে যা কদাপি সম্ভবপর হয়নি. বাঙালীরা এখন তারই সম্পাদনে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ। জনগণ যা যথার্থই করতে ইচ্ছুক তা সে করতে পারেই। কংগ্রেসের পূর্বতন নীতি বাংলায় ব্যর্থ ; তার আবেদন-নীতি কেবল নিরর্থক, তাই নয়, ক্ষতিকর। বাঙালীকে খর্ব করতে কার্জন সচেষ্ট। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল, ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পার্টিশন—তারই ক্রমিক চেষ্টা। পার্টিশনের বিরুদ্ধে 'আবেদন' ব্যর্থ হলে 'স্বদেশী' ও বয়কট গৃহীত হয়েছে। প্রথমে নেতৃবৃন্দ বয়কটকে অসম্ভব বিবেচনা করলেও যখন জনগণ এগিয়ে এল তখন তাকে গ্রহণ করতে হল। অরবিন্দ বললেন :

"The Calcutta leaders, however, first proclaimed it (boycott) as 'im-

possible'..But people did not listen to this advice..The current of public opinion grew so strong that the leaders had ultimately to give their consent to the new movement...People..refused to be hypnotised and consider themselves, cowards. It was Swami Vivekananda who preached this doctrine to his countrymen. This was believed by the new party."

কিভাবে রঙপুরে প্রথমে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, অরবিন্দ তার কথা বলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবে অনেকেই আপত্তি জানান, কিন্তু টাকা এসে যায়, এবং তা স্থাপিত হয়। কাপুরুষ বাঙালীর চরিত্র বদলের কথা অরবিন্দ তোলেন : "বাঙালীদের সম্বন্ধে ভাবা হত, তারা খাঁটি ও নিষ্ঠাযুক্ত কাজ করতে সমর্থ নয়। তারা কোনোপ্রকার আত্মত্যাগ করতে পারে না। বাঙালীদের কাপুরুষ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই ভাবটি ইংরাজি সাহিত্যের অংশীভূত হয়ে গেছে, তাদের বিদ্যালয়গুলিতে তার শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে বাঙালীরাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল তারা অবশ্যই কাপুরুষ, তাদের পিতৃপুরুষরা কাপুরুষ, তাদের পুত্র-পৌত্ররাও তাই হবে। কিন্তু রাজনৈতিক নাস্তিকতায় আক্রান্ত নন এমন মানুষও আছেন। তাঁরা জাতির শক্তিতে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁদের স্থির প্রত্যয়—কাপুরুষের জাতি বীরের জাতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ন্যাশন্যালিস্ট ও মডারেটের মধ্যে এইখানেই তফাত। ন্যাশনালিস্টরা দেশের মানুষের শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী, আর মডারেটদের মনে সে বিশ্বাসের চিহ্ন নেই। 'নব ভাব' বাঙালী তরুণদের এমন শক্তিশালী করেছে যাতে তারা পুলিশের আক্রমণ, সরকারের আক্রোশের মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছে, জেলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছে। 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি যুবক তো অভিযোগ করেই বলেছে যুগান্তরে যথেষ্ট পরিমাণে উগ্র রচনা বেরুচ্ছে না।" অরবিন্দ আরও বলেছিলেন, "সমগ্র ভারতের উদ্দেশ্যে বাংলার বাণী—আমরা যা করেছি তোমরা তাই করো।" তিলক ঐ সভায় বলেন : "এখন পথ হল—অনুকূল সময়ের কল্পনা করা বা তার জন্য প্রতীক্ষা করা নয়—তাকে সৃষ্টি করা। সরকারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে—অথচ মধ্যপন্থিতার শিকল আমাদের পিছনে টানছে। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আত্মশক্তিতে, ঈশ্বরে এবং জনগণের ভবিষ্যতে।" [ঐ, ১১ জানুয়ারি, ১৯০৮]।

বহু বৎসর ধরে ইংরাজরা বাঙালীর সর্বাঙ্গে কাপুরুষতার কালি বুলিয়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনের ঘর্ষণে তার অনেকটাই উঠে যায়। মজঃফরপুরের বোমা-কাণ্ড ও পরবর্তী ঘটনাবলীর পরে বাঙালীর গায়ে কালো কালির জায়গায় লাল কালির ছাপ পড়তে থাকে। তার আগেই, ২৪ নভেম্বর, ১৯০৭, মরাঠায়—মেকলে-কথিত ভীরু, মেয়েলি বাঙালীদের বিষয়ে ইংলণ্ডের এক হাড়ে-মজ্জায় সাম্রাজ্যবাদী কাগজ ন্যাশন্যাল রিভিউ থেকে পরিবর্তিত ধারণার সংবাদ উপস্থাপিত হয়েছিল। ন্যাশন্যাল রিভিউ লিখেছিল :

"It never occurred to anybody to question the complete accuracy of Macaulay's comtemptuous opinion of the people of the lower Ganges valley; and when the late Mr. G. W. Steevens said that the Bengali had the 'leg of slave' the Bengalis raved but the onlookers nodded acquiescence. Recent events in Eastern Bengal have shown beyond doubt that the Bengali has—perhaps only of late—developed far more capacity for active offence than he has been credited hitherto. A crowd of Bengalis can now give considerable trouble if they like and their agile intellects suggest plenty of appropriate methods."

ন্যাশন্যাল রিভিউ বলেছিল, চন্দননগর ও অন্যান্য স্থান থেকে অস্ত্র খরিদের উৎসাহও বিশেষ লক্ষণীয়। মরাঠা, ন্যাশন্যাল রিভিউ-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরে বলে, এক বছর আগে লন্ডন স্পেকটেটর যখন বাঙালীদের বিরুদ্ধে ঘৃণাসূচক উক্তি করেছিল তখন আমরা বলেছিলুম, বাঙালীদের পিছনে সামরিকতার ঐতিহ্য না থাকতে পারে, কিন্তু তারা বর্তমানের কর্মের দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য ঐ ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যেতে পারে। বাংলাদেশে গত ১২ মাসের ঘটনাবলী আমাদের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করেছে। [২৪ নভেম্বর, ১৯০৭]।

মরাঠার ১৭ মে, ১৯০৮, তারিখের সম্পাদকীয়তে (ইতিমধ্যে ৩০ এপ্রিল, মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে) বিস্তারিতভাবে বলা হয় : "যে-বাঙালীকে আগে ঘৃণা করা হত, সে বাঙালীকে এখন ভয় করা হয়।" বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ কাগজের কলকাতা-সংবাদদাতা পায়োনীয়ার প্রমুখ সাহেবী কাগজ থেকে তথ্যসংগ্রহ করে লিখে পাঠিয়েছিলেন কিভাবে সাহেবরা বাঙালীদের ভয়ে জুজু হয়ে আছে। চিত্তাকর্ষক রচনাটি সংক্ষেপে এই : "দি ইন্ডিয়ান প্ল্যানটারস্ গেজেট বলেছে, কলকাতার উত্তরাঞ্চলে ইউরোপীয়দের পক্ষে ট্রাম-গাড়িতে যাতায়াত করা এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এশিয়ান স্পোর্টিং পেপারের মতে, বাঙালীরা এখন এমন মারাত্মক হয়ে উঠেছে যে, তাদের সকলকে গুলি করে মারা ছাড়া উপায় নেই। লেফট্ন্যান্ট গভর্নরের ট্রেনের উপর পুলিশকে কড়া নজর রাখতে হয়, বিপুল পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরিয়ে তবে তাঁর মোটরকে নিয়ে যেতে হয়—কাদের ভয়ে?—১৪-১৫ বছরের স্কুলের ছোকরাদের ভয়ে—যারা গীতা পড়ে মৃত্যুভয় জয় করেছে! ঐসব নচ্ছার ছেলেগুলো...ইউরোপীয়দের মধ্যে এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে—বাঙালী বড় ভয়ঙ্কর জাতি, কেবলই বোমা ফাটায়। একটি বাঙালী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বাঙালী জাতি সম্বন্ধে তার ধারণা কী? সে উত্তরে বলে : আগে বাঙালীদের না ছিল মর্যাদা, না বিরাটত্ব, জ্যামিতির বিন্দুর থেকে সে তুচ্ছ; কিন্তু সে এখন পৃথিবীতে সমস্ত বৃত্তের কেন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি।...অনেক ইউরোপীয়ই শহরের দেশীয় পল্লীতে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। যদি যেতেই হয়, গাড়িতে দরজা বন্ধ করে যাওয়া-আসা। অনেক বাঙালীই এখন বুক ফুলিয়ে হাঁটে—যেন একটা কেউ-কেটা হয়ে উঠেছে। স্কুল ছেড়ে দিয়ে ছেলেরা মাসল ফোলাচ্ছে! আমি বউবাজারে ট্যাস-পল্লীর একটা গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম; উল্টোদিক দিয়ে আসছিল একদল ট্যাস; হঠাৎ তারা একটা ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল এবং জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে লাগল। আমি কিছুই বুঝলাম না। যখন আমি সেই বাড়িটি পেরিয়ে যাচ্ছি দেখি যে, একটি লোক বেরুচ্ছে কিন্তু বাকি লোক তাকে বলছে, এখন যেও না, বাঙালী লোকটা আগে চলে যাক। কাণ্ড! আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে এক বেচারা বাঙালী হাতে নারিকেল নিয়ে যাচ্ছে—তাই দেখে সাতটি সাহেবের একযোগে দ্রুত পশ্চাদ্‌অপসরণ! নারিকেলটি থেকে ছোবড়া ঝুলছিল—ওঁরা হয়ত ভাবলেন, ওটা বোমার পলতে। এমন-কি বাঙালী নারীরাও মেকলের কথা অপ্রমাণ করতে অগ্রসর। কলকাতায় ত্রাসসঞ্চার হলে কিছু শান্তিপ্রিয় মানুষ ভেবেছিলেন, তাঁদের বাড়ির মেয়েদের কিছু সময়ের জন্য স্থানান্তরিত করবেন। সে প্রস্তাবে মেয়েরা রেগে অস্থির—না, আমরা মৃত্যুজয়ী করি না। রাজপুত নারীদের মতোই আমরা তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে মরব।"

১৭ মে, ১৯০৮ তারিখের মরাঠা বলে : বাঙালীরা বোমা বানিয়ে, রিভলভার ছুঁড়ে মেকলে-নিন্দার স্খালন করেছে। মেকলের বাঙালী-দূষণকে, (যা মেকলে হেস্টিংস-বিষয়ক রচনায় উদ্‌গিরণ করেছিলেন) মরাঠা পত্রিকা কোনো জাতির বিরুদ্ধে কৃত জঘন্যতম অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু এখন ভাগ্যের দান উল্টে গেছে। "ধৃত বাঙালী যুবকদের স্বীকারোক্তি থেকে কোনো সন্দেহই থাকে না, (তাদের জাতির কুৎসাকারীদের ধন্যবাদ!), মেয়েলি বাঙালী এখন পুরুষালি হয়েছে,

যোগ্যস্বভাব অর্জন করেছে, পরবর্তী প্রজন্মে যার মাত্রা বাড়বে। কুৎসা আর সত্য নেই। মেকলের রচনায় ঐ অংশটিকে টেনে বার করে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়াই উচিত। রাজনৈতিক সংস্কারক হিসাবে বাঙালী বোমারুরা বিশেষভাবে ভ্রান্ত [কথাটা বলতেই হয় আইনের মুখ চেয়ে], কিন্তু তারা জাতি সম্বন্ধীয় অতি দুষ্ট এক অপবাদকে সমূলে উৎপাটন করার মতো সংকাজ করেছে।"

বাংলার চরমপন্থা—প্রথমে বয়কটে, পরে সশস্ত্র আক্রমণে যার প্রখর প্রকাশ—তার সম্বন্ধে মরাঠা প্রকারান্তরে সমর্থন জানিয়েছিল রাশিয়ার বৈপ্লবিক চেষ্টার উজ্জ্বল বিবরণ প্রকাশ করে। রাশিয়ার ১৯০৫-০৬ সালের বৈপ্লবিক প্রয়াস সম্বন্ধে মরাঠা যেসব সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক মন্তব্য প্রকাশ করেছে তা বিস্ময়কর। ঐকালে ভারতীয় সংবাদপত্রে এই ধরনের মুক্ত সমর্থন যথেষ্ট দেখা যায়নি।

৩ ডিসেম্বর ১৯০৫, মরাঠা লেখে : রাশিয়ার বিপ্লব এখনো থামেনি। জারের ঘোষণায় জনগণ সন্তুষ্ট নয়। আর্মি ও নেভী কেবল জনগণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়, বস্তুতঃপক্ষে জারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছে। জার রাজতন্ত্রকে ঈশ্বরবিধান বলে প্রচার করে জনগণকে ধাপ্পা দিয়ে গেছেন দীর্ঘদিন। "কিন্তু সেখানকার বর্তমান অবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে, কোনো আমলাতন্ত্রই দীর্ঘকাল জনগণের উপর চেপে বসে শাসন করতে পারে না।...এর থেকে ভারতের আমলাতন্ত্র যেন শিক্ষা নেয়। রাশিয়ার সরকার নিপীড়ন-নীতি নিলেও সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ স্তব্ধ। এক্ষেত্রে ফুলারপন্থী ভারতীয় প্রশাসকরা যদি ভাবেন, জনসাধারণের উপরে গুর্খা লেলিয়ে দিয়ে বৃটিশ-দ্রব্য চালানো সম্ভব হবে তাহলে অলস সে কল্পনা।...ও-চেষ্টা রাশিয়ার ব্যর্থ হয়েছে, ভারতে একই প্রকারের পীড়ন-নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য।...বর্তমান ব্যবস্থাকে যদি ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বজায় রাখা হয় তাহলে কেবল কোমল বাঙালীরাই নয়, কালক্রমে সামরিক গুর্খারাও আমলা-তন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হবে।" মরাঠায় ১০ ডিসেম্বর, ১৯০৫, রাশিয়ার বৈপ্লবিক উত্থান সম্পর্কে সুদীর্ঘ এক সম্পাদকীয় লেখা হয়। বলা হয় : শাসকদের সর্ববিধ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বিপ্লব ছড়াচ্ছে। জারের জীবননাশের চেষ্টা হয়েছিল ; গ্রান্ড ডিউকরা পর্যন্ত অসন্তুষ্ট সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছে। যাঁরা ভেবেছিলেন, জার শাসনতান্ত্রিক সুবিধাদানের প্রস্তাব করে সোস্যালিস্টদের পালের বাতাস কেড়ে নিয়েছেন, তাঁরা ভ্রান্ত। রাশিয়ার পরিস্থিতির জটিলতা বেড়েছে সেখানকার নানা স্বার্থের টানাপোড়েনে—সংঘাতে নিযুক্ত রক্ষণশীল সম্রাট, রাজ-নৈতিক ক্ষমতাভিলাষী নেতৃগণ, অভিজাতবর্গ, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিকে নিহিলিস্টরা জারকে খুন করবার জন্য সর্বদা ব্যগ্র, অন্যদিকে 'হোলি লীগ' নামক ডিটেকটিভ-দল জারকে রক্ষা করার "পবিত্র ব্রতধারী।" মৃত দুরাত্মা প্লেভে ছিলেন এই দলের প্রধান। আবার বহির্মণ্ডলে আছে আর এক ডিটেকটিভ-দল যারা কেবল ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়ে জারকে আতঙ্কিত রাখছে। ফলে জার নিজেই ছায়াকেই ডরাচ্ছেন, ইত্যাদি। জারের আতঙ্কের বিস্তারিত বর্ণনার পরে, গ্রান্ড ডিউক-গণের উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের কথা বলা হয়, সেইসঙ্গে আমলাতন্ত্রের জঘন্য দুর্নীতির কথাও। রাশিয়ার অভিজাত সমাজ একেবারে পচে গেছে। শাসনতন্ত্র টলমলে, ভেঙে পড়ার মুখে। "রাশিয়ার আমলাতন্ত্রে—সর্বোচ্চ মন্ত্রী থেকে দূর প্রাচ্য-প্রদেশের কনিষ্ঠ কেরানী পর্যন্ত সকলে মনে করে—রাষ্ট্র ও জনগণ লুঠ করবার সামগ্রী।" এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবের বাণী রাশিয়ার অন্তর্দেশ ভেদ করে গেছে। সে শিকড় ওপড়ানোর সাধ্য জারের নেই। সেখানে চলেছে সর্বাত্মক বিক্ষোভ। "শিল্প-শ্রমিকরা করছে ধর্মঘট ; সোস্যাল ডিমক্র্যাটরা তাতে উস্কানি দিচ্ছে ; সোস্যাল রিভলিউশনিস্টরা শাসনতান্ত্রিক সংকটে মদত দিচ্ছে ; বিরাট কৃষকশ্রেণী তাদের দীর্ঘ অভিযোগের দূরীকরণের জন্য আন্দোলন করছে ; উদারনৈতিক দেশপ্রেমিকরা সংস্কারকদের ব্যস্ত করছে অধীর হয়ে ; 'তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা' নিঃসহায় ইহুদী ইত্যাদির উপরে প্রাণের সুখে প্রতিশোধ নিচ্ছে।" মরাঠার

৭ জানুয়ারি ১৯০৬, সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রথমতঃ বলা হল : বাহ্যতঃ মস্কোয় বিপ্লব দমিত। তার মানে সাময়িকভাবে বিপ্লবীরা পর্যুদস্ত। এটা জারের 'নৈতিক জয়' বলে ঘোষিত, যদিও অনেকেই একে 'দুর্নীতির জয়' বলছে। এর পরেই এই পত্রিকায় বিপ্লবীদের মুক্ত প্রশস্তি : "ধন্য সেই দেশ যেখানে হাজার-হাজার মানুষের মতো মানুষ পাওয়া যায় যারা রাজনৈতিক মুক্তির মহৎ আদর্শের জন্য মাছির মতো মরতে প্রস্তুত। এখানে আমাদের গভীরে দৃষ্টিপাত করতেই হয়। প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল—যদি হাজার-হাজার লোক প্রাণ দেয় তা মুহূর্তের পাগলামিতে ঘটেনি, তার পিছনে আছে নির্ধারিত পরিকল্পনা—সেরা সোস্যালিস্ট, অগ্রণী শ্রমিক, অগ্রণী উদারনৈতিক এবং অগ্রণী চরমপন্থীদের সম্মিলিত প্রজ্ঞার যা সৃষ্টি। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, গত দুই সপ্তাহে মস্কোর পথে লড়াইয়ে যে-পাঁচ হাজার লোক মরেছে এবং যে-চৌদ্দ হাজার লোক আহত হয়েছে, তাদের ছাড়াও, এক বৎসর আগে যখন রাশিয়ার রাজনৈতিক সংস্কারকামীরা সত্যকার বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু করেন তখন থেকে এতাবৎ সময়ে আরও পঁচিশ হাজার লোক হয় নিহত না-হয় চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, এবং তিরিশ হাজার মানুষ সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছে। রাশিয়ায় অবশ্যই উন্মাদ আছে যেমন সর্বত্র থাকে, কিন্তু যে-সংখ্যা আমরা দিলাম তা পাগল-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। পৃথিবীকে একথা স্বীকার করতেই হবে—এখন রাশিয়ায় যা ঘটছে তা স্বাধীনতার বেদীতে রাশিয়ার দেশপ্রেমিকদের প্রাণরক্ত উৎসর্গ করা ছাড়া আর কিছু নয়।"

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক উত্থানের প্রভাব সত্যই মরাঠা-সম্পাদকের উপরে পড়েছিল। তিনি ১৫ দিন পরে, ২১ জানুয়ারি, ১৯০৬, তারিখে 'জাস্টিস' পত্রিকা থেকে এক রচনা পত্রস্থ করলেন যাতে খোলাখুলি বলা হল—বিদেশী ও দেশী ধনতন্ত্র ভারতবর্ষকে শোষণ করছে—তাদের থেকে মুক্তি পেতে হলে সমাজতন্ত্রই একমাত্র উপায়। আমি লেখাটির কিছু অংশ মূলে উদ্ধৃত করছি। —

"Virulent capitalism is making headway in India. A great agitation is being carried on for the encouragement of home industries, as against the importation of foreign manufactured articles and exportation of raw matirial. This is chiefly being engineered by native capitalists, and is being shrouded with usual patriotic verbiage and flavour..The Lancashire mill-owners have a hopeless task in front of them in trying to successfully compete with the mill-owners of Bombay, who have not only cheap labour but also the raw material at hand..The only hope for India lies in Socialism. It is absolutely necessary that an agitation should be started at once for better pay and better working conditions by the Indian proletariat. Otherwise we shall witness the spectacale of an abject, crushed native population, the delight and desire of the capitalist class, toiling and slaving their wretched lives away."

২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ তারিখে মরাঠায় রাশিয়ার 'রিভলিউশনারি কমিটির' ম্যানিফেস্টো মুদ্রিত হয়। এর উপরে লিখিত সুদীর্ঘ সম্পাদকীয়ের গোড়াতে বলা হয়—ম্যানিফেস্টো-কথিত পরিণতি ঘটবে সুনিশ্চিতভাবে, "কেবল সময়ের অপেক্ষা।" তারপর বলা হয় : রাশিয়ায় যেসব সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটছে তা আশু ব্যাপক বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র। গত ডিসেম্বরে মস্কো-দাঙ্গা দমনের নায়ক জেনারেল মিন্ এক রেল স্টেশনে এক বালিকার গুলিতে মরেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে এক সামাজিক সম্মেলনের সময়ে বোমা পড়ে প্রচুর লোক হত-আহত হয়েছে। এখন এই টেররিজম্ কী?

তা জানতে হলে অনেক বছর পেছিয়ে যেতে হবে। শাসন সংস্কারের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু তা নিষ্ফল হল। ১৮৭৬-৭৭ সোস্যালিস্ট ও অন্য রাজনৈতিক আন্দোলনকারী-দের পক্ষে অতি দুর্বৎসর। নিদারুণ দুর্গতি তাদের। ঘৃণার আক্রোশে তাদের চূর্ণ করার ব্যবস্থা করা হয়। এই অবস্থায় আন্দোলনকারীরা সিদ্ধান্ত করলেন, কথায় যখন ফল হল না তখন 'কাজ' করা যাক। কাজের চরিত্র কী হবে? সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা এল, কিন্তু তাকে অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব নয় দেখে আংশিক উৎপাত সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হল। তাতেও যথেষ্ট ফল না হলে এল গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা—প্রথমে গুপ্তচরদের হত্যা, তারপর অন্যশ্রেণীর মানুষকেও। "বর্বর সরকারের বিরুদ্ধে যে-কোনো কাজই ন্যায় কাজ।" নিতান্ত ঘৃণার পাত্র এই সরকারের বিরুদ্ধে এখনই যখন বড়-রকমের আক্রমণ করা সম্ভব হচ্ছে না তখন সুবিধামতো তাকে আঘাত করো—তার অসতর্ক স্থানে। "ঘৃণায় উপ্ত, দেশপ্রেমে লালিত, উন্মাদনায় প্রসারিত, বৈদ্যুতিক প্রেরণাসৃষ্টিতে আকাঙ্ক্ষিত" এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্দীপ্ত এক নারী, ভেরা জাসুলিক, ২৪ জানুয়ারি ১৮৭৮, জেনারেল ত্রেপট-কে গুলিবিদ্ধ করেন—উক্ত জেনারেল একজন রাজনৈতিক বন্দীকে বেত্রাঘাত করার অপরাধ করেছিলেন। ভেরা গোঁড়া সন্ত্রাসবাদী না হলেও তাঁর কাজ প্রভূত উদ্দীপনার কারণ হয়। এর পরে ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তহত্যা হতে থাকে। মরাঠা-সম্পাদক রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের বিবরণকে আর অগ্রসর না ক'রে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে টেররিস্টের চরিত্রকথন করেছেন "আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশিয়া" নামক গ্রন্থের লেখক স্টেপনিয়াক-এর অনুসরণে। "টেররিস্টরা মহান, ভয়ঙ্কর, নিদারুণ আকর্ষক চরিত্রের। তাদের মধ্যে মানবচরিত্রের সর্বোচ্চ ঐশ্বর্যগরিমার সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে বীর ও শহীদদের উৎসর্গ। যখন থেকে সে স্থির করেছে—দেশের জনগণকে মুক্ত করবে, তখন থেকে সে মৃত্যুতে নিবেদিত, শহীদ। তার ঝঞ্ঝা-জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সে মৃত্যুর মুখোমুখি; প্রয়োজন হলেই মৃত্যুর সাক্ষাতে সে উদ্‌গ্রীব।...সে দরিদ্র, অপরিচিত, তথাপি সে লাঞ্ছিত মানবতার, পদদলিত মানবিক অধিকারের রক্ষায় অবতীর্ণ—মৃত্যুমূল্যে চ্যালেঞ্জ করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে।...সে তার কঠিন বাহুকে নিয়োজিত করেছে জনগণের স্বার্থে। যদি মন্দবুদ্ধি কেউ তাকে বলে, 'দাসত্বকে মেনে নাও', সে সদর্পে চেঁচিয়ে বলবে, 'না' —এবং অগ্রসর হয়ে যাবে সামনে, বিরোধীদের বাধা ও ক্রোধকে অগ্রাহ্য করে, কারণ তার এই বিশ্বাস আছে—তার কবরের উপরে একদিন ন্যায়বিচারের বার্তা লিখিত থাকবে। এরাই হল টেররিস্ট।"

৭ অক্টোবর, ১৯০৬, মরাঠার সম্পাদকীয়তে ছিল, সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রস্ত করতে রুশ সরকারের প্রয়াসের বিবরণ। একটি সরকারী কর্মচারী খুন হলে সেখানকার গোটা প্রদেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হবে—এই হুমকির প্রসঙ্গে মরাঠা-সম্পাদক লিখলেন, "যে সন্ত্রাসবাদীরা নিজ জীবনের পরোয়া করে না তারা, তাদের কাজ অনেক নির্দোষ মানুষের ধ্বংসের কারণ হতে পারে জেনেও ভ্রূক্ষেপ-হীন।...সে বোধহয় চিন্তা করে—তার কাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ তুলতে সরকার যেসব নির্দোষ মানুষকে মারবে তারা বিরাট জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে শহীদের দল। এমন শহীদ যত বেশি হয়, ততই মঙ্গল—এই বোধহয় তাদের যুক্তি।" এই ধরনের চিন্তাধারা অভিনব, রুশ বিপ্লবীরা অনন্য, ইংরাজ ও ফরাসি বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য আছে—এইকথা বলে সম্পাদক শেষ করেন।

রাশিয়ার ১৯০৫-০৬ সালের বৈপ্লবিক প্রয়াস সম্বন্ধে মরাঠার সম্পাদকীয় রচনাগুলির বিশেষ উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা আছে। স্বদেশী আন্দোলনের উপর রুশ-জাপান যুদ্ধে প্রাচ্য জাপানের জয়ের নৈতিক প্রভাবের কথা বহুল উল্লিখিত। কিন্তু ঐকালীন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উপর রুশ সন্ত্রাসবাদের প্রভাবের বিষয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়নি। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পূর্ণ রুশ-

ধাচে প্রস্তুত, এমন বলার কারণ নেই, তার উপর অন্য অনেক প্রভাবই আছে। তবু লক্ষণীয়—বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্য আরম্ভ হওয়ার কিছু আগে রাশিয়ার বৈপ্লবিক উত্থান ঘটেছিল এবং সে-বিষয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রে নানা বিবরণ বেরিয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করি, স্বদেশী আন্দোলন দমনে সরকারী নিপীড়ন-ব্যবস্থার সঙ্গে নিবেদিতা বারবার জারতন্ত্রী রাশিয়ার নিপীড়নের তুলনা করেছেন। মরাঠা-সম্পাদক কর্তৃক মৃত্যুভয়হীন রুশ সন্ত্রাসবাদীদের প্রশস্তিও লক্ষণীয়। সে-প্রশস্তি দেখিয়ে দেয়, ভারতীয় মনের একাংশ অন্ততঃ এদেশের ক্ষেত্রে ঐপ্রকার চরিত্রের বন্দনা করতে প্রস্তুত, প্রকাশ্যে সম্ভব না হলে অপ্রকাশ্যে নিশ্চয়ই। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার বোমারুদের বিষয়ে তিলক ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এই মনোভাবের প্রকাশ দেখব।

তিলকের পূর্বোক্ত জীবনীকাররা বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে কেশরী পত্রিকার মরাঠি ভাষায় লেখা তিলকের কিছু-কিছু সম্পাদকীয়ের উল্লেখ করেছেন। অসাধারণ শক্তিশালী সেই লেখাগুলি, কঠোর যুক্তিপূর্ণ, সুদৃঢ় এবং স্থিরপ্রত্যয়যুক্ত—বাঙালীসুলভ ভাবোন্মাদনা ও বাগ্মিতার প্রবাহ সেখানে নেই। ১৫ অগস্ট ১৯০৫, তিলক "সংকট" নামক রচনায় বলেন : সরকার অগণিত মানুষের আবেদনকে অবজ্ঞায় অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে আবেদন-নীতির উপর জনগণের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। জনগণ কঠিন পথ না নিলে সরকার তাদের কথা শুনবেন না। এখন কথা নয়, কাজ চাই—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কাজ। তিলক আরও বললেন, ইংলণ্ডের মানুষ অত্যাচারী শাসককে কি করে বিদায় দিতে হয় সে-পথ দেখিয়েছে। নিরস্ত্র পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে সে-পথ গ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু তারও আছে বয়কটের পথ, যাকে বেআইনি বলা চলবে না। বাংলা, বয়কটের সঠিক অস্ত্র নিয়েছে। সারা ভারত ঐ অস্ত্র তুলে নিক।

তিলক আর একটি প্রবন্ধে বয়কটকে 'বহিষ্কারযোগ' অভিধায় ভূষিত করেন। ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬, এক প্রবন্ধে বয়কটের বিরোধী ভীরু সমালোচকদের যুক্তির অসারত্ব তিনি খুলে ধরেন। কঠোর আঘাত করেন তাঁদের যাঁরা নানা বাকচাতুরীতে বয়কটকে ভিতর থেকে বানচাল করার চেষ্টা করেছিলেন। "লড়াই শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে" নামক সম্পাদকীয়ের গোড়ায় তিলক বলেন, লণ্ডন টাইমস রুশ জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে কারণ ধর্মঘটের দ্বারা তারা জার-কে জনগণের দাবি স্বীকারে বাধ্য করেছে। "যে-লণ্ডন টাইমস রাশিয়ার প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে এত তৎপর সে কিন্তু ভারতে অনুরূপ আন্দোলন লক্ষ্য করতে অপারগ।" বাংলার আন্দোলনের সমালোচকদের ধিক্কার দিয়ে তারপর তিলক বললেন : "খুবই দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ এখনি 'থেমে পড়ো' আওয়াজ তুলছেন যদিও যুদ্ধ প্রায় আরম্ভই হয়নি। কি নির্বোধ! এই লোকগুলি জাতীয় সংগ্রামের তত্ত্ব বা তাৎপর্য বোঝে কিনা সন্দেহ। তারা ধরে বসে আছে, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে কেবল স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করায় উৎসাহ দিতে। দেশে কিছু সাবান কারখানা কি ছাতার কারখানা তৈরীতে প্রেরণা দেওয়ার বেশি সে এগোবে না। আমাদের উদ্ধত ও চতুর শাসকরাও চান, এই ধারণাই বহাল থাক। কিন্তু যে-কেউ সহজেই দেখতে পাবেন, স্বদেশী আন্দোলনের অস্ত্র বাঙালী নেতারা তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই। শিল্পোন্নয়নের জন্য 'স্বদেশী'র অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অনেক বড়, বাংলায় তা দেখা গেছে। সেই কারণেই লেফট্‌ন্যান্ট-গভর্নর ফুলার খ্যাপা কুকুরের মতো আচরণ করছেন। তিনি বুঝে নিয়েছেন, বাঙালীরা এখন এই যে-অস্ত্র ব্যবহার করছে, একদিন তা আমলাতন্ত্রের পরাজয়ের কারণ হবে। তাই তিনি চটে অস্থির, এই আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর।"

স্বদেশী আন্দোলনের সর্বভারতীয় বিস্তারের জন্য তিলক কী করেছিলেন—বিপিন পাল,

অরবিন্দ, লাজপত রায় প্রমুখের সহযোগিতায় ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি বা নিউ পার্টি গঠন করে কংগ্রেসের মডারেট গোষ্ঠীকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিলেন, সুরাট কংগ্রেসে তার কোন্ পরিণতি হয়েছিল—সেই পরিচিত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একথা সাধারণভাবে জানা আছে, সুরাট কংগ্রেসের কয়েক মাস পরে তিলককে রাজদ্রোহ-মূলক রচনার জন্য ৬ বছরের নির্বাসন দেওয়া হয় মান্দালয়ে, যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উপরে প্রায় সমাপ্তির রেখা টেনে দেয়। কিন্তু অনেকেই সম্ভবতঃ সচেতন নন—তিলকের ঐ শাস্তিবিধান হয়েছিল বাংলার বোমারুদের সম্বন্ধে সহানুভূতিসূচক রচনা প্রকাশের জন্যই। স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গে আমরা যেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি—এই আন্দোলনের বৈপ্লবিক বিস্তারকে তারিফ করবার জন্য তিলককে নিজের সক্রিয় জীবনের বড় একটা অংশ উৎসর্গ করতে হয়েছিল। স্মর্তব্য—তাঁর তুল্য শাস্তি ঐকালে বাংলার কোনো চরমপন্থী নেতাকে পেতে হয়নি।

একথা বলা হয়েছে, ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা-বিস্ফোরণ থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে বোমার আবির্ভাব। এর ফলে অবিলম্বে তোলপাড় কাণ্ড ঘটে। মানিকতলা ও অন্যত্র বোমা ও অস্ত্র আবিষ্কার, বাঙালী বিপ্লবী তরুণদের গ্রেপ্তার, অরবিন্দের গ্রেপ্তার, সকলের বিচার ও শাস্তি ইত্যাদি ভারতবর্ষকে চমকে শিউরে দেয়। তিলক বোমার তাৎপর্য বুঝেছিলেন। তার আগে যদিও মহারাষ্ট্রের কয়েকটি সংবাদপত্রকে দমন করা হয়েছে, সম্পাদকদের বিচার ও শাস্তি হয়েছে, তথাপি তিলক অকুতোভয়ে কেশরীতে এই ব্যাপারে পাঁচটি প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে প্রথম ও শেষ এই দুইটি প্রবন্ধের সম্পূর্ণ অনুবাদ মরাঠায় বেরিয়েছিল—১২ মে, ১৯০৮। এই দুইটি প্রবন্ধের জন্য তিলক অভিযুক্ত হন। বাকি তিনটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছি তিলকের জীবনী থেকে।

প্রথম প্রবন্ধের নাম, "দেশের দুর্ভাগ্য", কেশরীতে বেরোয় ১২ মে। এর আরম্ভের বাক্য : "ভারতবর্ষের মতো শান্তিপ্রিয় মৃদুস্বভাব দেশ ইউরোপের রাশিয়ার দশায় উপনীত হয়েছে। এই দেখে অস্বস্তি ও দুঃখবোধ করবে না, এমন কেউ নেই।" মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমাই ঐ মন্তব্যের উৎস। তিলক বলেন, রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অস্বাভাবিক নয়। "কিন্তু আমরা কদাপি ভাবিনি যে, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত শীঘ্র ঐ পর্যায়ে পৌঁছবে। আমাদের দেশের শ্বেত আমলাতন্ত্রের ঔদ্ধত্য ও বিকৃতি এত দ্রুত আমাদের তরুণদের এমন নৈরাশ্যের মধ্যে ঠেলে দেবে যে, দেশের অগ্রগতি ঘটাবার জন্য তারা বিদ্রোহের পথ ধরবে—তাও আমরা ভাবিনি।" ধৃত বিপ্লবীদের বিবৃতি বিশ্লেষণ করে তিলক বললেন, কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঘৃণাবশে এই ধরনের কাজ তারা করেনি, তারা মাথামোটা পাগল নয়, তারা জানে যে, দু-একটা বোমা ছুঁড়ে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে না, তারা ব্যক্তিস্বার্থচালিত নয়, তারা চোর বা বদমাশও নয়—তারা এই পথে নেমেছে শ্বেত আমলাতন্ত্রের বেপরোয়া শক্তিমত্ততায় অতিষ্ঠ হয়ে। "সকলেরই জানা আছে, নিহিলিস্টদের বিদ্রোহ, যা রাশিয়ায় অবিরাম ঘটছে, তার কারণও একই। এই দৃষ্টিতে দেখলে বলতেই হয়, রাশিয়ার স্বদেশী প্রশাসকদের উৎপীড়ন-ব্যবস্থায় সেখানে যা ঘটেছে, তাই এখানেও ঘটছে বিদেশী প্রশাসকদের অত্যাচারে। সবাই জানে, বৃটিশরাজ কতখানি শক্তিশালী। কিন্তু লাগামছেঁড়া ক্ষমতা-ব্যবহারকারী শাসকদের এও জানা উচিত—মানুষের ধৈর্যের সীমা আছে।" তিলক বাংলার পার্টিশনের বিকট অন্যায়ের কথা তুলে বললেন, এর পরেও যদি দু-একজনের মাথাখারাপ না হয়ে যায় সেটাই হবে বিস্ময়কর। একটা বিড়ালকেও তো ঘরে বন্ধ করে রাখলে সে ছাড়া পাওয়া মাত্র যে-তাকে বন্ধ করে রেখেছে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। "বাঙালীরাও তো মানুষ, যত শক্তিহীনই তাদের মনে করা হোক।...একথা ঠিক, বহু বৎসর বিদেশী শাসনে থেকে ভারত-

বাসীর মন থেকে স্বাভাবিক রাগ-তাপ, তেজ ঠান্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা শূন্যে ডিগ্রিতে বরফ-ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে না।" "একথাও নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাবে, যে-দেশে ন্যায়সঙ্গত ক্রোধকে সর্বদা নির্দিষ্ট মাপে বেঁধে রাখা হয় সেখানে চিরদাসত্বই নিয়তি।" তিলক বললেন, নিজ স্বার্থেই কেউ অপরকে দাস করে। কিন্তু সেই স্বার্থেরও সীমা থাকা উচিত। শাসকরা সর্বদা ভাবে, তারা যা করে তাই ন্যায়, তাকেই অধীনস্থরা আশীর্বাদ বলে শিরোধার্য করতে বাধ্য। কিন্তু অপরপক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া প্রয়োজন—এই ধারণা ভারতে ক্রমবর্ধমান, আর তাতে বিচলিত শাসকরা উৎপীড়ন বাড়িয়ে চলছে। বিনা অভিযোগে লালা লাজপত রায়কে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। "শাসকরা যদি এইপ্রকার রুশ-ধরনের পদ্ধতি নিয়ে চলে তাহলে ভারতীয় প্রজারা অংশতঃ অন্ততঃ রাশিয়ার জনগণের পদ্ধতি অনুকরণ করতে বাধ্য হবে। কেননা 'যেমন বপন তেমন ফলন।' শাসকরা যদি প্রজাদের বলে : আমরা ইচ্ছামতো অত্যাচার চালিয়ে যাব, বিনাবিচারে যাকে ইচ্ছা নির্বাসনে পাঠাব, যে-কোনো প্রদেশকে বিভক্ত করব, যথেচ্ছ মিটিং বন্ধ করব, রাজদ্রোহী বলে যে-কোনো লোককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব, তাকে গরাদে পুরব—আর তোমাদের কাজ হল, এই সকলই নিঃশব্দে সহ্য করা, রাগ-তাপকে মন থেকে বেরুতে না দেওয়া—তাহলে বুঝতে হবে, ওঁরা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করছেন—ওঁরা মানবচরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।" সাহেবী কাগজগুলির অভিযোগ, ভারতীয় নেতাদের উগ্র বক্তৃতা ও লেখার জন্য মজঃফরপুর-কান্ড ঘটেছে। তিলক বললেন, দায়ী ওঁরা নন, "দায়ী হল স্বৈরাচারী, দায়িত্বহীন, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী শ্বেত আমলাতন্ত্র। তারা দিন-দিন জনগণের কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।" অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাধারণতঃ দুই উপায়ে এতাবৎ হয়েছে, আবেদনের পথ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ। কিন্তু তিরিশ কোটি মানুষের দেশে তৃতীয় কোনো প্রতিবাদের পথ নেওয়ার মতো মানুষ মিলবে না, একথা বললে সেটা অসম্ভব কথা হয়ে দাঁড়ায়। আসল কথা, যত অত্যাচার করাই হোক, মজঃফরপুর-ধরনের কার্যকে কখনো বন্ধ করা যাবে না যদিনা মূলে ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা যায়। তিলক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কেবলই একই ছবি তুলে ধরতে লাগলেন—অধিকারহীন ভারত-বাসী আর স্বাধিকারপ্রমত্ত ইংরাজ। রাশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, নিপীড়নের দ্বারা গুপ্তহত্যা বন্ধ করা যায় না। আপত্তি করলেন সরকারপক্ষীয়দের অনুচিত চাপানো অভিযোগের বিরুদ্ধে—না, সকল শিক্ষিত ভারতবাসীই সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী নয়। তবে সরকার যেন এই শিক্ষা নেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ব্যর্থতাই কিছু যুবককে হিংসার পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে। "উপায় না থাকলে হরিণও ব্যাধকে আক্রমণ করে"—এই চিত্তহারী উপমাও তিলক প্রয়োগ করলেন। "মজঃফরপুরের ঘটনাকে জঘন্য বলে ঘোষণা করেই যেন আমাদের কর্তব্য শেষ করা না হয়।" তিলক আরও বললেন, মানুষ ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেই এই ধরনের কাজ করে—এটা জানাও আমাদের কর্তব্য। "আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় এসে গেছে যখন রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের নিহিলিস্ট-দলের মতো দল এদেশেও সৃষ্টি হবে।" তিলক সচেতন ছিলেন, তাঁর এই কথাগুলি শ্বেত আমলাতন্ত্রের কাছে মিষ্টি লাগবে না। তবু কথা-গুলো তাঁকে বলতেই হয়েছে, কারণ সামনে আছে বিপর্যয়ের দিন। আমলাতন্ত্রকে আত্মশোধন করতেই হবে। "যদি সে কর্তব্যে অবহেলা করা হয়", তিলক নির্মম নির্ভয় কণ্ঠে প্রবন্ধশেষে বললেন, "মজঃফরপুরে ধরনের দুর্বিপাক অবশ্যম্ভাবী।"

১২ মে তারিখেই একই বিষয়ে তিলক কেশরীতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। কেউ-কেউ তখন বলছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যখন বোমা এসেছে, তখন স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। তিলক বললেন, স্বদেশী আন্দোলন হয়েছে পার্টিশনের জন্য, সেক্ষেত্রে পার্টিশন

বন্ধ করলেই তো সব গণ্ডগোলের অবসান। এলাহাবাদের পায়োনীয়ার বলেছিল, প্রতিটি বোমার ঘটনার জন্য সন্দেহভাজন ২৫টি নেতাকে ফাঁসিতে লটকানো উচিত। তিলক বললেন, "এটা জনগণকে আতঙ্কিত করার একটা উপায় সন্দেহ নেই, কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, এইপ্রকার ব্যবস্থায় সন্ত্রাসবাদী প্রবণতা বেড়েছে বই কমেনি।"

১৯ মে তিলক একটি প্রবন্ধে সাহেবি কাগজগুলির এই বিদ্বিষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন, (একই ধরনের প্রচার করছিল কিছু অনুগত ভারতবাসী)—তিলক প্রভৃতি গুপ্তহত্যাদির কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ২ জুন তারিখের আর একটি প্রবন্ধে তিলক জানালেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই বোমার জনক, এবং বোমার দ্বারা সরকারের সামরিক ক্ষমতার দর্প নাড়া খায়। তিলক এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বোমার নৈতিকতার ঘোষণাও করলেন : "যখন শাসনকর্তারা অযৌক্তিকভাবে জনগণকে নিতান্ত ভীতত্রস্ত করতে আরম্ভ করে, তার দ্বারা জনগণকে একেবারে বশীভূত ক'রে রাখতে চায় —তখন বোমার শব্দ কর্তৃপক্ষকে এই জ্ঞানদান করে যে, যে-জনগণ পূর্বতন ন্যাতাকাতা অবস্থায় শাসকদের কাছে অত্যাচার সত্ত্বেও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত, তারা এখন সেখান থেকে ঊর্ধ্বতর অবস্থায় উন্নীত হয়েছে।"

তিলকের পঞ্চম প্রবন্ধ বেরোয় ৯ জুন—"এইসকল প্রতিবিধান-ব্যবস্থা স্থায়ী হবে না।" অভিযুক্ত এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অতিশয় তীব্র এবং দুঃসাহসিক, স্বীকার করতেই হবে। গোড়াতেই তিনি বললেন, সরকারের ঘাড়ে শয়তান চড়েছে তাই নতুন উৎপীড়ন-ব্যবস্থা এনেছে—সভা-নিষেধ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ—বিস্ফোরক আইন প্রবর্তিত ইত্যাদি। সরকারের দমননীতি এদেশের অতীতের অর্জনগুলি কেড়ে নিচ্ছে—আগে এখানে ছিল বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, এখন তার কিছু নেই। সরকারের বুদ্ধিভ্রান্তি হয়েছে—তা সর্বনাশ সমুৎপাত করবে। অত্যন্ত তেজের সঙ্গে তিলক বোমার সঙ্গে বোমার পার্থক্য করলেন। বাঙালীরা অহেতুক উন্মত্ততায় সমাজ ধ্বংস করবার জন্য বোমা ফেলেনি। "বাংলার বোমার পিছনে রয়েছে দেশপ্রেমের আতিশয্য।...বাঙালীরা নৈরাজ্যবাদী নয়। কেবল তারা নৈরাজ্যবাদীদের অস্ত্র ব্যবহার করেছে।" তিনি পর্তুগালে বা রাশিয়ায় বোমার দ্বারা যে-শাসনসংস্কার সম্ভব হয়েছে তাদের উল্লেখ করার পরে বললেন, বাঙালীর বোমা একই উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। শাসনসংস্কার হলেই তবে বোমা থামবে। তিলক ভারতবাসীর অবস্থার সঙ্গে খাঁচায় পোরা তোতাপাখির অবস্থার তুলনা করে বললেন, সাধারণতঃ খাঁচার পাখিকে দানাপানি দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, "ভারত সরকার কিন্তু কেবল খাঁচার দরজা বন্ধ করে দেননি, একই-সঙ্গে তোতার পাখা টেনে ছিঁড়েছেন, পা ভেঙে দিয়েছেন, পাছে খাঁচা থেকে সে বেরিয়ে পড়ে।" এর পরে তিলক ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করার প্রসঙ্গ আনলেন। একাজ ইউরোপের অতিবড় স্বৈরাচারী দেশও করেনি। মুঘলরাও ভারতে করেনি। জনগণের হাতে হালকা অস্ত্র থাকলে তার দ্বারা শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে পরাভূত করবে, এই হাস্যকর কথা সাম্রাজ্যবাদীরাও ভাবে না, তবে কেন ওকাজ তারা করেছে? "অস্ত্রআইনের দ্বারা ভারতবাসীর পৌরুষকে হত্যা করে তাদের এমন অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে যাতে ক্ষুদে শাসকরাও বিনা বাধায় স্বার্থপর শাসন চালিয়ে যেতে পারে এবং জনগণ 'স্বরাজ্যের' অধিকার দাবি করতে না পারে।" তিলক মুঘল শাসন ও ইংরাজ শাসনের তুলনাও করেছিলেন। তাঁর মতে, কি সামরিক শক্তিতে, কি ঔদার্যে-মহত্ত্বে মুঘল শাসন ইংরাজ শাসনের চেয়ে অনেক বড়। মুঘলরা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দেখালেও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বহুলাংশে হিন্দুদের কাছে হস্তান্তরিত করেছিল এবং তারা ভারত থেকে অর্থ লুণ্ঠন ক'রে স্বদেশে পাঠাত না। লুণ্ঠক ইংরাজ তেমন কোনো ঔদার্য দেখায় নি। বোমার প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে তিলক বললেন, বোমা না ফাটলে সরকার বুঝতেই পারত না তার স্বৈরাচার জনগণকে কতখানি

অস্থির করেছে। এর আগে পর্যন্ত তো নিরস্ত্র মানুষ নীচু গলায় কেবল কাতর প্রার্থনাই জানিয়ে গেছে। বোমা সরকারের সামরিক শক্তির দর্পে ঘা দিয়েছে। যদি মুঘলদের মতো ইংরাজরা জনগণের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টন করে না দেয় তাহলে তার ভাগ্যে অশান্তি আছে। বোমা তো বন্দুক-জাতীয় অস্ত্র নয় যে, আইনের দ্বারা তার উৎপাদন বা বণ্টন বন্ধ করা যাবে। তার নির্মাণকৌশল সহজ, তা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেকেরই জানা হয়ে গেছে। বারীন্দ্রের বোমার কারখানায় কয়েকটি জালা ও বোতল ছাড়া কিছু ছিল না, কিন্তু সরকারী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সরকারের বড় বোমা-কারখানার মতোই নিখুঁত এই ছোট কারখানাটি। তিলক বললেন, "সরকারের কঠোর নিপীড়ন ব্যবস্থা যদি বহাল থাকে তাহলে বোমা বাংলার কুহকভূমি থেকে সারা ভারতে ছড়াতে আর কতদিন-বা লাগবে?" তিলক এর পরে সরকারের 'বিস্ফোরক আইনকে' কঠোর আক্রমণ করলেন। ব্যঙ্গ করে বললেন বোমা বস্তুটি যখন কিছু বিজ্ঞান-জানা মানুষের কাছে খেলনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে বিস্ফোরক আইনে বোমাকে আটকানো যাবে নাকি! আইনটি যে, ভালো লোকদের উপর পুলিশী উৎপীড়নের হাতিয়ার হয়ে উঠবে, তাও জানাতে ভুললেন না। তিনি প্রবন্ধ শেষ করলেন এই বলে : "বোমা বন্ধের যথার্থ স্থায়ী ব্যবস্থা হল—জনগণের হাতে স্বরাজের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার তুলে দেবার ব্যবস্থা শুরু করা।"

তিলককে শায়েস্তা করার সুযোগ সরকার অনেকদিন ধরেই খুঁজছিল—এবার মুঠোর পেয়ে গেল। তিলকই প্রধানতঃ বাংলার আন্দোলনের পিছনে সর্বভারতীয় শক্তি জুটিয়ে এনেছেন, কংগ্রেসে চরমপন্থী দলের তিনিই মুখ্য নেতা, তিনিই মডারেটদের প্রভাব খর্ব করেছেন, অসাধারণ দৃঢ়তা ও বাস্তববোধে সমৃদ্ধ তাঁর বিরাট প্রভাবশালী নেতৃত্ব ;—এই লোকটিকে ঠাণ্ডা করতে ছুতো চাই—সেই সুযোগ এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাওয়া গেল বলে সরকারপক্ষের উল্লাসের অন্ত রইল না। তিলকও বুঝেছিলেন, তাঁর উপরে খড়্গ নামছে। 'কাল' পত্রিকার অভিযুক্ত সম্পাদক অধ্যাপক শিবরাম পরাঞ্জপে-র (অসাধারণ শক্তিশালী চরমপন্থী লেখক, যাঁকে মহারাষ্ট্রে 'বিপ্লবের প্রফেট' বলা হয়েছে) বিরুদ্ধে আনীত মামলার তদ্বিরের জন্য তিনি বোম্বাই এসেছিলেন পুনা থেকে। তাঁকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, বোম্বাইয়ে তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন, সুতরাং তিনি যেন পুনায় সব ব্যবস্থাদি করে তবে বোম্বাই যান। তিলক হেসে বলেছিলেন, "কি আর ব্যবস্থা করব! দুর্গ খুঁড়ব না সৈন্য সাজাব, যাতে দুর্গরক্ষা করতে পারি! সরকার গোটা দেশকেই তো কারাগার করে তুলেছেন। আমরা সবাই বন্দী। নতুন করে বন্দী হওয়া মানে বড় খাঁচা থেকে ছোট খাঁচায় ঢুকে পড়া।" বোম্বাইয়ে তিলকের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সই করা হয় ২৩ জুন, ১৯০৮। সেদিন সেটি জারি করা হয়নি। তিলকের কাছে খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তাতে কিন্তু সেরাত্রে তাঁর সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়নি। সকালে উঠে সকৌতুকে বলেছিলেন, "কি ব্যাপার, এখনো পরোয়ানার সাক্ষাৎ নেই?" পরোয়ানা জারি করতে দেরী করার একটা কদর্য কারণ ছিলই। সন্ধ্যা ৬টার সময়ে সেটি ধরানো হয় যাতে তিলক জামিনে খালাস চাইতে না পারেন। বস্তুতঃ তিলককে আর ঘরে ফিরতে না দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তই করা হয়েছিল। সেজন্য সমস্ত রীতি ভেঙে প্রশাসন-সহায়ক বিচারক মহোদয় জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করে দেন। ২৫ জুন তিলকের বাসভবন, কেশরী ও মরাঠা অফিস, ইত্যাদি তন্নতন্ন করে তল্লাস করা হয়, পুলিশ কোনো-কোনো জিনিস পেয়ে উল্লাসে অধীর হয়ে ওঠে, প্রমাণ হিসাবে যাদের তুচ্ছতা পরে প্রমাণিত হয়েছিল। কেশরীর পূর্বোক্ত প্রথম ও পঞ্চম প্রবন্ধের জন্য তিলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, এবং যেহেতু বিচারের আগেই স্থির করা হয়েছিল, তিলককে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে, তাই ইংরাজ বিচারকদের সহযোগিতায় এমন ব্যবস্থাদি করা হল যাতে জেলে আবদ্ধ তিলক আত্মপক্ষ সমর্থনের

উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারেন। তাঁর মামলায় স্পেশাল জুরি নিয়োগ করা হল, যাঁরা মরাঠি ভাষা না জেনেই মরাঠি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের বিচার করবেন। প্রবন্ধগুলির ইংরাজি অনুবাদে অনেক ইচ্ছাকৃত বিকৃতিও রইল। তিলক স্থির করেছিলেন, তিনি নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন, যদিও মহম্মদ আলি জিন্নার সে-কাজ করার কথা ছিল। কেন জিন্না ওকাজ করেন নি তার কারণ জিন্না নিজেই জানিয়েছেন, তার দ্বারা অসামান্য গৌরবে ভূষিত করেছেন তিলককে। "মিঃ জাস্টিস ডাভারের আদালতে মিঃ তিলকের বিচারপ্রসঙ্গে কোনো গোপন তথ্য ফাঁস না করেও বলতে পারি [জিন্না লিখেছেন]—তিনি [তিলক] নিজের মুক্তির জন্য যত-না ব্যস্ত ছিলেন, ততোধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন সাহেবী সংবাদপত্রগুলি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কুৎসা করে কি পরিমাণে অপরাধ করে যাচ্ছে তা দেখিয়ে দিতে। এটা তাঁর মতে সমপরিমাণে মানহানিকর ব্যাপার, অথচ সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনোই ব্যবস্থা নেয়নি।" জিন্নার পক্ষে তিলকের মতানুযায়ী তাঁর পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হয়নি (কোনো প্রতিষ্ঠিত আইনজীবীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না), সেজন্য তিলক নিজের সওয়াল-জবাব নিজেই করেছিলেন ২১ ঘণ্টা সময় ধরে, এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি "ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই ধ্বনিত করেছিলেন, কারণ তিনি ভারতের জাতীয় মর্যাদার প্রতিভূ-রূপেই উত্থিত হয়েছিলেন।" "আসামী হিসাবে তিনি যখন অভিযোগের উত্তর দিচ্ছিলেন তখন একইসঙ্গে অভিযোক্তার ভূমিকাও নিয়েছিলেন—দায়ী করেছিলেন ভারতবর্ষের কুৎসাকারক সাহেবি কাগজগুলিকে এবং ভারতের স্বাধীনতা-অপহারক বৃটিশ সরকারকে।" তিলক বলেছিলেন, "আমি এখানে আপনাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করতে আসিনি। আমি আমার কাজের ফলাফলের সম্মুখীন হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই। আমি একথা বলবই না যে, ঐ সকল প্রবন্ধ আমি খ্যাপামির ঝোঁকে লিখেছি। আমি পাগল নই। আমি ওগুলি লিখেছি কারণ জনস্বার্থে ওগুলি লেখা কর্তব্যবোধ করেছি। আমার স্বদেশবাসীরও তাই মত বলে আমি মনে করেছি।"

তিলককে যে, শাস্তি দেওয়া হবেই, তা পূর্বনির্ধারিত ছিল। রাত্রি আটটার সময়ে বিচারক মামলার মূল কথাগুলি জুরিদের সামনে বুঝিয়ে বলা শেষ করেন। সাধারণ অবস্থায় পরদিন জুরিদের সিদ্ধান্ত জানানোর কথা। কিন্তু না, ঐদিনই সবকিছু শেষ করে তিলককে সরিয়ে দিতে হবে। আগ্রহী ও উত্তেজিত জনতা মামলার রায় বেরুবে না ধরে নিয়ে বিকেল পাঁচটার সময়ে চলে গিয়েছিল। সেই সুযোগটার প্রয়োজন ছিল শাসনকর্তাদের। কড়া পুলিশ পাহারা চারিদিকে, হাইকোর্টের বিশাল কক্ষে মৃদু আলোকের অপচ্ছায়া, জুরিরা রাত্রি আটটার সময়ে শ্বাসরোধী আবহাওয়ার মধ্যে ভিতরে চলে গেলেন, তিলক—খাপার্দে, কেলকার প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চা-খেলেন, শাস্তি বড় রকমের হবে নিশ্চিত, তাই বন্ধুদের কাছে অসহ্য পরিবেশ, তিলক হাসলেন, খাপার্দেকে বললেন, "কি বলেন, আজকের দিনটি অন্যদিনের মতো নয়। মনে হচ্ছে যাবজ্জীবন নির্বাসন! কে জানে, এই আমাদের একত্রে শেষবারের মতো চা-পান কিনা!" "তিলক হাসতে লাগলেন যাতে অন্যরা কাঁদিতে না পারেন।" ৯-২০ মিনিটের সময়ে জুরিরা ফিরলেন—৭-২ ভোটে তিলককে তাঁরা দোষী সাব্যস্ত করেছেন। বিচারপতি ডাভার তিলককে জিজ্ঞাসা করলেন, বিচার ঘোষণার আগে তাঁর কিছু বলার আছে কিনা। তিলক অসামান্য এই কথাগুলি বললেন, "আমি কেবল বলতে চাই, জুরিদের বিপরীত সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও আমি নির্দোষ। ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রিত হয় এখানকার শক্তি অপেক্ষা উর্ধ্বতর শক্তিতে। ঈশ্বরের বিধান হয়ত এই—আমি যে-আদর্শের পক্ষে দাঁড়িয়েছি তা আমার মুক্তজীবন অপেক্ষা আমার যন্ত্রণাজীবনের দ্বারা অধিক শক্তিশালী হবে।" এইকথা যিনি বলতে পারেন তিনি অবশ্যই বিচারপতি ডাভারের দৃষ্টিতে

"অসুস্থ ও বিকৃত মনোবৃত্তিসম্পন্ন।" সুতরাং তিনি ঐ দুটি প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ভারতবর্ষের প্রধান জননেতাকে ৬ বছরের নির্বাসনে পাঠালেন। বৃটিশ শাসনের লৌহযবনিকা লোকমান্য তিলকের পরিণত কর্মজীবনের সুদীর্ঘ ৬টি বৎসরকে ছিন্ন করেছিল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে।

তিলকের অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলির সবচেয়ে তীব্র অংশকে আমি আগে উপস্থিত করেছি। ঐসকল কথা বলার জন্য তিলকের মতো লোকনায়ককে ৬ বছরের নির্বাসন দেওয়া যায়, এটা একেবারেই কল্পনাতীত। বুঝতে অসুবিধা হয় না বশম্বদ বিচারকের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা প্রতিশোধ তুলতেই চেয়েছিলেন। এই কথার সত্যতা ভ্যালেন্টাইন চিরলের রচনাসূত্রে নিরতিশয় প্রমাণিত। ১৯১০ সালে এই সাম্রাজ্যবাদী লেখক ভারতীয় পরিস্থিতি বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লণ্ডন টাইমস-এ প্রকাশ করেন, পরে সেগুলি গ্রন্থাকারেও বেরোয়। চিরল সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ বিশ্লেষক লেখক বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর গ্রন্থে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির সুষ্ঠুতম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। [এঁর গ্রন্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা পরে করেছি]। সেই গ্রন্থে, কৌতূহলী যে-কেউ দেখতে পাবেন—ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সর্বাধিক আক্রমণের লক্ষ্য করা হয়েছে তিলককে। সেখানে সুদীর্ঘ স্থান নিয়ে তিলকের কর্মজীবনকে উপস্থিত করে তার উপরে মুহুর্মুহু অস্ত্রবর্ষণ করা হয়েছে। পরিষ্কার দেখা যায়, তিলককে নির্বাসনে পাঠাবার ঔচিত্য প্রমাণে এঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। ঐ বিশ্লেষণকালে উনি যেসব দোষে তিলককে দোষী করেছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই যে, পরবর্তীকালে তিলকের গুণরূপে গৃহীত হবে তা এই আচ্ছন্নদৃষ্টি লেখকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। উল্টোদিকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যচালিত ঐ সাম্রাজ্যবাদী লেখক আতঙ্কিত ছিলেন এই দেখে—সমকালেই বিরাটসংখ্যক ভারতবাসী তিলকের উক্ত দোষগুলিকে গুণ বলে বিবেচনা করছিল।

চিরল যে-সব কারণে তিলককে দোষী-সাব্যস্ত করেছিলেন তার একটি—মহাদেব গোবিন্দ রানাডের সঙ্গে তিলকের সংঘর্ষ। ইংরেজ শাসককুলের প্রশ্রয়ে লালিত মডারেট সংস্কারকদের বিরোধিতা করা অবশ্যই অপরাধ, যা তিলক করেছিলেন। চিরল লিখেছেন : "জনৈক হিন্দু ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, যদি আমি ভারতীয় অসন্তোষ-অস্থিরতার ('আনরেস্ট') মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করতে চাই তাহলে তিলকের কর্মজীবনের পর্যালোচনা দিয়েই আরম্ভ করা ভালো।" চিরল বুঝেছিলেন :

"Bal Gangadhar Tilak..one of the most dangerous pioneers of disaffection."

ইংরাজ প্রশাসক ও মডারেট সংস্কারকদের অনুগত হয়ে চিরল গণপতি উৎসব, শিবাজি উৎসব, গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির জন্য তিলককে দোষী করেছেন। কিন্তু তাঁর অন্য দোষও কম ছিল না, যথা :

"..his active propaganda amongst school boys and students, his gymnastic societies, his preaching in favour of physical training and last but not least his control of the Press and the note of personal violence which he imparted to newspaper polemics, represent the progressive stages of a highly-organised campaign which has served as a model to the apostles of unrest all over India."

তিলক সম্বন্ধে চিরলের যে-দুবর্ণবাক্যটি ভূষণ-বাক্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে সেটি এই :

"If any one amongst the Brahmans of the Deccan can claim to be truly *the father of Indian unrest,* it is Bal Gangadhar Tilak."

তিলকের জনজীবনের প্রতিটি কাজকে নিন্দা করতে-করতে অগ্রসর হয়ে চিরল যখন ১৮৯৫-৯৬ সালে পৌঁছে গেলেন তখন দেখলেন—গোটা মহারাষ্ট্রকে তিলক একেবারে মুঠিতে ধরে ফেলেছেন। যথে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশ করে তিনি সরকারকে 'ঔদ্ধত্যের' সঙ্গে আক্রমণ করে যাচ্ছেন, পুনা মিউনিসিপ্যালিটিকে কব্জা করেছেন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, তরুণ-প্রবীণ নির্বিশেষে সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং ১৮৯৬ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে 'কর-বন্ধ' আন্দোলন পর্যন্ত করেছেন। এই প্রকার মানুষকে দমন করতেই হয়। চাপেকর-ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ১৮৯৭ সালে র‍্যান্ড ও আয়ার্স্ট হত্যাকাণ্ডের পরে তিলককে কেশরীতে প্রকাশিত শিবাজী-বিষয়ক এক বক্তৃতার সূত্রে ১৮ মাস জেলে পাঠানো হল, যেটি অবশ্যই চিরলের বিবেচনায় "অল্প সময়ের কারাবাস।" [প্রসঙ্গটি 'সমকালীনের' চতুর্থ খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।]

কারামুক্তির পরে তিলক কিভাবে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে সারা ভারতের সমর্থনকে সম্মিলিত করেছিলেন, এবং বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন রাজানুগত মডারেটদের—তার রাগত বিবরণ দেবার পরে, নিরপেক্ষতার বিরক্তিকর দায়ে পড়ে চিরলকে বলতে হয়েছিল, বোম্বাইয়ে বস্ত্রশ্রমিকদের দুঃখদুর্দশা দূরে করার জন্য তিলক কিছু উত্তম কাজ করেছিলেন, কিন্তু সকলই গরল ভেল, কারণ তিনি "বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবে সবকিছু ডুবিয়ে দিতেন।" সর্বনাশা ঐ লোকটি, অসম্ভব জনপ্রিয়, গোখলের পালের বাতাস কেড়ে নিয়েছেন, সারা ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা, যাঁর গৃহ বিদ্রোহীদের তীর্থক্ষেত্র :

"Not even Mr. Gokhale with all his moral and intellectual force could stem the flowing tide of Tilak's popularity in the Deccan any more than Ranade had been able to do so 10 or 15 years before..Tilak commanded the allegiance of barristers and pleaders, school masters and professors, clerks in Government offices ;..and his propaganda had begun to filter down not only to the coolies in the cities, but even to the rayats, or at least the head-men in the villages.

"More than that. From the Deccan..his influence was projected far and wide. His house was a place of pilgrimage for the disaffected from all parts of India. His prestige as a Brahman of the Brahmans,..his reputation for profound learning in the philosophies both of the West and the East, his trenchant style, his indefatigable activity, the glamour of his philanthropy, his accessibility to high and low, his many acts of genuine kindliness, the personal magnetism which, without any great physical advantages, he exerted upon most of those who came in contact with him, and especially upon the young, combined to equip him more fully than any other Indian politician for the leadership of a revolutionary movement."

এর পরে আর বুঝতে অসুবিধা হয় না, বৃটিশ ভারতে তিলকের জীবনের মেয়াদ হ্রাস করা কেন প্রয়োজন ছিল। চিরল বোম্বাইয়ের গভর্নর স্যার জর্জ ক্লার্কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। "যদিও বিচারকালে ও পরে মারাত্মক দাঙ্গা হয়েছিল যা হাঙ্গামাপ্রবণ কোনো-কোনো শ্রেণীর

মানুষের উপর, প্রধানতঃ শহরের মিল-মজুরদের উপর, তিলকের নিরতিশয় দুষ্ট প্রভাবের প্রকৃতি ও *পরিমাণ দেখিয়ে দেয়"*, *তথাপি স্যার জর্জ তিলককে শাস্তি দেবার দায়িত্ব* এড়ান নি। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সংগে চিরল লিখেছেন, এই লৌহমুষ্টি হানার উত্তম ফলই হয়েছিল—জাতীয় আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিল :

"..it was by the prosecution of Tilak that the forces of unrest in the Deccan lost their ablest and boldest leader—perhaps the only one who *might* have concentrated their direction, not only in the Deccan, but in the whole of India, in his own hands and given to the movement, with all its varied and often conflicting tendencies, an organisation and unity which it still happily seems to lack."

তিলককে জনজীবন থেকে সরিয়ে দেবার ব্যাপারে মডারেটদের গোপন উস্কানি ও উৎসাহ ছিল কিনা, এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। ভ্যালেন্টাইন চিরল এক্ষেত্রে কিছু মারাত্মক ইঙ্গিত করেছেন। মডারেটরা প্রকাশ্যে তিলকের শাস্তিকে সংবর্ধনা জানাতে না পারার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বলে তিনি দুঃখিত কিন্তু অপ্রকাশ্যে তাঁরা সরকারের পাদস্পর্শ করেছিলেন সরকারের উক্ত মহাকীর্তির প্রতি নমস্কারে—তা খুশিমনে জানিয়েছেন :

"Sir George Clarke,...though..failed to secure the active support which he might have expected from the Moderates, there were few of them who did not secretly approve and even welcome his action."

নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনাকালে মহারাষ্ট্র ও তিলক-প্রসঙ্গ বাদ থাকতে পারে না, তিলককে বাদ দিয়ে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির কথা ভাবাই যায় না। তাই কিছু বিস্তারিতভাবে তিলক-প্রসঙ্গ উপস্থিত করতে হল। বিস্ময়ের কথা, নিবেদিতার চিঠিতে তিলকের কথা খুব অল্পই আছে। এরকম হওয়ার সহজবোধ্য কারণ, নিবেদিতা চিঠিপত্রে বিপজ্জনক রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিষয়ে বলতেন না, অন্ততঃ নামোচ্চারণ করে। যদি তিনি তিলককে কোনো ছদ্মনামে চিহ্নিত করে থাকেন, আমরা তা জানি না। স্মর্তব্য, ইংলণ্ডে অবস্থিত র‍্যাটক্লিফকে পাঠানো চিঠি ছাড়া অরবিন্দের নামও নিবেদিতার চিঠিতে পাই না। ১৯০৮ সালে তিলকের মামলা যখন চলছিল তখন নিবেদিতা ইংলণ্ডে ছিলেন, সেই প্রকাশ্য বিচার সম্বন্ধে তাঁর বলার বা করার কিছু ছিল না। সে যাই হোক, তিলকের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ পরিচয় যথেষ্টই ছিল। ১৯০৫, বেনারস কংগ্রেসের সময়ে তাঁরা নিশ্চয় আলাপ-আলোচনা করেছেন। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে তাঁর সঙ্গে তিলকের সাক্ষাৎ হয়ে থাকতে পারে (নিবেদিতা অবশ্য অসুস্থতার জন্য ঐ কংগ্রেসে যোগদান করেন নি), এবং চরমপন্থী দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য তিলকের সঙ্গে চিন্তাবিনিময় না হবার কথা নয়। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, *গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার বন্ধুত্ব সত্ত্বেও রাজনৈতিক ধারণায় তিলকের সঙ্গেই নিবেদিতার ঐক্য* ছিল বেশি। ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে নিবেদিতা যখন ভারত-সফর করে বিভিন্ন মহলে সংযোগ স্থাপন করছিলেন, তখন তিলকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়েছিল, তিলকের কাগজে তাঁর বক্তৃতাদির দীর্ঘ বিবরণ বেরিয়েছিল, তা নিবেদিতার চিঠি থেকেই দেখতে পাই। ১ অক্টোবর ১৯০২, মিস ম্যাকলাউডকে বোম্বাই থেকে লেখা চিঠিতে সেখানে কয়েকটি বক্তৃতার উল্লেখ করার পরে নিবেদিতা বলেছেন : "আমি তোমাকে প্রথম বক্তৃতাটির যে-দীর্ঘ বিবরণ তিলকের

[কেশরী] কাগজে বেরিয়েছে, তা পাঠাব। তুমি কাগজটি [মরাঠি ভাষায় বলে] পড়তে পারবে না, কিন্তু বিবরণটি কোথায় আছে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।" [বিবরণটি সচিত্র ছিল]।

তিলক ও তাঁর চরমপন্থী সহযোগীদের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের বিষয়টি বোঝা যায় গোখলেকে লেখা ৫ অক্টোবর, ১৯০৪ তারিখের চিঠি থেকে। নিবেদিতা স্থির করেছিলেন, ঐ বৎসর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ক্রিস্টিনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করবেন। ঐ সময়ে কয়েকদিন পুনাতে কাটাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন : "পুনার ব্যাপারে কি মিঃ তিলককে লিখব? কিংবা এর ব্যবস্থার ভার তোমার বা অন্যান্যদের উপর ছেড়ে দেব? আমি নাগপুরের মিঃ কোলাটকর এবং অমরাবতীর মিঃ খাপার্দের সঙ্গেও দেখা করতে চাই।" ভারততাত্ত্বিক হিসাবে তিলককে নিবেদিতা প্রভূত শ্রদ্ধা করেছেন। স্বামীজীর মুখ থেকে তিনি অবশ্যই তিলকের এই পরিচয়টির বিষয়ে অবহিত হন। ১ নভেম্বর ১৯০৫, মিসেস উইলসনকে লেখা চিঠিতে তিলকের "ওরিয়ন" এবং "আর্কটিক হোম ইন দি বেদস্" বই দুটির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করলেও, তাদের মধ্যে তিনি ঠিক-ঠিক প্রবেশ করেন অনেক পরে, এবং একেবারে মুগ্ধ হন। বিখ্যাত খ্রীস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক ডঃ টি কে চেনীকে ২৪ অগস্ট ১৯১১, লিখেছেন : "আমি এই প্রথম তিলকের 'ওরিয়ন' পড়ছি। তাঁর এবং হেউইট-এর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমার মনে হয়েছে, পুরাতন কালগণনার পদ্ধতি থেকে অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা যায়।" ৩১ অগস্ট ১৯১১, একই জনকে লিখেছেন : "তিলকের অপূর্ব প্রথম গ্রন্থ 'ওরিয়ন' পড়ছি, এবং প্রাচীন কালগণনারীতির স্বীকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করছি। তিলক ভারতীয় সাহিত্যের নিদর্শন থেকে খ্রীস্টপূর্ব ৬ হাজার বছর পুরাতন সময় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট থিয়োরী উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। ঐ ধরনের একটা জিনিসের সত্যতা সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত। তিনি মনে করেন, ঋগ্‌বেদের অধিকাংশ স্তোত্র খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার থেকে খ্রীস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরের মধ্যে রচিত। ঐ সময়টিকে তিনি ওরিয়ন পর্ব বলেছেন।"

এসব সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিলকের অধিক উল্লেখ নিবেদিতার পত্রে বা রচনায় না থাকা কিছু বিস্ময়কর। তিলকের সমাদরের ক্ষেত্রে কি গোখলের প্রভাব আড়াল তুলেছিল? কথাটা সত্য মনে হয় না, কারণ গোখলের দারুণ বিরোধী অরবিন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতা উচ্ছ্বসিত। তবে কি তিলকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে নিবেদিতা কিছু সন্দিগ্ধ ছিলেন, তিলকের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনায় তিনি চিন্তিত ছিলেন? এর পক্ষেও যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তবে এটা দেখা গেছে যে, তিনি অরবিন্দকেই ন্যাশনালিস্টদের নেতা বলে চিহ্নিত করেছেন, এবং বলেছেন, রক্ষণশীল মহারাষ্ট্রীয়রা এই নবজাতীয়তার তাৎপর্য বুঝতে সমর্থ নন। নবজাতীয়তা ক্ষত্রধর্মকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হবে।

তথাপি আমার ধারণা, এইসকল চিন্তা অলস চিন্তা ছাড়া কিছু নয়। চিতপাবন ব্রাহ্মণ তিলকের জনসাধারণ সম্পর্কে ঐকান্তিক আগ্রহ এবং ব্যাপক জনসেবা নিবেদিতার দৃষ্টি এড়াতে পারে না, এবং মনে করি, কোনো না কোনো সময়ে নিবেদিতা ও তিলকের গভীর রাজনৈতিক সম্পর্কের তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের চমকিত করে দেবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জনের উদ্‌ঘাটনে নিবেদিতা

॥ ১ ॥ কার্জন সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রাথমিক ধারণা ও তার রূপান্তর

নিবেদিতা যদি কখনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী শাসককে সর্বাঙ্গীণভাবে ঘৃণা করে থাকেন—তিনি লর্ড কার্জন। কার্জনের উল্লেখ করতে গেলে তাঁর ভাষা নিরতিশয় তিক্ত হয়ে উঠত। কার্জনকে আক্রমণের কোনো সুযোগ তিনি ছাড়েন নি। তাঁর চিঠিপত্রে ও রচনায় কার্জন নীচ, ক্রূর ও দম্ভী—ভারত ও ইংলন্ডের স্বার্থের প্রধান শত্রু।

জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন (১৮৫৮-১৯২৫), ("ফার্স্ট ব্যারন কার্জন অব কেডলস্‌টন", পরে "ফার্স্ট মার্কুইস কার্জন অব কেডলস্‌টন")—তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসকজীবনের প্রায় সূচনাকাল থেকে—১৮৯১-৯২ সালে যখন "আন্ডার-সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া" পদে অধিষ্ঠিত হন তখন থেকে—ভারত-ব্যাপারে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৯৫-৯৮ সালে তিনি "আন্ডার-সেক্রেটারি ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স।" তারপরে ১৮৯৮-১৯০৫ সাল অবধি ভারতের ভাইসরয়। সেনাধিনায়ক এইচ এইচ কিচনারের সঙ্গে মতভেদের কারণে তাঁকে শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করে চলে যেতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি নানা উচ্চ সরকারী পদে কাজ করেছেন। ভারতে ভাইসরয় থাকাকালে, বা পূর্বে, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সমস্যা ও অভিজ্ঞতার উপরে লেখা কার্জনের কয়েকটি বই বেরিয়েছে, যাদের মধ্যে "প্রবলেমস্‌ অব দি ফার্‌ ইস্ট" (১৮৯৪) বইটি নিবেদিতার কল্যাণে ভারতবর্ষে কার্জনের পক্ষে অবাঞ্ছিত প্রচারলাভ করে।

কার্জনের ভাইসরয়-কার্যকালের গোটা সময়টি নিবেদিতার ভারতীয় জীবনকালের মধ্যে পড়েছিল ; তদুপরি বঙ্গভঙ্গ কার্জনেরই কীর্তি—তাই নিবেদিতার পত্রে ও রচনায় কার্জনের বহুল উল্লেখ আছে।

কার্জন নিজ কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সর্বদাই গর্বোদ্ধত। "যদি আমাকে আমার [ভারতীয়] কার্যাবলীর বিবরণ সংক্ষেপে বলতে হয় তাহলে আমি এক কথায় বলব, কর্মদক্ষতা"—কার্জন বলেছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী লোকটি সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন : তিনি নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংলন্ডের উচ্চাভিলাষের প্রতিভূ বিবেচনা করেছিলেন ; সে মিশন আর কিছু নয়, "আইন ছাড়াই নিম্নজাতদের শাসন করা।" শাসনসংস্কারক হিসাবে তাঁর পরিস্ফীত দাবির কল্পনাতীত অহমিকা, তাঁর অবিশ্রান্ত কাজ, আড়ম্বর, নাটকীয় ভঙ্গি, এ সমস্তকিছু

কেবল তাঁর দম্ভগর্ভ উচ্চাভিলাষের নির্দেশক নয়, অধিকন্তু তাতে আছে স্বদেশীয় অপরাপর ছোকরাদের সমঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা—দ্যাখো হে, কি ক'রে ঠিকভাবে সরকার চালাতে হয়।১ ভারতবর্ষ সম্পর্কে কার্জনী দক্ষতার সমাদরকারী সামুয়েল স্মিথ বলেছেন, "সহৃদয় স্বেচ্ছাচারিগণই এশিয়াবাসীর পক্ষে আস্‌লি আদমী। ভারতবর্ষের চাই আধুনিক আকবর।" বলাবাহুল্য সেই আকবরটি হলেন ন্যাথানিয়েল কার্জন।২

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে নিবেদিতাকে কার্জনী-দক্ষতা সম্বন্ধে সমাদরের মনাভাবে ভরপুর দেখি। ব্যাপারটা আপাততঃ বিস্ময়কর মনে হলেও তার নিরাকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু আগেই পরিবেশন করেছি : ইংলন্ড থেকে ভারতে সদ্য-আগত মার্গারেট নোবলের তৎকালীন মনোভাব ছিল—বৃটিশ শাসনের দোষ আছে ঠিকই, কিন্তু ঘষা-মাজা করে দোষ উঠিয়ে দিতে পারলে ও-শাসন ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর দাঁড়াবে। কার্জন নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসকের ভূমিকায় সে কাজ করতে পারবেন—নিবেদিতা মনে করেছিলেন। উপরে উল্লিখিত সামুয়েল স্মিথ-এর কথাগুলির পূর্বরূপ আমরা যেন নিবেদিতার ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯, চিঠিতে পেয়ে যাই :

"সরকার অতীব জনপ্রিয়। লর্ড কার্জন শক্ত মানুষ বলে প্রতীয়মান, এবং সহৃদয়। শক্তির চেহারা সকলকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিয়েছে।...এই শাসনকালে বিভিন্ন দলের কার্যাবলী লক্ষ্য করবার পক্ষে চিত্তাকর্ষক বিষয় দাঁড়াবে। ভারতবর্ষ কি সহৃদয় হবার মতো শক্তি ধরে এমন স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে সর্বাপেক্ষা সুখী হবে?"

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ থেকে নিবেদিতার ভারত-সংক্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টি বদলে যাচ্ছিল, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি প্রচণ্ড বৃটিশ শাসন-দ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন —তা আমরা দেখেছি। সুতরাং কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ; এবং দরিদ্র ভারতবাসীর অনুভূতি সম্বন্ধে অসাড়তার নিদর্শন—১৮০,০০০ পাউন্ড ব্যয়ে আয়োজিত দিল্লী দরবারের রাজকীয় তামাশা—এসকল বিষয়ে নিবেদিতার মনোভাব অনুমেয়। না, অনুমানের প্রয়োজন নেই, নিবেদিতার চরিত্রের ছায়ায় রচিত উইলিয়ম স্টেডের সিস্টার রোজের এই বিষয়ক মনোভাব থেকে তা স্পষ্ট দেখা যায়। [সে রচনার কিয়দংশ উইলিয়ম স্টেড-প্রসঙ্গে পরে উপস্থিত করব]। নিবেদিতা ২৯ ডিসেম্বর, ১৯০২, সরাসরি চিঠিতে লিখেছেন : "সকল ভণ্ড ও হতভাগ্য দরবারের জন্য দিল্লীতে গেছে।" দিল্লীর দরবারে যে-সকল দেশীয় রাজা সম্মান কুড়ুতে গিয়েছিলেন তাঁরা সেখানে অসম্মানিত হন, ফলে তাঁদের মর্যাদাবোধ নাড়া খেয়েছে—এটা ধরে নিয়ে নিবেদিতা কিছুটা খুশির সুরে লিখেছিলেন (২৮.১.১৯০৩) :

"এই সেদিন যে দরবার হয়ে গেল—তার থেকে ভারত নতুন ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করল। এখনকার একটি ছেলে এক দেশীয় রাজ্যের রাজকর্মচারীর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল

---

১ ত্রিপাঠী, ৫২—৫৩।
২ ঐ, ৪৭।

—'দিল্লীর দরবার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?' সে উত্তর দিয়েছিল, 'আমার ধারণা হচ্ছে, আমাদের সকল রাজা-মহারাজা চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছেন।' সুতরাং ভারতবর্ষ পূর্ব দরবারের পরবর্তী এই পঁচিশ বছরে যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ ক'রে ফেলল। এর পরবর্তী পঁচিশ বছরের মধ্যে সে না-জানি কোথায় উপস্থিত হবে?"

এই চিঠিতে নিবেদিতা 'শয়তানকে তার পাওনা' দেবার চেষ্টা করেছেন : "লর্ড কার্জন একটি বিকট ভাইসরয়। তাঁর বিষয়ে স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন আমাকে যা বলেছেন তা খুবই সত্য : 'যেমন সমর্থ তেমনি আম্মাদরী, তেমনি উচ্চাভিলাষী।' এই পর্যন্ত তার ভালোর দিক—কাজকর্মে এক ধরনের ঔদার্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা, অবিচারের ভিত্তিতে নির্মিত আইনকে কঠোর বিচারের দ্বারা প্রয়োগের ইচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি।"

কিন্তু শয়তানের জন্য কোনো পাওনা শেষপর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না, এই চিঠিতেই তার লক্ষণ আছে। নিবেদিতা লিখেছিলেন : "আমরা সম্প্রতি একটি ইউনিভার্সিটি কমিশন পেয়েছি, যা সর্বপ্রকার শিক্ষাকে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানশিক্ষাকে, হত্যা করার ব্যবস্থা করছে। ভারতের সম্বন্ধে এই বিশেষ অন্যায়টি আমাকে জ্বালিয়ে তুলছে। ভারতের 'ভারত' থাকার অধিকার, নিজের জন্য চিন্তা করার অধিকার, জ্ঞানের অধিকার—হরণ করা হচ্ছে। এই বিরাট অভিযোগটি যদি সামনে না থাকত তাহলে আমি তার খাদ্যের অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার, বা অন্য অধিকারের পক্ষে জ্বলে উঠতাম। কিন্তু এখন পূর্বোক্ত ব্যাপারটি সব ঢেকে দিছে।"

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা সংকোচ-ব্যবস্থা করার জন্য নিবেদিতা যেমন কার্জনকে কখনো ক্ষমা করেন নি, তেমনি অন্যদিকে কার্জন ভারতবাসীর পক্ষে ও-বস্তুর কোনো প্রয়োজন আছে মনেই করেন নি। ভারতীয়দের চরিত্র ও বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে খুবই নিম্ন ধারণা নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছিলেন। সেইসঙ্গে সতর্কও ছিলেন—পাছে ভারতবাসীর বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি বেড়ে যায়। এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্যে তিনি উচ্চশিক্ষার মান উচ্চে তোলার নাম ক'রে সিমলায় ১৯০১ সেপ্টেম্বরে এক শিক্ষা-সম্মেলন ডাকলেন। তাতে কিন্তু কোনো ভারতীয় শিক্ষাবিৎ আমন্ত্রিত হলেন না।৩ তারপর ১৯০২ জানুয়ারিতে গঠিত 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ কমিশন' কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের সুপারিশগুলি কিছু গ্রহণ ক'রে, এবং প্রয়োজনমাপে পরিবর্তিত ক'রে, ১৯০৪ সালে কার্জন যে 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' পাস করালেন, তার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারের তাঁবেদার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। সেইসঙ্গে বেসরকারী কলেজগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হল, কেননা সরকার তাদের ভাগ্যনির্ণয়ের অধিকার গ্রহণ করেছেন। পরিস্থিতির বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের মন্তব্য : "নতুন আইনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পৃথিবীর মধ্যে চূড়ান্ত প্রকারে, আগা-পাশ-তলা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।"৪

৩ নিমাইসাধন, ১৩২।
৪ ত্রিপাঠী, ৫৬।

শিক্ষার উপরে এই হস্তক্ষেপকে নিবেদিতা মানুষের পবিত্রতম অধিকারে হস্তক্ষেপ মনে করেছেন। ৪ জুলাই, ১৯০৪, লিখলেন : "তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, জনগণকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার চাপ ক্রমে কত বেড়ে উঠছে। কিন্তু যদি চাকায় কাঁধ লাগাতে পারি তাহলে আমার এই বড় রকমের আশা—চিন্তার স্বাধীনতার উপরে সরকারের প্রতিটি আঘাত জ্ঞানকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবে গভীর থেকে আরও গভীরে, তাকে দৃঢ়তর, সত্যতর করে তুলবে। এমন মনে করার কারণ, জনগণ ন্যূনতম জিনিসটি পেয়ে গেছে—তার থেকে তাদের আর বঞ্চিত করা যাবে না। যদি আমার বিচার ঠিক হয় তাহলে দেখা যাবে—লর্ড কার্জন ভারত-বর্ষে সর্বাধিক বৃটিশবিরোধী প্রভাবরূপে উল্লিখিত হবেন।"

কার্জনের আক্রমণ থেকে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কী পেয়েছে সে সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন (১৮.৭.১৯০৬) :

"ভেবে দ্যাখো, যে-বাড়িটিতে গত বছর অসুস্থতার সময়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে এগারো-বারো লক্ষ টাকা ব্যয়ে পলিটেকনিক খোলা হচ্ছে। 'জনগণের দ্বারা জনগণের শিক্ষা'—অবশেষে তার জন্ম হল ভারতবর্ষে। স্বামীজী থাকলে এই দিনটিতে কী-না উল্লসিত হতেন। লর্ড কার্জনই জনগণকে বুঝিয়ে ছেড়েছেন—শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের অভিপ্রায় মিত্রোচিত নয়। সুতরাং তাদের পক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই—তারা সেটা জেনে গেছে।"

কার্জনের শিক্ষাবিষয়ক কুকীর্তিকে নিবেদিতা কদাপি ভুলতে পারতেন না। ২৫ নভেম্বর ১৯০৯ তারিখেও লিখেছেন : "কার্জন ভারতে বিজ্ঞানকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।" যোগ করেছেন : "সকলেই জানে, বয়কট ও বিজ্ঞানই ভবিষ্যতের নিয়ামক।" নিবেদিতা বক্তৃতাতেও কার্জনের শিক্ষাসংকোচ নীতিকে আক্রমণ করেছেন।৫

॥ ২ ॥ কার্জনের কনভোকেশন-ভাষণের উপর নিবেদিতার 'বজ্রাঘাত' ও তার ফলে ব্যাপক আন্দোলন

রাজনৈতিকভাবে নিবেদিতা কার্জনকে যথার্থ বিপাকে ফেলেছিলেন একবার—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জনের কনভোকেশন বক্তৃতাসূত্রে। কার্জন মনে করতেন, তিনি একদেহে 'মহান আচার্য' এবং 'মহান সংস্কারক'। সুতরাং তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন-সভায় (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫) দাঁড়িয়ে স্বাচ্ছন্দে সদর্পে প্রাচ্যবাসীকে মিথ্যাবাদী বলতে পেরেছিলেন। তিনি ছাত্রদের যত্ন করে বুঝিয়েছিলেন—অসত্য কাকে বলে। এবং সত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ যে বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্যের সৃষ্টি, তাও বলতে ছাড়েন নি। অতীব উদ্দীপনায় বলেছিলেন—পাশ্চাত্যের নীতিকথায় 'সত্য' প্রাচ্যের তুলনায় উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত। তিনি অধিকন্তু ছাত্রদের কাছে সৎ ও অসৎ, উভয়প্রকার তোষামোদের চরিত্র নির্ণয় করে, উভয় বস্তু থেকে ছাত্রদের দূরে থাকার সদুপদেশ দিয়েছিলেন।

৫ আত্মপ্রাণা, নিবেদিতা জীবনী (২য় সংস্করণ) ১৭৬-৭৭।

প্রাচীন ও নবীন সুশিক্ষিত ভারতীয়দের দ্বারা হল ভর্তি। সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনে গেলেন বিনা প্রতিবাদে—তাঁরা মিথ্যাবাদী জাতির মানুষ। একজনের মর্যাদায় কিন্তু কথা-গুলো ভয়ানক আঘাত করেছিল। তিনি আঘাত ফিরিয়ে দিতে জানতেন।

"ঐ কনভোকেশন-সভায় ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন।...তিনি সভা হইতেই উত্তেজিত অবস্থায় গুরুদাস ব্যানার্জিকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গেলেন। লর্ড কার্জনের 'প্রবলেমস্ অব দি ইস্ট' পুস্তকটি বাহির হইল।"৬

তারপর?

ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বাণীদানের দাক্ষিণ্যে আত্মতৃপ্ত লর্ড কার্জন ১৩ ফেব্রুয়ারির প্রভাতে অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নের সংবাদটি পড়লেন (যদি তিনি ঐ প্রভাতে সত্যই অমৃতবাজার পান করে থাকেন!):

নানাবিধ ভূমিকায় লর্ড কার্জন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার-রূপে
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ তারিখে কনভোকেশনে
তাঁর ভূমিকা

"কোনো ব্যক্তির বাক্য অথবা কার্য যদি কারো চরিত্র সম্বন্ধে, অপর মানুষের আচরণ সম্বন্ধে, ঘটনা সম্বন্ধে, কিংবা জীবনের তথ্য সম্বন্ধে, ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে, তাহলে তার নাম অসত্য।...

---

৬ গিরিজাশঙ্কর, শ্রীঅরবিন্দ, ৩৭০।

একই কাহিনী ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন—"ভারতের জাতীয় কংগ্রেস" (২য়, পৃ. ১৪) গ্রন্থে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কার্জনের কনভোকেশন-ভাষণের উল্লেখের পরে লিখেছেন: "বক্তৃতান্তে তিনি চলিয়া যাইবার পর—যখন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়জন সম্ভ্রান্ত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের প্রবেশকক্ষে দাঁড়াইয়া সেই অপমানজনক উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করেন, কাহারও নিকটে কি কার্জনের 'প্রবলেমস্ অব দি ফার ইস্ট' পুস্তক আছে? উহা গুরুদাসবাবুর কাছে ছিল। নিবেদিতা তাঁহার সহিত তাঁহার গৃহে যাইয়া উহা আনয়ন করেন।...ভগিনী নিবেদিতা যে-পল্লীতে বাস করিতেন, সেই পল্লীতে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয় অবস্থিত। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় লর্ড কার্জনের ঐ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন—লর্ড কার্জন স্বয়ং মিথ্যাসক্ত ও তোষামোদকারী। ঐ পত্রে লর্ড কার্জনের বক্তৃতার আপত্তিকর অংশ ও এই স্বীকৃতি পাশাপাশি প্রকাশিত হইল। লর্ড কার্জনের পক্ষে যেন জলোকার মুখে চূণ পড়িল। বিখ্যাত সাংবাদিক গার্ডিনার এই ব্যাপারে মন্তব্য করেন—'India was dissolved in laughter. It almost forgot the insult for the sake of the jest'.

"আমার মতে, সত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ বহুলাংশে পাশ্চাত্যদেশীয় ধারণা।...

"নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাচ্যদেশে সম্মানের স্থান গ্রহণ করবার পূর্বেই পাশ্চাত্যদেশের নীতিকথায় সত্য উচ্চতর স্থান গ্রহণ করেছিল।

"তোষামোদ—সৎ বা অসৎ, দুইই হতে পারে। তা যে-আকারেরই হোক, তোমরা তাকে পরিহার করবে। প্রথম প্রকারের হলেও তা মিথ্যা। আর দ্বিতীয় প্রকারের হলে সে তো জঘন্য।..."

'প্রবলেমস্ অব দি ফার ইস্ট্' গ্রন্থে (পৃ. ১৫৫-৫৬)
লর্ড এন কার্জনের চেহারা

"রাজসভায় যাত্রার আগে কোরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি এক সাক্ষাৎকার উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

"সেখানে প্রশ্ন ও উত্তরের কিছু-কিছু অংশ আমার স্মরণে আছে। আমাকে বিশেষ-ভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, আমি কদাপি যেন স্বীকার না করি যে, আমার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর, কারণ কোরিয়ায় ঐ বয়সেই কেউ সম্মানভাজন হতে পারে না। তাই প্রেসিডেন্ট যখন আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন (যে-প্রশ্ন প্রাচ্যদেশে অবধারিতভাবে প্রথমেই করা হয়) : 'আপনার বয়স কত?'—আমি দ্বিধাহীনচিত্তে বললাম, 'পঞ্চাশ'। তিনি বললেন, 'প্রিয় মহাশয়, বয়সের তুলনায় আপনাকে তো রীতিমতো তরুণ দেখায়। এটা কিভাবে সম্ভব হল?' 'সম্ভব হল এই কারণে', আমি উত্তর দিলাম, 'মহামহিম মহারাজের রাজ্যের অপূর্ব আবহাওয়ায় আমি মাসাধিককাল ভ্রমণ করেছি।' শেষে তিনি বললেন, 'আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি ইংলন্ডের মহারাণীর নিকট-আত্মীয়।' 'না তো, আমি তা নয়।' কিন্তু যখন দেখলাম, আমার উত্তরে তাঁর মুখের উপর বিতৃষ্ণার ছায়াপাত হল তখন সানন্দে যোগ করলাম, 'আমি অবশ্য অদ্যাপি অবিবাহিত'—এই নীতিহীন ইঙ্গিতের দ্বারা আমি সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রসন্নতার প্রসাদ পুনরায় পুরোপুরি অর্জন করে ফেললাম।"

এইখানে এইটুকু সংযোজন করা যায় [অমৃতবাজারের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছিল], কোরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে লর্ড কার্জনের এই সাক্ষাৎকার-বিবরণ 'প্রবলেমস্ অব দি ফার ইস্ট্' গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ থেকে বুদ্ধিমানের মতো বাদ দেওয়া হয়েছে।

"নিবেদিতাই যে লর্ড কার্জনের দাম্ভিকতা ভূমিতে লুণ্ঠিত করাইয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানিতে পারেন নাই। কোনো বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক—তাহা কোনো অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন হিন্দুর কার্য বলিয়াছিলেন।" ['ভগিনী নিবেদিতা', উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৮, ১৬১]।

উদ্ধৃতি থেকে দেখা গেল, কার্জন কেবল ডাহা মিথ্যাবাদী নন, মিথ্যার প্রদর্শনীও ভালবাসেন। তিনি যে কোরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের প্রেসিডেন্টের কাছে নিজের বয়স ভাঁড়িয়েছিলেন, রাজপরিবারে নিজের বিয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মিথ্যা-চতুর ইঙ্গিত করেছিলেন—তা তিনি করতেই পারেন, স্বদেশের প্রয়োজনে বেতনভোগী রাজনৈতিকদের সেকাজ করতেই হয়—কিন্তু কারো আত্মশ্লাঘা তার বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্পূর্ণ ঢেকে দেবার মতো স্ফীত না হলে সে ব্যক্তি কদাপি বই লিখে সেই সংকার্যের বিবরণ দেয় না। নিবেদিতা-প্রদত্ত তথ্যগুলি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হয়ে কার্জনের ফাঁপানো চেহারাকে একেবারে চুপসে দিয়েছিল। কার্জন তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে এমনভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন কিনা সন্দেহ। এবং এমনভাবে অপমান আর কখনো তাঁকে হজম করতে হয়নি। কার্জনের মতো দম্ভী লোক নিন্দা সহ্য করতে, এমনকি উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু হাস্যাস্পদ হওয়া তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক।

অমৃতবাজারে সংবাদটি বেরুবার ঠিক পরদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ইংরাজদের কাগজ স্টেটসম্যান, "লর্ড কার্জন অ্যাজ্ ওরিয়েন্টাল ডিপ্লোম্যাটিস্ট" শিরোনামায় সেটি পুরো উদ্ধৃত করেছিল। তার গোড়ায় স্টেটসম্যান মন্তব্য করে : "লর্ড কার্জনের কনভোকেশন বক্তৃতার উপরে এতাবৎ-প্রাপ্ত সবচেয়ে মনোরম মন্তব্য অমৃতবাজারে বেরিয়েছে, যা নিম্নে উদ্ধৃত হল।"

আত্মপ্রাণা জানিয়েছেন, এইসূত্রে স্টেটসম্যানে মন্তব্য করা হয় :

"একটি ক্ষুদ্র সুস্বাদু কমেডি দিয়ে আনন্দ-আসরের সমাপ্তি হয়েছে—সেটি না থাকলে কনভোকেশন-নাট্যের পূর্ণতা ঘটতে পারত না। আহা, হিজ এক্সেলেন্সিকে কি প্রচুর দে'তো হাসি পরদিন প্রভাতে নির্ঘাত হাসতে হয়েছিল যখন তিনি দেখলেন—আমাদের তৎপর সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকা পাশাপাশি দুটি ছবি তুলে ধরেছে—'কনভোকেশনে বিরাজমান চ্যান্সেলার মহোদয়' এবং 'কোরিয়ায় অবস্থিত লর্ড কার্জন।' এই যে দুটি ছবি ভারতবর্ষে এত বিশুদ্ধ আনন্দদান করল, অনতিবিলম্বে ইংলন্ডেও তা একই কাজ করবে—গোটা রম্যানুষ্ঠানটির দাম তা পুষিয়ে দিয়েছে। আর সুন্দরতম ব্যাপার হল—যে-অভিনেতা জনগণের কাছে এহেন বিশুদ্ধ আমোদের উৎস খুলে দিলেন, তিনি নিজে সে সম্বন্ধে ছিলেন পুরো অসচেতন।"

অমৃতবাজারের সংবাদে সাংবাদিক চতুরতার চমৎকার নিদর্শনটি কার অবদান তা ঐসময়ে কেবল অন্তরঙ্গ মহলেই জানা ছিল। নিবেদিতাকে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন : "কে লেখাটি লিখেছে তা ওরা [শাসকেরা] জেনে ফেলুক তা আমি চাই না। বজ্রকে তো কৃষ্ণ মেঘের অন্তরালে থাকতে হবে।"৭

এই ব্যাপারে নিবেদিতার কীর্তির মধ্যে কার্জনের বিরুদ্ধে স্টেটসম্যানের আক্রমণকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা সাধারণতঃ করা হয়না। এই সময়ে, র‍্যাটক্লিফের সাক্ষ্য অনুযায়ী,

৭ আত্মপ্রাণা, ১৮৫।

[রেম্‌-এবর্‌-কে সাক্ষাৎকারকালে র‍্যাটক্লিফ যে-কথা বলেছেন] নিবেদিতা নিয়মিত স্টেটস-ম্যানে লিখেছেন—সম্পাদকীয় পর্যন্ত। সুতরাং ১৪ ফেব্রুয়ারি স্টেটসম্যান উপাদেয় ব্যঙ্গসহ অমৃতবাজারের সংবাদটি যে, উদ্ধৃত করেছিল তার পিছনে নিবেদিতার তাগিদ স্বচ্ছন্দে অনুমান করে নিতে পারি। কেবল তাই নয়, স্টেটসম্যান আরও কিছু করেছিল, যার বিষয়ে এতাবৎ বিশেষ নজর পড়েনি।

১১ ফেব্রুয়ারি শনিবার কার্জন কনভোকেশন বক্তৃতা করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার দেশীয় ইংরাজি কাগজগুলিতে, আমি যতদূর দেখেছি, উক্ত বক্তৃতা এবং সমাবর্তন-অনুষ্ঠানের রিপোর্টের অতিরিক্ত আর কিছু বেরোয়নি। ১৩ তারিখ সোমবার বেঙ্গলী কাগজ বন্ধ, অমৃতবাজার বেরিয়েছিল, তাতেই উক্ত 'নানাভূমিকায় কার্জন' সংবাদটি বেরোয়। ১৪ তারিখ থেকে দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে অনর্গল প্রতিবাদমূলক সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র বেরুতে থাকে। [যেমন বেঙ্গলীতে ১৪, ১৫, ১৬ তারিখে পরপর তিনটি সম্পাদকীয় এইসূত্রে বেরিয়ে যায়। অমৃতবাজারে ১৫, ১৬, ১৭ ফেব্রুয়ারি এই ব্যাপারে সম্পাদকীয় বেরোয়]। কিন্তু এঁরা কেউই কনভোকেশন-বক্তৃতার পরদিন কনভোকেশন-রিপোর্ট ছাপার সঙ্গে সম্পাদকীয় লেখেন নি—যেটি করেছিল স্টেটসম্যান—এবং সে-কাজের পিছনে নিবেদিতার প্ররোচনা সুস্পষ্ট। ঠিক-ঠিক বলতে গেলে, কার্জনী-বক্তৃতার সূত্রে অনতিবিলম্বে যে-একটি প্রবল আন্দোলনের তরঙ্গসৃষ্টি হয়, তার মূলে স্টেটসম্যান ও অমৃতবাজারের দানই সর্বাধিক আর উক্ত পত্রিকা-দুটির এই বিষয়ক লেখার মূলে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনিই যেভাবে স্টেটসম্যানে সম্পাদকীয় লিখিয়েছেন [স্বয়ং লিখেছেন?] এবং অমৃতবাজারে সংবাদ সাজিয়েছেন, তার দ্বারাই শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতীয়দের ক্রোধ-বিস্ফোরণ সম্ভব করেছিল, যদিও কার্জনী-ভাষণের অনৌচিত্য অন্যবিধ প্ররোচনা ছাড়াই ভারতীয় সংবাদপত্র-সমূহে আহত বেদনার দীর্ঘায়ত নিবেদন সম্ভব করতই, এই বিশ্বাস আমরা সহজেই করতে পারি।

কার্জনী-ভাষণের উপর সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে প্রথম প্রতিবাদী সম্পাদকীয়তে স্টেটস-ম্যান ১২ ফেব্রুয়ারি বলেছিল : উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চ চরিত্রসম্পন্ন ভারতীয়দের সামনে লর্ড কার্জন শোনালেন—প্রাচ্যবাসীরা অসত্যভাষী, তাদের ক্লাসিকসমূহে অবিমিশ্র সত্যের উপস্থাপনা নেই, ভারতীয়রা তোষামোদকারী, কুৎসা-সুখী, ইত্যাদি ইত্যাদি—সেসব বস্তু শ্রোতাদের কানে কিভাবে বেজেছিল? সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসত্যভাষণের এক-চেটিয়া অধিকার কিন্তু ভারতীয়দের নেই, সেই বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামুখে ইংরাজরাও আধিপত্য বিস্তারকামী এবং তাতে সফল। স্টেটসম্যান নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে দৃষ্টান্ত দিয়েছিল। সে অধিকন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিল—কেবল এই কনভোকেশন-বক্তৃতাতেই নয়, কাউন্সিল-বক্তৃতাতেও কার্জন শিক্ষানীতির ব্যাপারে ভারতীয়গণের প্রতিবাদ সম্পর্কে নিতান্ত ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছেন।

স্টেটসম্যানের এই সম্পাদকীয় রচনার পিছনে নিবেদিতার তাগিদ থাকলেও সেটি ভাষা-ভঙ্গিতে র‍্যাটক্লিফের বলেই মনে হয়। তবে কার্জনের ভাষণের বিশেষ-বিশেষ দিকে

নিবেদিতা যে, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তার পরোক্ষ প্রমাণ নিবেদিতার একটি মন্তব্য, যেটি আমাদের বিস্মিত করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন :

"এমন কি গত শনিবারে প্রদত্ত লর্ড কার্জনের কনভোকেশন-বক্তৃতা—যাতে তিনি ভারতীয় জনগণকে অপমান করেছেন—সেটিও 'জাতীয়তায়' পূর্ণ—যে-বস্তুটিকে আমরা মন্ত্রবাক্য করতে শিখেছি।"

কার্জন জাতীয়তার কোন্ কথা বলেছিলেন? আমরা দেখি, তিনি সুযোগ সুবিধার অভাবে আশাহত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন : "আকাশে আদর্শ খুঁজো না ; মানুষের বাস্তব জীবনে ও কর্তব্যকর্মের সম্পাদনে সে আদর্শকে দেখো। ভারতের মুক্তি বাইরে থেকে আসবে না, ভিতর থেকে তাকে নির্মাণ করতে হবে। খাঁটি ভারতীয় হও—তোমার জাতীয়তার দাবি তাই।" সবিস্ময়ে ভাবতে হয়—কার্জন এই কথাগুলি বলেছিলেন!! এ তো নিবেদিতারই কথা, কয়েক বৎসর ধরে যা তিনি বলে আসছেন ; কিংবা বিবেকানন্দের—যা ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভরতার মন্ত্র দিয়েছিল।

কার্জনের বক্তৃতার এই অংশের বিষয়ে স্টেটসম্যান লিখেছিল :

"In the latter part of the speech, which contained more than one wise and patient passage, His Excellency set himself to answer the question : What scope is there for the young Indian in the life of his country? And he answered that in his opinion there was much. Already, he reminded his hearers, men of Indian birth fill with distinction high judicial and administrative posts, adorn the learned professions, add to the intellectual wealth of the world in imaginative literature. It was not true that the doors were closed. 'Avoid', said Lord Curzon in his direct and impressive fashion 'the tyranny of faction and the passion of racial bitterness..Look for your ideals not in the air of heaven, but in the lives and duties of men. Learn that the true salvation of India will not come from without but must be created within..Be true Indians—that is the prompting of nationality. But while doing so strive also to be true citizens of the Empire.' These are admirable words. Lord Carzon at times has an unapproachable gift of saying things. But may we.."

কার্জনের বক্তৃতার 'জাতীয়তা' অংশ নিয়ে অবশ্য নিবেদিতা বাড়াবাড়ি করতে চাননি, কাল-প্রহার ভূতও রামনাম করে, এইটুকুই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি, যেদিন স্টেটসম্যান অমৃতবাজারের সংবাদ উদ্ধৃত করল, সেইদিনই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছদ্মনামে ["একস্" নামে] তাঁর একটি দীর্ঘ পত্র-প্রবন্ধ বেরুল—"দি হাইয়েস্ট আইডিয়াল অব ট্রুথ।" প্রচণ্ড শক্তিশালী রচনা, ব্যঙ্গ ও বেদনার মিশ্রণে। ব্যঙ্গ—কার্জনের অভিমানী দম্ভের উদ্দেশ্যে ; বেদনা—তরুণ ভারতীয়দের কাপুরুষতায়।

নিবেদিতা শুরু করেছিলেন এই বলে : "গত শনিবার প্রথম ভারতবর্ষের কাছে প্রামাণ্যভাবে ব্যাখ্যাত হল, কেন অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁর 'ভারত আমাদের কী শেখাতে পারে'

নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে 'হিন্দুদের সত্যাশ্রয়ী চরিত্র' বিষয়ে আলোচনায় নিয়োজিত করেছিলেন। আমরা এই প্রথম অক্সফোর্ডের পণ্ডিত-মানুষটির এই মন্তব্যের অন্তর্নিহিত কারণ বুঝতে পারলাম : 'প্রায় প্রতিটি [ইংরাজ] ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্টের মূলগত প্রত্যয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে—সকল ভারতবাসীই মিথ্যাবাদী।'...আর একটি অংশে তিনি বলেছেন, '[ভারতীয়দের বিরুদ্ধে] অসত্যভাষণের অভিযোগ এত বেশি পরিমাণে কথিত হয় এবং সচরাচর এমনভাবে তাদের বিশ্বাস করা হয় যে, তার সঙ্গে লড়াই ডন্ কুইকজোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো দাঁড়াবে।' তিনি যোগ করেছেন, 'এই দুর্ভাগ্যজনক লড়াই আমি করতাম না যদি না আমার এই স্থির বিশ্বাস থাকত—একটি গোটা জাতির বিরুদ্ধে আনীত এই ধরনের একটি অভিযোগ—অনুরূপ অভিযোগগুলির মতোই অত্যন্ত ক্ষীণ অনুমান ও যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, এবং তা অতীতে, বর্তমানে, না ভবিষ্যতে যে-দুষ্কার্য ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে, বা ঘটাবে, তার তুল্য কিছু ভারতে ইংরাজ-রাজ্যের চরমতম শত্রুও আবিষ্কার করতে সমর্থ নয়'।"

ম্যাক্সমুলার ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদির সঙ্গে অন্যান্য দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত সত্য-দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—ভারত এক্ষেত্রে কারো থেকে পেছিয়ে নেই। সে প্রসঙ্গ উপস্থিত করার পরে নিবেদিতা বলেন, ঘটা করে ম্যাক্সমুলারের লেখার কথা তোলার দরকার কি—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অমন একটা কল্পনাতীত অসার অভিযোগের খণ্ডনে? নিবেদিতা ঘনীভূত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন—কি বলছ, প্রয়োজন নেই? অবশ্য আছে। জানো না—ম্যাক্সমুলারের চেয়ে অনেক বড় মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে বিপরীত কথা বলছেন!! বলাবাহুল্য উক্ত মহাপুরুষের নাম—জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন।

কার্জনের আক্রমণ-লক্ষ্য ভারতীয়দের মধ্যে মুসলমানগণও আছেন। মুসলমানীশাস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান নেই বলে কোনো মুসলমানকে ঐ বিষয়ে আত্মসমর্থনের দায় দিয়ে [কিন্তু একইসঙ্গে একথা জানিয়ে যে, "সেমেটিক সাহিত্য ও সেমেটিক শিক্ষকদের কাছ থেকেই ইউরোপ সেইসকল নৈতিক আদর্শ লাভ করেছে, আজ যাদের কথা সে গর্বভরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে"] নিবেদিতা হিন্দু কাব্য-পুরাণ-শাস্ত্রগত সত্য সম্বন্ধীয় ধারণার ব্যাখ্যা করেন উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ—চমৎকার সে রচনা। নিবেদিতা দেখিয়ে দেন—গ্রীকদের সত্য-বিষয়ক ধারণার চেয়ে হিন্দু ধারণার মহত্ত্ব অধিক। কিন্তু উচ্চ আদর্শ কি হিন্দুর বাস্তব জীবনে পালিত হয়? হিন্দুরা কি নিজেদের ঘোষিত আদর্শের যোগ্য হয়েছে? নিবেদিতা সজোরে বলেন—'না'—যদি হিন্দুদের মাপে ব্যাপারটির বিচার করা হয়। তিনি অনুরূপ জোরের সঙ্গে বলেন—'হাঁ'—যদি ইংরাজদের পাশে রেখে হিন্দুদের বিচার করা হয়। "ভারতের সন্তানেরা এই ক্ষেত্রে নিজের কর্ম-কৃতিকে অন্য যে-কোনো পাশ্চাত্ত্যদেশীয়ের পাশে রেখে তুলনা করতে যেন ভীত বা লজ্জিত না হয়। হিন্দুরা একথা বলতেও যেন ভীত বা লজ্জিত না হয়—যে-বস্তু সত্য-ব্যাকুলতা প্রকাশ করে না তা কদাপি নিত্য সত্যের অংশ হতে পারে না।"

ভারতীয়দের সত্যপ্রীতির পক্ষে লড়াই করবার সময়ে ভারতীয় তরুণদের কাপুরুষতা নিবেদিতাকে মর্মান্তিক বেজেছিল। তিনি তীব্র ধিক্কার দিয়ে লেখেন :

"ছাত্রদের উদ্দেশ্য করেই [কার্জন] ঐসকল [অপমানজনক] কথা বলেছিলেন—আর ছাত্ররা (আমি স্টেটসম্যানের রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি) তাদের গ্রহণ করেছিল 'নিখুঁত নীরবতায়।' তারা ভালই করেছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ভালো বোধ হয় না যখন ভাবি যে, ঐ ছাত্ররা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে, তাদের জাতির নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে, আনীত অভিযোগ শুনে গেল—কিন্তু প্রতিবাদে শব্দমাত্র উচ্চারণ করার মতো পুরুষমানুষ হয়ে উঠল না।"

অতঃপর প্রতিবাদের শব্দ নয়—শব্দের বন্যা বয়ে গেল—কাগজপত্রে এবং সভাসমিতিতে।৮ কার্জনের প্রতিটি উক্তিকে কেটে ছিঁড়ে একাকার করা হল, ইউরোপীয়দের অসত্যভাষণের ভূরি-ভূরি নমুনা দেওয়া হল, ভারতীয় শাস্ত্র মন্থন ক'রে সত্য আদর্শের অমৃতরস ভাণ্ডে-ভাণ্ডে উদ্ধার ক'রে আনা হল।

পরাভূতের আত্মসান্ত্বনালাভের এইসকল প্রয়াসের মধ্যে একটা করুণ দিক ছিলই, কিন্তু শক্তির দিকও উন্মোচিত হল যখন দেখা গেল—এইসূত্রে ভারতীয়দের অধিকার-সংকোচের ধারাবাহিক কার্জনী চেষ্টার চেহারা টেনে খুলে তার উপরে কশাঘাত করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের দেশীয় কাগজগুলি প্রতিবাদের ঢেউ তুলে সর্বভারতীয় আলোড়ন সৃষ্টি করল যা পরবর্তী আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি কিছুটা এনে দিয়েছিল। আমি ভারতীয় সংবাদ-পত্র থেকে এ-সম্পর্কে সংবাদ উদ্ধার না ক'রে ইংলন্ডের 'ইন্ডিয়া' কাগজের কিছু মন্তব্য উপস্থিত করতে পারি যার থেকে বোঝা যাবে, এই বিক্ষোভের প্রবলতা বহুসহস্র মাইল দূরে কিভাবে অনুভূত হয়েছিল। ইন্ডিয়া ১৭ মার্চ, ১৯০৫ লেখে :

"ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্যমূলক আক্রমণ বর্তমানে ভারতবর্ষে

---

৮ স্টেটসম্যানে নিবেদিতার পত্র-সূত্রে ১৫ ফেব্রুয়ারি *Philalesthes*-লিখিত পত্রে কার্জনের কঠোর সমালোচনা ছিল। তবে পত্রলেখক নিবেদিতার একটি বক্তব্যে আপত্তি করে বলেন—ইউরোপীয়রা তাদের সত্য সম্বন্ধীয় ধারণা সেমেটিকদের কাছ থেকে পায়নি, পেয়েছে গ্রীকদের কাছ থেকে। [পরবর্তী ইউরোপীয়দের কাছে গ্রীক যে মহা গঙ্গোত্রী।] অন্য এক পত্রলেখকও (*Diogenes*) কার্জনের বক্তব্যের সমালোচনা করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি, এবং ১৯ ফেব্রুয়ারিও কয়েকটি চিঠি বেরোয় যাদের মধ্যে কার্জনের বক্তব্যের অল্পবিস্তর সমালোচনা ছিল—ক্ষেত্রবিশেষে সমর্থনের ঈষৎ চেষ্টাও দেখা যায়। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে পত্র ও প্রবন্ধে যে-সকল প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল তাদের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে অমৃতবাজারের সংবাদটি নানা মহলে কিরকম চাঞ্চল্য এনেছিল সে সম্বন্ধে অমৃতবাজারের ১৮ ফেব্রুয়ারির সম্পাদকীয় মন্তব্যের অংশ উপস্থিত করা যায় :

"On the same subject a distinguished English gentleman writes to us: 'I feel I must congratulate you upon your magnificent 'scoop' on yesterday about Lord Curzon and Western sincerity. It was crushing'."

সাধারণ আলোচনার মুখ্য বিষয়। অন্য একটি পৃষ্ঠায় আমরা কলকাতার সংবাদদাতা-প্রেরিত টেলিগ্রাম মুদ্রিত করেছি। গত শুক্রবার কলকাতা টাউন-হলে—লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে, তৎসহ ভারতীয়দের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর তীব্র নিন্দাসূচক উক্তির বিরুদ্ধে বিশেষভাবে, প্রতিবাদ করার উদ্দেশে আহূত বিরাট সভার বিবরণ তাতে আছে। এই সংখ্যাতেই আমাদের বোম্বাই সংবাদদাতা-প্রেরিত বার্তায় একই সংবাদ। আশা করা যায়, অন্যান্য বৃহৎ ভারতীয় শহরেও এই ধরনের প্রতিবাদ সভা হবে। কলকাতা-সংবাদদাতার টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহে সেটি প্রেরণ করি। আমরা দেখে আনন্দ পেয়েছি, বিপুল প্রভাবশালী সংবাদপত্রসমূহে সেটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে—তাদের মধ্যে মর্নিং লীডার ও ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানও আছে।"

ইণ্ডিয়া কাগজে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের প্রতিবাদ-সভার যে বিবরণী বেরোয় তাদের প্রথম কয়েক লাইন এইরূপ :

LORD CURZON AND THE INDIAN PEOPLE

REMARKABLE INDIGNATION MEETING IN CALCUTTA

"RUSSIANIZING THE ADMINISTRATION"

THE VICEROY'S RECORD REVIEWED

SPEECH BY DR. RASH BEHARI GHOSE ৯

* * *

LORD CURZON AND THE INDIAN PEOPLE

CROWDED MEETING OF PROTEST IN BOMBAY

SPEECH BY THE HON. GOKULDAS K. PAREKH

"TO REMONSTRATE AGAINST LORD CURZON'S INVECTIVE"

THE VICEROY'S "DISTRUSTFUL AND RETROGRADE POLICY"১০

ইংলণ্ডেও প্রতিবাদসভা হয় :

LORD CURZON AND THE INDIAN PEOPLE

PROTEST OF INDIANS IN THE UNITED KINGDOM

TEXT OF THE PROPOSED RESOLUTIONS

কলকাতা-সভার চরিত্র, কার্যাবলী এবং সভাপতি স্যার রাসবিহারীর বক্তৃতার (তিনিই একমাত্র বক্তা ছিলেন) সারসংক্ষেপ থেকে দেখা যায়—কার্জনের সমগ্র শাসননীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ফেটে পড়েছিল। কলকাতা থেকে ১৩ মার্চ তারিখে প্রেরিত (ইন্ডিয়া পত্রিকায় ১৭ মার্চ তারিখে প্রকাশিত) বিবরণ এই :

---

৯ *India*, March 17, 1905.
১০ *Ibid*, April 21, 1905.

"এখানে টাউন-হলে জনাকীর্ণ প্রকাণ্ড এক সভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন-ভোকেশন-সভায় প্রদত্ত লর্ড কার্জনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। সেইসঙ্গে প্রতিবাদ করা হয় তাঁর ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংকোচ, উচ্চতর শিক্ষার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট দ্বারা সংবাদ-পত্রের বন্ধন, এবং নিম্নতর সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার লোপ।

"ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ (দেশীয় আদালতের নেতা, সুপ্রীম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অ্যাডিশন্যাল মেম্বার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম গ্রাজুয়েটদের অন্যতম) সভা-পতিত্ব করেন। তিনি বলেন, ভাইসরয় তাঁর কনভোকেশন-বক্তৃতায় এশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা উপস্থিত করেছেন, যে-মহাদেশ বুদ্ধ, খ্রীস্ট ও মহম্মদের জন্ম দিয়েছে। মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের দ্বারা ভাইসরয় কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা হ্রাস করেছেন। সেই তিনি এখন জনগণের দেশাত্মবোধ ও সর্বজনীন আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী বঙ্গবিভাগ চাইছেন। নিম্নতর সরকারী চাকুরির জন্য ভাইসরয় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার বিলোপ ঘটিয়েছেন, যদিও সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ পরীক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী চাকুরিয়াদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করেছিল। [তাঁর প্রবর্তিত] ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট কেবল যে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ ও স্বাধীনতার ক্ষতি করেছে তাই নয়, শিক্ষা এখন অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।১১

"ডাঃ ঘোষ 'ইংলিশম্যান' উদ্ধৃত ক'রে দেখান—ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সম্মিলিত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ভাইসরয় কিভাবে অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট পাস করিয়েছেন। বাস্তব কথা হল, ভাইসরয় জনমতের কোনো গুরুত্ব দেন না, নিজের ইচ্ছা বলবৎ করতে বদ্ধপরিকর,

---

১১ লর্ড কার্জনের অনাচারী ব্যবস্থাগুলির সমালোচনা পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট করেছেন। কেবল শিক্ষাসংকোচ নয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সামান্য চিহ্নও কার্জন ভারত থেকে মুছে দিতে চান। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত দেশীয় সদস্যদের সংখ্যা ও ক্ষমতা কমিয়ে দেন ১৮৯৯-এর মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের দ্বারা; এবং তাঁর ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (১৯০৪) ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের কাছে বিপদসংকেত, এবং তা ১৮৭৮ সালের অ্যাক্টের চেয়ে খারাপ বলে বিবেচিত হয়েছিল। [নিমাইসাধন, ২৮৯]। কার্জন এইসকল কাজ করেছিলেন, পরবর্তী বাংলা বিভাগও করেছিলেন, কারণ, ত্রিপাঠী তথ্যযোগে দেখিয়েছেন—ভাইসরয়ের কার্যভার নেবার বহু পূর্ব থেকেই কার্জন "বাঙালী-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী এবং কংগ্রেস-বিরোধী।" "আমার বিশ্বাস, [কার্জন বলেছিলেন] কংগ্রেস ভেঙে পড়ো-পড়ো, আর ভারতে থাকাকালে আমার প্রধান উচ্চাভিলাষের একটি হল—তার শান্তিপূর্ণ মৃত্যু ঘটানো।" কার্জনের আরও বিশ্বাস ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্য ঈশ্বর-বিধানে আবির্ভূত সর্বপ্রধান মঙ্গল-যন্ত্র—পৃথিবী তেমন-কিছু পূর্বে দেখেনি। এক্ষেত্রে কার্জনের পক্ষে কি উক্ত মঙ্গল-যন্ত্রকে অকেজো করতে আকাঙ্ক্ষী যে-কংগ্রেস, বা তার মুখ্য পরিচালক যে-বাঙালীরা—তাদের ক্ষমা করা সম্ভব? এই বাঙালীরা স্পর্ধাভরে নিজেদের নেশন বলে মনে করে, এবং ইংরেজদের খেদিয়ে দিয়ে কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে অধিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখে। ঐ বাঙালীদের জাতীয়তাকে ধ্বংস করার জন্যই পার্টিশন-

এবং তাঁর প্রায় সকল ব্যবস্থাই সিমলার আমলাতন্ত্রকে জোরদার করতে ও শাসনতন্ত্রে রুশীয় কাঠামো আনতে উদ্যোগী।"

ইংলণ্ডের উদারনৈতিক সংবাদপত্রগুলি লর্ড কার্জনের অপকর্মে অতিশয় বিরক্ত ও বিচলিত হয়েছিল, ভারতীয় বিক্ষোভের প্রবলতাও তারা অনুভব করেছিল। এ-সম্পর্কে ডেইলি নিউজের সুকঠিন সম্পাদকীয়ের অংশ এই :

"লর্ড কার্জনের কার্যাবলী এবং বক্তৃতার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ঘৃণাপূর্ণ ক্রোধ পরপর বিক্ষোভ প্রদর্শনে ফেটে পড়েছে, যা পরাধীন ভারতের ইতিহাসে বিরল ব্যাপার।... যে মানুষদের শাসন করতে উনি গিয়েছেন তাদেরই বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদী বলার মতো আহাম্মকী তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতা ব্যাপারটিকে চরমে নিয়ে গিয়েছে। লর্ড কার্জন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার ক'রে [কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে প্রতিনিধিরা দেখা করতে চাইলে কার্জন গররাজি হন] যে-ইচ্ছাকৃত অপমান করেছিলেন, তাও সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এখন ঝড় এসে গেছে, ফলে লর্ড কার্জনের গোটা আমলা-তান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক নীতি আক্রান্ত। কার্জনী নীতির লক্ষ্য, বাইরে বেপরোয়া ঝুঁকি আর ভিতরে উৎপীড়ন। সমগ্র দেশীয় আন্দোলনকে তা ঠেলে পিছিয়ে দিতে চাইছে—তার দ্বারা কেবল ন্যায় লঙ্ঘিত হচ্ছে না, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মহারাণীর ঘোষণাও লঙ্ঘিত হচ্ছে। পাল্লার একদিকে আছে ভারতে উদার ও প্রগতিশীল সরকার, অন্যদিকে কার্জনের দ্রম ও প্রদর্শনী-বাতিক। শেষোক্ত জিনিসটি প্রথম ব্যাপারের তুলনায় নিতান্ত লঘু ও তুচ্ছ।"১২

॥ ৩ ॥ কার্জনের উপর নিবেদিতার ধারাবাহিক আক্রমণ

উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে অবশ্যই বলা যায়, জগদীশচন্দ্র যে-কথা বলেছেন, ঐতিহাসিকভাবে তাই সত্য—নিবেদিতার নিক্ষিপ্ত বজ্রই উপরি-বর্ণিত বিদারণের কারণ হয়েছিল। নিবেদিতা পরবর্তীকালেও ঘটনাটিকে দুষ্ট কৌতুকের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। স্টেটসম্যান থেকে পদত্যাগ করে র‍্যাটক্লিফ ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পরে, নিবেদিতা আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় র‍্যাটক্লিফ যাতে প্রবন্ধাদি লিখতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়ে-

---

পরিকল্পনা, তা কোনো ছলনা না রেখেই কার্জন লিখে জানিয়েছিলেন। কার্জনের সেই লেখা থেকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালী-ভূমিকার রূপ বোঝা যাবে : "কলকাতা-কেন্দ্র থেকেই সমস্ত বাংলা, বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের কংগ্রেস-দল নিয়ন্ত্রিত হয়। কংগ্রেসের সেরা মন্ত্রণাদাতা এবং উগ্র বাগ্মীরা সকলেই এখানকার অধিবাসী।...কলকাতার জনমতের উপর তাদেরই আধিপত্য।...স্থানীয় সরকারকে তারা সন্ত্রস্ত রাখে, এবং ভারত সরকারের উপর তাদের রীতিমতো প্রভাব নেই তাও নয়।...তারা কোনোদিন হয়ত দুর্বল সরকারকে তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করে ফেলবে। কোনো ব্যবস্থা যদি পরিণতিতে বঙ্গভাষী জনগণকে বিভক্ত করতে উদ্দিষ্ট হয়..যা কলকাতাকে ষড়যন্ত্রের পীঠভূমি হবার ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করবে,...বাঙালীরা সে ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে, উত্তপ্তভাবে প্রতিরোধ করবেই।" [ত্রিপাঠী, ১০-১১, ১৮]।

১২ ইণ্ডিয়া পত্রিকার ১৭ মার্চ, ১৯০৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত।

ছিলেন, তখন তিনি ও'কে উসকে দিয়েছিলেন "কনভোকেশন-বক্তৃতার রসালো ক্ষুদ্র কাহিনীটি" লেখার জন্য। (১৭.১২.১৯০৮)

নিবেদিতা নানাভাবে কার্জনী অপকর্মের প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন। বুদ্ধগয়া মন্দিরের শৈব সেবায়েতকে সরিয়ে সেখানে বৌদ্ধ-কর্তৃত্ব স্থাপনের যে-চেষ্টা অনাগারিক ধর্মপাল করছিলেন [বিষয়টি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি১৩]—তার মধ্যে নূতন এক সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের চেষ্টা দেখে নিবেদিতা প্রতিবাদের আয়োজন করেন। কার্জন ধর্মপালের পক্ষসমর্থনের গোপন সিদ্ধান্ত করেন। কার্জনের সেই সিদ্ধান্তের 'কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট' সংগ্রহ ক'রে সংবাদপত্রে তার সারাংশ প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে নিবেদিতা কার্জনকে আর একবার অসুবিধায় ফেলেছিলেন। (১৯০৩ সালে এইসূত্রে র্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি এবং বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে কার্জনের "স্ট্রিকট্‌লি প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনশিয়াল" নোটের কপি রেমঁ-সংগ্রহে আছে)।

কার্জনের অত্যাচারী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মন্তব্য নিবেদিতা চিঠিতে পুনঃপুনঃ করেছেন। "চারিদিকে কেবল মন্দ আর মন্দ—এখানকার গোটা সংবাদ এই। দিনে-দিনে সংগ্রাম তীব্রতর। অসাধুতা জঘন্য থেকে জঘন্যতর—আর তারই জয়।" নিবেদিতা আর্ত হয়ে লিখলেন, "মা। মা। কি করতে পারি বলো। সমুদ্রকে যেন হাত দিয়ে রুখে দেবার চেষ্টা—তাই মনে হচ্ছে—ঠিক তাই।" তিনি বলেই চললেন, "স্বাধীনতার উপর অবিরাম আক্রমণ—চলছেই। দিনদিন তার চেহারা আরো খারাপ। নৈরাশ্য বাড়ছে। এই কার্জন লোকটা যেন একেবারে ঔদ্ধত্য ও পাপের মূর্তি।" (৫.৩.১৯০৫)।

১৯০৯ সালের শেষের দিকে টোরীরা (রক্ষণশীলেরা) ইংলন্ডে ক্ষমতায় এলে কার্জনের ভারতসচিব হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। নিবেদিতা আতঙ্কিত হয়ে বলেন, "কি বিকট সময়ের মধ্যেই না রয়েছি!" [২৫.১১.১০৯০]। "নির্বোধ কার্জনটা বাজে বকবক করে যাচ্ছে। কোথায় লজ্জায় মাথা নামাবে, তা নয়!" [১০.২.১৯১০]। নিবেদিতা কার্জনের ক্ষমতা-প্রাপ্তি ঠেকাবার জন্য তাঁর কার্যকালের আসল চেহারা খুলে ধরতে র্যাটক্লিফকে অনুরোধ করেছিলেন। [৩১.৩.১৯১০]।

১৯০৭, এপ্রিল মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় নিবেদিতা একটি বেনামা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, "লর্ড কার্জন অন ফেমিনস ইন ইন্ডিয়া।" লেখাটিকে নিবেদিতা-রচনাবলীর, পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। [মডার্ন রিভিউ-এ নিবেদিতা অজস্র রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও নোট বেনামে বা না-নামে লিখেছেন ; সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরে দেব]। কার্জনের বিরুদ্ধে এটি নিবেদিতার ভয়ঙ্কর রচনার পক্ষেও ভয়ঙ্কর। কার্জনকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ধরে নিয়ে নিবেদিতা প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। সেজন্য এই রচনায় সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণের চেহারাও খুলে ধরেছেন। নিবেদিতার সর্বোত্তম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ধনতন্ত্র-বিরোধী রচনার মধ্যে এটি পড়ে।

---

১৩ 'সমকালীন', ৪র্থ, ২৪৫-৭১।

ভারতের ভাইসরয়ের পদ ত্যাগ করে কার্জন ইংলন্ডে ফিরে যান। অনপনেয় অপ্যার তিনি, সময়-সুযোগ পেলেই সাম্রাজ্যবাদের গুণগান করতেন। একটি সভায় তিনি ভারতে দুর্ভিক্ষ ও তার দুঃখ নিবারণে বৃটিশ শাসনের সক্রিয় চেষ্টার বহু প্রশস্তি করেছিলেন। নিবেদিতা তারই সূত্রে প্রবন্ধটি আরম্ভ করেন :

"গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, লন্ডনে ক্ষুদ্র এক সমাবেশে লর্ড কার্জন ভারতের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যে-বক্তৃতা করেছেন সেটি এই ব্যক্তিটিকে যেভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে, অন্য কোনো বিষয় তা করতে পারত না। ধনী ব্যক্তিদের আত্মপ্রশংসা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। তাদের অহমিকা—তাদের সঙ্গে সংশিলষ্ট যে-কোনো বস্তুকে বিচিত্রভাব আদর্শ-রঞ্জিত করে তোলে। কিন্তু তাদের মধ্যেও ঐ প্রবণতার জোয়ার এমন অকপট উদ্দীপনায় উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়নি যা ঘটেছে উল্লিখিত ব্যক্তিটির ক্ষেত্রে। আর কখনো কোনো ব্যক্তি নিজেকে এমন সুগভীরভাবে গ্রহণ করেন নি। আর কখনো কোনো ব্যক্তি অসজ্ঞান ক্ষণে এইভাবে নিজের মুখোশ খোলেন নি। ইনি যেভাবে নিজের বরেণ্য বস্তুর হিসাব দাখিল করেছেন, তার দ্বারা নিজ হৃদয়-গহনে অন্যদের দৃষ্টিপাত করার সহজ সুযোগ করে দিয়েছেন, সে-বস্তু কদাপি আর কারো দ্বারা সংঘটিত হয়নি। তবে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে হৃদয়-মনের গহন অংশে কোনোপ্রকার মহিমাই নেই।"

ভূমিকা এই। তারপর নিবেদিতা ভারতে দুর্ভিক্ষ ও তার প্রতিবিধানে ইংরাজ সরকারের কার্যনীতির বিষয়ে কার্জনী ভাষা উদ্ধৃত করেছেন। কার্জনের মতে, ঐ নীতি অতীব বৈজ্ঞানিক, বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার মতো নমনীয় এবং এমন সুনির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট যে, স্বচ্ছন্দে সূত্র-গ্রথিত হতে সমর্থ।

নিবেদিতা চীৎকার করে বললেন, সাড়ম্বর দুর্ভিক্ষ-নীতির কথা তো শুনলাম, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয় কেন? "নির্যাতিত দেশ ব্যর্থ ক্রন্দন করে যাচ্ছে—কেন দুর্ভিক্ষ হবে? স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো দেশে, কোনো সভ্যতায়, এই ধরনের বিপর্যয় ঘটে না। কোনো দেশে কোনো এক খণ্ডকালে সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনে এই কালো ছায়া নেমে আসা উচিত নয়। কিন্তু ভারতে দুর্ভিক্ষ স্থায়ী ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনৈক ইংরাজ সম্পাদক ভারতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংবাদে বলেছেন : "বুঝতেই পারছ, ভারতে দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে কেউ কিছু করে উঠতে পারবে না। এটা স্থায়ী ব্যাধি'।"

নিবেদিতা রেভাঃ ডাঃ আকেড-এর দুর্ভিক্ষ-হিসাব উপস্থিত করেছিলেন : "ভারতে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি যত দিন যাচ্ছে তত মন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে ভারতে ৫টি দুর্ভিক্ষে ১০ লক্ষ লোক, দ্বিতীয় পঁচিশ বছরে ২টি দুর্ভিক্ষে ৫ লক্ষ লোক, তৃতীয় পঁচিশ বছরে ৬টি দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক, এবং শেষ পঁচিশ বছরে ১৬টি দুর্ভিক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক মরেছে।...সোজা কথা হল, আমাদের শাসনকাল যত দীর্ঘায়ত হবে ততই অবস্থায় অবনতি ঘটবে।"

দুর্ভিক্ষের ছবিটি তুলে ধরে নিবেদিতা বললেন, এ-বস্তু অবধারিত—"দুর্ভিক্ষ হবেই—সাম্রাজ্যবাদ দুর্ভিক্ষ বাদ দিয়ে চলতে পারে না।" নিপুণ বিশ্লেষণ করে দেখালেন, কেবল

শাসিত দেশেই নয়, শাসকদের দেশেও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অল্পাধিক দুর্ভিক্ষের অবস্থা থাকবেই। "খোদ ইংলণ্ডে সাধারণ মানুষ এখন ক্রমবর্ধিত দারিদ্র্যের শিকার, আর তাদের মুখের গ্রাস উত্তরোত্তর হরণ করে নিচ্ছে সুবিধাভোগী শ্রেণী।" কোনো শীতকালের দশটি দুর্যোগের দিন পূর্ব ও দক্ষিণ লণ্ডনের শ্রমজীবীদের দুর্ভিক্ষের অবস্থায় ঠেলে দিতে পারে। অবশ্যম্ভাবী তা। "দেশের পূর্ণ উন্নতির জন্য তার সকল মানুষের শ্রম প্রয়োজন। কিন্তু দেশ সাম্রাজ্যবাদী হলে জনসংখ্যার বেশ-খানিক অংশকে স্থলসৈন্য ও নৌসৈন্য হয়ে পড়তে হয়—না, স্বদেশের রক্ষায় নয়, স্বদেশের সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি পৃথিবীর অন্যত্র যে-সব জায়গাকে মুনাফা-লোটার জন্য অধিকার করে রেখেছে, তাদের বজায় রাখার জন্য। ঐ স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী স্বদেশের পক্ষে নিছক আলস্যজীবী। তারপর অবশিষ্ট জনগণের বড় অংশকে ঠেলে নিয়ে আসা হল শহরে, সেখানে তারা পূর্বোক্ত অধিকৃত দেশের জন্য বস্তু উৎপাদন করবে—তার দ্বারা লাভবান হবেনা হাজার-হাজার শ্রমিক—সব লাভ লুটে নেবে কারখানার মালিক।"

সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্দশার কথা নিবেদিতা আরও বলেছেন। দিনে-দিনে সেখানে মানুষের দুর্গতির বৃদ্ধি; গ্রামসমূহ পরিত্যক্ত, কৃষিক্ষেত্র অকর্ষিত, শ্রমজীবীরা কৃষিসঞ্চয়ের উপর নয়, কারখানায় দিনমজুরির উপর নির্ভরশীল। তাদের প্রতিদিনের কাজের চেহারাই বা কি। বিরাট যন্ত্রের একটা ক্ষুদ্র অংশ চালাবার কাজে তারা নিযুক্ত, সত্যকার উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয়, বন্টনের সামান্য অংশেই সংশ্লিষ্ট। যদি তাদের জাতির কর্তৃত্বাধীন দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিপর্যয় ঘটে, তাহলে তাদের পেটে হাত।

নিবেদিতা বললেন, এই যদি শাসকজাতির জনগণের অবস্থা হয়, শাসিতের অবস্থা সেখানে কি-না শোচনীয়। সাধারণভাবে কোনো দেশে সরকার পোষার খরচ বেশি নয়—কর্মচারীদের মাইনেটুকুই খরচ। অথচ পরাধীন দেশে বিরাট মাইনে দিয়ে সরকার তৈরী করতে হয়। সাধারণভাবে কোনো দেশের শিল্প সে দেশের কৃষকদের যন্ত্রপাতি বস্ত্রাদি সরবরাহ করে, পক্ষান্তরে কৃষকেরা শিল্পশ্রমিকদের দেয় খাদ্যবস্তু। কিন্তু পরাধীন দেশে শিল্প-শ্রমিকরা ঠিক-ঠিক কাজ পায় না, কৃষকরা হয়ে দাঁড়ায় কুলি, যথা, রেলে; কিংবা তারা নিযুক্ত থাকে শাসক সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-বস্তুর উৎপাদনে—যথা চা, আফিম, পাট, নীল ইত্যাদি। পরাধীন দেশ এমন-কি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনার কলা-কৌশল পর্যন্ত শিক্ষা করার সুযোগ পায় না, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদীরা তা সযত্নে কুক্ষিগত করে রাখে।

যেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে নিজ দেশের স্বাভাবিক সুস্থ অর্থনৈতিক জীবনকে অব্যাহত রাখতে সেখানকার সকল মানুষের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, সেখানে পরাধীন দেশের দশা কী? "ভারতের ক্ষেত্রে আমরা কী আশা করতে পারি—যেখানে এ-দেশের শ্রমিকদের সকল শ্রম ইংলণ্ডের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য,...সেইসঙ্গে সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্থা ও কলকারখানার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য পুরো নিয়োজিত?"

কত প্রণালীতে ভারতকে শোষণ করা হয়, নিবেদিতা তার বিবরণ দিয়েছেন। তারপর বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এই ব্যবস্থা চললে দুর্ভিক্ষ বন্ধ হতে পারে না। দুর্ভিক্ষ-শ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে দম্ভী কার্জনের বর্বর চীৎকার নিবেদিতার কাছে বীভৎস ঠেকেছিল। কার্জন বলেছিলেন, ভারতে ইংরাজরা কি করেছে তা জানতে হলে সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে গেলে চলবে না—যেতে হবে দুর্ভিক্ষের দুঃখদিনে, কেননা তখনই বোঝা সম্ভব, ভারতে ইংরাজরা কী অপূর্ব কাণ্ড ঘটাতে পেরেছে। "নগ্ন লজ্জাহীন" ঐ লোকটির কোরিয়া-কাহিনীর উপর নিবেদিতা পুনশ্চ খড়্গাঘাত করলেন। এবার অবশ্য কার্জনের মিথ্যাবাদিতার নমুনা দিতে নয়—স্থূল অগভীরতার চেহারা খুলতে। "লোকটি কদাপি ঐ গ্রন্থে যেসব মানুষের মধ্যে তিনি গেছেন তাদের জীবনের মূলগত সংবাদ জানান নি—ওতে না আছে তাদের জীবনযাত্রার বিবরণ, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের রূপ, চিন্তাপ্রকৃতি, কাব্যকৃতি বা অনুরূপ বস্তু।...ও'র প্রদত্ত তথ্যগুলি সর্বদাই আমলাতান্ত্রিক—সেনসাস্, আমদানী রপ্তানি, যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। বইটি ভাবী রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক শোষকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিখুঁত ম্যানুয়াল। কোনো দেশের অন্য কিছু উনি দেখেন না, কেবল দেখেন সেখানে স্ব-শ্রেণীর স্বার্থ-সংগঠনের সুযোগ আছে কিনা। লোকটি নিজ ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুর্নৈতিক নন, লোকটি অনৈতিক (বা নিম্ন-নৈতিক) ছাড়া কিছু নয়—প্রকৃতি যেমন অনৈতিক।"

"He is not immoral in his geographical outlook : he is merely un-moral, or sub-moral, as un-moral as nature herself."

এই বন্য-প্রকৃতির লোকটি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"ভারতের জলবায়ু এবং মনুষ্য যদি একইপ্রকার থাকে তাহলে বৃটিশ সরকার, দৃষ্টি-গোচর কালসীমার মধ্যে, ভারতের দুর্ভিক্ষ দূর করতে পারবেন, তার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা সন্দেহ। তবে আশা করা যায়, দুর্ভিক্ষের সংখ্যা হ্রাস করা যাবে।"

নিবেদিতা বাহবা দিয়ে উঠলেন : হাঁ, এই একটি জায়গায় আমরা লর্ড কার্জনের সঙ্গে ঐকমত। বৃটিশ সরকার যে, ভারতের দুর্ভিক্ষসংখ্যার হ্রাস করতে পারবেন, অবশ্যই সেটাকে শুভবাসনা বলে ধরতে হবে। আর তাঁরা যে, অবস্থা যদি একই রকম থাকে, তাহলে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু করবেন বা করতে পারবেন, তাকে আমরা লর্ড কার্জনের মতোই মনে করি, 'অতীব অসম্ভব।'"

কেবল শাসক হিসাবে নয়, ব্যক্তিমানুষ হিসাবেও কার্জনকে ঘৃণা করবার যথেষ্ট কারণ নিবেদিতা খুঁজে পেয়েছিলেন। লেডি কার্জন, যাঁকে নিবেদিতা "যথার্থই রাজ্ঞীতুল্য" দেখেছেন, "স্বপ্নের মতোই সুন্দর"—তাঁর পাশে কার্জনকে অত্যন্ত নিরেট স্থূল বলে তাঁর মনে হয়েছিল। ১৯০৬ সালে লেডি কার্জনের মৃত্যু হয়। নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে ২৫ জুলাই, ১৯০৬ লেখেন :

"লেডি কার্জনের মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? লণ্ডনে কি ও'র আত্মহত্যার বিষয়ে কানাকানি শোনা গেছে? এখানে সেরকমই ধারণা।"

নিবেদিতা যোগ করেছেন :

"ঐ রকম একটা লোকের সঙ্গে বাস করার যন্ত্রণা কি কম! লোকটা এখনো ঠাট দেখিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্ত অপদার্থ।"

ষোড়শ অধ্যায়

নিবেদিতা ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে

॥ ১ ॥ নিবেদিতার পত্রে গোখলের সঙ্গে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রারম্ভিক রূপ

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেলে, নিবেদিতা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য সংগঠনে যেটুকু নেতৃত্ব করেছিলেন—তার থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। স্বদেশী আন্দোলনকালে তিনি বক্তৃতা করেছেন,১ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বা ফেডারেশন হল স্থাপন সম্বন্ধে উৎসাহ দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মূল কাজ দাঁড়াল—গোপন সংগঠন, জাতীয়তামূলক রচনা প্রকাশ এবং জাতীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের নিবারণচেষ্টা, প্রয়োজনে মধ্যস্থতা। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতা সর্বদাই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পক্ষপাতী।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পরে কংগ্রেসের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয় বারাণসীতে, ডিসেম্বর ১৯০৫। এই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬—১৯১৫) মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে—তখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের তরুণতম সভাপতি। বিদ্যাবুদ্ধি ও ত্যাগে গোখলে উজ্জ্বল পুরুষ। ধর্মীয় ধারণায় তিনি সংস্কারকদলের নেতা মহাদেব গোবিন্দ রানাডের অনুগামী—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাতেও। গান্ধীজী গোখলেকে নিজের রাজনৈতিক গুরু বলেছেন।

---

১ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর স্মৃতি :

"মিঃ সি আর দাশের বাড়িতে ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৫ যে 'স্বদেশী মণ্ডলী'-র প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা এই ক্লাবের [ফীল্ড অ্যান্ড একেডেমী ক্লাব] চরমপন্থী রাজনীতির কার্যকরী সমিতি। এই ক্লাব হইতেই পান্তির মাঠে স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হইতে বহু সভা হয়। ভগিনী নিবেদিতাকেও ঐসকল সভায় বক্তৃতা দিতে দেখিয়াছি। তাঁহার তো বক্তৃতা নয়, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইত। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, আর ভাবিতাম—বলে কী? ইনি কে? কোথা হইতে আসিলেন?—যেন একটি জ্বলন্ত বিদ্যুৎশিখা।" ['শ্রীঅরবিন্দ', ৪৭৮-৭৯]

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতি :

"ষাট বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতার কলেজে পড়িতাম তখন সভাসমিতিতে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। কারণ এই বিদেশিনী মহিলার জীবনকাহিনী তখন যেটুকু জানিতাম তাহাতেই আমাদের ছাত্রমহলে তাঁহার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব ছিল। ব্রহ্মচারিণীর বেশে

যতদূর মনে হয়, গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ের সূত্রপাত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে; গোখলে তখন ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য। গোখলের মডারেট-মত সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিকতা, বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব এবং দেশাত্মবোধে নিবেদিতা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গোখলের সঙ্গে রাজনৈতিক ধারণার পার্থক্যকে তিনি গোখলের সাধুতা সম্বন্ধে সন্দেহের হেতু করে তোলেন নি। অপরপক্ষে তিনি দেখেছিলেন—এই প্রতিভাবান, প্রতিপত্তিশালী, দেশপ্রেমিক মানুষটিকে যদি প্রভাবিত করা যায় তাহলে এঁর দ্বারা বহু কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। নিবেদিতার প্রভাবে গোখলের ধর্মধারণায় পরিবর্তন এসেছিল, তিনি বিবেকানন্দের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, তা আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি।২

গোখলের দ্বারা নিবেদিতা সরকারকে ভারতীয়দের শিক্ষা ব্যাপারে, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট ছিলেন,৩ এবং নিঃসন্দেহে তিনি গোখলের মারফত সরকারের মতিগতির বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। আর, মডারেট গোখলেকে যতখানি র‍্যাডিক্যাল করা যায়, তা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আংশিক সাফল্যক্ষেত্র—বেনারস কংগ্রেস।

কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত চরমপন্থী গোষ্ঠীর পক্ষে, (যার নেতা তিলক, বিপিন পাল, লাজপত রায়), এমনকি পার্টিশান-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বাংলার মডারেট নেতাদের পক্ষেও, বেনারস কংগ্রেস ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই কংগ্রেসে বাংলার 'স্বদেশী' ও 'বয়কট'কে স্বীকার করানোর উপরে স্বদেশী আন্দোলনের সর্বভারতীয় চরিত্র নির্ভর করছিল। বাংলার আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে কংগ্রেসের ঐ স্বীকৃতির যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি তিলক প্রমুখ যেসব চরমপন্থী নেতা নবজাগ্রত জাতীয় চেতনাকে সংগ্রামমুখী ক'রে তুলতে চাইছিলেন তাঁরাও সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাধাবার মতো অবস্থা সৃষ্টির জন্য কংগ্রেসের কাছ থেকে ঐপ্রকার স্বীকৃতির প্রয়োজন বোধ করছিলেন। বলা বাহুল্য ব্যাপারটা বৃটিশ শাসকদের অভিপ্রেত হতে পারে না—এবং তাঁদের প্রতি অখণ্ড আনুগত্যসম্পন্ন ফিরোজ শা মেটাদেরও নয়। কংগ্রেস ইতিপূর্বে ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের অধিবেশনে যদিও পার্টিশানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়েছে—কিন্তু প্রস্তাব নেওয়া এক জিনিস আর ইংরেজের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধের ডাক দেওয়া অন্য জিনিস। বয়কট কথাটার মধ্যে অবশ্যই এ'দের পক্ষে ক্রুর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল।

বেনারস-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে গোখলে যে-ভাষণ দেন, তা তাঁর পরিচিত মডারেট-চরিত্রকে এমনভাবে লংঘন করেছিল যে, কোথাও বিস্ময়, কোথাও বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

এই আইরিশ দুহিতা যখন বক্তৃতা করিতেন শ্রোতৃগণ মুগ্ধচিত্তে তাঁহার উদ্দীপনাময় বাণী শুনিয়া অভিভূত হইতেন। তখন স্বদেশীর যুগ—ছাত্রমহলে দেশপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত—ভগিনী নিবেদিতার ওর্জাস্বিনীর বক্তৃতায় আমরা দেশমাতৃকার বাণীমূর্তি দেখিতাম।" [ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, "ভগিনী নিবেদিতা", নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা, শতবর্ষ জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা (১৯৬৭), ১৬]।

২ 'সমকালীন', ৩য়, ৩৩৮-৪০।

৩ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬৭৭-৭৮, ৬৮১-৮৩, ৬৯৩ পৃষ্ঠাগুলি পঠিতব্য।

তিলক কার্জন-শাসনের বিরুদ্ধে গোখলের "খোলাখুলি সমালোচনাকে বিশেষ সমাদর করেন", অপরপক্ষে টাইমস অব ইন্ডিয়া গোখলেকে আক্রমণ করেছিল মডারেট-ভূমিকা ত্যাগ করার জন্য।৪ একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, বেনারস কংগ্রেসে গোখলেকে যতখানি র‍্যাডিক্যাল দেখা গেছে, পূর্বে বা পরে সে চেহারা তাঁর আর কখনো দেখা যায়নি। গোখলের এই বিশেষ অকারের হেতু অবশ্যই বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা, যার পরিবেশ-প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি—কিন্তু একটা ব্যক্তিগত কারণও ছিল। তিনি এইকালে 'নিবেদিতা-স্পেল'-এর মধ্যে ছিলেন, যার বিষয়ে আমরা যথেষ্টই জানতে পেরেছি—নিবেদিতার মরাঠি জীবনীকার ভি ভি পেন্ড্সে-র দ্বারা পরিবেশিত গোখলেকে লেখা নিবেদিতার চিঠিগুলি থেকে।৫

বেনারস কংগ্রেসের আগে গোখলেকে লেখা নিবেদিতার যেসব চিঠি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে গোখলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ (২০.৩.১৯০৩), এবং ভাইসরয়-কাউন্সিলে গোখলের বিভিন্ন বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রশংসা ইত্যাদি আছে। শেষোক্ত ব্যাপারে অভিনন্দন জ্ঞাপনের পরে, ২৯ মার্চ, ১৯০৩ তারিখের চিঠিতে নিবেদিতা বলেন : "মহারাষ্ট্রীয় তুমি, নিজ কাজের দ্বারা যেভাবে প্রথম শ্রেণীর বাঙালীদের ভালবাসা অর্জন করেছ, তা আমাকে অসীম আনন্দ দিয়েছে। সে ভালবাসার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তোমার মনঃপ্রকর্ষ, সাহস ও নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় অমূল্য বস্তু।" "ভাইসরয়ের উদ্দেশ্যে তোমার পূর্বযোচিত বক্তৃতার জন্যও অভিনন্দিত করতে চাই। যতই আমরা কাউন্সিলে ক্রমাগত দুর্বল থেকে দুর্বলতর মানুষদের পাঠিয়ে যাচ্ছি, ততই তোমার শক্তির উপরে আমাদের অধিক নির্ভর করতে হচ্ছে।" [১৯০৩-এর একটি চিঠি]। "এই শীত ঋতুতে তুমি যে-রকম শক্তিশালী ও খাঁটি যোদ্ধার ভূমিকা নিয়েছ, তাতে তোমার কলকাতা ছেড়ে যাওয়া খুবই বিপদজনক মনে হচ্ছে, বিশেষতঃ সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির কাছে, যারা কোনোমতেই তোমাকে হারাতে প্রস্তুত নয়।" [৯.৪.১৯০৪]।

গোখলে, নিবেদিতার 'বালকদে'র কাছে ঘরোয়া বক্তৃতা করেছিলেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিবেদিতা বলেছিলেন, "আমার ছেলেদের দলের ব্যাপারে যেরকম বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দেখিয়েছ, সেজন্য গত রবিবারের পর থেকে তোমাকে আমি চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছি। সেদিন তাঁদের কাছে যেভাবে বলেছ তার থেকে ভালো কিছু আমি কদাপি চাইতেই পারি না। তোমার সহজ শান্ত কথাগুলি তাদের কতখানি বাস্তব উপকার করেছে, তা তুমি ভাবতেই পারবে না—একথা আমাকে বলা হয়েছে।" [১৯০৩-এর চিঠি]।

নিবেদিতা তাঁর প্রভাবাধীন ছাত্রদের সর্ববিধ রাজনৈতিক ও জাতীয়তামূলক শিক্ষা দিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। গোখলের এই বক্তৃতা যতদূর মনে হয় বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের

৪ G. P. Pradhan and A. K. Bhagwat, *Lokamanya Tilak* (1958), 171.

৫ *Sister Nivedita's Letters to Gopala Krishna Gokhale*, by V. V. Pendse. (Sister Nivedita Birth Centenary Souvenir, First Series, Edited by Sankari Prasad Basu and Sunil Behari Ghosh).

ছাত্রদের কাছে হয়েছিল। [প্রমথরঞ্জন পাল নিবেদিতার আবাসে এইরকম একটি গোখলে-ভাষণের দীর্ঘ স্মৃতিকথা আমাদের দিয়েছেন, যার মধ্যে দেখা যায়, গোখলে ছাত্রদের কাছে শিক্ষানীতি ও চরিত্রনীতির কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। তিনি সার্ভেন্টস্ অব ইন্ডিয়া সোসাইটি ও ফার্গুসন কলেজের বিবরণ দেন, মহাদেব গোবিন্দ রানাডের প্রেরণার কথা বলেন, কেবল বিদেশী সাহিত্য, ইতিহাস ও পুরাণ-পাঠ নয়, স্বদেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার প্রতি জোর দেন। বারবার ঘুরে-ফিরে ছাত্রদের সৎ ও আন্তরিক হতে বলেন। মিথ্যা বস্তুটি নাকি কেবল ভারতীয়গণের একচেটিয়া—এইরকম একটা প্রচলিত পাশ্চাত্যধারণার প্রতিবাদ প্রসঙ্গে হলওয়েল মনুমেন্টের কথা তুলেছিলেন। "এই কলিকাতা নগরীর বক্ষঃস্থলে হলওয়েল মনুমেন্ট বা ব্ল্যাক হোল স্মৃতিস্তম্ভ [গোখলে বলেছিলেন] —তোমরা সর্বদা দেখে থাকো ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে-বিষয়ে পাঠ করো। এটা যে কত বড় LIE তা প্রমাণিত হয়েছে। একটি কক্ষের মধ্যে ১৮০-৮৪ জন ইংরাজের মৃত্যু হয়েছিল বলা হয়, সেটা কিন্তু বস্তুতঃ অসম্ভব। ঐসকল ব্যক্তিকে একটি পেষণযন্ত্রে পিষে ফেললে তাদের অস্থি ও মাংসপিন্ড যা দাঁড়াবে, তাকেও ঐ ঘরে ধরানো যাবে না। It is a deliberate lie exhibited here."]

নিবেদিতার পত্র থেকে আরও দেখি : ক্রিস্টিনের সঙ্গে গোখলের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল ; গোখলে নানা পরামর্শের জন্য নিবেদিতার কাছে এসেছেন বা নিবেদিতা জরুরী প্রয়োজনে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন ; নিবেদিতার সূত্রেই গোখলের সঙ্গে স্টেটসম্যান-সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফের বন্ধুত্ব ঘটেছে ; নানা নাগরিক-স্বার্থ বিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে গোখলে আলোচনা করতেন ; দেশীয় চেয়ারম্যানের পরিচালনায় পুনা মিউনিসিপ্যালিটির অগ্রগতিতে নিবেদিতা উল্লসিত হয়েছেন ইত্যাদি। গোখলের সঙ্গে মহারাষ্ট্রসফর নিয়ে নিবেদিতা আলোচনাও করেছেন। [২৪.৯.১৯০৪ ; ৫.১০.১৯০৪]।

নিবেদিতার প্রতি গোখলের শ্রদ্ধা প্রায় পূজার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ১৯০৫ মার্চ মাসে নিবেদিতা ব্রেন-ফিভারে আক্রান্ত হন। নিবেদিতা তাঁর বোন মিসেস উইলসনকে সেই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন (১.১১.১৯০৫) : "তোমাকে কি বলেছি, যখন আমি পীড়িত ছিলাম তখন তিনি [গোখলে] কিভাবে এসে সারারাত্রি থাকবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, এবং বারান্দায় বসে বরফ ভেঙে সরবরাহ করতে চেয়েছিলেন ? যখন কাজের প্রচন্ড চাপ, কার্জনের মোকাবিলা করবার জন্য তিনি বিরাট কাউন্সিল-ভাষণ তৈরী করছেন—তখনই এই কাজ করতে চেয়েছেন।"

এই পর্বে গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার উচ্চতর রাজনৈতিক বিষয়ে মতবিনিময়ও হয়েছে। ইংলন্ডের রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের ইঙ্গিত এইসকল আলোচনা থেকে পাওয়া যায়। নিবেদিতা গোখলেকে লিখেছেন :

"লিবারাল সরকার [ক্ষমতাসীন] হলে তুমি কাকে ভাইসরয় এবং ভারতসচিব [সেক্রেটারি অব স্টেট] হিসাবে চাইবে—লর্ড রী-কে ভাইসরয় এবং স্যার অ্যান্টনি ম্যাকডোনেলকে ভারতসচিব ? নাকি উল্টোটি ? স্যার ম্যাকডোনেল না হতে পারলে তাঁর স্থানে

অন্য কাকে চাইবে? দু'চার মিনিট অবসর নিয়ে যদি তোমার মনোনয়নের বিষয়টি কারণসহ লিখে পাঠাও কৃতজ্ঞ হব। নতুন মন্ত্রীসভার বিষয়ে অগ্রিম কোনো ধারণা আমার নেই, কিন্তু আমাকে এই প্রশ্নটি করা হয়েছে, এবং আমি তোমার মতামত পেলে বাধিত হব। ব্যাপারটি গোপনীয়।" [২৪.৭.১৯০৪]।

নিবেদিতা গোখলেকে লিখেছিলেন, "ছোটখাট মতপার্থক্য সত্ত্বেও আমরা অনুভব করি, তুমি আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গমহলের অন্তর্ভুক্ত।"

কিন্তু নিবেদিতা ভদ্রতাবশে এবং সম্পর্ক অটুট রাখার প্রয়োজনে মতপার্থক্যের কথাটাকে যতই নরম করে বলার চেষ্টা করুন, মতের ব্যবধান ছিল বিস্তৃত। তা নিয়ে প্রথমাবধি সংঘাতও ছিল। ২০ মার্চ ১৯০৩, উভয়ের পরিচয়ের প্রথম পর্যায়েই নিবেদিতা গোখলেকে উপহৃত কোনো একটি "ধাতানি"-র জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে লিখেছেন : "তোমার জীবন ও কার্যের অসীম মূল্যকে আমরা স্বীকার করি—আমার কোনো এক সময়ের উত্তপ্ত বাচালতা যেন ঐ ব্যাপারটিকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। তোমার দেশপ্রেমে আমি সন্দেহ করতে পারি, এমন কথা তুমি লিখতে পারলে—এই দেখে আমি গভীর বেদনা পেয়েছি। আমার কাছে এটা খুবই স্পষ্ট—তোমার সঙ্গে মতপার্থক্যের অর্থ এই নয়, তুমি যাকে ন্যায় বলে মনে করো তার পালনে তোমার সাহসের অভাব আমাদের হতাশ করেছে—বরং আমি তো ভাবতে চাই, শেষ কঠিন পরীক্ষার সময়ে আমিই পিছিয়ে পড়েছি। যতই যা হোক, আমি নারী, আর, সানন্দে ভাবছি, অপরপক্ষে প্রতি বিন্দুতে তোমার কতখানি পুরুষোচিত সাহস ও নাছোড় চেষ্টা।"

এর পরেই গোখলের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা যা লিখলেন সেই উদ্দীপক কথাগুলিকে স্বতঃই উচ্চাঙ্গের বীররসের সাহিত্য বলে মনে হবে :

"কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি তোমার মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে চাই। সেক্ষেত্রে বিষাদ নয়, অনন্ত আনন্দে তুমি পূর্ণ হয়ে যাবে। সে বস্তু তোমার প্রাপ্য। আমাদের চতুর্দিকে ক্রমজাগ্রত জীবন ও সংগ্রামের মহোৎসব। যদি কেউ বিভ্রান্ত বা বিষন্ন হয়, তার কারণ, যে-কাজে অগ্নি শিখায়-শিখায় লকলকিয়ে ওঠে, সেই যথার্থ কাজের ধারা সে গ্রহণ করতে পারেনি। আর যদি কেউ তা পেয়ে যায়, তার কি দীর্ঘশ্বাসের সময় থাকে? আমরা আর যেন [বলবৎ ব্যবস্থাকে] নিন্দার দ্বারা সংস্কার করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত না করি—যেন নির্মাণ করি জীবন। পুরুষের পৌরুষ, নারীর নারীত্ব—নিজের কর্মপথ নিজেই দেখে নেবে। মুক্ত করে দাও জীবনকে। বরণ করে নাও জীবনের পূর্ণ দানকে। সর্বোচ্চ মানবিক আবেগ এবং ত্যাগের দিব্য প্রেরণায় পূর্ণ একটি মহাজাতির প্রাণচেতনা—তার সম্বন্ধে তোমার আমার ভাবনাকে বহুধরে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবে।

"যে-আনন্দে পূর্ণ আমি, যদি তাকে ইচ্ছামতো তোমাকে দিতে পারতাম। আমি ভালবাসি দুঃখকে—সংগ্রামকে—দিব্য আত্মবলিদানকে। তার অধিকার আমাদের হোক।"

গোখলেকে উদ্বুদ্ধ করতে নিবেদিতার অক্লান্ত চেষ্টা :

"আমি নিতান্তই বিশ্বাস করি, এখনো বহু যুদ্ধে লড়বার মতো ক্ষমতা তোমার হবে—

আর, তোমার হাতে যতক্ষণ পতাকা ধরা আছে সে পতাকা ধুলোয় লুটোবে না। আমার এই বাসনার সমতুল আর কোনো বাসনা যে নেই, তা তুমি আমার মতোই জানো।" [১৯০৩-এর চিঠি]।

১৯০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে গোখলে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের কাছে বিদায় জানাতে আসেন—অবশ্যই অনুমতি নিয়ে—সেই অনুমতিদান গোখলের প্রতি "নিষ্ঠুরতা" বলেই নিবেদিতার মনে হয়েছে, তবু তাঁরা রাজি হয়েছিলেন কারণ তাঁদের সম্পর্ক *"বাহ্যিক পরিচয়ের চেয়ে বেশি কিছু।"* এইসব কথা বলার পরে নিবেদিতা লিখেছেন (৯.৪.১৯০৪) :

"তুমি মনে করো : এখন একের প্রতি অন্যের একমাত্র উপযুক্ত প্রশ্ন হল, 'প্রহরী! রাত্রি আর কত?' আর আমার মনে হয়, সূর্যোদয়ের অনিবার্যতায় সদাজাগ্রত বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের শক্তি। আমাদের মতভেদ যদি থাকে সে সামান্যই—এই মুহূর্তে তা অবশ্যই ভুলে যেতে পারি। এদেশীয় মানুষরা বিদায় দেবার সময়ে যা বলে বিদায় দেয় তাই তোমার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করছি—'দুর্গা। দুর্গা।' এই সহজ প্রার্থনা জানিয়ে—বর্তমানের কঠিন অর্জনের ভিত্তিতে তুমি যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর দর্শন লাভ করতে পারো—সেই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি।"

১৯০৫ সালে গোখলে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে ইংলন্ডে যান—বাংলা ও ভারতের অবস্থা সেখানে তুলে ধরবার জন্য। নিবেদিতা চেয়েছিলেন—গোখলে তাঁর সামাজিক দৃষ্টি প্রসারিত করতে ইংলন্ডে পজিটিভিস্টদের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা পজিটিভিস্ট দলের মিসেস হেস্টিকে লেখেন : "মিঃ গোখলে এই কয়েক সপ্তাহ ইংলন্ডে গেছেন। আমার খুবই ইচ্ছা, তিনি সকল প্রধান পজিটিভিস্টের সঙ্গে, বিশেষতঃ আপনার বন্ধু মিঃ উইলসনের সঙ্গে, মিলিত হোন।" [২.৯.১৯০৫]। নিবেদিতা আরও চেয়েছিলেন, উইলিয়ম স্টেডের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গোখলে ইংলন্ডের রাজনীতির ভিতরের কথা জানুন। স্টেডের কাছে বিশ্বাস ক'রে গোপন কথা বলা যায়, এই আশ্বাস দিয়ে তিনি স্টেডের নিকটে কার্জনের আসল কার্যাবলী খুলে বলতে বলেছিলেন। [২০.৯.১৯০৫]। ইংলন্ডে অবস্থিত গোখলেকে একই চিঠিতে নিবেদিতা বাংলার বয়কট ও স্বদেশীর প্রচণ্ড শক্তির বিষয়ে অবহিত করতে চেয়েছিলেন (পূর্বে উদ্ধৃত)—উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট—গোখলে যেন এই শক্তির মাপ মনে রাখেন। তারপর তিনি গোখলের মডারেট ইংরাজভক্তিকে শাসিত করার ইচ্ছায় এই দুষ্পাচ্য কথাগুলি লেখেন :

"আশা করি ইংলন্ডে থাকাকালে তুমি কতকগুলি ঋষিতুল্য ও সুমার্জিত চরিত্রের মানুষের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে না—আমার স্বদেশীয়রা ঠিক যা, তাদের সেইভাবে বিচার করার সুযোগ গ্রহণ করবে। তারা প্রায়শঃ রক্তপিপাসু, সর্বদা অর্থপিপাসু, অনুচিত যুদ্ধের কারণে অধঃপতিত, এবং যেসব বস্তু এতদিন 'ইংরাজ'-শব্দকে গৌরবান্বিত করেছে, তাদের দ্রুত বর্জনকারী।"

ইংলণ্ডে গিয়ে মডারেট গোখলে চতুর ইংরাজ রাজনৈতিকদের প্রভাবে পার্টিশন সম্বন্ধে মনোভাবে দ্বিধান্বিত হতে পারেন—এ আশঙ্কা নিবেদিতার ছিলই। ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, যে-চিঠিতে নিবেদিতা বেনারস কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবার জন্য গোখলেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, সেই চিঠিতেই পরোক্ষ তিরস্কারের ভঙ্গিতে লেখেন :

"একটা গুজব এখানে রটেছে—সরকারী লোকেরা বলছেন, তুমি নাকি পার্টিশনের পক্ষে মত দিয়েছ। আমরা অবশ্য জানি কথাটা সত্য নয়।"

তবু নিবেদিতা নিশ্চিন্ত নন। যদি গোখলে উক্ত অপকর্মটি করে থাকেন তাহলে কিভাবে সামাল দেওয়া যাবে, সে পথও বাতলেছেন :

"কিন্তু ঐ কথাগুলিকে [গোখলে পার্টিশনের পক্ষে মত দিয়েছেন] মানসিক ক্ষত সৃষ্টির কাজে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যে, তোমার স্বাক্ষরে ও-সবকে সরাসরি অস্বীকার করাই হবে শ্রেষ্ঠ প্রতিকারের পথ। আচ্ছা, এমন হয়েছে কি যে, কাউন্সিলের কোনো ইউরোপীয় সদস্য তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, আর তুমি পরীক্ষামূলক এমন কোনো প্রস্তাব করেছিলে যার থেকে উক্ত ভ্রান্ত প্রচারের উদ্ভব হতে পারে? যদি তেমন কিছু তুমি করেও থাকো, তথাপি স্পষ্ট ক'রে এই কথা লিখে জানাতে পারো—জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এই ক্ষেত্রটিতে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত হওয়া উচিত।"

গোখলে নিবেদিতাকে জানান, তাঁর মত বিকৃত ক'রে উপস্থিত করা হয়েছে। নিবেদিতা গোখলেকে আশ্বস্ত করে যা লেখেন, তাতে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে গোখলেকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা আছে :

"তোমার চিঠি ও কাগজ পেয়ে উৎফুল্ল। বিশেষ ধন্যবাদ। না, তোমার বন্ধুরা একেবারেই প্রভাবিত হননি। তাঁরা জানেন যে, ঐ বিবৃতিটি কুৎসা ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং তাঁরা কেবল ওটাকে খণ্ডন করবার অধিকার পেতে চেয়েছিলেন। তোমার ম্যাঞ্চেস্টার-বক্তৃতাটি নিজস্ব-ভাবে সেকাজ করেছে। শুনেছি যে, পূর্বোক্ত ব্যাপারটি হিন্দু পেট্রিয়টে বেরিয়েছিল।...আমাদের বেশির ভাগই ওটা পড়ি না। কিন্তু স্বার্থসন্ধ লোকেরা গুজব ছড়াতে চাইলে তাকে মারা কখনো-কখনো কঠিন হয়।" [১.১১.১৯০৫]।

গোখলে, ইংলণ্ডে ভারত ব্যাপারে নীতিপরিবর্তনের কোনো আভাস না পেয়ে [ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন] প্রত্যাবর্তন করেছিলেন "অধিকতর বিষাদ এবং অধিকতর প্রজ্ঞা সংগ্রহ করে।"৬

॥ ২ ॥ বেনারস কংগ্রেসে গোখলে ও নিবেদিতা

১৯০৫ সালের শেষভাগে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। ২৫ ডিসেম্বর তিনি বারাণসীতে পৌঁছান, তিলভাণ্ডেশ্বরে একটি বাড়িতে থাকেন, যা নেতৃবৃন্দের সাধারণ আলাপ-আলোচনার স্থান হয়ে ওঠে। নিবেদিতা এখানে বহু ব্যাপারেই

---

৬ মজুমদার, ২য়, ১১৯।

যে, মধ্যস্থতা করেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ব্যক্তিগতভাবে চরমপন্থী হলেও তিনি চিন্তা ও চেষ্টার বিভিন্নতাকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে সমর্থ ছিলেন। ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হতে পারে এমন কোনো সুযোগই তিনি ছাড়েন নি। লিজেল রেম' লিখেছেন, নিবেদিতা স্টেটসম্যানের সংবাদদাতার কাজও করেছেন। সেখানে "তাঁর রচনাগুলিতে মর্যাদাপূর্ণ সংযমের লক্ষণ ছিল, এবং ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে মত-পার্থক্যের রূপকে কমিয়ে দেখানো হয়েছিল।"৭

বিমানবিহারী মজুমদার বেনারস কংগ্রেসকে কংগ্রেসের ইতিহাসে "অন্যতম বিরাট ঘটনা" বলে চিহ্নিত করেছেন। তার মুখ্য কারণ, "এই প্রথম সমগ্র ভারতের আলোকপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা এখানে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।৮ [এই বাক্যের শেষাংশের "বাংলা বিভাগের" বদলে "ভারতে বৃটিশ শাসনের" কথাগুলো আমরা স্বচ্ছন্দে বসিয়ে দিতে পারি]। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই অধিবেশনের চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন : "বাংলার নিদারুণ দুর্গতির বিষয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা চড়া বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে ব্যক্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের ঘৃণাপূর্ণ ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে এর আগে এইপ্রকার উত্তেজনা দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।"৯

পার্টিশনের নিন্দা বা স্বদেশীর সমর্থন কংগ্রেসের কাছে কোনো সমস্যার বিষয় ছিল না—সমস্যা বয়কট নিয়ে, যা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সমরের সূচনা। জিনিসটির মন্দ গন্ধ সম্বন্ধে গোখলেকে নাসিকা কুঞ্চিত করতে হয়েছিলই : "বয়কট অপর প্রান্তে [অর্থাৎ শাসকদের মধ্যে] রোষবাসনা জাগ্রত করতে বাধ্য...কারণ তিক্ত এর অনুষঙ্গ, এবং ক্ষতিসাধনের আক্রোশমূলক ইচ্ছা বহন করছে।" তবু গোখলে যে, শেষপর্যন্ত বাঙালীদের পক্ষে এইরকম একটা "মারাত্মক অস্ত্র চরম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার" ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন, তার পিছনে নিবেদিতার প্রভাবকে সাবধানী ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন,১০ যদিও একইসঙ্গে বলা হয়েছে : তিলক, বিপিন পাল প্রভৃতির রাজনৈতিক চাপই শেষ পাল্লা ঝুঁকিয়েছিল। [এর পিছনেও নিবেদিতার মতলব থাকা বিচিত্র নয়]। তিলক বা পাল জানিয়ে দিয়েছিলেন—বয়কট-প্রস্তাব গৃহীত না হলে, প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে অভ্যর্থনা জানিয়ে যে-প্রস্তাব কংগ্রেস নিতে যাচ্ছে, তার বিরোধিতা করবেন। তা করা হলে শাসকদের কাছে মডারেটদের মুখ পুড়ে যেত। আপস হিসাবে কংগ্রেস বাংলার ক্ষেত্রে বয়কটের ঔচিত্যকে স্বীকার করে প্রস্তাব নিয়েছিল।

---

৭ রেম', 'দি ডেডিকেটেড', ৩২১।

৮ বিমানবিহারী, 'মিলিটান্ট ন্যাশন্যালিজম্ ইন ইণ্ডিয়া', ৫১।

৯ মজুমদার, ২য়, ২০০।

১০ ত্রিপাঠী, ১০৬।



NOTES OF SOME WANDERINGS
WITH THE SWAMI VIVEKANANDA

BY SISTER NIVEDITA OF
RAMKRISHNA-VIVEKANANDA.

*Author of "The Web of Indian Life";
"The Civic and National Ideals";
"Cradle-Tales of Hinduism";
"The Master as I saw Him" &c.*

AUTHORISED EDITION,

1913.

EDITED BY THE SWAMI SARADANANDA

PUBLISHED BY THE BRAHMACHARI GONENDRA NATH :
UDBODHAN OFFICE : BAGHBAZAR, CALCUTTA

স্বামীজী ও তাঁর দলের সঙ্গে ভ্রমণকালে ভগিনী নিবেদিতা যে-ডায়েরী রাখেন, তার থেকে এই বইটি প্রস্তুত হয়। এই বইয়ে প্রকাশিত বৃটিশ শাসন ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর কিছু মন্তব্য ইংরাজ প্রশাসকদের রোষদৃষ্টির কারণ হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপত্র ইংলিশম্যান কাগজে বইটির বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লেখা হয়।

Mr Parmeshwar [illegible] Letter address

233, Elgin Avenue.
Maida Vale
London. W.
Oct. 21. '04.

My dear Sister,

Many, many thanks for your letter. I fear I cannot reply to you fully till I have more time & have thought out what to say. I only [illegible] understand you at [illegible] of even that

Thanks too for the news. I am very glad to learn the industrial awakening is a real one & not merely an apparent one. As the university bill ~~with effect on the education~~ of the country I have no ~~fear~~ [illegible] Steps like these are other confiscation of the municipal franchises will do more to rouse us to the great danger that confronts us than anything

পরমেশ্বরলাল এককালে বিহারের নামী জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে নিবেদিতার অনন্য প্রভাবের কথা ইনি স্মৃতিকথা লিখেছেন। নিবেদিতাকে লেখা এই চিঠিতে (২১-১০-১৯০৪) তিনি নিবেদিতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রকাশ করেছেন।

[পর পৃষ্ঠাতেও একই পত্র]

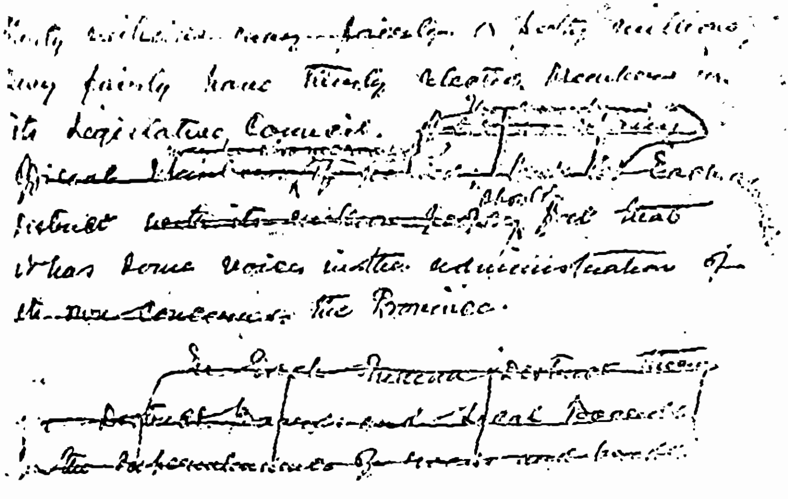
I know of . out of Evil Comes
Good — Shiva is the God
alike of death & birth.
I will agree with you that
Sri Ramakrishna Paramhansa
& your great master — the
Swami Vivekananda
~~are my~~ Bosses in a way
They are yours. I was
~~perfectly~~ hopeless before
I meet you. You gave
hope — though you some
part of my despair was
diminished — what you
Say is just true.

I am distressed to hear of
Mr. P. Mc Nair's illness. I hope
when you write to me next
you will have good news
to give me about him.
Could you please tell me what
progress Miss ~~Sataro~~ Sarala Ghoshal's
athletic clubs are making?
I am told she intend to organise
some ~~an~~ intercommunal athletic
Sports in connection with the I.
N. Congress. What success has
she.

Yours ever
Parmeshwar Lall



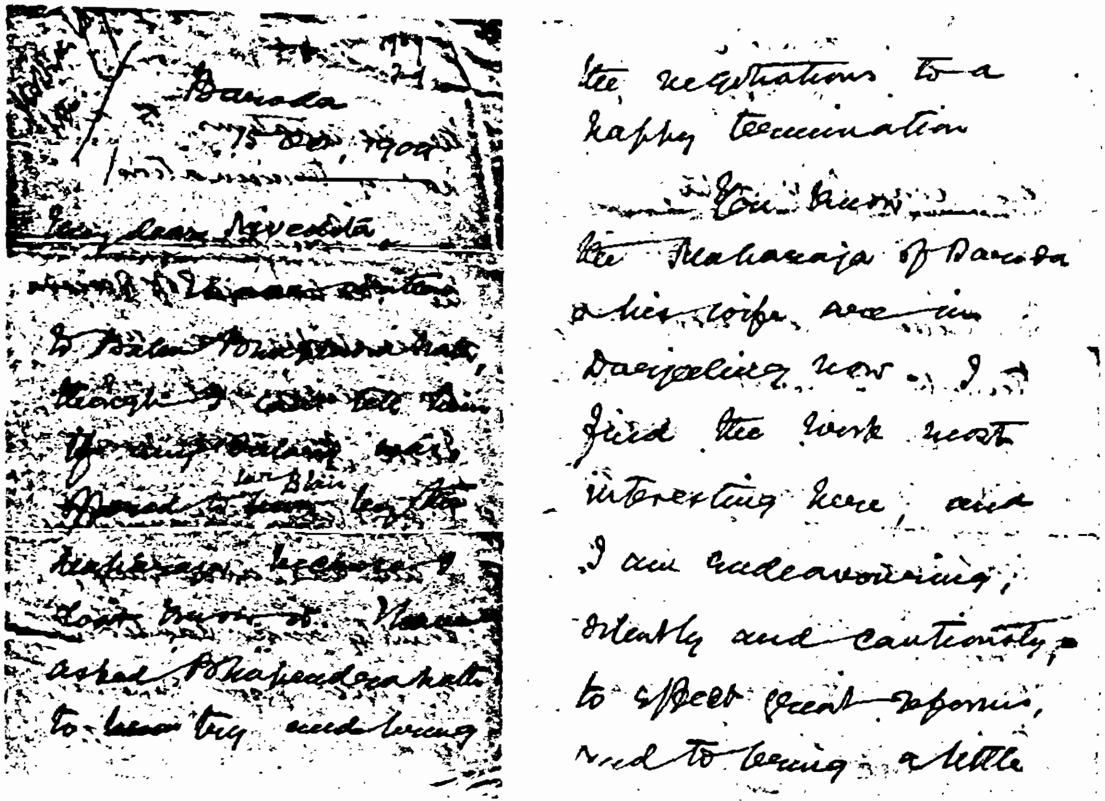
[উপরে] রমেশচন্দ্র দত্ত, বরোদার নতুন দেওয়ান, "যিনি বরোদার আকাশকে জ্যোতির্ময় করবার উজ্জ্বল চন্দ্র।" [হিন্দী পাঞ্চ]।



FACSIMILE OF R. C. DUTT'S HANDWRITING.

From the preface to his ECONOMIC HISTORY.

রমেশচন্দ্র দত্তর 'ইকনমিক হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অংশ। মডার্ন রিভিউ-এ (জানুয়ারি ১৯১০) রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনার মধ্যে মুদ্রিত।



Baroda
15 Oct. 1909

My dear Nivedita,

[illegible]

the negotiations to a
happy termination.
You know
the Maharaja of Baroda
& his wife are in
Darjeeling now. I
find the work most
interesting here, and
I am endeavouring,
steadily and cautiously,
to effect great reforms,
and to bring a little

বরোদা থেকে নিবেদিতাকে লেখা রমেশ দত্তর চিঠি (১৫-১০-১৯০৯)। এর মধ্যে তিনি বরোদার দেওয়ান হিসাবে প্রজাসাধারণের জন্য তাঁর উন্নয়ন-পরিকল্পনার কথা বলেছেন। [পরের পৃষ্ঠাতেও একই পত্র]।

more of light and joy and comfort to the lives of the poor voiceless agricultural population. Great expectations have been formed [illegible] disappointment, and in those expectations the people shall not be disappointed. But in order to succeed, we have to be cautious and slow and absolutely silent.

Unfortunately there is a famine [illegible] in some parts of the [illegible]

[illegible]



IN MEMORIAM

প্রয়াত আনন্দমোহন বসু, "কলকাতার প্রখ্যাত আইনজীবী ; ১৮৯৭-এ মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি। ("হিন্দী পাঞ্চ, ২৩-৮-১৯০৬)।



১৯০৬, কলকাতা কংগ্রেস-কালে গৃহীত চিত্র। (বাম থেকে উপবিষ্ট) : ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, আশুতোষ চৌধুরী, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, দাদাভাই নৌরজী, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। [দাঁড়িয়ে] রতন টাটা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, দীনশা ওয়াচা, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।



MOUNTING GUARD!

পূর্ববঙ্গের 'গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান' অম্বিকাচরণ মজুমদারের কার্টুন। প্রসঙ্গ: ফরিদপুর কনফারেন্সের আগে অম্বিকাচরণের সঙ্গে সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পত্রবিনিময় হয়। সরকারের তরফে জানানো হয়, বয়কট প্রস্তাব, বাক্‌স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, বা লাজপত রায়ের নির্বাসন সম্বন্ধে আলোচনা চলবে না। করলে মারাত্মক বিপদ ঘটবে। [হিন্দী পাঞ্চ, ২১ জুলাই ১৯০৭]।

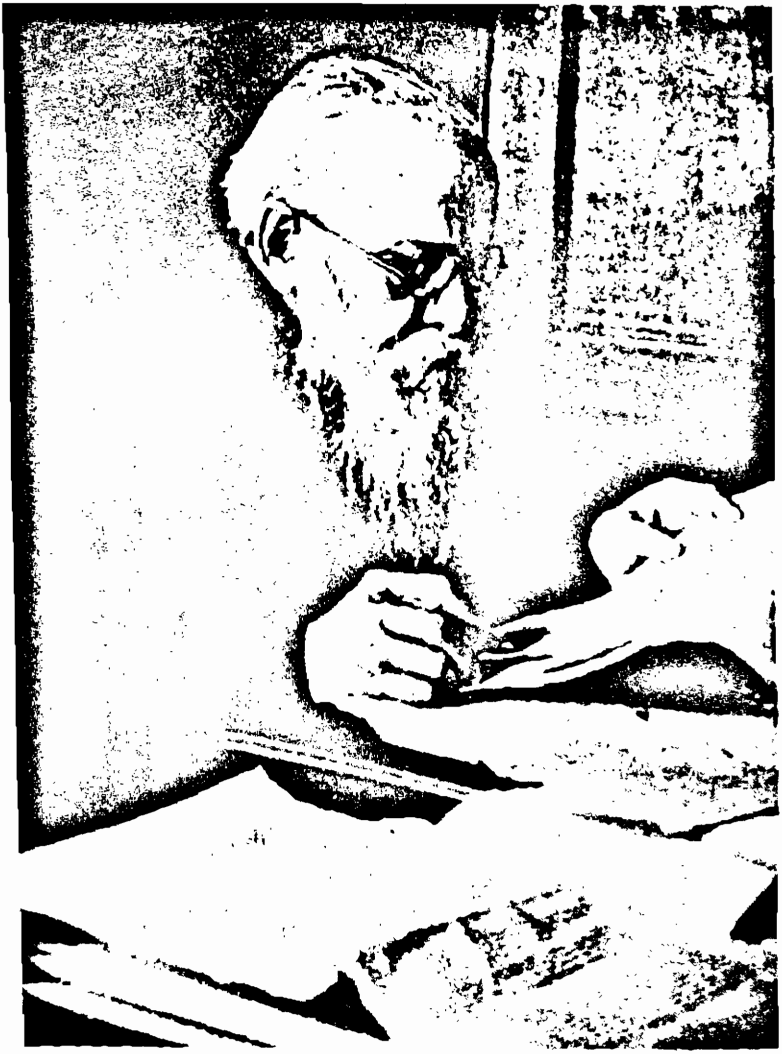


মডারেটগণ কর্তৃক বয়কট-বলে পদাঘাত। পদাঘাতকারীদের পাগড়িতে লেখা (বামদিক থেকে) : Madras, Bombay, United Provinces, *Punjab* ক্যাপশনের বক্তব্য : পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রতিনিধিরা ক্রমান্বয়ে বলেন, তাঁরা বাংলার বাইরে বয়কটের বিস্তার সমর্থন করেন না। (হিন্দী পাঞ্চ, ১০-১-১৯০৭)।



THE MODERN HERCULES.

রাসবিহারী ঘোষ 'মডার্ন হারকিউলিস ।' তাঁর হাতের উপরে লেখা, 'Moderate Party'. হাতের গদায় লেখা, 'Constitution.' গায়ের চাদরে—'I. N. Constitution'. সাপের মাথায়—'Hooliganism'. সাপের গায়ে—'Irresponsible Extremism'. ক্যাপশনের বক্তব্য :রাসবিহারীর সভাপতিত্বে কংগ্রেস-কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে—কংগ্রেসের লক্ষ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসন । উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন : সুরেন্দ্রনাথ জে চৌধুরী, লাজপত রায়, মুধলকর, ওয়াচা, পারেখ, খারে, দীক্ষিত, তায়েবজী । (হিন্দী পাঞ্চ, ২৬-৪-১৯০৮) ।



মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।



নূতন ভূমিকায় লাজপত রায়। শিশু ও বিধবাদের অনশন থেকে বাঁচাবার জন্য লাজপতের আবেদনসূত্রে অঙ্কিত। লাজপত রায় চরমপন্থী দল থেকে সরে আসেন—সেই ভূমিকা মডারেট মতের হিন্দী পাঞ্চ-এর পছন্দ হয়েছিল। (হিন্দী পাঞ্চ, ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)।



A HARD NUT.

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্টুন। লাহোর কংগ্রেসে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই মডারেটী প্রস্তাবেও কিন্তু সরকারের তরফে প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার প্রস্তাব বহুলাংশে আপত্তিকর, এমন বলা হয়েছিল।



গান্ধী-কার্টুন। গান্ধীজীর ডানদিকে জনবুল, মুরুব্বির হাসি-হাসি মুখে। গান্ধীজীর মাথার উপরে ডাণ্ডা তুলে আছে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়োর সরকার। ডাণ্ডায় লেখা—'ট্রানস্‌ভাল এশিয়াটিক অর্ডিনান্স।' কার্টুনটি ইংরাজ মহিমাজ্ঞাপক। ক্যাপশনে বলা হয়েছে—ট্রানসভালের ভারতীয় নেতা গান্ধীকে আশ্বাস দিয়ে জনবুল বলেছে : বৎস, ভয় পেয়ো না। আমি যখন পিছনে আছি, তখন তোমার উপর অত্যাচার করার আগে বুয়োর-ভায়াকে ফিরে চিন্তা করতে হবে।

ক্যাপশনে আরও আছে : ভারতীয়দের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। পরবর্তী তিনমাস ভারতীয়দের স্বেচ্ছায় নাম দাখিল করতে দেওয়া হবে ; গান্ধীকে আজ (২১ জানুয়ারি) মুক্তি দেওয়া হবে ; যেসব ভারতীয়ের সম্পত্তি আছে তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হবে, ইত্যাদি। (হিন্দী পাঞ্চ, ২-২-১৯০৮)।

গোখলে এই অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তাঁর বাঙালী-প্রীতির উল্লেখ আগেই করেছি। সুদূরে ইংলন্ডে গিয়েও তিনি প্রকাশ্যে বাংলার প্রশংসা করেছেন। সে বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন : "কি অদ্ভুত! বাঙালীদের সম্বন্ধে তোমার যথার্থ ধারণা কি তা তুমি দূরে ইংলন্ডে না-যাওয়া পর্যন্ত জানতেই পারিনি! ওটা জেনে অত্যন্ত খুশি! বড় সুন্দরভাবে কথাটা বলা হয়েছে—আর এই ধরনের ভালবাসার কথায় ভারতীয় হৃদয় গভীরভাবে সাড়া দেয়।" [১.১১.১৯০৫]।

গোখলে বেনারস কংগ্রেসে বলেছিলেন : বাঙালীর উপরে পার্টিশন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইংরাজ-পক্ষে সেটা "প্রকান্ড রাজনৈতিক ভ্রান্তি," আর বাঙালীদের সম্বন্ধে "ক্রূর অন্যায়।"১১ এমনই একটি ঘটনার শুভ ফল ভারতবর্ষের পক্ষে গোখলে দেখলেন! "বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল—এদেশের জনজীবন অতীব গুরুত্বপূর্ণ শক্তি অর্জনের উপযোগী ঘটনা পেয়ে গেছে, আর সেজন্য গোটা ভারতবর্ষ বাংলার কাছে গভীরভাবে ঋণী।"১২

স্বদেশীর মহিমা সম্বন্ধে বেনারস কংগ্রেসে গোখলের বক্তব্যে ছিল নিবেদিতার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি :

"সর্বোচ্চ স্বদেশী আদর্শের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তির যে-নিবেদন প্রকাশমান, তার প্রভাব এমনই প্রবল-ব্যাকুল ও এমনই সুগভীর যে, তার ভাবনাতেই শিহরণ জাগে, আর তার বাস্তব স্পর্শে মানুষ নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করে উত্থিত হয়। আজ ভারতের সর্বোপরি প্রয়োজন—ঐ [দেশ-] ভক্তির মহাবাণী প্রচারিত হোক উচ্চ এবং নীচ, রাজা এবং প্রজা, নগর এবং গ্রাম সর্বত্র, যে-পর্যন্ত না মাতৃভূমির সেবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাছে...সর্বগ্রাসী চেতনা হয়ে ওঠে।"১৩

নিবেদিতা তাঁর বারাণসীর কাজ নিয়ে গর্ববোধ করেছেন। "এবার স্বামীজী বেনারসে তাঁর জন্য সত্যই কিছু কাজ করতে দিয়েছেন", নিবেদিতা লিখেছিলেন। [২৪.১.১৯০৬]। কংগ্রেসের কাজ ছাড়াও নিবেদিতা অন্যত্র বক্তৃতা করেছেন যার দ্বারা মানুষ স্বামীজীর ভাবধারা কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছিল। অথচ এই কংগ্রেসের আগে নিজের শারীরিক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯০৫

---

১১ কোন্ কূট কৌশলে পার্টিশনকে উপস্থিত করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে গোখলে বেনারস কংগ্রেসে বলেন : "পরিকল্পনাটি গোপনে অন্ধকারে উদ্ভাবিত; গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক্ষেত্রেই তীব্রতম বিরোধিতা করা হলেও গায়ের জোরে বলবৎ।...এখানে দেখা গেছে, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির জঘন্য দিকের পরিপূর্ণ নমুনা, যাতে জনমত সম্বন্ধে ষোল আনা ঘৃণা, নিজেদের উচ্চতর স্থান সম্বন্ধে উদ্ধত ভ্রান্ত দাবি, এবং জনসাধারণের একান্ত প্রিয় অনুভূতি সম্পর্কে বেপরোয়া উপেক্ষা।" [ত্রিপাঠী, ১০১-০২]।

১২ ঐ, ১০২।

১৩ মজুমদার, ২য়, ২০০।

লিখেছিলেন : "আসন্ন বেনারস কংগ্রেসে উপস্থিত থাকবার আশা করছি। সেখানে কিছু কিছু মগজে করাত ও হাতুড়ির কাজ করতে পারব। তবে একথাটা মোটামুটি সত্য যে, উত্তেজনা চায় কিন্তু চিন্তা করতে চায় না—এমন বিশাল জনতার সামনে বক্তৃতা করার কথা আমি ভাবতেই পারি না।...পনর হাজারের কমে লোক হয়, এমন সভা এখন পাওয়াই মুশকিল।" তবু তিনি যথেষ্টই করেছিলেন। কেবল বিপিন পাল নন, তিলক, খাপার্দে, লাজপত রায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় থাকায় মডারেটদের সঙ্গে ওঁদের বোঝাপড়ায় মধ্যস্থতা করা সম্ভব হয়েছিল।

এবং নিবেদিতা কংগ্রেসে বক্তৃতাও করেছিলেন। এই একবারই মাত্র তিনি কংগ্রেসে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। সভাপতি গোখলেকে ধন্যবাদ দেওয়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। "এই মহৎ মানুষটির শক্তি ও ইস্পাত-চরিত্রকে আপনারা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন"—নিবেদিতা গোখলে সম্বন্ধে বলেন, এবং সেখানেই প্রশংসার শেষ। নিবেদিতার উদ্দেশ্য বস্তুত সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে প্রেরণা দান। সে কাজ তিনি সুকৌশলে করেছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল মডারেটদের মনে (গোখলে যাঁদের অন্তর্ভুক্ত); এবং বলা বাহুল্য সে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শাসকজাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। নিবেদিতা এই বক্তৃতাকালে নিজের গৃহীত ভারতীয়ত্ব সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখে [উত্তম রাজনৈতিক চতুরালি] বললেন—তিনি ইউরোপীয় হিসাবেই কথা বলছেন—এবং বলার কালে বোঝাতে চাইলেন, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত যদি সংগ্রাম শুরু করে তাহলে সে ইংলণ্ডকে ফিরিয়ে দেবে তার অপহৃত আত্মা :

"আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষে বিপুল জাতীয় চৈতন্যের উদ্বর্তন এবং তার বিরাট কণ্ঠস্বর ইউরোপের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন—যদি ইউরোপকে অমানবিকতার গহ্বরে উৎকট মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেতে হয়। সহস্র-সহস্র বার মানুষ ভারতের জন্য যেসকল আত্মোৎসর্গ করতে পারে, সে সকলই ইউরোপের পরিত্রাণের জন্য কৃত—এইভাবে সে-কাজ চিহ্নিত হতে পারে।...ভ্রাতৃগণ মনে রেখো, ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়, তাই নিয়ম। একশো বছর পিছনে দ্যাখো। দেখবে, ইউরোপে জাতীয়তার জন্ম হল। তিরিশ-চল্লিশ বৎসর এগিয়ে এসো—দেখবে, তোমাদের প্রবীণ ঋষি, প্রবীণ ভারতীয় পার্শী ঋষি, মিঃ নওরোজি, ইংলণ্ডের কাছে অশ্রুসজল কণ্ঠে আবেদন করেছেন—বহু মুক্তির দেশ ইংলণ্ড কি এখন তার বিরাট ভূমিকা দুঃখজনকভাবে ভুলে গেল! সে কি ইদানীং তার সমুচ্চ কর্তব্য-নিয়তিকে দুঃখজনকভাবে পদদলিত করতে উৎকণ্ঠিত নয়!! ভারতের জনগণ! উঠে দাঁড়াও, উদ্ধার করো ইংলণ্ডের ঐতিহ্যকে, তাকে নতুন ক'রে তৈরী করো, নতুন ক'রে সৃষ্টি করো, ইংলণ্ডকে বাধ্য করো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে, ইংলণ্ডের স্বার্থে নয় কেবল, এর দ্বারা তোমরা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীকে রক্ষা করবে একটি মহাদেশের [পাশ্চাত্ত্য মহাদেশের] অধঃপতনের দুঃখদৃশ্য থেকে, যে-মহাদেশের প্রাণাবেগ জাতীয়তার প্রাণাবেগ-রূপে সূচিত হয়েছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী সংহতি ও কেন্দ্রীকরণ প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-চেষ্টা থেকে।"

উচ্চ হর্ষধ্বনিতে এইসময়ে নিবেদিতার কণ্ঠ ডুবে যায়। তা প্রশমিত হলে নিবেদিতা বলেন :

"আমার কথা শেষ হয়নি। প্রিয় ভ্রাতৃগণ! [ইউরোপের ঐ] যে-প্রাণাবেগ জাতীয়তার প্রবাহরূপে নির্গত হয়েছিল, তা মানবতা-অর্চনার মনোভাবকে ত্যাগ করেছিল বলে, মূল ধারাপথ থেকে সরে গিয়ে ক্রমেই নিম্নগত হয়েছে, যার ফলে এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ—ছয়টি কি সাতটি কি আটটি সশস্ত্র সেনানিবাস থেকে ইউরোপীয় শান্তির, বৃটিশ শান্তির, বচন শোনা যাচ্ছে। আমরা ইংলণ্ডকে রক্ষা করব, ইউরোপকে রক্ষা করব, পৃথিবীকে রক্ষা করব—ঐ বিকট দৃশ্য থেকে।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রবলতম নৈতিক ঔচিত্যের ঘোষণাপত্র নিবেদিতা উচ্চারণ করলেন :

"ভারতের জাতীয়তার স্বপ্ন—ভারতের পক্ষে কোনো স্বার্থের স্বপ্ন নয়—এ হল মানবতার স্বপ্ন, যেখানে ভারত বিরাট আদর্শের জননী, যা-কিছু মহৎ, প্রেমময় এবং বৃহৎ, তারই পালিকা ধাত্রী। ঐ স্বপ্ন রূপায়ণের কাজ যদি আরম্ভ করতে পারো তাহলে দেখবে যে, ভারত আর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নেই, পরন্তু যে-বিরাট সংগ্রাম আরম্ভ হবার মুখে, ভারত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার স্বীকৃত প্রতিনিধি। ঐ সংগ্রামে ঈশ্বরেচ্ছায় ইংলণ্ডের রাজনীতির আসল প্রশ্নগুলির রূপ স্পষ্ট হয়ে যাবে ; দেখা যাবে—কনজারভেটিভ ও র‍্যাডিক্যালের সংঘর্ষের পুরনো ধরনের বস্তাপচা ধারণা চিরদিনের জন্য ভেসে গেছে, তার জায়গায় ইংরাজ-সাম্রাজ্যের মূলগত প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে : সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তা—জাতি-দাসত্ব বনাম জাতীয়তা—জাতি-দাসত্ব বনাম পৃথিবীর সর্ব মানুষের জাতীয়তার সংগ্রাম।"১৪

॥ ৩ ॥ কাছাকাছি সময়ে স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে নিবেদিতার বক্তৃতা ও প্রবন্ধ : নরম ও চরমপন্থী বিভেদ, হিন্দু-মুসলমান বিভেদের বিষয়ে তাঁর সতর্কবাণী

বেনারস কংগ্রেসের অব্যবহিত পর থেকে নিবেদিতা স্বদেশীর সমর্থনে জোরালো প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় মার্চ ১৯০৬, "দি স্বদেশী মুভমেন্ট" নামে একটি দীর্ঘ উৎকৃষ্ট লেখা বেরোয়।১৫ মাদ্রাজের পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশের নানা সম্ভাব্য কারণের মধ্যে বাংলার আন্দোলনের আসল সংবাদ মাদ্রাজে ছড়ানোর উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। শুরুতেই তিনি এই প্রয়োজনীয় শক্তিশালী কথাগুলি লিখেছিলেন :

"স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতি সমগ্র পৃথিবীতে নিজেকে মর্যাদা-যুক্ত করে তোলার সুযোগ পেয়েছে। ভয়ের বস্তুকেই পৃথিবী সম্মান করে : আর সুদৃঢ়,

---

১৪ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার "রিপোর্ট অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" থেকে নিবেদিতার এই মূল্যবান বক্তৃতাটি উদ্ধার ক'রে তাঁর "মিলিট্যান্ট ন্যাশন্যালিজম" গ্রন্থে (৫৩-৫৪) পরিবেশন করেছেন।

১৫ NCW, IV, 276-85.

বুদ্ধিষন্ত্র, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে সে সবচেয়ে ভয় করে।...স্বদেশী আন্দোলনে আদ্যন্ত পৌরুষ ও আত্মশক্তি বিঘোষিত। আর ভিক্ষা নয়, আর 'একটু সুবিধা দাও' বলে প্রার্থনা নয়—ভারত নিজের জন্য যা করতে পারে তা সে করবেই।"

'স্বদেশী'-বিরোধীদের বিভিন্ন আপত্তিকে নিবেদিতা খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। স্বদেশীর বিরুদ্ধে একটা আপত্তি—দুর্বল অপুষ্ট দেশীয় শিল্প প্রোটেকশন ছাড়া বাঁচতে পারে না, সেখানে প্রোটেকশন-হীন স্বদেশী শিল্পকে বাঁচানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের মতো দরিদ্র দেশের মানুষেরা সস্তায় জিনিস পেলে কিনবেই, তারা দেশী-বিদেশী বিচার করবে না, আর স্বদেশী দ্রব্যের চেয়ে বিদেশী যন্ত্রশিল্পে-প্রস্তুত দ্রব্য সস্তা হবেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। নিবেদিতা এখানে আন্দোলনাশ্রয়ী ভাবাত্মক উত্তরই দিতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "ঐসব কথা পাশ্চাত্যদেশীয়দের পক্ষে সত্য হতে পারে যারা 'আত্ম-স্বার্থের প্রয়োজনে সংগঠিত' সহযোগিতার শিক্ষায় লালিত হয়েছে। ওসব কথা একই সঙ্গে অসত্য হতে পারে ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে যারা 'আত্মোৎসর্গের ভিত্তিতে সংগঠিত' সহযোগিতার শিক্ষা পেয়েছে।" মানব-ইতিহাসের একটা সহজ অভিজ্ঞতার কথা নিবেদিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : "মানুষ সর্বদা সহজতম পথকেই বেছে নেয়, এটা যদি সত্য হয় তাহলে কোন্ সমাজ বর্বরতা থেকে উত্থানের আশা করতে পারে?" সদাকুণ্ঠিত, পরাজয়ের পূর্বেই পরাজিত, ভারতীয় সমালোচকদের নিবেদিতা স্মরণ করিয়ে দেন—"কেবল নির্বোধ ও কাপুরুষই বিরোধিতার সামনে বাধ্য মাথা নামিয়ে দেয়।" স্বদেশী কিভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, ছোট-ছোট কত শিল্প গড়ে উঠেছে, নিবেদিতা তার উল্লেখ করেন। [যদিচ নিবেদিতার এই সমকালীন আনন্দিত বিবরণ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের বিমর্ষ সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যাঁরা প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারেন নি বা তা করতে চাননি—'স্বদেশী' সফল হয়েছিল বা হতে পারে!!]। স্বদেশীর বিস্তার ও স্থায়িত্বের প্রসঙ্গে তিনি উৎপাদন ও বন্টন সমস্যা নিয়ে অর্থনৈতিক আলোচনা করেন, কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্বদেশী নামক "একমাত্র অস্ত্রটিকে" ধারালোভাবে তুলে ধরা—এটা বোঝানো যে, "আশা ও বিশ্বাস এসে গেছে—জনগণের মধ্যে।" "ক্ষতি—বিলম্বিত লাভ ছাড়া আর কিছু নয়।" আবেগে আশায় আন্দোলিত নিবেদিতার কণ্ঠধৃত এই সমকালীন ইতিহাস :

"পূর্ববঙ্গে যে-সংগ্রাম চলেছে তার দিকে চেয়ে আছে সারা ভারত। তার সম্বন্ধে কদাচিৎ কোনো শব্দ সংবাদপত্রে বেরোয় [সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ সম্বন্ধে উত্তম তারিফ!], তথাপি সে-বিষয়ে ধারণা সর্বত্রব্যাপ্ত। সুকঠিন বীরত্বে পূর্ণ মানুষগুলি স্বদেশী পণ্যের জন্য মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছে—সেদিকে তাকিয়ে প্রত্যাশায়, সহানুভূতিতে, গর্বে থমথম করছে আকাশ-বাতাস।"

শান্ত সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসে নিবেদিতা বললেন : "আমরা ব্যর্থ হব না কারণ ভবিষ্যতের সকল শক্তি আমাদেরই।" "দূরে হয়ে যাক ম্যাঞ্চেস্টার। দূরে হোক লণ্ডন। ভারতের জনগণ ব্রতী হোক নিজ কর্তব্যকর্মে।" তিনি সতর্ক করলেন শত্রুপক্ষকে :

"ন্যায়ের পথ রোধ করে যারা দাঁড়িয়ে আছো—সাবধান!...সকল ইতিহাসেই এমন লগ্ন

ঘনায় যখন নির্মম নিষ্ঠুরেয়া কেঁপে ওঠে, ঈশ্বরের করুণার প্রার্থনায় চীৎকার করে, কিন্তু দেখে তা অদৃশ্য।"

নিবেদিতা একদিন এক বাঙালী মুসলমান কারিগরের স্বদেশী বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। উক্ত বক্তা, স্বদেশীর সামান্য সাফল্যেই তাঁর সমধর্মী অত্যন্ত দরিদ্র মানুষগুলির অবস্থা পরিবর্তনের কথা বোঝাচ্ছিলেন—যাদের কাছে পেটের জ্বালায় চুরি করে জেলে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ আগে খোলা ছিল না। স্বদেশীর ও বয়কটের নৈতিক ঔচিত্য নিয়ে যারা কচকচি করছিল তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা বললেন : "ভারতের নিম্ন-শ্রেণীর এইসকল ক্ষুদ্র ভ্রাতাদের জন্য হাজার-হাজার অপরাধ করা যায়, চিরদিনের জন্য নিজের আত্মাকে অগ্নিকুণ্ডে ডুবিয়ে রাখা যায়।" প্রায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন :

"হে আমার ভারতীয় জনগণ! হে পদদলিত, অজ্ঞ, অসহায় জনগণ! উচ্চে তোলো স্বর, যাতে তোমারই রক্তমাংস আমরা তোমার কান্না যেন শুনতে পাই, তোমার সহজ সুখকে যেন জানতে পারি, আর আমাদের হস্ত ও হৃদয় যেন মিলিয়ে দিতে পারি তোমাদের সঙ্গে—সমবেত যন্ত্রণায়, সমবেত ভালবাসায়।"

ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার জুলাই, ১৯০৬ সংখ্যায় নিবেদিতার লেখা "দি টাসক্ অব দি ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া" প্রবন্ধের বিশেষ আলোচনার বস্তু—কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলি। বেনারসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ অনেক চেষ্টায় থামানো গেলেও ঐক্য রক্ষা করা ক্রমেই কঠিনতর হয়ে উঠেছিল, কেননা বেনারস কংগ্রেসের পর থেকে চরমপন্থীরা অধিক সংগঠিত হয়ে শক্তিপ্রকাশ করতে থাকেন, ফলে উভয় গোষ্ঠীর মত-পার্থক্যও ক্রমেই অধিক তীব্র ও তিক্ত আকারে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। নিবেদিতা প্রথমাবধি এই ধরনের সংঘাতকে শক্তির বৃথা অপচয় এবং শত্রুপক্ষের সহায়ক মনে করেছেন। এইসঙ্গে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মনোভেদকেও কথায় ও কাজে দূর করতে চেয়েছেন। ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা আগে যথেষ্ট জানিয়েছি। বেহার হেরাল্ড পত্রিকায় ২০ জানুয়ারি, ১৯০৪ তারিখে প্রকাশিত তাঁর "ছাত্রদের কর্তব্য" বক্তৃতার রিপোর্টে পাই :

"বারংবার নিবেদিতা সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদ-বিরোধ বিস্মৃত হবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রোতাদের অবহিত করেছেন।...[তিনি বলেন] হিন্দু ও মুসলমানগণ যেন পরস্পরকে সহিষ্ণুতার দৃষ্টিতে দেখে, কেবল তাই নয়, তারা পরস্পরকে ভাই বলে মনে করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তোমরা ক্রুর ঘৃণা ও নীচতার মনোভাব নিয়ে অপরের দোষদর্শন করবার চেষ্টা করো না।"১৬

পাটনায় অন্য একটি বক্তৃতাতেও ["দি এডুকেশন্যাল প্রবলেম ইন ইণ্ডিয়া"] নিবেদিতা জাতীয়তা, ঐক্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ এনে, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সাধনার উল্লেখ করে বলেছিলেন : "ঐ জীবনই কেবল তোমাদের শেখাতে পারে, কিভাবে একজন হিন্দু একজন মুসলমানকে ভালবাসতে পারে এবং একজন মুসলমান পারে হিন্দুকে।"১৭ ২০ মার্চ ১৯০৪, কলকাতা

১৬ NCW, V, 333-35.
১৭ NCW, V, 340. *Behar Herald*, January 27, 1904.

মাদ্রাসায় বক্তৃতা করার সময়ে বলেছিলেন, "ভারতীয় মুসলমানদের কর্তব্য আজ আরবের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা নয়।...না, তাদের কর্তব্য ভারতবর্ষের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা, ভারতের জাতীয় ভাবস্রোতে নিজেদের নিক্ষেপ করা।...ঐ প্রবল জাতীয় শক্তি তাদেরও—ঐতিহ্যগত কারণে। তারা ঐ ঐতিহ্যেরই সন্তান।"১৮

এই বছরে বুদ্ধগয়া মন্দির-সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নেবার সময়ে তাঁর লক্ষ্য ছিল—ধর্মপালের বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধ। [প্রসঙ্গটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে]১৯ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪ তারিখে "ডায়ন্যামিক রিলিজন" বক্তৃতার মূল কথা ছিল : ভারতবর্ষের ভাবগত অখণ্ডতা ; সেইসঙ্গে অখণ্ডতা-বিরোধী শক্তিগুলিকে জাতীয়তার দ্বারা উৎখাত করার প্রয়োজনীয়তা। ১৪ অগস্ট ১৯০৪, নিবেদিতা ডন সোসাইটিতে "ন্যাশন্যালিটি" বিষয়ে বক্তৃতাটি কার্যতঃ শুরু করেন এই কথাগুলি দিয়ে : "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষারূপে তোমরা অবশ্যই স্মরণ রাখবে—যে-দেশের লোক কেবল মত-ভেদ বা ভাব-ভেদের কারণে পরস্পরের টুঁটি চেপে ধরে, সেদেশে জাতীয়তা আসতে পারে না।" নিবেদিতা এখানেও হিন্দু-মুসলমান বিভেদের কথা তুলেছিলেন। মুসলিম লীগের তখনো জন্ম হয়নি, স্বদেশী আন্দোলন ধ্বংসে কার্জন-সলিমুল্লার আঁতাত হয়নি, সেই ১৯০৪ অগস্ট মাসেই নিবেদিতা হিন্দু শ্রোতাদের বলেছেন : "ধরা যাক, তোমরা বাঙালী জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছ—সেক্ষেত্রে তোমাদের একই ভ্রাতৃসংঘে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই তো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখানে তাহলে তোমাদের সংকীর্ণ গোঁড়ামি ভুলে যাওয়ার কথা আসছে, কারণ তাহলেই কেবল তোমরা তোমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি বোধ করতে পারবে।" ভারতে কত বিভিন্ন ধরনের মতসংঘর্ষ চলেছে তার একটা ছক দেবার পরে নিবেদিতা এই আবেদন করেছিলেন : "পরস্পরের কুৎসা করে আমরা যেন শক্তিক্ষয় না করি—এবং তার দ্বারা পথ-চলতি দর্শকের ঘৃণাপূর্ণ হাসির পাত্র না হই।"২০

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার পরে দেখা গেল, পূর্বতন হিন্দু-মুসলমান ভেদ ও অন্যান্য ভেদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত। একে অত্যন্ত ক্ষতিকর বিবেচনা করে নিবেদিতা এর বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রচার শুরু করেন। পূর্বে-উল্লিখিত "দি টাসক্ অব দি ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট" প্রবন্ধের সূচনায় তিনি দুঃখের বিদ্রূপ করে বলেছিলেন : "তরুণ ভারত [অর্থাৎ চরমপন্থীরা] ইউরোপীয় দেশসমূহের রাজনৈতিক দৃশ্য-দর্শনে

---

১৮ NCW, II, 479-80.

১৯ এইসূত্রে পঠিতব্য :

Bodh Gaya : *Its Place in Hinduism* in *Statesman*, April 3, 1904 (NCW, IV, 344-47). *Bodh Gaya*, in *Brahmavadin*, Aug. 1904 (NCW, IV, 193-98). *The Relation Between Buddhism and Hinduism*, in *Modern Review*, Sep. 1907 (NCW, IV, 144-53).

২০ *Nationality*, (lecture at the Dawn Society, Aug. 14, 1904), *Brahmavadin*, Dec. 1904, (NCW ; V, 150-53.).

একেবারে মোহিত। কেবল মোহিত নয়—সম্মোহিত।" তরুণ ভারত ভাবছে [নিবেদিতা লিখেছিলেন] ইউরোপের নকল করে কতকগুলি বিবদমান দল তৈরী করলেই পাশ্চাত্ত্য দেশপ্রেমের তেজ-বীর্য এসে যাবে। ইউরোপের কাছ থেকে তরুণ ভারত শিখতে চাইছে কী, না, "পারস্পরিক অভিযোগ, প্রতি-অভিযোগ এবং পারস্পরিক আক্রমণ, "নিন্দা ও নৈরাশ্যের রোষজ্বালা", "বিপথচালিত কর্ম ও বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক চিন্তা।" নকলনবিশি-লব্ধ এইসকল বদ বস্তুকে পরিহার করার অনুরোধ জানিয়ে নিবেদিতা ভারতীয়দের একটি বিষয়ে সচেতন করতে চেয়েছিলেন—ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের কিন্তু বাস্তবিক অভাব নেই। তারপর তিনি কংগ্রেসের প্রাণসত্যকে অনবদ্যভাবে প্রকাশ করেন : "কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক বা দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধি নয়—তা জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকের প্রতিনিধি।" ঐ জাতীয় আন্দোলনের দায়িত্ব, নিবেদিতা বললেন, "সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা—যা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবোধের, এবং ভূমির সঙ্গে জীবনের ঐক্যবোধের ভিত্তিতে প্রদত্ত হবে।" উন্মুখ করতে হবে নারীকে, স্পর্শ করতে হবে "অশিক্ষিত, অসহায়, অস্ফুটবাক জনগণকে।" শেষোক্ত কাজ করা যাবে "স্বদেশীব্রতের লক্ষ্য—শিল্পের পুনর্গঠনের দ্বারা।"

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষার প্রতিধ্বনি করে নিবেদিতা দৃঢ়ভাবে বললেন, নারী ও জনগণের জাগরণের উপরই দেশের উত্থান নির্ভরশীল। বিবেকানন্দেরই অনুসরণে তিনি লিখলেন :

"ছাত্র-প্রচারকরা ম্যাজিক লণ্ঠন,...ভারতের মানচিত্র নিয়ে ভারত-ভ্রমণ করুক, তাদের হৃদয় মন পূর্ণ থাক গাথা ও কাহিনীতে এবং ভৌগোলিক বিবরণে।...সমস্ত কিছুর ধুয়া শেষপর্যন্ত হোক—ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ।"

॥ ৪ ॥ ১৯০৬—০৭ সাল পর্যন্ত নিবেদিতা ও গোখলের সম্পর্ক : নরম ও চরমপন্থীদের সংঘর্ষ বিষয়ে নিবেদিতা

বেনারস কংগ্রেসের পরেও দেড় বছরের অধিক সময় নিবেদিতা গোখলের সঙ্গে উত্তপ্ত সম্পর্ক রক্ষা করেন, যা বিস্মিত করেছিল অরবিন্দকে। "নিবেদিতার একটা ব্যবহার আমার কাছে অবোধ্য ছিল [শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন]—গোখলেকে তিনি খুব সমীহ করতেন। কোনো বিপ্লবীর পক্ষে গোখলেকে শ্রদ্ধা করা আমার ধারণার অতীত। গোখলে ছিল, যাকে বলে as tepid as warm water. একবার গোখলের জীবন সংশয়াবস্থায় নিবেদিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বলেন, 'মিঃ ঘোষ, আপনার দলের ছেলে কি এই কাণ্ড করেছে?' আমি বললাম, 'না'। তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে কোনো free lancer হবে'।"২১

২১ 'কথাবার্তা', ২৬৯।

অরবিন্দের পক্ষে দুর্বোধ্য নিবেদিতার এই গোখলের প্রতি শ্রদ্ধার কারণ কী থাকতে পারে, তা কিছুটা আমরা অনুমান করতে পারি। অন্য কারণ বাদ দিলেও, গোখলের সঙ্গে সম্পর্করক্ষা করা বৈপ্লবিক প্রয়োজনেও সম্ভব। অমলেশ ত্রিপাঠী ঠিকই বলেছেন : অরবিন্দ কদাপি প্রলেটারিয়েটদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে চেষ্টা করেন নি। তাদের থেকে অরবিন্দ জন্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কারণে বিচ্ছিন্ন, নিজ শ্রেণীতে তিনি আবদ্ধ ; তাঁর নিঃসঙ্গ্য পূর্বতন ইউরোপীয় পরিবেশের দান।২২ অপরপক্ষে দেখি, নিবেদিতা প্রথম থেকেই প্রলেটারিয়েটদের মধ্যে কাজ করেছেন ; আবার বিদগ্ধ গোষ্ঠীতেও তাঁর সহজ সঞ্চরণ। তাই তিনি নিজ মতে সুস্থির থেকে, তার পক্ষে সক্রিয় থেকেও, অপর মতের মানুষদের স্বস্থানগত মূল্য স্বীকার করতে পারতেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা বলেছিলেন, "কিছু এসে যায় না কে কোন্ বিশেষ কর্মধারা গ্রহণ করলেন ; তাঁকে আমরা অবশ্যই জাতীয় বীরের সম্মান দেব যদি তিনি যথার্থ কাজের দ্বারা, বাস্তব আত্মোৎসর্গের দ্বারা, ঐকান্তিক দেশভক্তির পরিচয় দেন। জাতীয় আদর্শের প্রতি এই ধরনের পূর্ণ প্রাণের আনুগত্য জন-জীবনের সর্বত্রই দেখা যায়—যেমন তা দেখা গেছে বিদ্যাসাগরের মতোই রমেশচন্দ্র দত্ত বা গোখলের মধ্যে।"২৩

বেনারস কংগ্রেসের পরে, মডারেটদের হয়ে যদি কিছু সুবিধা আদায় করা যায়, এই আশা নিয়ে গোখলে পুনশ্চ ইংলণ্ড যান। চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবিলা করতে হলে অল্পবিস্তর শাসনতান্ত্রিক সুবিধালাভের আশ্বাস ছিল অত্যাবশ্যক। কিছু আশার কারণও ঘটেছিল—ইংলণ্ডে লিবারালেরা ক্ষমতায় এসেছেন এবং ভারতসচিব হয়েছেন দারুণ রকম প্রগতিশীল জন মর্লে—বার্ক, মিল, গ্লাডস্টোনে যিনি হাবুডুবু। নিবেদিতা কিন্তু গোখলের অভিপ্রায়ের সাফল্যে আশান্বিত ছিলেন না, তিনি মর্লে সম্বন্ধে প্রথমাবধি সন্দিগ্ধ; জেনে গেছেন যে, ভারত-ব্যাপারে মর্লে অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল [বিষয়টি পরে আলোচিত হবে] —তাই তিনি চাইলেন, গোখলে ইংলণ্ডে গিয়ে প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন এবং তাঁর কাছ থেকে অর্থনীতির পাঠ নিন। অর্থনীতিক হিসাবে পরিচিত গোখলের অর্থ-নীতিবিজ্ঞানের আবদ্ধতার আকার নিবেদিতার জানা ছিল। গোখলে পণ্যসমূহের সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে অবহিত নন ; তাই ঐ শিক্ষা গেডেসের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে সুদূরপ্রসারী ফল হবার সম্ভাবনা আছে বলেই তিনি মনে করেছিলেন। [২২.৩.১৯০৬ পত্র]। নিবেদিতা আরও চেয়েছিলেন, গোখলে যেন বিপ্লবী ক্রপটকিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। [১১.৪.১৯০৬]। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এইসব উপায়ের দ্বারা নিবেদিতা গোখলেকে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার অভ্যস্ত পন্থার বিপরীত দিক সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন—এমন কি আকৃষ্টও।

গোটা ১৯০৬ সাল জুড়ে ভারতে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের প্রচণ্ড মতসংঘর্ষ চলেছিল।

২২ ত্রিপাঠী, ১১৫।
২৩ NCW, V, 152.

শেষোক্ত দলে অরবিন্দ যোগ দেওয়ায় তাদের বিশেষ শক্তিবৃদ্ধি হয়। নিবেদিতা এই দলাদলিতে উত্তরোত্তর ক্লান্তিবোধ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বোধহয় আর সম্ভব নয়। তখন তিনি নিজের পথেই কাজ করতে থাকেন। তাছাড়া, ১৯০৬ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পূর্ববঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ অবস্থা তাঁর মনে দারুণ আঘাত করে ; কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সেখানে সেবাকাজ করেন ; সেখান থেকে ফেরার পরেই মারাত্মক ধরনের ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হন, এবং তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। সুতরাং ১৯০৬ কলকাতা কংগ্রেসে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেননি বা নিতে চাননি। [যদিও এই কংগ্রেসে তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হয়েছিল]। তাছাড়া তিনি যে-ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তার জন্যও বোধহয় প্রকাশ্য মনোযোগের লক্ষ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। কলকাতা কংগ্রেসে মডারেটরা যদিও কৌশলে লাজপত রায়কে সভাপতি করার চেষ্টাকে ঠেকিয়ে তাঁর জায়গায় ভারতীয় রাজনীতির "সুমহান বৃদ্ধ পিতামহ" দাদাভাই নৌরজিকে সভাপতি করতে পেরেছিলেন—কিন্তু তাঁর "কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বরাজ"—এই সিদ্ধান্তকে ঠেকাতে পারেন নি [অবশ্য "স্বরাজ" শব্দটি নানা হাতে নানা অর্থে সেজেছিল], এবং বাংলার পক্ষে অন্ততঃ স্বদেশী ও বয়কট সমর্থনীয়, একথা তাঁদের পুনশ্চ প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কলকাতা কংগ্রেসেই "একস্ট্রিমিস্ট"দের (বা "ন্যাশন্যালিস্ট"দের) প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিগোষ্ঠীরূপে দেখা গেল।

কলকাতা কংগ্রেসের পরেও নিবেদিতা গোখলেকে পরামর্শাদির জন্য ডেকেছেন। [২৫.২.১৯০৭] নানা ব্যাপারে গোখলের সাহায্য তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল। তাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা স্টেটসম্যান-ত্যাগী র‍্যাটক্লিফের চাকুরিসন্ধানও আছে। [শেষের বিষয়টি পরে আলোচ্য]। এইসব ব্যাপারে সাহায্য করতে হলে গোখলের ভাইসরয়-কাউন্সিলে থাকা দরকার। তাই গোখলে কাউন্সিল-ত্যাগের ইচ্ছাপ্রকাশ করলে নিবেদিতা তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। ২৮ মার্চ, ১৯০৭, চিঠিতে নিবেদিতা গোখলের প্রতি তাঁর, ক্রিস্টিনের, এবং জগদীশচন্দ্রের বিশেষ প্রীতি-অনুরাগের কথা জানিয়ে, কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে তাঁকে দেখা ক'রে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন ; তারপর লেখেন : "না, তুমি কাউন্সিল ছাড়তে পারবে না—এটাই আমার বিশেষ আশা। কাউন্সিলই তোমার স্বস্থান, সেখানে তোমার অসীম মূল্য।"

গোখলেকে উৎসাহিত ক'রে তিনি আরও লিখলেন : "তাছাড়া বিরাট সংকটকালে প্যারিসে লামার্টিন যা ছিলেন, তাই একদিন তুমি ভারতের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াবে—সেটাই তোমার ভবিতব্য—সর্বদা ভেবেছি। তুমি কাউন্সিলে থাকো বা না-থাকো, ও-জিনিস তোমার কাছে আসবে। 'জীবনের ক্ষেত্রে তোমার জন্য নির্ধারিত স্থান তোমার পশ্চাদ্ধাবন করছে—সুতরাং তাকে সন্ধানের প্রয়োজন তোমার নেই'।"

গোখলের কাছে নিবেদিতা কিন্তু স্নিগ্ধ মুখ বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারতেন না। কিছুদিনের মধ্যে এক চিঠিতে (১১.৭.১৯০৭) তিনি "নিবেদিতা দি ফিউরিয়াস" রূপ ধরে গোখলেকে যে-চিঠি লেখেন, তার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে ইংরাজ-মহলের ঘোর

অবিচারের বিরুদ্ধে রোষ-বিস্ফোরণ ছিল। "যখন আমি ভারতবর্ষ নামক এই দেশের কথা ভাবি, [নিবেদিতা লিখেছিলেন] দেখি যে, বিদেশীরা তার দান গোগ্রাসে গিলে পেটমোটা হচ্ছে, অথচ দেশসেবা করতে গিয়ে দেশের সন্তানকে যে-কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হচ্ছে তা শাস্তিভোগ ছাড়া কিছু নয়—তখন আমার বিরক্তি ও উত্তেজনার শেষ থাকে না। লালা লাজপত রায় একেবারে ঠিক কথাই বলেছেন—ইংরেজরা কি এদেশটাকে আকাশ থেকে পেড়ে নামিয়েছে নাকি?"

১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে নিবেদিতার পক্ষে ভারতে অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় তিনি ভারতত্যাগ করেন। নিবেদিতার সংস্রবে গোখলেও বোধহয় সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়েছিলেন।২৪ গোখলে নিবেদিতার সঙ্গে সম্ভবত কিছুসময় ভারত ছেড়ে যেতে চেয়েছিলেন (৩১.৭.১৯০৭), কেননা তাঁরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, এবং সে-বিষয়ে তাঁকে নিবেদিতা ১ অক্টোবর, ১৯০৭, চিঠিতে অবহিত করেছিলেন :

"সাপারের সময়ে প্রতিদিন ক্রিস্টিন মর্লে-র মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যায়। তা, প্রতিদিন সকালে মতিলাল [ঘোষ] [অমৃতবাজার পত্রিকায়] কার্জনকে যেভাবে উৎপীড়ন করে, ঠিক তারই মতো আমোদজনক। কি বিচিত্র সময়েই না আমরা বাস করছি! শুনছি, এমনকি তুমিও [গোখলেও] একেবারে নিরাপদ নও। আমি অবশ্য তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দেখতে খুবই ইচ্ছুক।"

॥ ৫ ॥ সরকারের কাছে গোখলের আত্মসমর্পণ : তার বিরুদ্ধে নিবেদিতার কঠোর সমালোচনা

এইসময়ে ও কিছু পরে ভারতীয় রাজনীতিতে ওলট-পালট কাণ্ড ঘটে যায়—চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক মতের প্রবল প্রচার, বৈপ্লবিক হত্যার চেষ্টা ও সাফল্য, তার পরিণতিতে কারাদণ্ড, নির্বাসন, প্রাণদণ্ড। এই পরিস্থিতিতে গোখলের পক্ষে নিবেদিতার সঙ্গে সম্পর্করক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ১৯০৭-এর শেষে সুরাট কংগ্রেসে (নিবেদিতা যখন ভারতে নেই) গোখলে ন্যাশন্যালিস্ট দলকে রুখতে ফিরোজ শা মেটা-গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্র হয়ে যেসব কাজ করেছিলেন, তা শেষোক্ত দলে গোখলের পুরো আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছু নয়।

---

২৪ মর্লে এবং মিন্টো মডারেট গোখলের দ্বারা একস্ট্রিমিস্টদের শমিত রাখতে চেয়েছিলেন। যতদিন গোখলে তা করতে পেরেছেন ততদিন তিনি ও'দের কাছে "গুড বয়", কিন্তু তাতে ব্যর্থ হবার পরে তিনি "নির্বোধ লোক।" ৭ অগস্ট ১৯০৭ মিন্টো মর্লেকে লেখেন :

"As to Gokhale, if he chooses to play with fire he must take the consequences...I am thoroughly disappointed in Gokhale. I had liked what I had seen of him and believed he was honest at heart, but the part he has played of late has disgusted me. As an honest moderate he has lost a great opportunity of discountenancing rank sedition." [R. C. Majumdar, Vol. II, 158].

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এর পিছনে ছিল মর্লে-মিন্টোর প্ররোচনা। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে বহু সমর্থক প্রমাণ তিনি মিন্টোর চিঠিপত্র থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন।২৫

সম্ভবতঃ এই কারণেই সুরাট কংগ্রেসের পরবর্তীকালে গোখলেকে লেখা নিবেদিতার কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি। ঐ সময়ের পরে নিবেদিতা যদি গোখলেকে কিছু লিখেও থাকেন তাতে নিশ্চয় গোখলের কঠোর সমালোচনা ছিল, কিংবা এমন কোনো বিপজ্জনক কথা ছিল যার জন্য সেগুলিকে রক্ষা করা গোখলে নিরাপদ মনে করেন নি।

সুরাট কংগ্রেসের পরে, পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে নিবেদিতা গোখলে সম্বন্ধে যেসব সংবাদ পেয়েছিলেন, তাদের থেকে আনন্দবোধ করার বস্তু তিনি খুঁজে পাননি। নেভিনসনের লেখা থেকে, তাঁর মুখ থেকেও, নিবেদিতা সুরাট কংগ্রেসে ন্যাশন্যালিস্টদের হঠাবার জন্য মডারেট-দের নিন্দনীয় প্রয়াসের কথা জেনেছিলেন। ন্যাশন্যালিস্টরা যদি কংগ্রেস ভেঙেও থাকেন, সে কাজের উস্কানি কম ছিল না। নিবেদিতা ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তিতে ছিলেন, যদিও ইংলণ্ডে তিনি "ওটা এমন কিছু নয়" বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ইংলণ্ডে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, ভারতীয়রা রাজনীতিকে এখন অত্যন্ত তীব্র-গভীরভাবে নিচ্ছে বলেই এরকম সংঘর্ষ ঘটছে। ভারতের পক্ষে এ-বস্তু ভালো ফলই দেবে। যখন ভিতরে আগ্নেয়গিরি, তখন বাইরে মসৃণ চেহারা দেখিয়ে লাভ কি? ১৯০৮, ৫ জানুয়ারি এসেক্স-হলে লণ্ডন পজিটিভিস্ট সোসাইটিতে মিঃ এস এইচ সুইনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিবেদিতা "ফ্যামিলি অ্যান্ড ন্যাশন্যালিটি ইন ইণ্ডিয়া" বক্তৃতার শেষে বলেন :

"The recent events at Surat showed that in this rsepect [of applying 'representative system to affairs of State'] there was progress. Indian politics were becoming serious. The younger men were making it plains that they were prepared to risk even separation from their elders in order to find expression for their own convictions."২৬

---

২৫ মজুমদার, ২য়, ২১৪-১৭।

২৬ *India*, January 10, 1908.

ইণ্ডিয়া পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে নিবেদিতার বক্তৃতার আগ্নেয় অংশ প্রায় ছিল না। অমৃতবাজারের লণ্ডন সংবাদদাতার বিবরণীতে তেমন অগ্নিঝলকের কিছু নিদর্শন আছে। যখন ভিতরে আগ্নেয়গিরি তখন বাইরে মসৃণ চেহারা দেখিয়ে লাভ কি, ইত্যাদি—

"[She said :] The method of self-Government [in the family life of India] has not had until recent times a political agitation, but India is now discovering that she is a cohesive mass and the struggle to assert the fact before the world is her true national movement...The disruption of the Congress, she maintained, would be good for India ; it was no use to make onlookers believe that there was a smooth surface when beneath was a volcano." [*London Letter, Amrita Bazar Patrika,* Jaunary 29, 1908. Reymond Collection.].

ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে লিখিত মডার্ন রিভিউ-এর "দি রিসেন্ট কংগ্রেস" প্রবন্ধে [ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮] তিনি বৃথা দলাদলির যথেষ্টই নিন্দা করেছিলেন ["অবশ্যই আমরা অন্তর্দ্বন্দ্ব, বলপ্রয়োগ, গুন্ডামি, অনুচিত বাধাদান, রীতিহীন পদ্ধতির কুণ্ঠিত সমর্থক বা উৎসাহী প্রচারক নই ; দ্বিধাহীনভাবে সজোরে তাদের নিন্দা করছি"]—কিন্তু লেখাটিতে প্রধানতঃ মডারেটী কাঁদুনিকেই ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল—আর ধিক্কার ছিল সেইসব সুযোগ-সন্ধানী শাসক বা তাঁদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে যাঁরা এই ধরনের একটা সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক অধিকারলাভের যোগ্য নয় প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। "আমরা খোলাখুলি বলছি, [নিবেদিতা লেখেন], কিছুকিছু লোক ভায়োলেন্স সম্বন্ধে বলবার সময়ে যে-ধরনের মর্মপীড়ন ও আত্মগ্লানি দেখাচ্ছে, সেটা...ভায়োলেন্স আমাদের যতটা লজ্জা দিয়েছে তার থেকেও বেশি লজ্জাজনক।" পৃথিবীর নানা স্থানে পার্লামেন্টে সুরাট কংগ্রেসের অনুরূপ সংঘর্ষ হয়েছে ; সেসব ব্যাপার যদি ঐ দেশগুলির স্বায়ত্তশাসন-লাভের অধিকার নষ্ট করে না থাকে, ভারতের ক্ষেত্রেই বা তা করবে কেন?—নিবেদিতা প্রশ্ন করেছিলেন। "কেন আমাদের তরুণদের রক্ত রাগে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবে না, কেন তাদের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হবে না...যে-রকমটি অন্য দেশে হয়?" নিবেদিতা অধীর হয়ে সজোরে বললেন : "না—না, মানুষ মানুষই—ভারতেও। এই অতীব আত্মনিন্দা, দুঃখপ্রকাশ, মৃদুতা—এসকলই একেবারে মেয়েলি। এসব যদি আন্তরিক হত তাহলে মেয়েলি, আর যদি মৌখিক হয়—আদিখ্যেতা।" চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যদি গা-জুরি বা গালাগালির অভিযোগ করা হয় তাহলে নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে মিনমিনে তাঁবেদারি, তোষামোদি এবং জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনাস্থা পোষণের অভিযোগ আনা যাবে। বলাবাহুল্য নিবেদিতার বিতৃষ্ণা দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অধিক।

এই রচনায় নিবেদিতা "মডারেট" ও "একস্‌ট্রিমিস্ট"—এই দুই নামকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রে বলেন, সবাই ন্যাশন্যালিস্ট, তবে তারই মধ্যে পদ্ধতি-প্রশ্নে মতভেদ আছে। নিবেদিতা কংগ্রেসের মধ্যে দুই মত-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও স্বাধীন বিকাশের পক্ষপাতী। "ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির দুই বিভাগ থাকলে ভারতীয় জাতীয়তা তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে দ্বিগুণ-প্রসারিত করতে পারে।" তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, "একরূপতার অভাব মানে ঐক্যের অভাব নয়।" এবং তিনি সবকিছুকে মাপতে চাইলেন একটি মাপকাঠিতে—"আত্মোৎসর্গ।" "বাকপটুতা, সাজানো যুক্তির চালাকি, বা সাবলীল রচনাশক্তি কাউকে ভক্তিনত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘের অধিকারী করতে পারে না। কেবল সেবার দ্বারাই আত্মনিবেদিত দেশপ্রেমিকের জন্য অর্জিত হয় নেতৃত্বের শিরোভূষণ।"

১৯০৭ সালের পরে গোখলেকে লেখা নিবেদিতার চিঠি পাওয়া না গেলেও র‍্যাটক্লিফকে লেখা তাঁর চিঠিতে গোখলের কিছু-কিছু উল্লেখ আছে, আর সেগুলি প্রায়ই বিরক্তিসূচক। দেখা যায়, গোখলে ক্রমেই অধিক মডারেট হয়ে রাজভক্তিতে ডগমগ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা তাঁর কাছে পাগলের প্রলাপ। অপরপক্ষে ঐ 'সুস্থ মস্তিষ্ক'

ব্যক্তিটি অরবিন্দের কাছে 'বিভীষণ।'২৭ নিবেদিতা অবশ্য গোখলে সজ্ঞানে ভারতের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে পারেন, এমন বিশ্বাস করতে চাননি, এবং গোখলে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে তাঁর বিরোধী রাজনৈতিকদের (যথা তিলককে) জেলে পাঠিয়েছেন—এমন অভিযোগকে কুৎসিত বলেই মনে করেছিলেন। বিপিন পাল তাঁর ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় ঐ নোংরা অভিযোগ করলে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় পালকে কঠিনতম আক্রমণ করেন। উক্ত পত্রিকার জুলাই ১৯০৯ সংখ্যায় একটি নোট—"ইনসিনুয়েসনস্ এগেনস্ট মিঃ গোখলে"—ভাষা ও ভঙ্গিতে পরিষ্কার নিবেদিতার। এর মধ্যে স্বরাজ পত্রিকার লেখাটিকে "দায়িত্বহীন ও অবিবেকী" বলে চিহ্নিত করার পরে বলা হয়: "মিঃ গোখলের সঙ্গে মতৈক্যের সুখানন্দ আমরা সর্বদা উপভোগ করতে পারিনি একথা সত্য, কিন্তু কোনো স্বদেশবাসীর মধ্যে সাহস ও মর্যাদাবোধ দেখলে তাকে স্বীকার না করার মতো অধঃপতন আমাদের হয়নি। ঐরকম এক মানুষ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজ পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ভারতসচিবের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করেছেন, এমন ইঙ্গিত চূড়ান্ত বর্বরোচিত। এক্ষেত্রে আমরা সন্দেহ না ক'রে পারছি না যে, এই ধরনের অভিযোগ যে-প্রকার নৈতিক ঘৃণ্যতার সূচক—তার পরিমাণ নির্ধারণে অসামর্থ্যই স্বরাজ পত্রিকার লেখককে ঐকাজে প্রণোদিত করেছিল। 'জাতীয়তা' নামের আবরণে ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও দম্ভের উচ্ছ্বাসকে ঢেকে রাখার চেষ্টা সামাজিক অপরাধ।...হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শত্রুতা বাড়ানোর চেষ্টার মতোই আমাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ভেদসৃষ্টিতে নিয়োজিত থাকাও চরম বজ্জাতি। যে-ব্যক্তি সেকাজ করে সে স্পর্শের অযোগ্য।"

মানুষের মর্যাদাকে নিবেদিতা রক্ষা করতে সচেষ্ট, কিন্তু অন্যায়কে আঘাত করতেও দ্বিধাহীন। সুতরাং গোখলের অনুচিত আচরণেও তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধ বোধ করেছেন। ৯ জানুয়ারি, ১৯০৯ লিখেছেন: "হতভাগ্য মরাঠা ব্রাহ্মণটি! জীবনকে কিভাবে না কাটাছেঁড়া করছে!" ২০ অক্টোবর ১৯০৯: "ইদানীং কেবল তার ভ্রান্তি আর ভ্রান্তি।... তার প্রধান ভ্রান্তি, আমার মতে, কংগ্রেসের পথে পাঁচিল তোলা এবং পার্শীদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া।" ৩ নভেম্বর ১৯০৯: "মিঃ গোখলের দুটি এখন-খ্যাত বক্তৃতার নির্বুদ্ধিতার কথা তুমি জানো। বক্তৃতা দুটি তার জনপ্রিয়তা অত্যন্ত নষ্ট করেছে। তার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্নেহ-প্রীতি যতই থাক, ওর সমর্থনে শব্দমাত্র উচ্চারণ সম্ভব নয়।" ২১ জানুয়ারি ১৯১০: "হতভাগ্য মিঃ গোখলের জনপ্রিয়তার ভাণ্ড এখন শূন্য। তবে সরকারের কাছে অবশ্যই সে জনপ্রিয়!" ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০: "কেটি-র [মিসেস র‍্যাটক্লিফের] বন্ধুর [গোখলের] উপর এখন যেন অভিশাপের কালো ছায়া। সে প্রকাণ্ড ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু ঘটাচ্ছে না।" ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০: "মিঃ গোখলে অবশ্যই অতি সরলমতি। সে মনে করছে, প্রেস বিলের দ্বারা বাংলা ইতিমধ্যেই কাত হয়ে পড়েছে—কেননা সে সম্বন্ধে

---

২৭ গিরিজাশঙ্কর, 'শ্রীঅরবিন্দ', ৭৮১-৮২।

কোথাও উচ্চবাচ্য নেই। এর দ্বারা সত্যি মনে হয় নাকি যে, বুদ্ধিবিকাশের ব্যাপারে রাজনীতি খুবই অনুর্বর জমি।"

গোখলেকে যে, সরকার গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না, তা নিবেদিতার ১০ অগস্ট, ১৯১০, চিঠি থেকে দেখা যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদারও মিন্টোর চিঠি থেকে এই পর্বে গোখলে সম্বন্ধে সরকারের উপেক্ষার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।২৮

মডার্ন রিভিউ পত্রিকার অগস্ট ১৯০৯ সংখ্যার অনেকগুলি নোট-এর মধ্যে গোখলের ঐকালীন নানা মন্তব্যকে খণ্ড-খণ্ড করা হয়। লেখাগুলির মধ্যে যেমন তথ্যযুক্তির সমাবেশ তেমনি চাপা ব্যঙ্গের মুন্সিয়ানা। প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, লেখাগুলি নিবেদিতার, তবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতার চড়া সুর হয়ত কিছুটা নামিয়েছিলেন, যার স্বাধীনতা নিবেদিতা তাঁকে দিয়ে রেখেছিলেন। "ইণ্ডিয়ান সেলফ্-রুল অ্যাণ্ড এ ন্যারো ভিউ অব ইংলিশ ইনটারেসটস্" নামক নোট-এর শুরু এই বলে : "এমন কি ভবিষ্যতেও ভারতের স্বাধীন রাজনৈতিক অস্তিত্বের কথা যাঁরা বলেন তাঁদের সম্বন্ধে নিন্দার কঠিনতম ভাষা মিঃ গোখলে খুঁজে পাচ্ছেন না।" এই দীর্ঘ নোট-এ অতঃপর গোখলের চিন্তার অসারত্ব খুলে দেখানো হয়। পরবর্তী নোট—"মিঃ গোখলে অ্যাণ্ড দি সিভিলাইজড্ ওয়ার্লড্"-এর শুরুতে আছে : "দি অনারেবল মিঃ জি কে গোখলে, সি আই ই, মেম্বার অব দি ভাইসরয়েস্ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া—সম্প্রতি পুনায় বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে-বক্তৃতা করেছেন, তার দ্বারা তিনি নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার খ্যাতি বৃদ্ধি করেন নি।" মদনলাল ধিংড়া, কর্নেল কার্জন উইলিকে ইংলণ্ডে খুন করেন—তার নিন্দা ক'রে গোখলে বলেছিলেন : এই ঘটনা ভারতের নামে কলঙ্কলেপন করেছে। কোনো একটি হত্যাকাণ্ড কিভাবে একটা গোটা জাতির নামকে কালিমালিপ্ত করতে পারে, সে প্রশ্ন তুলে এই লেখায় বলা হয় : "যখন কোনো ইংরাজ কোনো ভারতীয়কে খুন করে তখন ইংরাজরা সেই ঘটনার নিন্দা করতে, কিংবা নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাতে, সভা আহ্বান করে না। কিন্তু সেজন্য আমরা তো সিদ্ধান্ত করি না যে, সকল ইংরাজ এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের সমর্থক?...মিঃ গোখলের বুদ্ধিতে কদাপি ধরা পড়েছে কি, কোনো ইংরাজ তার জাতি-নিন্দায় অগ্রসর হয়না যদি দেখে যে, তার স্বজাতীয় কেউ কোনো-এক ভারতীয়কে খুন করেছে?" গোখলে ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের একাংশে "অ্যানার্কি-তত্ত্বের প্রসার" দেখে আতঙ্ক প্রকাশ করেন। গোখলের মন্তব্যের হেতু সন্ধান করতে গিয়ে এই নোট-এ বলা হয় : "এই উক্তির জন্য তাঁর উপরে বিশেষ উদ্দেশ্য আরোপিত হবার সম্ভাবনা আছে, কারণ একথা কি ঠিক নয় যে, গত বৎসর লণ্ডনে ছাত্ররা এক সভায় গোখলের আচরণের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাস করেছিল, যেহেতু তিনি মিঃ তিলকের শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় যোগদান করতে অস্বীকার করেছিলেন?" এই নোট-এ আরও বলা হয়, অ্যানার্কিস্টদের শিরোমণি প্রিন্স ক্রপটকিনকে ইংলণ্ডে মাথায় তুলে নাচা হয়। যে

২৮ মজুমদার, ২য়, ১৫৯।

অ্যানী বেশান্ত রাজনৈতিক প্রশ্নে ভারতের ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা, তিনিও ক্রপটকিনের মহা অনুরাগী। "আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, অ্যানার্কিজম দমনের নামে ন্যায্য রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যেন চূর্ণ করা না হয়।" গোখলে বলেছিলেন, "পাগলা-গারদের ভিতরের লোকই কেবল স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে বা বলতে পারে।" এইসূত্রে লিখিত "মিঃ গোখলে অন আইডিয়াজ অব ইনডিপেনডেনস্" নামক সুদীর্ঘ নোট-এ ভারতের ভাবী স্বাধীনতার সপক্ষে বিখ্যাত ইংরাজ শাসকদের উক্তি উদ্ধৃত করে প্রশ্ন করা হয় : "ও'রা কি পাগল?" ভারতীয়দের স্বাধীনতার অনুপযুক্ততা প্রমাণ করতে গোখলে যে-ধরনের জাতি-নিন্দায় মেতেছিলেন তার নিন্দনীয় রূপকে এই রচনায় খুলে ধরা হয়েছিল। গোখলের প্রতিটি কথাকে তীক্ষ্ন যুক্তি ও বুদ্ধিযোগে ছিন্নভিন্ন করার পরে তাঁরই সুস্থ-বুদ্ধিকে সন্দেহের অধীন করা হয়েছিল। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গোখলের বক্তব্য ছিল, "স্বাধীনতা যেহেতু বলপ্রয়োগ ছাড়া কদাপি অর্জিত হয়নি, তাই যারা স্বাধীনতার বিষয় ভাবে বা বলে বা প্রচার করে, তাদের অবশ্যই দমন করতে হবে।" এই উক্তির দ্বারা গোখলে সরকারকে যেভাবে উৎপীড়নে উস্কানি দিয়েছেন, তা অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হয়েছিল : "দমন-নীতি কতখানি ঘটাতে পারে? তা সম্ভবতঃ, কিন্তু নিশ্চিতভাবে নয়—দেশের উপর মৃত্যুর নীরবতা ছড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু তখনো জনগণের হৃদয়ে স্বাধীনতা-প্রেম ধিকিধিকি জ্বলবে—অপ্রত্যাশিত ক্ষণে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়।" নির্ভয়ে অতঃপর দেওয়া হল স্বাধীনতার জয়ধ্বনি : "স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করার ব্যাপারে দমননীতি নিষ্ফল। তা বিশ্বনীতির পরিপন্থী বলে একইসঙ্গে অবিবেকী। যেহেতু আমাদের সকলের মধ্যেই স্বাধীনতার বাসনা অন্তর্নিহিত তাই তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা ন্যায়সম্মত হতে পারে না। বরং সকল জাতির মানুষকে স্বাধীনতার শিক্ষাদান ও তার অর্জনে সাহায্যদান মানব-সংসারের পক্ষে মঙ্গলকর।" "স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসা অনপনেয়।" গোখলের ধারণায়, স্বাধীনতাপন্থীরা বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী, সুতরাং তাদের মুখে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা "নিছক একটা আচ্ছাদন—নিজেদের চামড়া বাঁচাবার জন্য গায়ে চাপানো হয়েছে।" এর উত্তরে গোখলেকে কার্যতঃ কথার থাপ্পড় মারা হয়েছিল :

"কেউ হয়ত কিছুটা সত্য কথা বলবে যদি বলে যে, ঐসব ব্যক্তি [স্বাধীনতাপন্থীরা] নির্বোধ, উন্মাদ, ফ্যানাটিক, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি বলা যায়, শ্রেণী হিসাবে তারা নিজেদের চামড়া বাঁচাতে ব্যস্ত, তাহলে সেটা হবে বিকট মিথ্যা।...ও'দের অনেকেই নিজেদের আচরণের দ্বারা এমন নির্ভীকতা দেখিয়েছেন, যা গোখলে বা তাঁর দলের কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি।"

॥ ৬ ॥ নিবেদিতা সম্বন্ধে গোখলের বিপুল শ্রদ্ধা

নিবেদিতার সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে চূড়ান্ত মতপার্থক্যের পরেও তাঁর প্রতি গোখলের সবিস্ময় শ্রদ্ধা অটুট ছিল। নিবেদিতার স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে গোখলে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে নিবেদিতার যথার্থ এক রূপকে পাওয়া যায় :

"ভগিনী নিবেদিতাকে দশ বৎসরের অধিককাল জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব অপূর্ব ও চমকপ্রদ। তা এমনই যে, তাঁর সাক্ষাতে এলে মনে হত, বুঝি কোনো বিরাট নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছি। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও মননশক্তি, কাব্যময় রচনাপ্রতিভা ; বিপুল শ্রম-সামর্থ্য ; আদর্শ ও বিশ্বাসকে সুতীব্র আবেগে ধরে রাখার ক্ষমতা ; সর্বোপরি যে-কোনো বস্তুর আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করার যথার্থ বিরাট প্রতিভা—এই সকলই তাঁকে যে-কোনো দেশের যে-কোনো কালের এক অত্যাশ্চর্য নারী করে তুলেছে। এদের সঙ্গে যখন যুক্ত হল সর্বপ্লাবী সীমাহীন ভারতপ্রেম, যে-প্রেমের অর্থ ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে প্রাণব্যাকুল অনুরক্তি, ভারতের সেবায় পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন, এবং ব্যক্তি-জীবনে কঠোর অথচ আক্ষেপহীন, আনন্দময় কৃচ্ছ্রসাধনা—তখন ভগিনী নিবেদিতা যে আমাদের কল্পনাকে আলোড়িত ক'রে হৃদয়কে অধিকার করে নেবেন, কিংবা চতুষ্পার্শ্বের মানুষদের উপর সুগভীর, সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবেন, এবং আমরা তাঁকে দেশ-সেবায় নিয়োজিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবগণের অন্যতম বলে গ্রহণ করব—তাতে বিস্ময়ের কি আছে?"

এর পরে নিবেদিতার ভারতপ্রেমের অনবদ্য বর্ণনা :

"যেমন কোনো-কোনো ব্যক্তি মুরুব্বিয়ানার সুরে [নিজেদের ভারত-বিষয়ক দায়িত্বের কথা] বলে থাকেন, ভগিনী নিবেদিতা সেইভাবে আমাদের 'উপকার করতে' আসেন নি। এমন কি তিনি আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণায় বা দৈন্যে বিচলিত হয়ে মানবতাবাদী কর্মী রূপেও আসেন নি। ভারতের ডাক শুনেছিলেন বলেই এসেছিলেন—ভারতের সম্মোহনে ধরা দিয়েছিলেন বলেই এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন ভারতে তাঁর হৃদয়ের পূজা নিবেদন করতে, সেইসঙ্গে ভারতের সন্তান-সন্ততিদের পাশে দাঁড়িয়ে সামনে যে-বিরাট কর্মভার রয়েছে তার দায়িত্ব নিতে। তাঁর সেই অপরূপ সর্বাত্মক ভারত-বরণের মহিমাকে মানবভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভারতের অতীত গৌরব যেসব শ্রেষ্ঠ কীর্তির উপর নির্ভরশীল, শুধু সেগুলিকে বরণ করা নয়, অথবা ভবিষ্যতে ভারত, ঈশ্বর করুন, যেসব গুণগৌরবের উপর আবার দণ্ডায়মান হবে, কেবল সেইগুলি নয়—তিনি গ্রহণ করেছিলেন বর্তমানের, প্রতিদিনের, ভারতকে—তার সকল দোষত্রুটি সমেত। আমাদের জীবনের ক্লেশ ও দৈন্য তাঁকে পরাভূত করেনি, প্রতিহত করেনি তাঁকে আমাদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, এমন কি মালিন্যও। তাঁর পক্ষে, আমাদের জীবন এমন সম্পূর্ণভাবে যাপন করা কতখানি কঠিন, কষ্টকর, এমনকি অসম্ভব ব্যাপার ছিল, তা যথার্থভাবে বুঝবার মতো মানুষ আমাদের মধ্যে কজন আছেন জানি না। যাঁরা ভারতে জন্মেছেন, বর্ধিত হয়েছেন—তাঁরাও যদি বিদেশভ্রমণ বা অন্য কারণে পুরাতন জীবন থেকে সরে যান তাহলে তাতে পুনঃপ্রত্যাবর্তন তাঁদের পক্ষে কী-না কঠিন হয়ে ওঠে! তাহলে তিনি—হাজার-হাজার মাইল দূরে জন্মেছেন, আমাদের থেকে বহুলাংশে পৃথক পরিবেশে বর্ধিত হয়েছেন—তাঁর পক্ষে সর্বাঙ্গীণভাবে আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন যাপন করা কোন্ অসাধ্য ব্যাপার ছিল!! যখন সেকথা ভাবি তখন বারেবারে যেন চোখের সামনে আবির্ভূত হয় সেই মহানতমার প্রতিমাখানি—চরম

কল্পনার একখানি সৃষ্টি। তাঁর সেই দর্শন আমাদের প্রেরণ করে বৃহত্তর, মহত্তর আদর্শপথে।"

॥ ৭ ॥ নিবেদিতা, গান্ধী, গোখলে

নিবেদিতা গোখলেকে কিভাবে সহ্য করতেন তা শ্রীঅরবিন্দের কাছে যেমন বিস্ময়ের বিষয় ছিল, তেমনি গোখলে কিভাবে নিবেদিতাকে সহ্য করতেন, তা বিস্ময়ের বিষয় হতে পারত মহাত্মা গান্ধীর কাছে যদি তিনি নিবেদিতা সম্বন্ধে গোখলের পরিণত ধারণার কথা জানতেন! (জেনেছিলেন কি?)। প্রথম দিকে গোখলে যখন নিবেদিতার কথায় ও আচরণের উগ্রতায় দিশাহারা, সেইসময়ে, ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কলকাতায় নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে যান। উভয়ের সাক্ষাৎকার সুখকর হয়নি। গান্ধী নিবেদিতার বাসস্থানের পরিবেশগত ঔজ্জ্বল্যে চমকিত এবং কথাবার্তার প্রচণ্ডতায় বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। তারপর গোখলের কাছে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলার পরে, তাঁর মুখে নিবেদিতা সম্বন্ধে যা শোনেন, তাকে তিনি নিজ মনোভাবেরই সমর্থক বলে মনে করেন। অনেক বছর পরে গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করেন—তার মধ্যে তাঁর জীবনের সর্বাধিক দায়িত্বহীন কিছু উক্তির সন্নিবেশ আছে।

গান্ধীজী লিখেছিলেন :

"তারপর আমি ভগিনী নিবেদিতার বাসস্থানের সন্ধান ক'রে, তাঁর সঙ্গে চৌরঙ্গীর প্রাসাদোপম এক বাড়িতে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর চারপাশের জাঁকজমকের চেহারা দেখে আমি হতভম্ব। আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও বেশি-কিছু ঐক্যের ক্ষেত্র ছিল না। সে সম্বন্ধে গোখলেকে জানালে তিনি বললেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই; নিবেদিতার মতো অস্থিরচিত্ত (*Volatile*) নারীর সঙ্গে তোমার ভাবৈক্যের কোনো অবকাশ থাকতেই পারে না।"২৯।

নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের বহু বৎসর পরে, আত্মজীবনী লেখার সময়ে, গান্ধীজী নিবেদিতার সম্বন্ধে আর-কিছু জানবার চেষ্টামাত্র না ক'রে, এই-যে মন্তব্য করলেন, তার অসারত্ব খুলে দেখান নিবেদিতার বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মডার্ন রিভিউ পত্রিকার মে, ১৯২৭ সংখ্যায়। তিনি বলেন, নিবেদিতার চতুষ্পার্শ্বের জাঁকজমকের কথা বলে নিবেদিতার

---

২৯ নিবেদিতার সঙ্গে ঐকালে আর এক সাক্ষাৎকারের কথা গান্ধীজী বলেছেন, তার মধ্যে কিছু ঔদার্য লক্ষ্য করা যায় :

"মিঃ পেস্টনজি পাদশার বাড়িতে তাঁর [নিবেদিতার] সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হল। পেস্টনজি-র বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন সেখানে আমি গিয়ে পড়ি। দুজনের মধ্যে দোভাষীর কাজ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে মতৈক্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে ব্যর্থ হলেও, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ভালবাসার প্লাবিত রূপে আমার নজরে এসেছিল এবং আমি সমাদরবোধ না করে পারিনি। তাঁর বইগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় পরে।"

জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রান্তধারণা উপস্থিত করা হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে গান্ধীজী যখন তাঁকে দেখেন তখন নিবেদিতা—মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডের অতিথিরূপে চৌরঙ্গীতে আমেরিকান কনসুলেটে বাস করছিলেন। "বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে একটি ভাঙা বাড়িতে তাঁর তপস্বিনীর সরল জীবনযাত্রার কথা তাঁর বন্ধুদের কাছে সুপরিচিত।"

'ভোলাটাইল' কথাটি নিবেদিতা সম্বন্ধে গোখলে কি ইংরাজিতে বলেছিলেন, নাকি তা কোনো গুজরাটি শব্দের অনুবাদ—রামানন্দ প্রশ্ন করেন। "কিন্তু শব্দটি ব্যবহারের জন্য যিনিই দায়ী হোন, এটি নিবেদিতার স্মৃতির প্রতি অসম্মান। সিস্টার নিবেদিতার চরিত্রে নিশ্চয় ত্রুটি ছিল, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যেও তা থাকে, কিন্তু তিনি কোনো অর্থেই 'ভোলাটাইল' হতে পারেন না।" রামানন্দ যোগ করেন : "ইংরাজি আমাদের মাতৃভাষা নয় বলে টেবিলে রাখা দুটি অভিধান উল্টেছি—শব্দটি মানুষের সম্পর্কে কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয় দেখতে। পকেট অক্সফোর্ড ডিক্সনারির সংজ্ঞামতো, 'men of gay temparament, mercurial'—এ'রাই ঐ। ওয়েবস্টারের নিউ ইনটারন্যাশন্যাল ডিক্সনারির মতে —'light hearted ; airy ; lively ; hence, changeable ; fickle.' সিস্টার নিবেদিতা অত্যন্ত গভীর গম্ভীর চরিত্রের মানুষ ছিলেন—ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের জন্য ঋজু অব্যাহত নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তির জন্য তিনি সুপরিচিত।"

রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত বেদান্ত কেশরী নামক মাসিক পত্রিকা এবং বাংলা উদ্বোধন পত্রিকাও কঠোর প্রতিবাদ করে। বেদান্ত কেশরীর জুন, ১৯২৭ সম্পাদকীয়তে আহত বিস্ময় ও তীক্ষ্ম সমালোচনা ছিল। নিবেদিতার যথার্থ বাসস্থান কোথায়, কোন্ দুঃখযন্ত্রণা ও কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে বাগবাজারের ভাঙা বাড়িতে তাঁর দিন কাটত, তা নানা স্মৃতিকথা থেকে অংশ উদ্ধৃত ক'রে প্রদর্শিত হয়। "কখনো-কখনো তাঁকে অত্যন্ত অর্থ-কষ্টের মধ্যে থাকতে হত। আর তখন তিনি [বিদ্যালয়ের খরচ সংক্ষেপ না ক'রে] নিজের সামান্য ব্যক্তিগত খরচে কাটছাঁট করতেন। জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন থেকেও তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতেন। তার ফলে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন।" বেদান্ত কেশরীর সম্পাদক বলেছিলেন—নিবেদিতার সঙ্গে গান্ধীজী নিজের কোনো ঐক্যভূমি আবিষ্কার করতে পারেন নি, এটা গান্ধীজীরই দুর্ভাগ্য, কারণ নিবেদিতা ছিলেন বহুধাব্যাপ্ত প্রতিভার অধিকারিণী—আধ্যাত্মিক আদর্শবাদী, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচণ্ড সমর্থক, বিরল সাহিত্য গুণসম্পন্না লেখিকা, শিল্পের ব্যাখ্যাতা, জাতীয় আন্দোলনের শক্তিময়ী নেত্রী। নিবেদিতার অসামান্য চরিত্রের বিষয়ে উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধাবাণী উচ্চারণের পরে বেদান্ত কেশরীর সম্পাদক বলেন : "মহাত্মা গান্ধী আসল নিবেদিতাকে সামান্যই দেখেছেন। আর সেই অল্প জ্ঞান, যা সর্বদাই 'বিপজ্জনক', এক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে?" "ভোলাটাইল" শব্দের দ্বারা নিবেদিতার পবিত্র স্মৃতির অত্যন্ত অপমান করা হয়েছে, একথা বলার পরে সম্পাদক যোগ করেন : "জানি না এই অনুচিত কথাটির জন্য যথার্থই দায়ী কে? যিনিই হোন, একথা বলতেই হবে, সুবিখ্যাত ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যের পরীক্ষা' [গান্ধীজীর আত্মজীবনীর নাম] সফল হয়নি। সেটা

একেবারে ব্যর্থ হত যদি তিনি ভগিনীর সঙ্গে মতৈক্যে আসতে না পারলেও 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর ক্লান্তিহীন ভালবাসা লক্ষ্য করতে ও সমাদর করতে ব্যর্থ হতেন।"

শ্রাবণ ১৩৩৩ সংখ্যার উদ্বোধন-এর প্রতিবাদ ["সিস্টার নিবেদিতা ও গান্ধী মহারাজ"] নাতি বিস্তারিত কিন্তু কম প্রখর নয়। তথ্যযোগে গান্ধীজীর বক্তব্যের ভ্রান্তি দেখাবার পরে উদ্বোধন-সম্পাদক বলেন :

"ভারত-প্রেমিকা সিস্টার নিবেদিতা হিন্দুধর্মের জন্য যে, চিরদারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা সর্বজনবিদিত। ভারত-নেতা গান্ধী মহারাজ যখন আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন তখনও কি তিনি তাহা জানিতেন না? নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অন্য একজন ভারতগতপ্রাণা বিদেশিনী তপস্বিনীর জীবনযাপন-প্রণালী ও কার্য-পদ্ধতি অবগত না হওয়া তাঁহার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নহে। যদি জানিয়াও তিনি তাহা না-লিখিয়া বা লিখিবার আবশ্যকতা বোধ না করিয়া, শুধু একদিনের একটি সাময়িক ঘটনার উল্লেখ দ্বারা পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদনের সহায়তা করিয়া থাকেন, তবে [তাহা] আরও দুঃখের বিষয়। গান্ধী মহারাজ ইতিপূর্বে কোনো-কোনো বিষয়ে যে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির মতো কথা বলিয়াছেন, ইহা তাহাদেরই অন্যতম।"

শ্রীঅরবিন্দও এইপ্রসঙ্গে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেছেন :

"নিবেদিতা Volatile! বাজে কথা। তিনি একেবারে খাঁটি কর্মী।"৩০

গান্ধীজী ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন। ৩০ জুন, ১৯২৭, ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় [গান্ধীজীর নিজের কাগজ] তিনি মডার্ন রিভিউ-এর প্রতিবাদ-রচনাটি উদ্ধৃত করার পরে বলেন, তিনি সত্যই জানতেন না, নিবেদিতা ঐসময়ে অন্যের বাসস্থানে অতিথিরূপে বাস করছিলেন। নিজ কর্মব্যস্ত জীবনে তিনি "আধুনিক ভারতের নির্মাতাদের" জীবনের সবকথা পড়ে বা জেনে উঠতে পারেন নি, গান্ধীজী তাও বলেন। আত্মজীবনীতে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে যেসব বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলি ঐসব ব্যক্তির বিষয়ে তাঁর "শেষ বক্তব্য বা তা তথ্যগতভাবে সত্য", এমন দাবি তাঁর নেই। তিনি কেবল ঐসময়ে ঐসকল মানুষ তাঁর উপর কী-প্রকার ছাপ রেখেছিলেন তাই বলতে চেয়েছেন।

'ভোলাটাইল' শব্দটি একটি গুজরাটি শব্দের অনুবাদ, গান্ধীজী জানিয়েছেন, কিন্তু যেহেতু তিনি অনুবাদ দেখে দিয়েছেন তাই শব্দটি প্রয়োগের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। শব্দটি নিয়ে তিনি মহাদেব দেশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন, এবং সেটি ব্যবহার করা উচিত কিনা সে সন্দেহ থেকে যায়। "আমাদের উভয়ের মনেই এই বিশেষণটি ঠিক কিনা সন্দেহ ছিল। Volatile, Violent, এবং Fanatical—এই তিনটি শব্দের মধ্যে একটিকে বাছতে হবে দেখে মহাদেব ভোলাটাইল শব্দটি বাছে, আর আমি তার অনুমোদন করি কারণ বাকি শব্দ দুটি অত্যন্ত কড়া। কিন্তু আমাদের দুজনের কারোরেই মনে শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী হতে পারে খেয়াল ছিল না। গোখলে ঠিক কোন্ শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন আমি স্মরণ করতে পারছি না। [আত্মজীবনীর] মূল লেখায় ছিল 'তেজ' শব্দ।"

---

৩০ 'কথাবার্তা', ২৭১।

গান্ধীজী আন্তরিকভাবে তাঁর লেখা শেষ করেন এই বলে : "মূল বা অনুবাদে [শব্দ ব্যবহারের] কোনো ত্রুটি সম্ভবতঃ সেই মানুষটির স্মৃতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না যিনি হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষকে অত ভালবেসেছিলেন। সে স্মৃতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।"

গান্ধীজীর মহত্ত্বের পরিচায়ক একটি রচনা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হল, তাঁর আত্ম-জীবনীতে নিবেদিতা সম্বন্ধীয় কথাগুলি প্রত্যাহৃত হয়নি, কেবল পাদটীকায় ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত ত্রুটি স্বীকারসূচক লেখাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে গান্ধীজীর আত্ম-জীবনীর অগণিত ভক্ত-পাঠকের কাছে নিবেদিতার স্মৃতির লাঞ্ছনা বজায় থেকে গেল, যেটা অবশ্যই লেখকের দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়, যদিনা তিনি মনে ক'রে থাকেন, পাঠকেরা ইয়ং ইণ্ডিয়ার দুষ্প্রাপ্য ফাইল সন্ধান ক'রে তাঁর কটুবাক্যে আহত নিবেদিতা-স্মৃতিকে মেরামত ক'রে নেবার মতো ব্রতী পাঠক হবে॥ এই বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকাও সঙ্গত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।৩১

নিবেদিতা প্রসঙ্গে গান্ধীজীর মন্তব্য ও পরবর্তী বিতর্ক অবশ্যই চিত্তাকর্ষক কিন্তু তর্কতাপ উপভোগ করবার জন্য বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি—নিবেদিতার দৃষ্টি-ভঙ্গির উদ্‌ঘাটনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমরা মনে করি, ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে নিবেদিতার সঙ্গে সদ্য পরিচয়ের পরে তাঁর সম্বন্ধে 'ভোলাটাইল', 'ভায়োলেন্ট', বা 'ফ্যানা-টিক্যাল' শব্দ গোখলের পক্ষে ব্যবহার করা খুবই সম্ভব ছিল, এবং গান্ধীজীর পক্ষে তাকে সাগ্রহে স্বীকার করাও সম্ভব ছিল। নিবেদিতার ব্যক্তিত্বে উগ্রতা ছিল—মহিমার সঙ্গে। প্রথম আলাপে, যদি কাউকে তিনি তাঁর ভাববিরোধী মনে করতেন, তার উপর অগ্নিস্রোত বইয়ে দিতেন। তাঁর অন্তরসান্নিধ্য পেতে হলে সেই অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হত, নচেৎ ভুল বুঝবার প্রচুর সম্ভাবনা থেকে যেত। গান্ধীজী সেই ভুল বুঝেছিলেন। গোখলেও ভুল বুঝেছিলেন—তবে পরিচয়ের দীর্ঘতার জন্য নিজের ভ্রান্তি দূর করতেও পেরেছিলেন।

---

৩১ গান্ধীজীর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের উপর আলোচনাকালে (আলোচকের নাম ছিল না; সম্ভবতঃ সম্পাদকই এটি লেখেন) মন্তব্য করা হয় :

"We would only mention at present that his observations on Sister Nivedita ought not to have been allowed to be printed in the book without due modification. The short footnote will help none who have not read the particular number of *Young India*. The *Young India* note also was not perfect...The *Vedanta Kesari* of Madras gave a comprehensive reply to Mahatma Gandhi's remarks on the Sister. Mahatmaji is expected to have seen it. The modification of the offending passage in accordance with the information that came to him later on, would have been more truthful in our opinion." [*Prabuddha Bharata*, Oct. 1927, pages 475-76].

ইয়ং ইণ্ডিয়ার পূর্বোক্ত রচনায় গান্ধীজী বলেছেন, "সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে কথা-বার্তায় পুরো স্মৃতি আমার মনে আছে। আমি তাদের বর্ণনা করতে চাই না।"

আলোচ্য বিষয়গুলি কী হতে পারে, আমরা অনুমানের চেষ্টা করতে পারি।

বিষয়গুলির মধ্যে হিংসা-অহিংসা, মাংসাহারের ঔচিত্য, কালীমন্দিরে বলি ইত্যাদি থাকতে পারে। এ-সব বিষয়ে নিবেদিতা ও গান্ধী একেবারে বিপরীত ভূমিতে অবস্থিত। নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা বিস্তারিত বলে এসেছি। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, কালীঘাটে বলি তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল; তিনি নিজে কেবল নিরামিষাশী নন আমিষভোজনের সক্রিয় বিরোধী; এবং অহিংসা তাঁর কাছে আপসহীন জীবনধর্ম, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অহিংসার বিস্তারে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এসব বিষয় অপেক্ষা আমাদের ধারণা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মনোভাবের প্রশ্নেই উভয়ের মধ্যে ঘটেছিল মূল সংঘাত। বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে নিবেদিতার তখন অধীর ঘৃণা, বৃটিশ পতাকা ও বৃটিশ জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সমূহ মানসিক বিচ্ছেদ—গান্ধীজী ঐকালে ঠিক বিপরীত প্রান্তে আছেন। আত্মজীবনীতে গান্ধীজী সবিস্তারে লিখেছেন : "বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রতি আমার যে-রকম আনুগত্য ছিল, আমার জানা কোনো ব্যক্তির মধ্যে সে-জিনিস ছিল কিনা সন্দেহ।...নাটালে যেসব সভায় যেতাম তার সব কটিতে [বৃটিশ] জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হত। আমি অনুভব করেছিলাম, ঐ সঙ্গীতে আমারও অংশ নেওয়া উচিত। বৃটিশ শাসনের ত্রুটি সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম না তা নয়, কিন্তু ভেবেছিলাম, সব জড়িয়ে ঐ শাসন গ্রহণযোগ্য। ঐসব দিনে আমার বিশ্বাস ছিল, শাসিতের পক্ষে বৃটিশ শাসন সাধারণভাবে কল্যাণকর।

"দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ দেখে ভেবেছিলাম, তা বৃটিশ ঐতিহ্যের বিরোধী; বিশ্বাস করেছিলাম, ও-বস্তুটা নিতান্ত সাময়িক ও স্থানীয়। সুতরাং আমি রাজসিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ইংরাজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলাম। সযত্নে, চেষ্টা সহকারে, জাতীয় সঙ্গীতের সুর শিখে নিয়েছিলাম এবং যেখানেই তা গাওয়া হত তাতে যোগ দিতাম।...আমার বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের [বৃটিশ] জাতীয় সঙ্গীত শিখিয়েছিলাম।"

বুয়োর যুদ্ধের সময়ে নিবেদিতার সহানুভূতির ঝোঁকটা ছিল বুয়োরদের দিকেই, যদিও তিনি ডাচ সাম্রাজ্যবাদের দংষ্ট্রার দিকটি যথেষ্ট জানতেন। বুয়োর যুদ্ধসম্বন্ধে গান্ধীজীর মনোভাব এই :

"[বুয়োর] যুদ্ধ ঘোষিত হবার সময়ে আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি ছিল বুয়োরদের পক্ষে কিন্তু তখন মনে করতাম, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে সামনে এগিয়ে আনার অধিকার আমার নেই।...একথা বললেই যথেষ্ট হবে, বৃটিশ শাসনের প্রতি আমার আনুগত্য ঐ যুদ্ধে বৃটিশদের পক্ষে অংশগ্রহণে আমাকে প্রণোদিত করেছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, আমি যদি বৃটিশ নাগরিকের অধিকার দাবি করি তাহলে বৃটিশ সাম্রাজ্য-রক্ষায় অংশগ্রহণ করা আমার কর্তব্য। তখন আমার এ ধারণাও ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই ভারত পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে।"

এই ধরনের মনোভাবে সম্মুখ গান্ধী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা তখন সদ্য ইংলন্ড থেকে ফিরেছেন, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ আগ্নেয়গিরি, অস্ত্রপ্রহারে কিভাবে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়ানো যায় তার মতলব করছেন, সেই উদ্দেশ্যে দল গড়ছেন এবং তরুণ ভারতীয়দের দলে টানতে চাইছেন। সেই সময়ে একজন ভারতীয়ের মুখে অহিংসা, নৈতিক শক্তির গুণগান, বৃটিশ সাম্রাজ্যের জয়গান, তাঁর কাছে কি রকম লাগবে না বললেও চলে। সন্দেহ নেই গান্ধীজী নিবেদিতাকে বিস্ফোরণের ক্ষণে দেখেছিলেন, তারপর প্রাণ জুড়িয়েছিলেন গোখলের বৃটিশ-ভক্তির স্নিগ্ধ স্পর্শলাভ ক'রে।৩২

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু ঘৃণা ও ক্রোধের প্রথম পর্বে নিবেদিতার কোন্ চেহারা গান্ধী দেখেছিলেন তার কিছুটা আভাস পাবো আরও সাত বৎসর পরে ১৯০৯ খৃীস্টাব্দে গান্ধী-অনুচর এইচ এশ এল পোলক-এর সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎকার-বিবরণ থেকে। পোলক স্বয়ং তার কিছু সংবাদ দিয়েছেন। ১২ জানুয়ারি ১৯৫৩, লন্ডনে স্যার জন স্টুয়ার্ট ওয়ালেসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিবেদিতা-স্মরণসভায় পোলক নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিকথা বলেছিলেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

"আমি ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর গুরুর কাহিনীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই যখন গান্ধীর 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকাটি সম্পাদনা করছিলাম। জোহানেসবার্গে গান্ধীর জীবনের শেষ দশ বৎসর তাঁর সঙ্গে আমি ছিলাম। আমাদের সংবাদপত্র বিনিময়ের দ্বারা

---

৩২ সাপ্তাহিক বসুমতী ৯ অক্টোবর ও ১৭ অক্টোবর ১৯৬৯, সংখ্যা দুটিতে "কলকাতায় গান্ধীজীর প্রথম বক্তৃতা : গোখলের ধন্যবাদ-ভাষণ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। কলকাতায় গান্ধীজী-প্রদত্ত ১৯ জানুয়ারি, ১৯০২ তারিখের বক্তৃতা ও সেখানে গোখলের ভাষণসূত্রে গোখলে-গান্ধীর সম্পর্কের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলুম। গান্ধীজী গোখলেকে রাজনৈতিক গুরু মনে করতেন, 'প্রথম দর্শনেই গোখলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন', গোখলে তাঁর হৃদয়ের রাজা হয়ে উঠেছিলেন। অপরদিকে গোখলে মায়ের মতো স্নেহে যত্নে গান্ধীজীকে গ্রহণ করেছিলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে গান্ধীজী সেসব কথা বলেছেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত সভায় গোখলের ভাষণের দু'এক লাইন তুললেই বোঝা যাবে, এই পর্বে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে গোখলে গান্ধীর ঐক্য কতখানি। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, এর কয়েক বৎসর আগে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের হাতে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন। গোখলে-বক্তৃতার কিছু বিবরণ এই :

"বক্তা [গোখলে] তারপর ইন্ডিয়ান অ্যামবুলেনস্ কোর-এর উল্লেখ করেন। বুয়োর যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় মিঃ গান্ধীই প্রধানতঃ ওটি সংগঠিত করেন। এই অ্যামবুলেনস্ কোর গঠনের ফলে ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইউরোপীয় মনোভাবের যে-উন্নতি ঘটেছে [বলা বাহুল্য ভারতীয়দের সক্রিয় বাধ্য আনুগত্য দেখে !] তার বিষয়ে বক্তা উল্লেখ করেন।...মিঃ গান্ধী প্রমাণ করেছেন—কঠিনতম প্রতিরোধকে জয় করা যায়, তিক্ততম ভুল বোঝাবুঝিকে দূর করা যায়, যদি আমরা নিজের কাছে খাঁটি থাকি, নিষ্ঠার সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে সরলপথে কাজ করি এবং অপমানের

আমি ভারতবর্ষ থেকে সংবাদপত্র পেতাম। সেসব থেকে জানতে পারি যে, এই মহিলা কলকাতায় অবস্থান ক'রে অপূর্ব কাজ করছেন। ইতিপূর্বে তাঁর বিষয়ে যা জেনেছি তার থেকে আরো বেশি কথা গান্ধীর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, যেহেতু তিনি নিবেদিতার কাহিনী ও তাঁর মহান আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলীর সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষে আমি প্রথম যাই দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী যাকে সত্যাগ্রহ বলেছেন তারই প্রথম পর্বের সময়ে—ট্রানস্ভালের ভারতীয়দের অবস্থা, তাদের দুঃখকষ্টের কথা, গোচর করতে। সেইসময়েই নিবেদিতার সঙ্গে আমার কলকাতায় সাক্ষাৎ।

"ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা ক'রে কথাবার্তা বলার অনুরোধ আমাকে কে করেছিলেন তা এখন নিশ্চিতভাবে মনে করতে পারছি না। খুব সম্ভব লেডি [অবলা] বসু সে অনুরোধ করেন। আমি তাঁর [নিবেদিতার] বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, অনাড়ম্বর চেহারার জায়গা; তাঁর দেখা পেয়েছিলাম, তিনি অত্যন্ত আকর্ষক, মধুর চরিত্রের [!] মানুষ। কিন্তু আপনারা শুনে আগ্রহী হবেন যে, প্রথম যা ঘটল তা আর কিছু নয়—ফাটাফাটি! আর তা হয়েছিল কেননা তিনি জন্মে আইরিশ। আপনারা যাঁরা আইরিশদের জানেন তাঁরা জানেনই যে আইরিশদের সঙ্গে লড়াই বাধানো কঠিন নয়। আমি যখন বললাম আমি কী জন্য এসেছি, ট্রানস্ভালে কী ঘটছে—তখন তিনি গোড়াতেই অত্যন্ত কঠোরভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ নীতির সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। তখন আমার পক্ষে না বলে উপায় রইল না...ইংরাজেরা অবশ্যই খারাপ, কিন্তু তারা নয়, ডাচরাই এইসব ভয়াবহ জিনিস ঘটাচ্ছে। এইসব তীব্র কথাবার্তার পরে তিনি সহসা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'একদিন এসে আমার মেয়েদের কাছে ভাষণ দাও না কেন?' শুনে ভাবলাম, কী মধুর! এই তো ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সৌন্দর্য—সব একসঙ্গে।"

পোলক বালিকাদের কাছে সাউথ আফ্রিকার কথা বলেছিলেন এবং তা নিবেদিতার মনঃপূত হয়। নিবেদিতার চারিত্রশক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সুন্দর কিছু উক্তিও পোলক করেছেন।৩৩

নিবেদিতার সঙ্গে সংঘাতের কথা পোলক বলেছেন, তার কারণও বলেছেন, কিন্তু সেটা আংশিক। নিবেদিতার বিরক্তির আসল কারণ তিনি হয় বুঝতে পারেন নি, না-হয় ভুলে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার ১ ডিসেম্বর ১৯০৯ চিঠিতে পোলকের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আছে। তা এই :

বিরুদ্ধে অপমান, নিন্দার বিরুদ্ধে নিন্দাকে ফিরিয়ে না দিই। মিঃ গান্ধী তাঁর কাজের দ্বারা যথার্থই প্রমাণ করেছেন—প্রেম ঘৃণার উপর জয়ী হয়। এসবের দ্বারা মিঃ গান্ধী ইংরাজের চোখে ভারতীয় চরিত্রকে উঁচু করে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।...তিনি উভয় জাতির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমাজের মর্যাদাকে উন্নীত করতে চেয়েছেন; তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত বন্ধু।"

৩৩ *Prabuddha Bharata*, March 1953, 147-48.

"সুদর্শন এক তরুণ ইহুদী এখানে ট্রান্সভালের ভারতীয়দের প্রতিনিধি-রূপে এসেছেন—তাঁর সঙ্গে সবে সাক্ষাৎ হয়েছে। এইসব লোকের মিঠে-মোলায়েম ভাবভঙ্গিতে আমার ঘেন্না হয়। এ'রা জানাতে থাকেন যে, এ'রা কেবল 'নৈতিক শক্তি' প্রয়োগ করবেন—কিন্তু তার গাওনা গেয়ে ও-বস্তু লাভের ক্ষমতা এ'রা হারিয়ে ফেলেন। নৈতিক শক্তির প্রথম আবশ্যিক লক্ষণ—পর্বত কখন বর্বরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই ক্ষণটি সম্বন্ধে তাকে অনিশ্চিত রাখা। এবং একই সময়ে ঐ নৈতিক শক্তি হৃদয়বান মানুষের কাছে বিবেকের ভাষায় কথা বলে। নৈতিক শক্তি! অহো, এই লোকগুলির যদি তা কিছুটা থাকত!

"একই সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্বন্ধে এসব কথা বলা নির্বুদ্ধিতা—সে-বিষয়ে আমি সচেতন, কারণ এরা সহনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সামর্থ্য দেখিয়েছে। তোমার সন্ধানে কি কোনো টলস্টয়পন্থী নেই যিনি মানবতার জন্য সর্বকিছু উৎসর্গে প্রস্তুত হয়ে ওখানে গিয়ে ওদের মধ্যে উন্নত ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে? ওদের অবশ্যই নিজেদের মর্যাদাবৃদ্ধি করতে হবে। বেরিয়ে পড়ে ওখানে গিয়ে ওদের দেখতে আমার খুবই ইচ্ছা হয়। কিন্তু তা আবার চাই না কারণ তা ব্যর্থ হবে। জনগণের মধ্যে বস্তু থাকলেই তার উপর ভিত্তি নির্মাণ করা যায়। ওখানকার নেতারা তো সত্য-কর্মের মতলবধারী মানুষ।"

অহিংসার কাঁদুনি, নৈতিক শক্তির গাহনার বিষয়ে নিবেদিতার ঘৃণার চেহারাটা এখানে স্পষ্ট, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর মধ্যে অন্ততঃ সহনের যে-শক্তির কথা তিনি জেনেছিলেন, তার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি ভাবিত ছিলেন—তাঁর দ্বিধান্বিত রচনা থেকে তাই মনে হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

রমেশচন্দ্র দত্ত ও নিবেদিতা

॥ ১ ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত ও নিবেদিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা তথ্য

মডারেট মহলে নিবেদিতা শ্রদ্ধা করবার মতো যথেষ্ট মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন। আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা আগে বলেছি।১ স্যার রাসবিহারী ঘোষ, কিংবা ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিবেদিতার গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁদের প্রতিও নিবেদিতার সহজ শ্রদ্ধা ছিল। এই নামগুলির সঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তর নাম যোগ করতে পারি। নিবেদিতার

---

১ আনন্দমোহন বসুর উপরে নিবেদিতা অন্ততঃ দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। একটি আনন্দমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিত—"দি ফার্স্ট সিটিজেন অব বেঙ্গল।" এই লেখাটিতে স্বভাবতঃই ভাবাবেগের বিশেষ প্রকাশ ছিল। আনন্দমোহনের ব্যক্তিচরিত্রের গুণাবলী, তাঁর একান্তিকতা, ন্যায়বোধ, উদারতা ইত্যাদির কথাই নিবেদিতা বিশেষভাবে বলেন। আনন্দমোহন বসু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, তথাপি তিনিই প্রথম এগিয়ে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য-প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন—সেই ঘটনাটির কথা নিবেদিতা সানন্দে উল্লেখ করেছেন—এবং গৌরবের সঙ্গে বলেছেন, আনন্দমোহন কিভাবে মৃত্যুশয্যা থেকে বাহিত হয়ে গিয়ে ফেডারেশন-হলের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

হেমচন্দ্র সরকার-লিখিত আনন্দমোহনের জীবনীর ভূমিকা হিসাবে নিবেদিতা দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লেখেন, "আনন্দমোহন বোস অ্যাজ এ নেশন মেকার।" নামেই প্রকাশ, নিবেদিতা কোন্ বিশেষ দিক দিয়ে আনন্দমোহনকে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থ-ভূমিকারূপে লিখিত এই প্রবন্ধটিতে আনন্দমোহনের ব্যক্তিচরিত্র, তৎসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্রের মূল্যায়নের চেষ্টা ছিল। চরমপন্থী নিবেদিতা—মডারেট আনন্দমোহনকে জাতি-সংগঠকরূপে দেখাচ্ছেন—এর থেকেই বোঝা যায়, বাইরের আচ্ছাদনকে ভেদ করে মৌল চরিত্রকে দর্শনের যথার্থ ক্ষমতা ও ইচ্ছা তাঁর ছিল। নিবেদিতার মতে, জাতি সংগঠক তিনিই হতে পারেন যিনি চূড়ান্ত আদর্শবাদী—আনন্দমোহন তা ছিলেন। "সর্বোচ্চ নেতা তিনি, যিনি মরুভূমিতে পথ চলার অসীম কষ্ট স্বীকার করেন, কিন্তু কামনায় মোক্ষধামে পদার্পণ করে উঠতে পারেন না। এইসব মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষণ—সহজতা ও সরলতা, এবং সম্পূর্ণ বিবেক-নির্ভরতা। সেইসঙ্গে নিঃস্বার্থতা। এই নিঃস্বার্থতার জন্য আনন্দমোহন সমষ্টিমনে অবস্থিত থাকতে পেরেছেন। সমষ্টি মানুষকে তিনি বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন—তাদের চোখে আদর্শকে প্রজ্বলিত রেখেছেন—তারা দ্বারা হয়ে উঠেছেন জাতি-সংগঠক।

প্রতি রমেশচন্দ্রের ছিল সুগভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা। নিবেদিতা তাঁকে 'গড্ ফাদার' ক'রে নিয়েছিলেন, তদনুযায়ী ব্যবহার করতেন। রমেশচন্দ্রকে খুব নিকট থেকে দেখে শ্রদ্ধা করার কারণ নিবেদিতা খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৯০১ সালে ইংলণ্ডে থাকাকালে নিবেদিতার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় হয়। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহযো তাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন। সে কাহিনী এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেছি। ভারতের রাজনৈতিক

মনে হতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ক'রে আনন্দমোহন বৃহত্তর জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এমন সন্দেহের হেতু আছে। যাঁরা এই ধরনের মতান্তর বা ধর্মান্তর গ্রহণ করেন তাঁদের অনেকেই নবকীর্তির উগ্র উত্তেজনার পোশাক চড়িয়ে পারিপার্শ্বিকের আঘাতে অটল থাকেন—তাঁদের মনে তখন ছেড়ে-আসা মানুষ বা মত সম্বন্ধে হিংস্র ঘৃণা। নিবেদিতা বললেন, আনন্দমোহন ব্রাহ্ম হলেও পুরাতনী ঐতিহ্যের শক্তি ও সামর্থ্যকে শ্রদ্ধা করে গেছেন, নিজেকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি, মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল, কারণ তিনি প্রাচীন আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গেই মাত্র সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন, প্রাচীন ধ্রুব আদর্শের সঙ্গে নয়। নিবেদিতা আনন্দমোহনের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সঙ্গে তাঁর জাতি-সংগঠক ভূমিকাকে সুগ্রবন্ধ করতে চেয়েছেন। অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং জটিল হিন্দু-ধর্মের মধ্য থেকে সহজ উদ্দেশ্যযুক্ত ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব—তা জনগণকে একটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ পথনির্দেশ করে দেয়, যা জাতীয়তার ধর্মীয় পত্তনভূমি হতে পারে। আনন্দমোহন কেশবচন্দ্র সেনের দলত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে নেতৃত্ব করেছিলেন, সেখানেও নিবেদিতা জাতীয়তার সূত্র দর্শন করেছেন। নিজ কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে কেশবচন্দ্র নীতিত্যাগ করেছিলেন বলে আনন্দমোহনের বিদ্রোহ নয়, তাঁর বিদ্রোহ একনায়কত্বের বিরুদ্ধে, সাধারণের অধিকারের পক্ষে। নিয়মতন্ত্র ও সাম্যকে ভিত্তি করে ব্রাহ্মসমাজের জন্য কনস্টিটিউশন রচনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এইখানেই এসে গেল ভারতের নাগরিক জীবনের আদর্শ। একই মনোভাব প্রসারিত হয়েছিল আনন্দমোহন কর্তৃক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে এবং পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন সমর্থনে। আনন্দ-মোহন ক্রমেই অগ্রসর হয়েছেন এবং অধিকতর দ্রুতগামীদের পথ ছেড়ে দিয়েছেন। এই গণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক-পদ বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি-পদ আঁকড়ে থাকতে চাননি।

নিবেদিতা বলেছেন, আনন্দমোহন এখানেও থামেন নি। স্বদেশী যুগে 'কনস্টিটিউশনালিজম্'-কে ত্যাগ করে 'ন্যাশন্যালিটি'-কে গ্রহণ করেছিলেন। আনন্দমোহনের এই রূপান্তরের কথা বলে নিবেদিতা রাজভক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে কী প্রচণ্ড গাল খেয়েছিলেন, তা আগেই জানিয়েছি।

নিবেদিতা সব সময়েই 'জাতীয়' আদর্শের সঙ্গে 'নাগরিক' আদর্শকে বন্ধনীবদ্ধ করেছেন—'সিভিক অ্যান্ড ন্যাশন্যাল আইডিয়ালস।' নাগরিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা-ভিন্ন জাতীয় আদর্শের জন্ম হতে পারে না। নিবেদিতার কাছে আনন্দমোহন নাগরিক আদর্শের প্রতিভূ। এই আদর্শের সিদ্ধিলাভ করতে আনন্দমোহনকে দীর্ঘ সাধনা করতে হয়েছে, যার সঙ্গে একজন ঋষির জীবনব্যাপী সাধনার কোনোই পার্থক্য নেই। "দুশো বছর আগে জন্মালে আনন্দমোহন বসু একজন ভারতীয় ঋষি হয়ে উঠতেন। তিনি জন্মেছেন আমাদের কালে—পূর্বকালের মতোই জাতীয় বিবেকচৈতন্যের মহা-শক্তিতে সম্পন্ন তিনি—হয়ে উঠেছেন নাগরিক আদর্শের সম্মানিত শূরবীর।" "নাগরিকতার আদর্শ ঋষিত্বের আদর্শের মতোই উচ্চ;" নিবেদিতা পুনশ্চ বলেছেন, "আনন্দমোহন তাঁর বহুল কর্ম ও

উদ্দেশ্যসাধনেও ঐকালে তাঁরা সহযোগিতা করেছেন।২ ১৯০১ সালের মধ্যভাগে মিসেস ওলি বুলের আমন্ত্রণে তাঁর নরওয়ের অন্তর্বর্তী বার্জেন-এর আবাসে গিয়ে নিবেদিতা তিনমাস কাটান—সেইসময়ে সেখানে রমেশচন্দ্রও কিছুকাল ছিলেন। নিবেদিতার 'দি ওয়েব' গ্রন্থ রচনার পিছনে রমেশ দত্তর বিশেষ তাগিদ ছিল—গ্রন্থটির কয়েকটি অধ্যায় নিবেদিতা এখানেই লেখেন। রমেশ দত্তও তাঁর ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থের কিছু অংশ এখানে লিখেছেন। আমরা ধরে নিতে পারি, এইকালে নিবেদিতা ভারতের অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বহু সংবাদ রমেশচন্দ্রের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন, কারণ ঐসকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ওঁর মতো খুব কম মানুষেরই ছিল; আর ভারতের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের মুখে সেইসব সংবাদ নিবেদিতার মনোগঠনে নিশ্চয় বিশেষ সাহায্য করেছিল। তারপর ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিবেদিতা যখন ভারতে ফেরেন তখন জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন মিসেস ওলি বুল ও রমেশ দত্ত। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০২, জাহাজ মাদ্রাজে পৌঁছলে মাদ্রাজ মহাজন-সভার পক্ষে তাঁদের জন-সংবর্ধনা দেওয়া হয়—সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত সংস্কারক, সাংবাদিক ও কংগ্রেস নেতা জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

রমেশ দত্ত ঐ সভায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ভারতের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ভারতের ইতিহাসে অধিকাংশ মানুষকে আর কখনো এখনকার অপেক্ষা অধিক নিঃস্ব, শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক ভগ্নশক্তি, এবং কৃষকরূপে অধিক ঋণগ্রস্ত দেখা যায়নি। স্বল্পকালের পরিধিতে আর কখনো এমন দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুর সমাবেশ ঘটেনি। আর কখনো একটি সভ্য, উর্বর এবং শ্রম-সমর্থ দেশ এমন ব্যাপক দারিদ্র্য ও শ্মশানশূন্যতার দৃশ্যাবিস্তার করেনি।" তিনি মডারেট রমেশ দত্ত, সুতরাং বলতে বাধ্য ছিলেন—বৃটিশ শাসন শুভসংঘটনে সমর্থ। কিন্তু তাঁর সেই ভরসার থলিকে কেটে ফাঁক করে দিয়েছিল সরকারের মন্দ প্রশাসন ও উৎপীড়ন-ব্যবস্থার বিষয়ে তাঁর কঠোর অসন্তোষ। তিনি বলে বসলেন, "কোনো সভ্য সরকার আর একটি সভ্য ও ঐক্যবদ্ধ জাতিকে কখনো চিরদিনের জন্য স্বায়ত্তশাসনের অমূল্য আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না।" আত্মশক্তির আহ্বানও তিনি জানালেন : "আমরা যেন আত্মবিশ্বাসী হই। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই উপর নির্ভর করছে।...আমাদের ভাগ্য আমাদের শ্রমের উপর স্থাপিত। মহান ও সুযোগ্য

কীর্তির মধ্য দিয়ে নিজেকে নাগরিকরূপে উপলব্ধি করেছেন; এই ভাবটির উপলব্ধিতেই তিনি জীবন সমর্পণ করেছেন। সকল ধর্মই বস্তুতঃ আত্মবলিদানের ধর্ম। আনন্দমোহন এই সম্বন্ধে সচেতন থাকুন বা না থাকুন, নাগরিক আদর্শ বিষয়ে ঐকান্তিকতা ও অখণ্ড আদর্শনিষ্ঠা ছিল তাঁর ধর্ম—সেই বেদীতে সমর্পিত তাঁর জীবন।"

২ "Mr Romesh Chandra Dutta...thinks her [Nivedita] an important factor in the organisation, set on foot by the liberal-hearted friends of India." [*Amrita Bazar Patrika*, July 5, 1901, *VIN*, 217].

উদ্দেশ্যের অনুসরণ করার মধ্যেই আছে জাতীয় জীবনের সম্পদ। অপরপক্ষে স্তব্ধ হয়ে, আবদ্ধ হয়ে থাকার মধ্যে আছে জাতীয় জীবনের মৃত্যু।"

রমেশ দত্তের মুখে প্রকাশ্যে এইসব কথা শুনে নিবেদিতা নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন। এই বক্তব্য সহস্রগুণে অধিক অগ্নিময় ভাষায় বিবেকানন্দের মুখে ইতিপূর্বে উচ্চারিত হয়েছে (*নিবেদিতার মুখে অতঃপর তাই হবে*), তবু রমেশ দত্ত যে, ঐপ্রকার বলতে পেরেছিলেন, তাও কম কথা নয়। *উৎস কিন্তু বিবেকানন্দই। এর মাত্র ৫ মাস পরে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হলে, রমেশ দত্ত নিবেদিতাকে লেখা এক চিঠিতে বিবেকানন্দ জাতিকে আত্ম-শক্তির কোন্ মন্ত্রদান করেছেন, তার কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন :*

"তাঁর [স্বামীজীর] উচ্চ স্বদেশপ্রেম, স্বদেশের মহত্ত্বে তাঁর ঐকান্তিক আস্থা, এবং তাঁর স্বদেশবাসী যদি নিজের কাছে খাঁটি হতে পারে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর পুরুষোচিত বিশ্বাস—তুমি জানো, এই সমস্ত-কিছুকে আমি হৃদয়ের সঙ্গে কিভাবে সমাদর করেছি ও প্রশংসাপূর্ণ আনন্দে লক্ষ্য করেছি। এই আত্মনির্ভরতার ভাবচেতনা—আমাদের মুক্তি আমাদেরই আনতে হবে, *এই দৃঢ় সংকল্প—আমাদের* ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে, এই স্থির প্রত্যয়—এসকলই ছিল তাঁর জীবনের মহানতম শিক্ষা।"৩

মহাজন-সভার উপরি-কথিত সমাবেশে, নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের উষাকালে, রমেশ দত্ত নিবেদিতার বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা গভীর সত্য প্রমাণিত হয়েছিল পরবর্তীকালে। তিনি বলেন, "আমি অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করছি এই দেখে যে, আপনারা সেই নারীকে হৃদয়ের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন যিনি এখন আমাদেরই একজন, আমাদেরই অনুরূপ জীবন যাপন করছেন, আমাদের সুখদুঃখের অংশ নিচ্ছেন, আমাদের সংকট ও সমস্যার ভার বহন করছেন, এবং আমাদের মাতৃভূমির সেবায় আমাদের সঙ্গে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।"

উক্ত সভায় বক্তৃতার মূল দায়িত্ব নিবেদিতার উপর অর্পণ ক'রে রমেশচন্দ্র বলেন :

"আমি অনুভব করছি, এখন আমি যেন সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার—মঞ্চে এসে রাজ-প্রাসাদের দ্বার যে-লোকটি উন্মুক্ত করে দেয়—রাজকুমারীকে পরিচিত করিয়ে দেয়—তারপর প্রস্থান করে।"

নাটকীয় উক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু অচিরে প্রমাণিত হবে—এটি ভারতের বাস্তব জীবন-নাট্যেরই অংশ।

নিবেদিতার চিঠিতে রমেশ দত্তের উল্লেখগুলির কয়েকটিতে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-গবেষণায় সাহায্য-প্রসঙ্গ আছে।৪ আরও আছে—স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রমেশ-

---

৩ 'বিশ্ববিবেক', ১ম সং, ১০২।

৪ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় রমেশ দত্তর সাহায্যের বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পরিবেশিত তথ্যের অতিরিক্ত কিছু তথ্য আমরা বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে (৩০৪-০৫, ৩০৭-৮) দিয়েছি। সেখানে এই ব্যাপারে রমেশ দত্তকে এবং নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর দুটি পত্র মুদ্রিত আছে।

চন্দ্রের ইচ্ছার কথা ; সেই সাক্ষাৎ না হওয়ায় দুঃখ ; স্বামীজীর দেহান্তের পরে বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর মুগ্ধতা। (১৯.২.১৯০৩)। রমেশ দত্তকে নিয়ে নিবেদিতার অল্পস্বল্প কৌতুকও আছে, যে-ধরনের কৌতুক বাড়ির বৃদ্ধ অভিভাবকদের নিয়ে অন্তরালে করা হয়। নরওয়েতে রমেশচন্দ্রের অবস্থানকালের কিছু খবরও পেয়েছি।

রমেশচন্দ্র নিবেদিতাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। বরোদায় প্রধান-মন্ত্রিত্বকালে সেখানকার কাজকর্মের উৎসাহিত বিবরণ তিনি নিবেদিতাকে পত্রে লিখে পাঠাতেন। রমেশ দত্তর দেহত্যাগের পরে ২৭ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে, মিসেস বুলকে নিবেদিতা অমনই একটি পত্রের প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"পুরনো কাগজপত্র ওল্টাবার সময়ে আমাকে লেখা একটা চিঠি পাচ্ছি যাতে তিনি [রমেশ দত্ত] বরোদা রাজ্য সম্বন্ধে তাঁর উদ্দেশ্য ও আশার বিষয় ব্যাখ্যা করেছিলেন। এটি তাঁর জীবনীকারকে পাঠাবার আশা রাখি। অসাধারণ ডকুমেন্ট এটি।"

জে. এন গুপ্ত প্রণীত রমেশ দত্তের জীবনীতে৫ পত্রটি ব্যবহৃত হয়েছিল। সেটি এই :

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি এখন প্রগতির নতুন ধারা উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি—নতুন নীতি ও সংস্কারের পদ্ধতি। সেই অগ্রগতির পথে এই রাজ্যটিকে আমি বহন করে নিয়ে যেতে চাইছি। এখানে যেসব শক্তি আছে তাদের সম্মিলিত করতে সচেষ্ট আমি। তরুণদের উৎসাহিত করতে, কর্মে প্রবর্তিত করতে এবং তাদের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান করতে চাইছি। সর্বপ্রকারের নতুন ভাব ও নতুন পরিকল্পনাকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত আমি, সকল দিকে প্রগতির সূচনা করতেও। বরোদাকে অধিকতর সম্পন্ন ও সুখী রাজ্যে পরিণত করাই আমার উদ্দেশ্য। জনগণের মধ্যে আমি চলে যাই ; আমার পরিকল্পনাগুলিকে ছেপে প্রকাশ করি ; প্রস্তাব-সমূহ নিয়ে মহারাজার সম্মুখীন হই ; এবং যেভাবে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করে

---

৫ জে এন গুপ্ত রমেশ দত্তের জীবনী লেখেন ; সমকালীন পত্র-পত্রিকায় জীবনীটি নিয়ে প্রভূত প্রশংসা বেরিয়েছিল। কিন্তু বইটি নিবেদিতাকে অত্যন্ত অসুখী করে। র‍্যাটক্লিফকে ২৮ জুলাই ১৯১১ তিনি লেখেন :

"গড্‌ফাদারের জীবনী সম্বন্ধে তুমি কি বলবে ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি। হায়, এইসব নিতান্ত মাঝারি লোকেরা বড় নামের আশ্রয়ে নিজেদের বিখ্যাত করতে চায়। আমি তাঁকে বরোদা সম্বন্ধে [রমেশ দত্তের] একটি চিঠি পাঠিয়েছি, যেটি গোটাগুটি আকারে ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিগত—সেটিকে কঠোরভাবে কেটে-ছেঁটে দিয়েছি, বাকি অংশকে নষ্ট করেছি—এ-ব্যাপারে জামাইয়ের [অর্থাৎ জীবনীকার জে এন গুপ্তের] করবার কিছু রাখিনি।"

নিবেদিতাকে লেখা রমেশ দত্তের মূল চিঠিটি আমরা পাইনি, আর সেজন্য অত্যন্ত দুঃখবোধ করছি। নিবেদিতা কর্তৃক কর্তিত পত্র জে এন গুপ্ত-লিখিত জীবনীতে বেরিয়েছে, এবং তাই উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। নিবেদিতার চিঠি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট—তাঁর সঙ্গে কি ধরনের গোপন সংবাদ চালাচালি করতেন সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা। যাঁরা নিবেদিতার পত্র-কর্তন কর্মের

ফেলি, সেটা এই রাজ্যের পুরনো কর্মচারীদের মতে—'অভাবিত কাণ্ড।' জমির অতিরিক্ত খাজনার বোঝা থেকে কৃষকদের কিছুটা অব্যাহতি দিতে চেষ্টা করছি, আর মূলধনীদের এনে জড়ো করতে চাইছি—নতুন শিল্প ও কারখানা স্থাপন করাবার জন্য। এইসঙ্গে যদি একটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন করে উঠতে পারি, তাহলে সত্যই এই রাজ্যের কাজকর্ম জনগণের স্বার্থে জনগণের সহযোগিতায় পরিচালিত করাতে পারব। সেক্ষেত্রে সমস্তই উন্মুক্ত এবং প্রকাশ্য—কোনো কিছুই গোপন অন্ধকারে স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচারের দ্বারা কৃত নয়। স্বপ্ন! এ হল শুধু স্বপ্ন!—অনেকেই বলবে। বলে বলুক। নৈষ্কর্ম্য ও জড়ত্বের মধ্যে চোখ চেয়ে বসে থাকার চেয়ে, কর্ম ও প্রগতির স্বপ্ন দেখাও ভালো। প্রথমোক্ত ব্যাপারটি আমার স্বভাবে নেই, আমার বৃত্তিও হবে না কদাপি। ইতি—

তোমার স্নেহময় গড্‌ফাদার

নিবেদিতা রমেশচন্দ্রের কাছ থেকে শেষ চিঠি পান ১৫ অক্টোবর, ১৯০৯। বরোদা থেকে লেখা সেই চিঠিতে নিবেদিতার অন্যতম সাংবাদিক ইংরাজ-বন্ধু র‍্যেরকে বরোদায় চাকরি দেবার প্রসঙ্গ আছে। নিবেদিতা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ইংরাজদের ভারতের সেবায় সর্বদাই নিয়োজিত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। র‍্যাটক্লিফের সম্বন্ধে তাঁর এই ধরনের চেষ্টার বিষয় পরে দেখব।

রমেশচন্দ্রের উল্লিখিত পত্রটি এই :

অনৌচিত্যে দুঃখবোধ করবেন (দুঃখিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও আছি) তাঁর ঐ কাজের একটা কারণ বোধহয় নিবেদিতাকে লেখা র‍্যাটক্লিফের ৭ জুলাই ১৯১১, চিঠি থেকে খুঁজে পাবেন :

"জে এন গুপ্তের লেখা তোমার প্রিয় গড্‌ফাদারের জীবনীর পাণ্ডুলিপি পড়ছি। তোমাকে একান্তে বলছি—ওটা যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই। সংশোধন ও সম্পাদনার কাজ যথাসম্ভব করেছি, সাজেশনও দিয়েছি, কিন্তু কি জানো, দরকার হল—'ডিমে নতুন করে তা দিয়ে নতুন করে ফোটানো।' ওদের উচিত ছিল উপাদানগুলো আমাকে দেওয়া (তোমার পক্ষে ওগুলো অত্যন্তই নীরস) যাতে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারি। এক মাসের কঠোর পরিশ্রম করলে ওসব থেকে একটা পাতে দেবার মতো বই অন্তত: তৈরী করা যেত। কিন্তু উপায় কি, বইটি এখন প্রেসে চলে যাচ্ছে। জে এন গুপ্তের কাছে কঠোর আপত্তি জানিয়ে বলেছি—রিফর্ম স্কীম যখন প্রস্তুত হচ্ছিল তখন রমেশচন্দ্র দত্ত মর্লে-কে এবং নিজের বন্ধুবান্ধবকে যে-সব চিঠি লিখেছিলেন সেগুলি যেন কদাপি প্রকাশ করা না হয়। ঐসব চিঠিতে মর্লে-র সঙ্গে আলোচনার বিবরণ আছে। সে বস্তু একেবারে গোপনীয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ও মর্লে—দুজনই সতর্ক করে বলেছেন—চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলতে। জে এন গুপ্তকে বলেছি—চিঠিগুলো কোনোমতে ছাপবে না। ছাপলে হৈ-চৈ বেধে যাবে—বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উঠবে—এবং হোয়াইটহল ও অন্যত্র এই সাধারণ ধারণাই ঘোষিত হবে—কোনো ভারতীয়কে বিশ্বাস করা যায় না। ফল বিপর্যয়। মনে হয়, সে যেহেতু আই সি এস, তাই আমার আপত্তি শুনবে। তবে তার কাছ থেকে এখনো উত্তর পাইনি।"

প্রিয় নিবেদিতা,

বাবু ভূপেন্দ্রনাথকে আমি লিখেছি। তবে মহারাজা মিঃ ব্রেয়ারকে মাহিনা দেবার কোনো প্রস্তাব করেছেন কিনা বলতে পারব না, কারণ তা আমি জানি না। এ-ব্যাপারে কথাবার্তা যাতে সুখজনক পরিণতিলাভ করে সেজন্য ভূপেন্দ্রনাথকে চেষ্টা করতে বলেছি।

মহারাজা ও তাঁর পত্নী এখন দার্জিলিঙয়ে আছেন, তা তুমি জানো। এখানকার কাজকর্ম আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষক। আমি শান্ত ও সতর্কভাবে বিরাট আকারে রিফর্ম আনার চেষ্টা করে যাচ্ছি—যাতে হতভাগ্য মূক কৃষকসমাজের জীবনে কিছুটা আলোক, আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য আসে। আমার নিয়োগে এখানে বিরাট প্রত্যাশা জেগেছে—জনগণের ক্ষেত্রে সেই প্রত্যাশা ব্যর্থ হতে দেব না। তবে সফল হতে গেলে সতর্ক, ধীর এবং সম্পূর্ণ নীরব থাকতে হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজ্যের কোনো-কোনো অংশে দুর্ভিক্ষ দেখা গেছে, ত্রাণকাজও আরম্ভ হয়েছে। কাজে ডুবে আছি। স্বাস্থ্য ও শক্তি থাকলে কাজ আমার পরম সমাদরের বস্তু।

তোমার চির স্নেহময় গড্‌ফাদার

রমেশচন্দ্র দত্ত

॥ ২ ॥ রমেশ দত্ত সম্বন্ধে অরবিন্দের রচনার প্রতিবাদে নিবেদিতা

উপরের চিঠির দেড় মাস পরে, ৩০ নভেম্বর, ১৯০৯ তারিখে রমেশ দত্তর মৃত্যু হয়। ১ ডিসেম্বর নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখেন :

"তাঁর [রমেশচন্দ্রের] এবং আনন্দমোহন বসুর মধ্যে এই অপূর্ব ব্যাপারটি ছিল—তাঁরা নবযুগকে প্রাণোত্তপ্ত অভ্যর্থনা জানাতেন, যদিও সে জীবনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি কেবল চাই—এঁদের মতো মহৎ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে যেন ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ চালিত হয়। এঁরাই ঐ ভবিষ্যতের ভিত্তিস্থাপন করে গেছেন।"

চিঠিতে এই কথাগুলি যখন নিবেদিতা লিখছিলেন, তখন নিশ্চয় জানতেন না যে, কিছুদিনের মধ্যে একটু বেশি জোর দিয়ে একই কথা তাঁকে পুনর্বার উচ্চারণ করতে হবে। প্রকাশ্যে প্রবন্ধে সে-কাজ তিনি করেছিলেন, খুব বেদনার সঙ্গেই করেছিলেন। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার জানুয়ারি, ১৯০৯ সংখ্যায় নিবেদিতার *Romesh Chunder Dutt : Being in Some Sort a Reply* লেখাটি কর্মযোগিনের ৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় অরবিন্দর *The Men that Pass* নামক রচনার প্রতিবাদে রচিত। নিবেদিতা নিরানন্দ চিত্তে এটি লেখেন, কারণ তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু অরবিন্দর প্রতিবাদে তাঁকে কলম ধরতে হয়েছিল।

নিবেদিতা ২৭ জানুয়ারি, ১৯১০, এই প্রসঙ্গে মিসেস বুলকে লেখেন, "গড্‌ফাদারের উপরে একটি নোট [মডার্ন রিভিউ-এ] লিখেছি। তরুণদের তরফে ধারালো উজ্জ্বলভাবে তাঁর সমালোচনা করা হয়েছে।"

অরবিন্দ রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোক্ত রচনায় স্বীকার করেছিলেন, "রমেশ দত্তের

অর্থনৈতিক ইতিহাস বয়কটের রূপায়ণে বৃহৎভাবে সহায়ক এবং এক্ষেত্রে তিনি বিরাট নিয়ামক শক্তি।" এতৎসত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে লেখাটি নিবেদিতার কাছে "অত্যন্ত শীতল।" "যাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন", সেই তাঁদের পক্ষে উত্তর দিতে নিবেদিতা অগ্রসর হয়েছিলেন। অরবিন্দের সঙ্গে সৌহার্দ্য-সম্পর্কের কথা মনে রাখলে বলতে হবে, অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনা সম্বন্ধে নিবেদিতার মন্তব্য অত্যন্ত কঠিন, যখন তিনি বলেছেন, অরবিন্দের ঐ "লেখা অশিষ্ট ও অসুন্দর, যত বুদ্ধির ঝলকই তাতে থাক না কেন।" খুবই আহত মনে তিনি লেখেন :

"ভবিষ্যৎকালের জন্মদাতাদের পংক্তিতে অবস্থিত এক মানুষের মৃতদেহ যখন চিতাভূমে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সম্ভ্রমে স্তব্ধ হওয়া উচিত ছিল নিন্দার কণ্ঠস্বর, স্থগিত থাকা উচিত ছিল বুদ্ধি-চতুরতার প্রদর্শনী।"

অরবিন্দের রচনাটির ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং দীপ্ত স্টাইল সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না—কিন্তু গোটা লেখাটিতে রমেশ দত্তকে একজন সফল মাঝারি লোক প্রমাণের চেষ্টাই প্রকট। রমেশ দত্তর সফলতাই তাঁর সম্বন্ধে অরবিন্দের তাচ্ছিল্যের কারণ। আর রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) যে, অত্যন্ত সফল পুরুষ, কে অস্বীকার করতে পারবে? প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অভিজাত শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম; বিদ্যালয় ও কলেজে কৃতী ছাত্র, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কঠিনতম বলে কথিত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ইংরাজ ছাত্রদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় বহুশত পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানলাভ; অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে কর্মজীবন শুরু করে প্রথম ভারতীয় ডিভিশনাল কমিশনার-রূপে অবসর গ্রহণ; তারপর সর্বাধিক অগ্রসর দেশীয় রাজ্য বরোদায় অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী; পার্লামেন্টারি কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য; সরকারী সি-আই-ই উপাধিপ্রাপ্ত; দেশ-বিদেশের একাধিক সাহিত্যসংস্থার সম্মানিত সদস্য বা কর্মকর্তা; পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির বিষয়ে বহুতর ইংরাজি ও বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা; ভ্রমণ-কাহিনী, কবিতা এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক, উল্লেখযোগ্য অনুবাদকও। এই শ্বাসরোধী তালিকাকে আরও এগিয়ে দেওয়া যায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনও ছিল; অবসরগ্রহণের পরে তিনি অধিকতর সময় ও উদ্যম নিয়ে ভারতের শাসনসংস্কারের পক্ষে এবং ভারতে ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে, বলতে ও লিখতে শুরু করেন, এবং তার দ্বারা ভারত ও ইংলণ্ডে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন; ভারতীয় রাজনীতিতে ঐকালের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছেন ১৮৯৯ সালে। ব্যক্তি-জীবনেও তিনি সুখী; ৪৫ বৎসরের আনন্দময় দাম্পত্যজীবনে অনেকগুলি পুত্রকন্যার জনক, যাঁরা সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। এমন মানুষ যে, লৌকিক অর্থে সমসাময়িক সকল ভারতীয় অপেক্ষা সর্বাধিক সফল—তাতে কে সন্দেহ করবে? এবং অরবিন্দর মতো যাঁরা দুঃখের কঠিন পথ বেছেছেন তাঁদের বক্রোক্তির লক্ষ্যও তিনি হবেন, তাও বোধহয় সম্ভাবিত।

অরবিন্দ রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "সুদীর্ঘ জীবন তাঁর—বহুমুখী ও অক্লান্ত প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তিতে পূর্ণ—বিখ্যাত, সম্মানিত, পরিণত, ভারতে ও ইংলণ্ডে খ্যাতনামা—তিনি সেই মানুষ যিনি সর্বদাই সফল্যযুক্ত, সর্বদাই ভাগ্যদেবীর বরপুত্র।" রমেশ দত্তর সফলতার কথাটা অরবিন্দ বারেবারেই বলেছেন। "আর কোনো মানুষকে...এমন বহুমুখী প্রয়াসে, শক্তিতে, আশায়, উদ্যমে পূর্ণ দেখা যাবে কিনা সন্দেহ, যিনি নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাসে ভরপুর এবং আগাগোড়া সাফল্যময়। প্রকৃতিদেবী এঁর সম্বন্ধে গুণদানে বদান্য, ভাগ্যদেবী বদান্য পক্ষপাতিত্বে।" "ভাগ্যদেবী এঁকে সম্পন্ন, বিদ্যানুরাগী, সুপরিচিত এক পরিবারে স্থাপন করেছিলেন...ইংলণ্ডে পাঠিয়ে সিভিল সার্ভিসের দরজা খুলে দিয়েছিলেন ;...এবং এঁর বর্ণ ও জাতির মানুষকে ঐ সর্বোচ্চ চাকুরিটি যে-সর্বোচ্চ পুরস্কার দান করতে পারে তার দ্বারাই এঁকে ভূষিত করেছিলেন।"

অরবিন্দের মতো প্রতিভাবান, এবং স্বচ্ছন্দে উচ্চজীবনে প্রতিষ্ঠিত মানুষ ভিন্ন অন্য কেউ ঐসব কথা বললে ঈর্ষাকাতরতার সন্দেহ করা যেত । কিংবা অরবিন্দ যদি বৈষয়িক উন্নতিতে উদাসী ব্যক্তি না হতেন তাহলে বরোদায় একত্র থাকাকালে রমেশ দত্তর সঙ্গে তাঁর স্বার্থসংঘাতের প্রশ্ন তোলা যেত। না, সে ধরনের কথা আমাদের মনে আসছে না। কিন্তু একথাও মনে না ক'রে পারছি না, রমেশ দত্তর প্রায় শবদেহের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা অরবিন্দের সমালোচনাগুলি বিস্ময়করভাবে কর্কশ যখন তিনি বলেন যে, "রমেশ দত্তর প্রশাসন-ক্ষমতা দ্বিতীয় শ্রেণীর", কিংবা "সমকালের বৃহৎ বাঙালীদের মধ্যে রমেশ দত্তই বোধহয় সবচেয়ে কম মৌলিক।" অরবিন্দ চোখা ব্যঙ্গ করেছেন : "তাঁর সাবলীল কণ্ঠ ও কলম কদাপি শব্দ ও চিন্তার জন্য অপেক্ষা করত না।" লেখক হিসাবে রমেশ দত্তকে তিনি "সংবাদিক ও প্যামফ্লেট-লেখকের" বেশি মনে করেন নি। অরবিন্দ বলতে চেয়েছেন : রমেশ দত্ত বড় সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন না ; অর্থনীতিবিদ-রূপে তাঁকে রানাডে বা গোখলের সমপর্যায়ে ফেলা যাবে না ; ভবিষ্যতে তাঁর রচনাগুলিকে স্মরণে রাখা হবে না ; তাঁর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থে মৌলিক গবেষণা নেই, সে গ্রন্থ দ্রুত পুরাতন ও বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি। রমেশ দত্তর বহু প্রশংসিত ঋগ্‌বেদের অনুবাদ সম্পর্কে অরবিন্দর তির্যক মন্তব্য : "অনুবাদ সুন্দর, তবে ব্যাপারটা বেদ নয়।"

অরবিন্দর সঙ্গে রমেশ দত্তর পরিচয় ছিল কিন্তু তাঁকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ বা ইচ্ছা বোধহয় অরবিন্দর হয়নি। নিবেদিতার সে সুযোগ ও ইচ্ছা দুইই ছিল। সুতরাং তিনি বলতে চেয়েছিলেন : অরবিন্দর লেখাটি রমেশ দত্ত সম্বন্ধে লিখিত, রচনা হিসাবে তা সুন্দর, কিন্তু তা রমেশ দত্ত নয়। অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে দিবারাত্র পরিশ্রমে লিপ্ত রমেশ দত্তকে যখন নিবেদিতা বলেছিলেন, "জীবনে কতখানি-না ক্লান্তি জমেছে আপনার!"—তৎক্ষণাৎ এই উত্তর শুনেছিলেন, "আঃ! না!—এখনো ক্লান্ত নয়। অতি সামান্যই যে ক'রে উঠতে পেরেছি!" [২৩.৭.১৯০৯]। এরই স্মরণে নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ-এ লিখেছিলেন : "কখনো-কখনো রাত্রে জেগে উঠে দেখেছি যে, অর্ধ-মুক্ত দরজা দিয়ে বাতির

আলো বেরিয়ে আসছে ; পাণ্ডুলিপির উপরে ঝুঁকে-পড়া চেহারাটি একনজরে চোখে পড়ছে।...বহু ঘণ্টা বিনিদ্র রজনী কাটাবার পরে তিনি উঠে পড়েছেন কাজ করতে।"

রমেশ দত্ত অবসর গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে অন্য বড় চাকরি পেয়েছিলেন—তখনি তা গ্রহণ না ক'রে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয় জীবনে সে-গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে অরবিন্দকেও বলতে হয়েছিল : "অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থটি, এবং তাতে বর্ণিত ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও রাজস্ব-গত লেনদেনের জঘন্য কাহিনী —এ ছাড়া বয়কটের জন্য জনমত প্রস্তুত হত কিনা আমাদের সন্দেহ হয়। এই একটি ক্ষেত্রে বলা যায়, তিনি কেবল ইতিহাস লেখেন নি, ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।" [বিস্ময়কর হল, রমেশ দত্ত সম্বন্ধে অরবিন্দর এই প্রশস্তিই বারবার উদ্ধৃত হয়েছে, এখনো হয়—তাঁর নিন্দা-রচনা প্রায় অগোচর থেকে গেছে]। নিবেদিতা এহেন রমেশ দত্তকে বলতে শুনেছিলেন, "ভারতের কথা বলতে আমি বাঘের খাঁচায় যেতেও প্রস্তুত।" তাই এঁর দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের উক্তিকে নিবেদিতা একেবারেই পছন্দ করেন নি। কোন্ বিজাতীয় পরিবেশে জন্মলাভ ক'রে, রমেশ দত্ত ক্রমে যথার্থ ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছিলেন, তার উল্লেখ ক'রে নিবেদিতা বলেন, "জাতীয়তার পথে তাঁকে চালিত করবার মতো কেউ ছিলেন না", অথচ শেষে "তিনি নিজেকে নিজের পূর্ব-ধারণার একেবারে বিপরীতপ্রান্তে উপনীত দেখেছিলেন।"

অরবিন্দর অনেক সমালোচনাই নিবেদিতার দৃষ্টিতে আংশিক ও অনুচিত। রমেশ দত্ত-র "সিভিল্যাইজেশন ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া" গ্রন্থ প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন, "এই ধরনের বই সম্বন্ধে অতি ছেঁদো কথা—এটি 'আউট-ডেটেড' [নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বাতিল], কেননা এই বই কখনই মৌলিক গবেষণা-পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল না। এই বইয়ে সে-ধরনের কিছু ঘটানোর চেষ্টা বা দাবিও করা হয়নি। বইটি যদি ঐ প্রকার [মৌলিক কিছু] হতও তথাপি একদিন না একদিন আউট-ডেটেড হতই।" রমেশ দত্তর কর্মজীবনের নানাপ্রকার সাফল্যের অল্প উল্লেখের পরে নিবেদিতা বলেছেন : "প্রশাসক হিসাবে তিনি কোন্ অর্থে দ্বিতীয় শ্রেণীর তা বলা শক্ত।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, প্রশাসনের ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত কাজের চমক নয়, শান্ত সম্পাদনই বেশি ফলদায়ক। রমেশ দত্তের বাংলা রচনাবলী যে, তাঁর দেশবাসীর মুখে প্রয়োজনীয় মানসিক খাদ্য তুলে দেবার দায়িত্বশীলতা থেকে এসেছিল, সাহিত্যসৃষ্টির সুখোল্লাস উপভোগের বাসনা থেকে নয়, তাও নিবেদিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

একটি ক্ষেত্রে নিবেদিতা অরবিন্দের বক্তব্যে অত্যন্ত আপত্তি করেছেন—সেই ক্ষেত্রটিতে কিছু বলার নিজস্ব অধিকার তাঁর ছিল। অর্থনীতিবিদ হিসাবে রমেশ দত্তের অরবিন্দ-কৃত মূল্যায়নকে নিবেদিতা একেবারেই গ্রাহ্য মনে করেন নি। রানাডে বা গোখলে যেখানে বিদেশী পুস্তকলব্ধ পদ্ধতির অনুসারী, সেখানে রমেশ দত্তর অর্থনীতি তথ্যভিত্তিক। তাঁর অর্থনীতি—ভূমি ও তার উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের

অর্থনীতি। নিবেদিতা অর্থনীতিকে কদাপি নিরপেক্ষ বিজ্ঞান মনে করেন নি—তা সমাজ-বিজ্ঞানেরই অংশ।

অরবিন্দ যেখানে নিছক একজন 'সফল' মানুষকে দেখেছেন, সেখানে নিবেদিতার চোখে এই সত্য ধরা পড়েছে—"জীবনের শিখরস্পর্শী সাফল্য সত্ত্বেও রমেশচন্দ্র যথার্থ বিরাটত্বের সরলতাকে বজায় রেখেছিলেন।" নিবেদিতা অনুভব করেছেন, "রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর জনগণেরই অন্তর্ভুক্ত মানুষ।" মৃত্যুর এক বছর আগে রমেশ দত্তকে তিনি সবিনয়ে স্বীকার করতে শুনেছেন, "ভারতে নব দিনোদয় হয়েছে—আমাদের দিন শেষ।" যাঁরা এই কথাটিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করার উত্তেজনায় ছিলেন তাঁদের লক্ষ্য করে নিবেদিতা বলেছেন :

"বস্তুতঃপক্ষে এমন সত্তাসম্পন্ন মানুষদের দিন কখনো শেষ হয় না। দুর্ভাগা সেই দেশ ও মনুষ্যগণ, যাদের মধ্যে এঁরা আর জন্মাবেন না।"৬

৬ নিবেদিতার এই লেখাটি সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় (২১ জানুয়ারি, ১৯১০) লেখা হয় :
"প্রয়াত মিঃ আর সি দত্তের চরিত্র ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যে-সকল সমাদরমূলক লেখা আমরা দেখেছি, তাদের মধ্যে মডার্ন রিভিউ-এর জানুয়ারি সংখ্যার লেখাটি যে-কোনো হিসাবে সর্বোত্তম। লেখক, রমেশ দত্তের চরিত্রের সেই মূল্যবান গুণটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যার দ্বারা তিনি স্বচ্ছন্দে ভারতের নবযুগকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছিলেন, যদিও তাঁর যৌবনের এবং প্রথম পরিণতির দিনগুলির সকল প্রভাবই ছিল পুরাতন চিন্তা-ভাবনার জগতের। দেখা গেল যে, 'সিভিলাইজেশন ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া' গ্রন্থরচনাই রমেশ দত্তর জীবনের অন্যতম পরিবর্তনের বাঁক।"

রমেশ দত্তের মৃত্যুর পরে ভারত ও ইংলণ্ডের পত্রপত্রিকা অজস্র রচনায় ভরে গিয়েছিল—সেখানে নিবেদিতার লেখাটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা—লেখাটির অতীব প্রশংসা বলা যাবে। তবে এক্সট্রিমিস্ট অরবিন্দের বিরুদ্ধে রমেশ দত্তের মর্যাদারক্ষায় এক্সট্রিমিস্ট নিবেদিতাকে অগ্রসর হতে দেখে মডারেট মত-সমর্থক ইণ্ডিয়া পত্রিকা একটু বেশি সুখী হয়েছিল কিনা বলতে পারব না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নিবেদিতা ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥ জাতীয় জীবনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দান

কেবল সাংবাদিকতা করে যিনি জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন, বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে যিনি সত্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সৎসাহসের জন্য সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) নিবেদিতার প্রিয় বন্ধু—জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতা বহু শুভফলদায়ী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই কাগজ—বাংলা মাসিক প্রবাসী (১৯০১ সালে শুরু) বাংলার উপর, এবং ইংরেজি মাসিক মডার্ন রিভিউ (১৯০৭ সালে শুরু) বাংলাসহ সারা ভারতের শিক্ষিত মানুষের উপর, কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল—সে ইতিহাস দীর্ঘ, এখানে সম্পূর্ণ বলাও সম্ভব নয়। কিন্তু এইটুকু বলে নেওয়া যায়, পূর্বোক্ত তিন দশকে বাংলা ও ভারতের যথাসম্ভব নিরপেক্ষ এবং ভারসাম্যযুক্ত ইতিহাস যদি কেউ জানতে চান, তাঁকে এই দুটি পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টাতেই হবে।

রামানন্দের জীবন ও কর্মের উপরে প্রকাশিত রচনা অনেকই আছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেকালের ভারতীয় সাংবাদিক সেন্ট নিহাল সিং, ইংলণ্ডের রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকার জানুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চরিতচিত্রণ করেন, তার মধ্যে রামানন্দের উচ্চ শিক্ষা, অধ্যাপনা-জীবন, ব্যাপক সাংবাদিক জীবন, সাহস ও কৃচ্ছ্রসাধনার বিবরণ ছিল। জাতীয়তার ক্ষেত্রে তাঁর দান সম্বন্ধে বলা হয় : "তিনি সেই শ্রেণীর জাতীয় নেতা যাঁরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে তার পতিত রূপ সম্বন্ধে সচেতন করতে ও ভারতবাসীকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট।" রামানন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংবাদিক চরিত্র সম্বন্ধে এঁর আরও বক্তব্য : "অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সর্বকর্মে নির্ভীক। নৈরাজ্য ও বিপ্লবের প্রচারক না হলেও তিনি সংগ্রামী, ইংরাজদের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের দাবিদার। ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাধিক প্রখর আঘাত মডার্ন রিভিউ-এর মধ্য দিয়েই তিনি ক'রে থাকেন ; মাসের পর মাস তিনি অভিযোগের পর অভিযোগ হাজির করেন, তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে যান অনবদ্য যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে ; সেগুলি দেখিয়ে দেয়—ইংরাজরা ভারতে মানবতায় প্রণোদিত হয়ে আবির্ভূত হয় নি—ইংলণ্ড ভারতকে ভারতের হিতে নয়, নিজের লাভের জন্যই অধিকার করে রেখেছে। সংগ্রহে ও সজ্জায় পারদর্শী তিনি, অপরপক্ষের উক্তি উদ্ধৃত করেই নির্ঘাত নিজ বক্তব্য প্রমাণ করেন।"

আরও ৩৪ বৎসর পরে, রামানন্দের দেহত্যাগের পরে—ঐতিহাসিক-শ্রেষ্ঠ স্যার যদুনাথ সরকার, যিনি মডার্ন রিভিউ-এর সঙ্গে সূচনা থেকেই লেখক-সম্পর্কে যুক্ত—রামানন্দের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে উনিশ শতকের শেষভাগে এডিনবরা রিভিউ-এর সম্পাদক ফ্রান্সিস জেফ্রি-র তুলনা করেছিলেন : "ওয়ালটার বেগট ১৯ শতকের শেষ তিরিশ বছরকে চিহ্নিত করেছিলেন—এডিনবরা রিভিউ-এর সঙ্গে টোরি লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড ইডনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের এক পর্ব বলে। আমরা অনুরূপভাবে বলতে পারি, ভারতবর্ষে বিশ শতকের প্রথম ৪০ বছর মডার্ন রিভিউ-এর সঙ্গে ভারতের ভাগ্যনিয়ামক টোরিদের দীর্ঘতর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কাল।" "এডিনবরা রিভিউ-এর সঙ্গে মডার্ন রিভিউ-এর তফাত—প্রথম পত্রিকাটি নিজ উদ্দেশ্যের জয় দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু সে সৌভাগ্য দ্বিতীয় পত্রিকাটি তার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের জীবনকালে অর্জন করতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, এডিনবরা রিভিউ একটি বিশেষ দলের মুখপত্র ছিল, আর মডার্ন রিভিউ সমগ্র দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করত।" প্রবাসী পত্রিকা আরম্ভ ক'রে রামানন্দ যে-কাজের সূচনা করেন, তাকে তিনি ব্যাপকতর করেছিলেন মডার্ন রিভিউ-এ। "১৯০৭ সালে—চিত্তের আলোক, স্বাধীনতা ও মানবিক অগ্রগতির জন্য অক্লান্ত সংগ্রামকে তিনি [মডার্ন রিভিউ-এ] ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিয়ে অধিকতর সর্বজনীন ক'রে তুললেন।" সূচনা থেকেই মডার্ন রিভিউ-এর সর্বভারতীয় চরিত্রের বিষয়টি যদুনাথ সরকার বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "প্রথম সংখ্যা থেকে বাংলার স্বার্থ এতে অতি সামান্য স্থান অধিকার করে থাকত—যেখানে মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, দ্রাবিড়ভূমি এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রধান স্থান নিয়েছিল। এখানেই নিহিত ছিল তার উদার দৃষ্টির আবেদন। ভারত এক ও অখণ্ড। ভারতের কোনো প্রদেশের কোনো সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের কোনো স্থানের কোনো যথার্থ সন্তান উদাসীন থাকতে পারে না।"

মডার্ন রিভিউ-এর বৈশিষ্ট্য এবং বহুমুখী দানের কথা বলার পরে, যদুনাথ সরকার রামানন্দের এই মূল্যায়ন করেছেন :

"রামানন্দ বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। যেসব দেশের চিন্তাশীল মানুষদের কাছে যুক্তি ও মানবতা সম্মানিত—তেমন প্রতিটি দেশে তাঁর কথা মনোযোগের সঙ্গে শোনা হয়েছে।"১

॥ ২ ॥ নিবেদিতা : রামানন্দ ও মডার্ন রিভিউ :
নিবেদিতা প্রসঙ্গে রামানন্দ

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে প্রণোদিত রামানন্দ এদেশের বহু ব্যক্তির সংগ্রাম ও সাধনার পোষকতা করে গেছেন তাঁর পত্রিকার পৃষ্ঠায়—যখন মনে করেছেন, ঐসব ব্যক্তির সৃষ্টির মূল্য আছে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখের কলা-

১ মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি অমৃতবাজারে ৩১ মে, ১৯৬৫, উৎকলিত হয়।

শিল্প, যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক রচনা ইত্যাদির ব্যাপক পরিচিতি দানকে তিনি নিজ কর্তব্যমধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। রামানন্দ যতখানি পেয়েছেন, দিয়েছেন তারও বেশি। কিন্তু একজনের কাছে তাঁর দান অপেক্ষা গ্রহণের পরিমাণ ছিল বহুগুণে অধিক—তিনি ভগিনী নিবেদিতা। অবশ্য একথাও মনে রাখব, এই কৃতজ্ঞ, কর্তব্যপরায়ণ মানুষটি নিবেদিতার অবর্তমানে তাঁর গুণকীর্তন ক'রে গেছেন, নিবেদিতার মর্যাদারক্ষায় দৃঢ়তা দেখিয়েছেন—নিবেদিতা-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর অসার বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই তা প্রতীয়মান। এবং জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিবেদিতার সাহায্যের কথাও তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কেননা দেখেছেন—কালগতে ঐ অনন্য সাহায্য ঔদাসীন্যে বিস্মৃত হবার মুখে।

নিবেদিতার বিষয়ে রামানন্দ একাধিকবার লিখেছেন। তার মধ্যে নিবেদিতার দেহান্তের পরে মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে তাঁর সম্পাদকীয় এবং পরবর্তীকালে মাঘ ১৩৫৫, উদ্বোধনের প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত রচনায় নিবেদিতার কাছে তাঁর ব্যক্তিগত ঋণের স্বীকৃতি প্রচুর। এ ছাড়াও প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এ বিক্ষিপ্তভাবে তিনি নিবেদিতার সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য করেছেন।

উদ্বোধনের প্রবন্ধে রামানন্দ নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় কিভাবে ঘটল তার বিবরণ দিয়েছেন। সেখান থেকে আমরা জানতে পেরেছি, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর মারফত ঐ পরিচয় হয়। রামানন্দ ডাঃ বসুর ছাত্র এবং গুণগ্রাহী। রামানন্দ যখন এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষতার পদ ত্যাগ ক'রে, বিরাট আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে, ইংরাজি মাসিক মডার্ন রিভিউ বার করতে মনস্থ করেন, তখন পত্রিকার জন্য উৎকৃষ্ট লেখা পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎকণ্ঠা বোধ করেছেন। নিজের সংগৃহীত তথ্যাদি দিয়ে তিনি পত্রিকা পূরণ করতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু ভেবেছেন, "আমার প্রবন্ধে সাহিত্যিক উৎকর্ষ থাকিবে না।...এইরূপ লেখার পত্রিকাটি উৎকৃষ্ট হইবে না।" তিনি লেখক সন্ধান করতে থাকেন এবং সে সম্বন্ধে ডাঃ বসুকে বলেন। জগদীশচন্দ্রই নিবেদিতাকে মডার্ন রিভিউ-এর জন্য লিখতে বলেছিলেন। রামানন্দের প্রয়োজনের কথা জেনে নিবেদিতা "দৃঢ়তার সহিত বলেন, লেখার অভাব যাহাতে না হয় সে চেষ্টা হইবে।" নিবেদিতা তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে রামানন্দের প্রথম পরিচয় ঘটে, পরে সাক্ষাৎ পরিচয় ও বিশেষ সৌহার্দ্য হয়েছিল।২

---

২ উদ্বোধনের প্রবন্ধে রামানন্দ বলেছেন, মডার্ন রিভিউ বের হবার বেশ কিছুদিন পরে, তিনি যখন এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন পত্রিকাটি চালাবার জন্য (মডার্ন রিভিউ প্রথমে এলাহাবাদ থেকে বেরিয়েছিল)—তখন দমদমের 'ফেয়ারী হল' নামক ভবনে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। এখানে রামানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় সময়ের ঈষৎ গন্ডগোল ক'রে ফেলেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের রামানন্দ জীবনী অনুযায়ী রামানন্দ ১৯০৮, এপ্রিল মাসে এলাহাবাদ ছেড়ে পাকাপাকি কলকাতায় চলে আসেন। ঐ সময়ে নিবেদিতা ভারতে ছিলেন না।

রামানন্দের এই লেখা থেকে মনে হতে পারে, মডার্ন রিভিউ সূত্রেই বুঝি তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার যোগসাজস। মোটেই তা নয়। জগদীশচন্দ্র আগেই নিবেদিতাকে প্রবাসী পত্রিকার বিষয়ে অবহিত ও উৎসুক ক'রে তুলেছিলেন। নিবেদিতা ১৮ জুলাই ১৯০৫, কিছু উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় চিত্রের উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "বাংলা ম্যাগাজিনে" তিনি সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করতে পারেন। ২৪ অগস্ট, ১৯০৬, চিঠিতে পুনশ্চ কয়েকটি ইউরোপীয় চিত্রের উল্লেখের পরে তিনি লিখেছেন, "ওগুলিকে একটি বাংলা সাময়িক পত্রে টিপ্পনি-সহ মুদ্রণের সুযোগ পেয়েছি।" এই সাময়িক পত্রিকাটি অবশ্যই প্রবাসী। আমরা দেখি, মডার্ন রিভিউ বেরোবার আগেই প্রবাসীতে ১৯০৬ অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর মাসে নিবেদিতার টিপ্পনি-সহ দেশী বিদেশী চিত্র পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

নিবেদিতা ১৯০৫ সালের মধ্যেই রামানন্দ সম্বন্ধে রীতিমতো সচেতন ও সশ্রদ্ধ, তার পরিচয় পাই ক্ষিতিমোহন সেনের লেখায় :

"বলিষ্ঠ স্বদেশানুরাগের জন্য ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার [রামানন্দের] গভীর একটি যোগ ঘটিল। ঠিক সাল আমার মনে নাই, বোধহয় ১৯০৬ সালে [১৯০৫ ডিসেম্বর—১৯০৬ জানুয়ারি] ভগিনী নিবেদিতা কিছুদিন কাশী তিলভাণ্ডেশ্বরে একটি বাড়িতে বাস করেন। তিনি একদিন রামানন্দবাবুর প্রবাসী-র প্রচুর প্রশংসা করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কেমন করিয়া প্রবাসী-র প্রশংসা করিলেন, ইহাই ভাবিতেছিলাম, কারণ প্রবাসী তো বাংলা কাগজ। তবু দেখিলাম, প্রবাসী-র সব মতামত, সব খোঁজখবর তিনি রাখেন এবং রামানন্দবাবুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ সচেতন।

"ভগিনী নিবেদিতা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'এই-যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ দুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনাপ্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সে যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দয়া কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন আরও প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।"৩

না, ক্ষিতিমোহন এখানে 'সম্ভাব্য সত্যের' প্রলোভনে ধরা দিয়ে রামানন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার মুখে অগ্রিম প্রশস্তি বসান নি। নিবেদিতার পক্ষে ঐ ধরনের কথা বলা সম্ভব

নিবেদিতা অসুস্থতার পরে বিশ্রাম নেবার জন্য দমদমের 'ফেয়ারী হলে' ছিলেন ১৯০৬ নভেম্বর থেকে ১৯০৭ এপ্রিল পর্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যে রামানন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। বাগলের লেখা থেকে দেখি, মডার্ন রিভিউ প্রথম সংখ্যা প্রস্তুত ক'রে (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯০৭) রামানন্দ ১৯০৬ ডিসেম্বরের শেষে কলকাতা কংগ্রেসে এসেছিলেন নেতৃবৃন্দকে সে পত্রিকা দেবার জন্য। ঐ সময়ই খুব সম্ভবতঃ তিনি নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা ঐ প্রথম সংখ্যার অন্যতম লেখিকা।

৩ শান্তাদেবী প্রণীত "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের রচিত "পুণ্যচরিতকথা", পৃ. ১০।

তার অন্যতর প্রমাণ আছে। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার দিন, ১৬ অক্টোবর ১৯০৫, নিবেদিতা *রামানন্দের কাছে রাখীসহ একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তারই মধ্যে সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তার* ঐক্যমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল :

ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

আজ ৩০শে আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫—আজ বাঙালী জাতিকে আইনের সাহায্যে বিভক্ত করা হবে।

এই দিনটিকে যেহেতু আমাদের বিভক্তির দিন হিসাবে ধার্য করা হয়েছে, তাই একে অতঃপর প্রতি বৎসর আমরা আমাদের জাতীয় ঐক্যের গভীরতর উপলব্ধির দিন হিসাবে নির্ধারিত রাখব। বিচ্ছেদের এই হুমকির সম্মুখীন হয়ে, সমগ্র ভারতীয় জাতির মূলগত ঐক্যচেতনার প্লাবনে নিমজ্জিত বাংলার হৃদয় আজ আমাদের সাধারণ মাতৃভূমির প্রতিটি অংশে উপনীত।

বঙ্গদেশের নিকট হতে আজ আপনাদের কাছে প্রেরিত হল এই রাখীবন্ধনের রাখী, যা কেবল প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের, বা প্রদেশের অংশগুলির মধ্যে মিলনের সূত্র নয়—একই মাতৃভূমির সন্তান আমরা, যে-বন্ধনে সকলে বাঁধা আছি, এ তারই সূত্র। বন্দেমাতরম্।

উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এর বিতরণ অভিপ্রেত।৪

ক্ষিতিমোহন-কথিত নিবেদিতার পূর্বোক্ত আশার মর্যাদা রামানন্দ মডার্ন রিভিউ প্রকাশ ক'রে আশাতীতভাবে রক্ষা করেছিলেন। ক্ষিতিমোহন আরও লিখেছেন :

"মডার্ন রিভিউ বাহির হইবার পর ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হইলে আমি বলিয়াছিলাম, 'আপনার সেই ভবিষ্যৎবাণী এতদিনে সফল হইয়াছে। কিন্তু আপনি এত আগে হইতে কি করিয়া এমন একটি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন?' ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, 'গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার মতোই তাহাতে আলোকশক্তি দেন। এই-যে একটি প্রদীপ জ্বলিল, দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম, ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। তখনই বুঝিলাম, এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ-প্রদীপ হইবে। আলোকস্তম্ভের মহাদীপের মতো যেই শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতেই নিঃশেষিত হয়?"

আলঙ্কারিক কাব্যিক উক্তি। তবে যেটুকু অলঙ্কার এতে আছে, নিবেদিতা তদনুরূপ বা ততোধিক অলঙ্কারপ্রয়োগে পারদর্শী ছিলেন।

ক্ষিতিমোহনকে নিবেদিতা পুনশ্চ বলেন :

"ভারতের অন্তর্গূঢ় ব্যথাকে প্রকাশের ভার যাঁহাকে বিধাতা দেন, তাঁহার কি আর

৪ "রাখাল বেণু" পূজা সংখ্যা, ১৩৮৬, পৃ. ৭১৬।

চাকুরি করা চলে? শুধু বাংলার কথা বলিয়াই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, তাঁহাকে সকল ভারতের কথা বলিতে হইবে এবং সকল জগতের কথা ভুলিলে তাঁহার চলিবে না। তিনি বাঙালী, তিনি ভারতীয়, তিনি বিশ্ববাসী।"

রামানন্দ যে নিবেদিতার শুভবাসনাকে চূড়ান্তভাবে সার্থক করেছিলেন, তা ইতিপূর্বে যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন থেকে আমরা জেনেছি।

মডার্ন রিভিউ বের হবার পরে তার চরিত্র দেখে, এবং রামানন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাবার পরে, নিবেদিতা একটি ব্যাপারে খানিক আশ্বস্ত হয়েছিলেন—এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি যথাসম্ভব নিজের মত প্রকাশ করতে পারবেন। ভারতে আসার আগে থেকেই নিবেদিতা সংবাদপত্রের লেখক। ঐ পর্বে নিজের অন্যতম পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—"লণ্ডন জার্নালিস্ট।" পরে ভারতে থাকাকালে ইংলণ্ডের পত্রিকায় "ভারতীয় সংবাদ-দাতার" কাজ করেছেন। রামকৃষ্ণ আন্দোলনের দুটি ইংরাজি পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারত ও ব্রহ্মবাদিনে তিনি প্রচুর লিখেছেন। মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ, কলকাতার নিউ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড্, পাটনার হিন্দুস্থান রিভিউ, ও অন্য পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরিয়েছে। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন বলে র‍্যাটক্লিফ জানিয়েছেন। স্টেটসম্যানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগের বিষয়টি পরে আলোচিত হবে। সাহেবদের 'এমপ্রেস' পত্রিকায় তাঁর একাধিক লেখা প্রকাশিত হতে দেখেছি। অরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের পরে কয়েক মাস তিনি কর্মযোগিন্ চালিয়েছেন। বিভিন্ন পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁর লেখা পাবার জন্য সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার নিজস্ব একটি পত্রিকার প্রয়োজন অত্যন্ত অনুভব করতেন; অথচ বুঝতে পারেন—তাঁর যে-ধরনের কর্মব্যস্ত এবং অনিশ্চিত জীবন (ভারতে কতদিন নিরাপদে বাস করতে পারবেন, তাই ছিল সন্দেহজনক), তাতে বিপুল খরচে ও পরিশ্রমে পত্রিকা বার করার ইচ্ছা বা চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে উপায়—এমন একটি পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ রাখা যাকে তিনি প্রায় নিজের বলে মনে করতে পারবেন, যার সম্পাদক হবেন নিষ্ঠাবান, সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বের মানুষ। মডার্ন রিভিউ-এর মধ্যে সেই পত্রিকাকে, এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সেই সম্পাদককে, নিবেদিতা পেয়েছিলেন।

মডার্ন রিভিউ-এর জন্য নিবেদিতা কতখানি করেছিলেন, সে সম্বন্ধে রামানন্দ বলেছেন :

"এই পত্রিকার একেবারে সূচনাকাল থেকে ভগিনী নিবেদিতা লেখা দিয়ে, উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, এবং অন্যান্য উপায়ে আমাদের অসামান্যভাবে সাহায্য করেছেন। ব্যক্তিগত কথাবার্তার সময়ে তিনি আমাদের অসম্পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে কোনপ্রকার রেয়াত না করে যে-সমালোচনা করতেন, তার থেকে আমরা কম উপকৃত হইনি।"

ভাবাপ্লুতভাবে রামানন্দ লিখেছেন : "এই সকল সাহায্যের মূল্য প্রতিদিনই উপলব্ধি করছি। তাদের প্রকাশ করার চেষ্টা না করাই ভালো।"

রামানন্দ আরও বলেছেন : "তিনি ছিলেন...জন্মসাংবাদিক। দীপ্তোজ্জ্বলভাবে তিনি লিখতেন, শক্তি ও মৌলিকতার সঙ্গে; সামান্য বিষয়ের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিতেন

প্রেরণার উন্মাদনা। তিনি নানা বিষয়ে লিখতে সমর্থ—তাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ লেখা দিয়ে অনেক সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু যা লিখতেন তার কোনোটিই গতানুগতিক হত না ; নিতান্ত ছেঁদো বিষয়বস্তুও তাঁর কলমে নতুন শক্তি ও সৌন্দর্যে ভূষিত হত, সর্বমানবের কর্মনীতির মৌল আদর্শের সঙ্গে এবং সর্ব শক্তির মুখ্য উৎসের সঙ্গে তাদের যুক্ত ক'রে দিতে পারতেন। ভাড়াটে লেখক হওয়া তাঁর পক্ষে কদাপি সম্ভব ছিল না। প্রেরণা এসে গেলে তিনি হয় তাঁর পছন্দের বিষয়ে লিখবেন, না হলে লিখবেনই না। তিনি ধনী ছিলেন না, নানা দাবির টান পড়ত তাঁর তহবিলে, কিন্তু তিনি একটি ইউরোপীয় পত্রিকায় লেখা দেননি (সেকথা তিনি একবার আমাদের বলেছিলেন) কেননা সম্পাদক লেখার বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, যদিও প্রতিশ্রুত দক্ষিণা ছিল রীতিমতো বেশি।"[৫]

লেখিকা নিবেদিতার কাছ থেকে মডার্ন রিভিউ কতখানি পেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে রামানন্দ বহু বৎসর পরেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও শ্রীমতী অবলা বসু "বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে" "ভগিনী নিবেদিতা বয়ন মন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন। তার দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে রামানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার পরিচয়লাভের সুযোগ হয়েছিল আমার আচার্যদেব শ্রদ্ধেয় জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ও তাঁহার সহধর্মিণী লেডী অবলা বসু মহোদয়ার স্নেহের আনুকূল্যে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভগিনী নিবেদিতার নিকট যথেষ্ট ঋণী ছিলাম। সেসব কথা এখানে বলতে চাই না। মাত্র এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমার ইংরাজি মাসিক পত্রিকা মডার্ন রিভিউ প্রথম প্রকাশের সময়ে তিনি নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর লেখার জোরেই আমার এই পত্রিকা দেশ বিদেশে এত বিখ্যাত হয়েছিল।" (আনন্দবাজার, ১ অক্টোবর, ১৯৩৭)।

॥ ৩ ॥ নিবেদিতার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে রামানন্দ : মডার্ন রিভিউ-এ নিবেদিতা-লিখিত সম্পাদকীয়

সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, কলাশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে নিবেদিতার শক্তিপূর্ণ অথচ সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ রচনার কথা রামানন্দ বলেছেন—যেসব রচনায় মডার্ন রিভিউ-এর পৃষ্ঠা অলংকৃত। রামানন্দ খোলাখুলি স্বীকার করেছেন—ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ তাঁর মনে নিবেদিতাই সঞ্চারিত করেছেন। বর্তমানে ঐসকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করব না। [তৃতীয় খণ্ডে বিষয়টি আলোচিত হবে]। এখানে নিবেদিতার রাজনৈতিক রচনা সম্বন্ধে রামানন্দের বক্তব্যে আমাদের প্রয়োজন। সে বিষয়ে মূল্যবান স্বীকারোক্তি তিনি উদ্বোধনের প্রবন্ধে করেছেন :

"রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি [নিবেদিতা] খুব ভালো প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। তাঁহার প্রবন্ধ তিনি যেরূপ লিখিতেন, প্রায় সেইরূপই ছাপিতাম। দু'একটির কিছু

৫ Sister Nivedita, *Modern Review*, Nov. 1911.

পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। টিপ্পনী, মন্তব্য বা নিবন্ধিকা (Notes) তিনি যাহা লিখিতেন, তাহার কোনো-কোনোটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিতাম। তাহা করিবার একটি কারণ, আমাদের দেশের রাজদ্রোহ-বিষয়ক আইন। কেননা তিনি অনেক সময় খুব স্পষ্টভাষায় কঠোর সত্য লিখিতেন। 'আপনার বিবেচনার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে'—পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার অধিকার আমাকে এই বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কোনো-কোনো Note আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া স্বাক্ষরবিহীন-ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় এখন আর তাঁহার বলিয়া সহজে ধরিবার জো নাই। যাঁহারা তাঁহার লিখনভঙ্গি ও চিন্তাধারার সহিত বিশেষ পরিচিত, তাঁহারাই ধরিতে পারেন।"৬

রামানন্দের এই স্বীকারোক্তি দেখিয়ে দিচ্ছে নিবেদিতা কেবল নিজ নামে, বেনামে বা নামবিহীনভাবে মডার্ন রিভিউ-এ প্রবন্ধ লেখেন নি, সম্পাদকীয় পর্যন্ত যথেষ্ট লিখেছেন। রামানন্দের বিষয়ে লেখকেরা আলোচ্য পর্বে যেসব রাজনৈতিক রচনার গৌরব রামানন্দের উপরে চাপিয়েছেন, তাদের অনেকগুলিই, বিশেষতঃ যেগুলি তীব্রভাবাপন্ন ও শক্তিশালী—নিবেদিতার লেখা। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাদের যে-স্বাধীনতা দিয়েছেন তদনুযায়ী, নিবেদিতার "লিখনভঙ্গি ও চিন্তাধারার" সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয়ের সুবাদে, এবং তাঁর পত্রাবলী থেকে প্রাপ্ত ইঙ্গিতের সাহায্যে, বেশকিছু অ-স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় নোট-কে নিবেদিতার বলে নির্ধারণ করেছি, যদিও তাদের অংশবিশেষে এমন মন্তব্য আছে যা নিবেদিতার হতেই পারে না—রামানন্দ তাদের (তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী) রাজদ্রোহ আইন বাঁচাবার জন্য নিবেদিতার লেখার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। রামানন্দের জীবনীকার যোগেশচন্দ্র বাগল অধিকন্তু জানিয়েছেন : ১৯১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে রামানন্দ অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য যখন কলকাতার বাইরে ছিলেন, তখন নিবেদিতা "মডার্ন রিভিউ-এর নোটস্ বা সম্পাদকীয় প্রায় সবটাই কয়েক মাস যাবৎ লিখিয়া দেন। তাঁহার এবংবিধ সহায়তার কথা রামানন্দ পরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।"৭

এক্ষেত্রে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৯০৮ সালের জুন মাসে মডার্ন রিভিউ-এ, ক্ষুদিরামের বোমায় মিসেস কেনেডির মৃত্যু, মাণিকতলায় বোমাকেন্দ্র আবিষ্কার এবং বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির স্বীকারোক্তির সূত্রে পরপর কয়েকটি নোট লেখা হয়। পড়লেই বোঝা যায় তাদের সবগুলি এক হাতের লেখা নয়। অধিকাংশই নিবেদিতার লেখা, কিন্তু সম্পাদকের যোজনাও আছে। যতদূর মনে হয় নিবেদিতা মূল লেখাটি লিখে পাঠিয়ে দেন, (নিবেদিতা তখন পাশ্চাত্যে আছেন) তা মারাত্মকরকম তীব্র ছিল, তাই তার বিপজ্জনক অংশ রামানন্দ বাদ দিয়েছেন, বা বদলেছেন, এবং তাতেও তাদের যথেষ্ট ঠান্ডা করা না গেলে, মাঝখানে কুণ্ঠিত কিছু কথা যোগ করে দিয়েছেন। নোটগুলি পরপর এই :

---

৬ উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৫, পৃ. ২২-২৩।

৭ যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত সাহিত্য-সাধক চরিতমালার দশম খণ্ডে ১০১ সংখ্যক গ্রন্থ—"রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়", পৃ. ১২৯।

(i) Political Assassination and Western Sentiment, (ii) The Genesis of Terrorism in Bengal, (iii) Political Assassination by Bomb Throwing, (iv) Political Enfranchisement by Assassination, (v) How to Dare and Die, (vi) The Problem of Path, (vii) The Gita and Bomb Throwing.

ভাষা ও রচনারীতি অনুযায়ী আমরা মনে করি ১নং লেখাটি রামানন্দের। ২নং নোট নিবেদিতার, যার মধ্যে এই অংশ পাই : (অনুবাদ নয়, এখানে মূল রচনাই উদ্ধৃত করতে হচ্ছে) :

"The ultimate cause of terrorism in Bengal must be sought in the utterly selfish, high handed and tyrannical policy of the Government and in the contemptuous and insulting manner in which most official and non-official Anglo-Indians have spoken of and treated Bengalis....The Russianization of the administration in spirit and methods has led to the conversion of a small section of the people to the methods of Russian terrorism. It is simply a question of action and reaction, 'stimulus' and 'response.'"

এই নোট-এর শেষের ভাষা-কৌশল লক্ষণীয়—দুজন নিরীহ নারীর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ এতে করা হয়েছে, কিন্তু যাঁকে হত্যা করা অভিপ্রেত ছিল তিনি নিহত হলে ব্যাপারটা গর্হিত দাঁড়াত, এমনটি বলা হয়নি :

"The result has been a mistake, horrible in its consequences. Instead of the man they wanted to kill, they have murdered two innocent women, whose death is deeply mourned."

৩নং নোট সুস্পষ্টভাবে রামানন্দের রচনা, যেটি উপরের মারাত্মক কথাগুলির উপরে জলবর্ষণের জন্যই রচিত। সেই নোটটি উদ্ধৃত করছি—রামানন্দের ভাষার সঙ্গে নিবেদিতার ভাষার তফাত দেখাবার জন্য। ২নং নোটের উপরে-উদ্ধৃত লাইনটির পরেই ৩নং নোটে নিম্নের অংশ জুড়ে দেওয়া হয় :

"That is almost invariably a feature of assassination by bomb-throwing. More often than not, it is innocent persons who die, not those whom the bomb-throwers consider guilty. Even when the latter are killed, some innocent persons are killed along with them. So that the method is essentially reckless and wicked, and we may add, cowardly. For there is no heroism in killing an unarmed person, whom, moreover, the assailant has not the courage to face."

৪নং ও ৫নং নোট দুটিও রামানন্দের বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে নিবেদিতার লেখা অল্পস্বল্প থাকতে পারে কিন্তু সেগুলি এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে, তার ভাষা ও

ডাঁশ প্রায় মুছে গেছে। এই নোট দুটিতে বোমারুদের অবিমিশ্র নিন্দা, বোমার কাপুরুষতা, অকৃতকার্যতা ইত্যাদির বিস্তৃত বিশ্লেষণ। কিন্তু এর পরের নোটে কিছু আবরণের ছলনা রেখে সরকারকে প্রচণ্ড আক্রমণ, এবং আত্মোৎসর্গকারী তরুণদের সম্বন্ধে সম্ভ্রম। এই ৬নং নোটটি পরিষ্কার নিবেদিতার—দু'এক লাইনে রামানন্দীয় হস্তক্ষেপ থাকতে পারে :

"Both Government and the people are in the presence of a most difficult problem. To Government we have nothing to say. For, the bureaucracy may not understand that the highest courage and statesmanship consist in recognising one's mistake and retracing one's steps from path of selfish tyranny, and that any further Russianization of the administration is sure to be confronted with a fiercer Russian response on the part of at least a section of the people."

দেশবাসীর উদ্দেশে ঐ নোটে যে-আবেদন করা হয়েছিল, তার মধ্যে সতর্কতাসূচক দু'একটি কথার পরে বলা হল :

"Let them dare, but dare righteously, and die, if need be, in the country's cause. Let them not indulge in cowardly and insincere exaggeration in condemning the misguided youngmen under trial. It is not for us to judge. God will judge. It may be easy for arm-chair critics who are incapable of risking or sacrificing anything for humanity to inveigh in unmeasured terms against persons who have made a terrible mistake, but who, nevertheless, were prepared to lose all that men hold dear, for their race and country;—persons whose fall has been great, because, perhaps, equally great was their capacity for rising to the heights of being; but, for ourselves, we pause awe-struck in the presence of this mysterious tragedy of mingled crime and stern devotion."

অসাধারণ রচনা। সাহসী তিনি যিনি লিখেছেন—কম সাহস নয় তাঁর যিনি ছেপেছেন। এই নোটটি আরও অগ্রসর হয়েছে। দুজন নির্দোষ ইংরাজ রমণীর মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ ক'রে, সেই মানবিক মহত্ত্বের আঘাতে ধূলিশায়ী করে দেওয়া হয়েছে সেইসকল ইংরাজ সম্পাদক ও অন্য ব্যক্তিদের—যাঁরা নিরীহ, আত্মরক্ষায় অসমর্থ ভারতীয় নরনারীর খুন ও ধর্ষণে লিপ্ত বর্বর ইংরাজদের বিরুদ্ধে নিন্দার শব্দমাত্র উচ্চারণ করে না :

"Deplore as we do the death of the two European women, and strongly condemn the murderous deed, we scorn to associate ourselves, even in our condolence and condemnation, with those Anglo-Indian editors and others who have not even a word of regret to express when brutal Anglo-Indians kill inoffensive and defenceless Indians or assault helpless Indian women."

পরের নোটটিও নিবেদিতারই মনে হয়।

॥ ৪ ॥ মডার্ন রিভিউ-এর ব্যাপারে নিবেদিতার কাছে রামানন্দ সর্বাধিক ঋণী

১৯০৭ জানুয়ারি মডার্ন রিভিউ-এর আরম্ভ, ১৯১১ অক্টোবর নিবেদিতার মৃত্যু—মধ্যবর্তী পৌনে পাঁচ বছরে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত নিবেদিতার রচনার যে-তালিকা আমরা প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা-সম্পাদিত নিবেদিতার ইংরাজি রচনাবলীর মধ্যে পেয়েছি, তা খুব মৃদু ভাষাতে বললেও বলতে হবে—বিস্ময়কর।৮ আত্মপ্রাণার হিসাবে, এই কালের মধ্যে মডার্ন রিভিউ-এ নিবেদিতার রচনার সংখ্যা সত্তরের মতো, যাদের অনেকগুলি আবার কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ। নিবেদিতার দেহান্তের পরেও তাঁর অনেক লেখা এই পত্রিকায় বেরিয়েছে, তাদের কথা এখানে আনছি না।

মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত বলে যেসব লেখা আত্মপ্রাণা নিবেদিতা রচনাবলীতে নিয়েছেন, তাদের সবগুলি কিন্তু উক্ত পত্রিকায় নিবেদিতার স্বনামে বেরোয়নি—তাদের কোনো-কোনোটি ছদ্মনামে বা লেখিকার নাম ছাড়াই বেরিয়েছিল। আত্মপ্রাণা তাঁর নিবেদিতা-জীবনীতে নিবেদিতার লেখা বলে উল্লেখ করেছেন, এমন একটি লেখা ["আওয়ার ফ্রেন্ডস্ ইন পার্লামেন্ট অ্যান্ড আউটসাইড", মডার্ন রিভিউ, এপ্রিল ১৯০৯] ভুলক্রমে রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেন নি—তাও ঘটেছে। তাছাড়া আরও অনেকগুলি লেখা আমরা প্রায় সুনিশ্চিতভাবে নিবেদিতার বলে নির্ধারণ করতে পেরেছি—*নিবেদিতার পত্রের ইঙ্গিতে বা তাঁর ভাব ও ভাষাভঙ্গির বিচারে—সেগুলির* সংখ্যাও কম নয়। যথাসময়ে সেগুলির উল্লেখ করব। **এইসমস্ত কারণে যদি বলা যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মডার্ন রিভিউ-এর ক্ষেত্রে (যাকে ভারতবর্ষের অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ 'রিভিউ' বলা যায়) নিবেদিতার কাছে সর্বাধিক ঋণী তাহলে তা ন্যূনতম সত্যজ্ঞাপনের অতিরিক্ত কিছু নয়।**

রামানন্দের কন্যা ও জীবনীকার শ্রীমতী শান্তা দেবী ঐ কথাগুলি মোটামুটি স্বীকার করেছেন। রামানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ও যোগাযোগের বিষয়ে তিনি স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর এই বিবরণ দিয়েছেন :

"ভগিনী নিবেদিতার সহিত রামানন্দের বন্ধুত্ব ও কর্মক্ষেত্রে যোগ কলিকাতায় আসিবার পর আরও ঘনিষ্ঠ হয়। প্রায়ই দেখা যাইত, প্রবাসী অফিস হইতে ছবি কিংবা প্রবন্ধের প্রুফ লইয়া কেহ তাঁহার সেই বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে চলিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রবন্ধ কাহাকেও সংশোধন করিতে দিতেন না শুনিয়াছি। কিন্তু

---

৮ মডার্ন রিভিউ-এর প্রথম সংখ্যাতেই নিবেদিতার সর্বোত্তম রচনার একটি—"আর্ট ইন শেপিং ন্যাশন্যালিটি" বেরিয়েছিল। মডার্ন রিভিউকে তার আবির্ভাবে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে অমৃতবাজার যা লেখে তার মধ্যে নিবেদিতার লেখাটির প্রশংসা ছিল :

"Sister Nivedita...and the editor...have sought to direct the moral and intellectual energy of our nation in channels hitherto greatly neglected."
['রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা ১২১]।

রামানন্দের প্রতি তাঁহার এত গভীর শ্রদ্ধা ছিল, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যেও তাঁহার এতটা বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সংশোধন করিলে নিবেদিতা কখনও কিছু বলিতেন না। ভগিনী নিবেদিতার নিকট যাঁহারা কাজ লইয়া যাইতেন তাঁহাদেরও তিনি শুধু পত্রবাহক হিসাবে দেখিতেন না। রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের কতটা জ্ঞান, দেশের বিষয় তাঁহারা কিছু জানেন কিনা সব খোঁজ লইতেন। যদি দেখিতেন হিন্দুর ছেলে হইয়াও হিন্দুর মহাকাব্য সম্বন্ধে ইঁহারা তেমন কিছু জানেন না, তাহা হইলে নিবেদিতা চটিয়া যাইতেন। এই ভয়ে তাঁহাদের কেহ-কেহ তাঁহার কাছে যাইতে চাহিতেন না। গণেন মহারাজ অনেক সময় নিবেদিতার কাজ লইয়া প্রবাসী অফিসে আসিতেন। রামানন্দ প্রায় নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে, এবং কখনও-বা জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকে নিবেদিতার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। ডাঃ বসুর গৃহেও ইঁহাদের নানা প্রসঙ্গ হইত। বাঙালীদের পোশাক-আশাক ও জীবনযাত্রা সবের মধ্যেই নিবেদিতা যে, সৌন্দর্যসন্ধান করিতেন। এই কথা তাঁহাদের কথোপকথন হইতে বুঝা যাইত ।...১৯১০ খ্রীস্টাব্দে... [এক সময়ে] রামানন্দ পীড়িত হইয়া পড়েন। দুই-তিন দিন যাইতে না যাইতেই ভগিনী নিবেদিতা খবর পাইলেন। অমনি একদিন শোনা গেল, 'ভগিনী নিবেদিতা রামানন্দবাবুকে দেখতে এসেছেন।' তাড়াতাড়ি তাঁহাকে উপরে আনা হইল। সুদীর্ঘ শুভ্র পরিচ্ছদ ও বিলাতী জুতা পরিয়া তিনি আসিয়াছেন। কিন্তু রোগীর ঘরের সামনে আসিয়াই জুতা-জোড়া খুলিয়া রাখিলেন। ইউরোপীয় মহিলাকে জুতা খুলিতে দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই নিবেদিতা ইংরাজিতে বলিলেন, 'আমি জানি জুতা খুলিতে হয়।' কিছুক্ষণ ঘরে বসিয়া কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

"তাহার ঠিক কতদিন পরে মনে নাই, ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং দার্জিলিঙে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি বাঁচিবেন না বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এদেশে যাঁহাদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁহাদের বোধহয় শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। হয়ত এই দুর্ভাগ্য দেশের প্রতি তাঁহার মমতার কোনো কথা বলিয়া যাইবার ইচ্ছা, কিংবা কোনো কাজের ভার দিবার ইচ্ছা ছিল। দার্জিলিঙ হইতে খবর আসিল, 'ভগিনী নিবেদিতা রামানন্দবাবুকে দেখিতে চান ।' কিন্তু যখন খবর আসিল তখনই যাওয়া সম্ভব ছিল না, এবং যখন সম্ভব হইল তখন আর যাইবার সময় ছিল না।...নিবেদিতার লিখিত পত্রাবলীর একখানিও নাই। থাকিলে তাহা হইতে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যাইত।...

'তিনি মডার্ন রিভিউ-এর জন্মকাল হইতে লেখা দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সম্পাদককে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন তেমন সাহায্য সচরাচর কাহারও নিকট মিলে না। সম্পাদক বলিতেন যে, নিবেদিতা সাধারণ কথাবার্তার সময় সম্পাদকের কাজের দোষত্রুটি যাহা দেখিতেন তাহার কঠোর সমালোচনা করিতেন। সেই সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল না । এই-যে নানা ভাবের সাহায্য, ইহার জন্য নিবেদিতার মৃত্যুর পরও সম্পাদক স্মরণ করিতেন। ভাষায় তাহা প্রকাশ করতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। [উদ্বোধনের প্রবন্ধে সে চেষ্টা কিছুটা করেছিলেন]। তিনি কেবল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতি

যাঁহারা সদয় তাঁহারা যেন সকলেই নিবেদিতার মতো কঠোর সমালোচক হইতে পারেন, এবং যাঁহারা এখন কেবলমাত্র কঠিন সমালোচনা করেন তাঁহারা যেন নিবেদিতার মতো সদয় ও সহায় হইতে পারেন।...**এমন প্রাণ দিয়া মডার্ন রিভিউ-এর উন্নতিচেষ্টা আর কেহ করিয়াছিলেন কিনা জানি না।**"৯

॥ ৫ ॥ রামানন্দের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা ও তা নিবারণে নিবেদিতার অন্তরালের চেষ্টা

নিবেদিতার পত্রাবলীতে রামানন্দের উপরে সরকারী রোষদৃষ্টির কিছু সংবাদ আছে। মডার্ন রিভিউ-এ ডুপ্লে-র উপর প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির মামলায় সাক্ষ্য দিতে রামানন্দকে সমন দিয়ে লাহোরে ডেকে পাঠানো হয়। (২০.১.১৯১০)।১০ এই ধরনের লেখা প্রকাশ করে রামানন্দ সরকারকে অস্বস্তিতে

---

৯ 'অর্ধশতাব্দী', ১৫৬-৫৭।

শান্তাদেবী নিবেদিতা শতবার্ষিকীকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৮.১০.১৯৬৭) এক রচনায় মোটামুটি উপরে উদ্ধৃত কথাগুলিই বলেছেন। উপরের লেখাটির মধ্যে ভারতের শিল্প-আন্দোলনে নিবেদিতা-রামানন্দ সহযোগিতার কথা ছিল, এই রচনাতেও আছে। সে অংশ শিল্প-আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকার বিষয়ে লেখার সময়ে উল্লেখ করব বলে এখানে বাদ রেখেছি। শান্তাদেবী আনন্দবাজারের প্রবন্ধে, যাঁরা নিবেদিতার কাছে প্রবন্ধ নিয়ে গিয়ে রামায়ণ মহাভারত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবের জন্য বকুনি খেতেন তাঁদের মধ্যে তাঁর এক মামাও ছিলেন বলে জানিয়েছেন। "আমার এক মামাকে প্রায়ই সেখানে পাঠানো হইত। মামা বলিতেন, 'বেজায় কড়া লোক, বাপু। কিছু জানিনা ধরা পড়ে গেলে এমন চটে বকুনি দেন যে, ওখানে যেতেই ভয় করে'।"

শান্তাদেবী এখানে আরও জানিয়েছেন, রামানন্দই নিবেদিতার বাড়িতে বেশি যেতেন, নিবেদিতা অল্প আসতেন, এলেও অফিস থেকে কাজ সেরে চলে যেতেন। জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে নিবেদিতাকে কর্মব্যস্তরূপে একবার দেখেছিলেন বলে শান্তাদেবী স্মরণ করতে পেরেছেন। নিবেদিতার আকার সম্বন্ধে এঁর স্মৃতি : "নিবেদিতা ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী। সুশুভ্র দীর্ঘ পরিচ্ছদে, কতকটা ইউরোপীয়ভাবেই সজ্জিতা, অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ও সুগঠিতা। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর ঘন চুল সোনালি রঙের ছিল। মুখে চিন্তাশীলতার চিহ্ন জ্যোতির মতো।"

মডার্ন রিভিউ-এর সঙ্গে যোগসূত্র বিষয়ে ইনি লিখেছেন : "নিবেদিতার একটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল [এ-বিষয়ে নিবেদিতার চিঠিতে তথ্য আছে]। এ ইচ্ছা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। এই সময়ই তিনি অন্যের পত্রিকায় নিজের ভাবাদর্শ প্রচার আরম্ভ করেন।...মডার্ন রিভিউকে ভারত সরকার সুনজরে দেখিতেন না। কয়েকবার সম্পাদকের বাড়িতে খানাতল্লাশ হইয়াছে। শোনা যায়, নিবেদিতা প্রথমেই খবর পাইয়া সম্পাদককে সাবধান করিতেন।" [এ-বিষয়ে সংবাদ পরে দেব]।

১০ যদুনাথ সরকার পূর্বে-উল্লিখিত রামানন্দ-বিষয়ক রচনায় এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কিছু চিত্তাকর্ষক সংবাদ দিয়েছেন। মামলাটির নাম ছিল "পঞ্জাব ব্রিজ্‌নেবল্‌ কনস্‌পিরেসি কেস।"

ফেলতেন, অথচ সরকার সরাসরি কিছু করে উঠতেও পারত না, কারণ রামানন্দ আইন বাঁচিয়ে লিখতে জানতেন, তদুপরি তিনি পূর্বে প্রকাশিত নথিপত্রকেই নিজের প্রয়োজনে সাজিয়ে নিতেন, বাইরে নিরাবেগ ভঙ্গি থাকত। সরকারকে অত্যন্ত বিপাকে ফেলেছিল রামানন্দের "মিলিটারি আর্টিকলস্"—যার মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ছিল—যে-বিষয়টির আলোচনা সরকার সবচেয়ে অপছন্দ করত, কারণ ভারতবর্ষকে পরাধীন ক'রে রাখার জন্য প্রস্তুত ঐ প্রধান যন্ত্রটি যাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্বদা পরিমার্জিত, উদ্যত এবং অখণ্ড হিংসায় পূর্ণ থাকে, তার সম্বন্ধে সরকারের সাবধানতার শেষ ছিল না। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে মাঝে-মাঝে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার, ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের পদ ও বেতনের ব্যবধান ইত্যাদি সম্বন্ধে ক্রোধাবেগমূলক লেখা বের হতনা তা নয়, কিন্তু রামানন্দের মতো গোটা ব্যাপারটির চেহারা আর কেউ খুলে ধরতে পারেন নি, এবং ইনি তা করেছিলেন প্রচুর তথ্যের সঙ্গে, যার ফলে বিষয়টি সাধারণ জ্ঞান-বস্তু হয়ে উঠেছিল আর এক্ষেত্রে জ্ঞানের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয় শাসকশ্রেণীর কাছে কী থাকতে পারে? অথচ রামানন্দকে এই রচনার জন্য শাস্তি দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু লোকটিকে থামাতেই হয়। অগত্যা উপায়—মিথ্যা এবং একেবারে উদ্ভট অভিযোগে তাঁকে জড়িয়ে দেওয়া—তা আর কিছু নয়—ডাকাতির অভিযোগ!! রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাকাত দলের সর্দার!!! বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান শাসকদের অসম্ভব দুষ্ট কল্পনা ছাড়া এবস্তু আর কার পক্ষে আয়ত্তে আনা সম্ভব? ব্যাপারটির সংবাদ নিবেদিতা পেয়েছিলেন—রামানন্দকে তিনি বারবার সতর্ক করেছেন। আর যদি রামানন্দকে নির্বাসনে পাঠানোর মতো দুষ্কার্য সরকার করেই ফেলে, তাহলে তার মোকাবিলা কিভাবে করা যাবে, তার চিন্তাও তিনি করেছিলেন।

রামানন্দ ১৮ মাস সময়কালে ১৩টি প্রবন্ধে ভারতের সামরিক বাহিনী নিয়ে আলোচনা

"সরকারী উকিল মিঃ বিভান পেটম্যান তাঁর সওয়ালে মিঃ চ্যাটার্জিকে রাজানুগত্যহীন আন্দোলন-কারী হিসাবে অভিহিত করে বলেন, ও'কে পঞ্জাবী ন্যাশন্যালিস্টদের মতোই কাঠগড়ায় তোলা উচিত ছিল। উক্ত অভিযোগের সমর্থনে তিনি বলেন, মডার্ন রিভিউ-এ রাজদ্রোহাত্মক প্রচার চালিয়েছিলেন বলে এলাহাবাদ কলেজের চাকুরি থেকে মিঃ চ্যাটার্জিকে বরখাস্ত করা হয়।" একেবারে ভিত্তিহীন কথা, কারণ কলেজের চাকুরিতে ইস্তফা দেবার পরেই রামানন্দ মডার্ন রিভিউ-এর কাজে হাত দেন। এবং কলেজে ইস্তফা দেবার মূলে ছিল কলেজের প্রশাসনগত ব্যাপার—তার সঙ্গে রাজদ্রোহ-প্রচারের কোনো সম্পর্কই ছিল না।

এর পরে কিছু 'উলট পুরাণ' ঘটল। আদালতে মডার্ন রিভিউ-এর খণ্ডগুলি আনা হয়েছিল। অনুমতি নিয়ে পেটম্যান-সাহেব সেগুলি উল্টে দেখেন। দেখে স্তম্ভিত—দেশীয় কাগজে এ-ধরনের উচ্চাঙ্গের ছবি ছাপা হয়—এবং দেশীয় শিল্পীরা এমন উচ্চস্তরের ছবি আঁকতে পারেন, যা শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ছবির সমতুল!! মুগ্ধ পেটম্যান—রামানন্দকে ছবিগুলি অ্যালবাম ক'রে প্রকাশ করার জন্য বিশেষ তাগিদ দেন।

করেন।১১ প্রতিটি প্রবন্ধেরই লক্ষ্য—ভারতের সামরিক বাহিনীতে ভারতীয়দের দুর্দশা কতখানি তা দেখানো। সে দুর্দশা পদমর্যাদা ও মাহিনা, উভয় ক্ষেত্রেই। অসন্দিগ্ধ তথ্যের পর তথ্যের দ্বারা রামানন্দ এই ব্যাপারে কল্পনাতীত অবিচারের রূপ দেখিয়ে দেন। অথচ ভারতীয়গণের যোগ্যতা অসাধারণ, তাও তাঁর লেখায় প্রতীয়মান।

রামানন্দ সুকৌশলে আরও কতকগুলি জিনিস উপস্থিত করেন, যাদের ঠেকিয়ে রাখার উপরে ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। অথচ রামানন্দ আপাততঃ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন—ঐসব কাজ করলেই ভারতে বৃটিশ শাসন বলবৎ থাকবে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নিছক বেতনভুক সৈন্য দিয়ে দেশরক্ষা হয় না; প্রয়োজন, সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ার কোর। সে সুযোগে কিন্তু ভারতীয় যুবকেরা বঞ্চিত। তিনি আরও বললেন—ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'ন্যাশন্যাল' হওয়া দরকার। অস্ত্র আইন জনসাধারণের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বীর্যহীন করেছে। তা বাতিল হোক। ভারতীয়রা কেবল জমাদার বা সুবেদার পর্যন্ত উঠতে পারে—তাদের কমিশনড্ অফিসার হবার সুযোগ দেওয়া হোক। যেখানে সিপাহীরা পশুর মতো বাস করে, সেখানে শ্বেতাঙ্গ সৈনিক প্রায় প্রাসাদবাসী—এই বৈষম্য দূর হোক। এইসব মারাত্মক কথা রামানন্দ অত্যন্ত নিরীহ অনুগত ভঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন।

রামানন্দ যে, সেকালে এইসকল মন্তব্য প্রায় এককভাবে তুলে ধরেছিলেন, সেটুকু দাবি তিনি নিজেই না করে পারেন নি। শেষোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন :

"ভারতের সামরিক সমস্যাকে আমি এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করি যে, গত আঠারো মাস ধরে এর সর্বদিকের বিষয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। এটি এমনই মূলগত ব্যাপার যে, এর সঠিক সমাধানের উপরে কেবল ভারতের অর্থনৈতিক সংস্থিতি নয়, জাতির পৌরুষও নির্ভরশীল। এটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সম্প্রসারণ, অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা, এমনকি 'কাউন্সিল অব নোটেবলস্'-এর প্রতিষ্ঠার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি এতাবৎ যে-মনোযোগ পেয়েছে তার থেকে বেশি মনোযোগ পাবার যোগ্য। এই দেশের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, কিংবা বিভিন্ন প্রাদেশিক সম্মেলনসমূহ এই প্রশ্নটির বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করেনি।

---

১১ প্রবন্ধগুলি মডার্ন রিভিউ পত্রিকার নিম্নোক্ত সংখ্যায় ও নামে প্রকাশিত হয়েছিল :

1907, June, The Native Indian Army. Aug., Efficiency of the Native Indian Army. Sep., How the Sepoy is Housed. Oct., Indians and Artillary. Nov., The Organisation of the Native Indian Army. Dec., Native Officers of the Native Indian Army.

1908, Jan., Lord Roberts on the Efficiency of the Native Army. Feb., Foreign Mercenaries in the Indian Army. March, The Barracpore 'Massacre'. May, The Pay of the Sepoy. June, The White Army in India. Nov., Indian Military Charges. Dec., India's Military Charges.

খুবই দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও এই প্রশ্নটিকে আলোচনার যোগ্য মনে করেনি।"

একেবারে শেষে রামানন্দ সরকারকে মধু মাখিয়ে বিষবটিকা সেবন করাবার বাসনা করেছিলেন ; সরকারকে তিনি এমন-সব কাজ করতে বলেছিলেন, যা করলে তাকে নিজের বরখাস্তের পরোয়ানায় নিজেকেই দস্তখত করতে হয়। রামানন্দ লিখেছিলেন :

"বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সরকারের পক্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্যকর্ম হল—ভারতীয় জনসাধারণকে বিশ্বাস করা—অবিশ্বাস নয়। তা যদি করা হয়, তাহলে বিনা ঝঞ্ঝাটে সকল বিভাগেরই সংস্কার করা যাবে। তখন ভারতের সামরিক প্রশ্নের মীমাংসা পৃথিবীর সহজতম বস্তু। জনসাধারণের উপর বিশ্বাসই হোক বৃটিশ-ভারত প্রশাসনের নির্ভর-খিলান। সেই বিশ্বাস করলে আর্মস্‌ অ্যাক্ট অবিলম্বে বাতিল, গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের প্রবেশ-নিষেধ বরবাদ, দেশের সন্তানদের কাছে অফিসার-পদ উন্মুক্ত, এবং বর্তমানে ভারতে যে-বিপুল শ্বেতাঙ্গ বাহিনী রাখা যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান তার কার্যকারিতা বিলুপ্ত। এখন দারিদ্র্য—তার পাপসঙ্গী দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ইত্যাদির সাহায্যে ভারতবর্ষকে মরুভূমি করে তুলেছে—তাদের বিদায় ঘটে ভারতে আবার আসবে সম্পদের যুগ।"

বলাবাহুল্য এই প্রাণকাড়া সিদ্ধান্ত পড়ে বৃটিশ প্রশাসকেরা প্রথমে বলবে, 'আহা-রে!' তারপর রাগে দাঁত কিড়মিড় করবে—এবং তাই করেছিল। নিবেদিতার চিঠিতে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রবন্ধগুলির পিছনে নিবেদিতার প্ররোচনা থাকা অসম্ভব নয়। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, ফলাফল সম্বন্ধে তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়েছিল।

র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা ৬ জুলাই, ১৯১০, লেখেন :

"ভয়াবহ কণ্ঠরোধ—কল্পনাতীত। যথা, আশঙ্কা করার কারণ আছে যে, রামানন্দকে ডাকাতির জন্য পাকড়ানো হবে। তিনি বলছেন, অতি আনন্দে তিনি রাজনৈতিক অভিযোগের সম্মুখীন হবেন—কিন্তু ওরা খুবই জানে যে, মিলিটারী আর্টিকেলগুলির পিছনে অন্ততঃ রাশিকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, যেগুলি [মামলাকালে] চাউর হয়ে পড়বে, তাই তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। ভূপেন বসু [এই ব্যাপারে] জেনকিনসের [হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যিনি ন্যায়রক্ষায় সচেষ্ট] কাছে গিয়েছিলেন ; জেনকিনস পি এল রায়ের কাছে বলে পাঠান যে, (পি এল রায়টা এখন একটি পাক্কা নরকের শয়তান)—[রামানন্দের মতো] একজন সম্মানিত মানুষকে কাঠগড়ায় তোলা পি এল রায়ের পক্ষে উচিত কাজ হবে না। মতি [মতিলাল ঘোষ] সম্ভবতঃ এসব ব্যাপার জানেন না। তিনি আমাকে জানালেন যে, গতকাল 'বেঙ্গলী' একটি গুজব ছেপেছে—পি মিত্র ও জে এল রায় এবং আর একজন একই অভিযোগে গ্রেপ্তার হবেন। খবরটা প্রকাশিত হওয়ার দাম আছে [অর্থাৎ এই ধরনের খবর বেরুবার পরে সরকার কাজটা ক'রে ফেলতে দ্বিধান্বিত হয়], এবং লরেন্স জেনকিনসও কিছু-একটা ব্যাপার। [অর্থাৎ ঐ ন্যায়নিষ্ঠ দৃঢ় মানুষটিকে টলানো যাবে না] কিন্তু কতদিন এইভাবে চলবে?"

একই চিঠিতে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে অনুরোধ করলেন : "যদি রামানন্দের কিছু ঘটে যায়, তুমি যৎপরোনাস্তি করবার জন্য তৈরী থেকো। তোমাকে একথা স্মরণ করাবার দরকার নেই যে, যত উদ্ভট মামলাই হোক ফরিয়াদী পক্ষ [এখানে সরকার পক্ষ] কত সহজে জিতে যায়।" [র‍্যাটক্লিফ কি প্রকার তোলপাড় করতে পারতেন বা করতেন, তার পরিচয় পরবর্তী এক অধ্যায়ে দেব]।

১৩ জুলাইয়ের চিঠিতে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে এই প্রসঙ্গে পুনশ্চ লিখেছেন :

"রামানন্দের নাম বোধহয় ইস্টবেঙ্গল ডাকাতির মামলায় জড়ানো হবে। লোকটির চরিত্র তুমি জানো—বুঝতেই পারছ, কি উদ্ভট। এই মেলে হেরম্ব [মৈত্র] বার্লিনের উদ্দেশে যাত্রা করছে।...যদি রামানন্দের ঘটনাটি সত্যই ঘটে, হেরম্বকে ব্যবহার করো। ডাকাতি করার পক্ষে দুজনেই এক পদার্থ।" [অর্থাৎ ডাকাতি করার পক্ষে দুজনই অ-পদার্থ !!!]।

রামানন্দকে অবশ্য শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি। "রামানন্দের গ্রেপ্তারের কথা শুনব ভাবছিলাম। তা করা হয়নি।" (১৯-২০ জুলাই)। "রামানন্দকে এখনো পাকড়ানো হয়নি—তবে যে-কোনোদিন হতে পারে।" (২৮.৭.১৯১০)। "রামানন্দের নাম শেষ মুহূর্তে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।" (১৪.১০.১৯১০)।

নিবেদিতা যে রামানন্দকে গ্রেপ্তার-সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন—একথা রামানন্দ তাঁর নিবেদিতা-স্মৃতিতে স্বয়ং বলেছেন : "একবার তিনি [নিবেদিতা] চরমুখে জানিতে পারেন যে, আমার নামে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা উঠিবে। খবরটা সত্য ছিল। কিন্তু কি কারণে জানি না, মোকদ্দমা হয় নাই। খবর পাইয়া তিনি অনেক দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়া তাহা আমাকে জানান।"১২

রামানন্দ কি জানতেন না—তাঁকে ডাকাতির মামলায় জড়াবার চেষ্টাও চলছিল—রাজদ্রোহের মামলায় জড়ানো ছাড়াও? নিশ্চয় জানতেন। তবে পরবর্তী স্মৃতিকথায় তা লেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আর তিনি কি জানতেন না—তাঁর গ্রেপ্তার ঠেকানোর নিবেদিতার কতখানি প্রয়াস ছিল? বলতে পারব না।

রামানন্দ ভয় পাননি। নিবেদিতা সানন্দ গর্বে লিখেছেন : " রামানন্দ প্রোজ্জ্বল নয়ন ও আনন নিয়ে বিচরণ করছেন। [বলছেন] 'আহা! ঈশ্বর এমন একটা উৎসর্গের যোগ্য আমাকে বিবেচনা করবেন—এ যে অসম্ভব কাণ্ড!" [১৯-২০ জুলাই]।

রামানন্দের চরিত্রে মুগ্ধ নিবেদিতা আরও লিখেছেন :

"বেচারা রামানন্দ প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় ভুগছে।...কয়েক মাস আগে এক রাঁধুনির ভুলে বিষক্রিয়া ঘটেছিল—এটা তারই ফল। মাথার যন্ত্রণা বাদ দিলে—কী অপূর্ব মানুষ তিনি!"

---

১২ উদ্বোধন, মাঘ ১৩৩৫, পৃ ২৫।

॥ ৬ ॥ পুনশ্চ, নিবেদিতা প্রসঙ্গে রামানন্দ

মডার্ন রিভিউ পত্রিকার মধ্য দিয়ে নিবেদিতার রাজনৈতিক মত কী আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তার উল্লেখ পরে করব। এখানে নিবেদিতার চরিত্রের প্রতি রামানন্দের অত্যুচ্চ শ্রদ্ধার উল্লেখ আর একবার করে নেওয়া যায়। রামানন্দের কাছে "নিবেদিতার কীর্তি আশ্চর্য", কিন্তু "তাঁর জীবন মহত্তর।" নিবেদিতার ছিল "নিবিড় ও গভীর আধ্যাত্মিকতা, চরিত্রের শক্তি, মনের বল, মনীষার ক্ষমতা, ব্যাপক অধ্যয়ন।" তাঁর ছিল "উত্তরোত্তর আত্ম-বিলোপ এবং ভারতের জন্য আত্মোৎসর্গ।" নিবেদিতা সেই ধরনের "হিন্দুভাবাপন্ন পাশ্চাত্ত্যবাসী" ছিলেন না যাঁদের মধ্যে ভারতের জন্য "নাতি-আবৃত করুণাপূর্ণ পৃষ্ঠ-পোষকতার মনোভাব দেখা যায়"; কিংবা তিনি তেমন "ভারত-সমর্থক ইংরাজ" নন যাঁরা "সহানুভূতি দেখাতে ব্যস্ত।" রামানন্দ এখানে স্পষ্টতঃ অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে নিবেদিতার তুলনা ক'রে (রামানন্দ বেশান্তের কঠোর সমালোচক) বলেছেন : "অদৃশ্য, কুহেলিকাচ্ছন্ন কোনো মহাত্মাকে নিজ 'মাস্টার' রূপে গ্রহণ করার পরিবর্তে (যেসব মাস্টার-গণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মর্তজীব অবশ্যই প্রশ্ন তুলবে ; শিষ্যদের প্রয়োজনে সময়-বিশেষে মতামত জানাবার জন্য যাঁদের টান দেওয়া হয়) নিবেদিতা একজন সম্বন্ধেই 'দি মাস্টার' কথাটি বলেছেন—সেই স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিকতা এবং সংগ্রামী পৌরুষ (শেষোক্ত বিষয়টি সকলের পছন্দ হোক বা না হোক) কদাপি প্রশ্নের বিষয় নয়—ওঁরই পাদমূলে উপবেশন করতে পাবার সৌভাগ্যে নিবেদিতা গর্বিত ছিলেন।" নিবেদিতা "ভারতের ইংরাজ সমাজের সুখ-বিলাসের জন্য লালায়িত ছিলেন না," "তিনি উত্তর কলকাতার সংকীর্ণ গলিতে জীর্ণ পুরাতন একটি বাড়িতে অভাবী দুঃখীদের মধ্যে বাস করতেন—গভীর প্রীতি, সহৃদয়তা এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় ভরা নিতান্ত সরল জীবনযাত্রা তাঁর।" "রামকৃষ্ণের অনুগামীরূপে সকল ধর্মমতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ; এবং নিজ গুরু বিবেকানন্দের অনুসারে সামাজিক ব্যাপারে প্রগতির সমর্থক ; বিবেকানন্দ জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের পরোয়া করতেন না।" রামানন্দ নিবিড় আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছেন :

"তিনি যথার্থ ভগিনী ছিলেন। তিনি যথার্থই নিবেদিতা—যাঁরা তাঁর জীবন-পথে এসেছেন সকলেরই সেবায় নিবেদিতা।"১৩

---

১৩ মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর, ১৯১১।

প্রবাসী পত্রিকায় (কার্ত্তিক ১৩১৮) রামানন্দের শোকরচনা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু কম আন্তরিক নয়। তার মধ্যে তিনি বলেন : "ইউরোপীয় বংশসম্ভূত যত লোকের কথা আমরা অবগত আছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভারতবর্ষকে ভগিনী নিবেদিতা অপেক্ষা অধিক প্রীতি ও ভক্তি করিতেন না।...ভারতবাসীরা সর্বপ্রকারে উন্নত, একজাতিসূত্রে বদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করে, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছা ফলবতী করিবার জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন। নারীর শিক্ষা ও জনসাধারণের শিক্ষা ভারতবর্ষের মঙ্গলকর সকল চেষ্টার ভিত্তি বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি স্বাধীনচিত্ত, প্রতিভাশালী ও শক্তিশালিনী লেখিকা ছিলেন। অনেক বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাকে তিনি পালন করিতেন। অনেককে শিক্ষা দিতেন।"

উনবিংশ অধ্যায়
নিবেদিতা—উইলিয়ম স্টেড

॥ ১ ॥ ইংলণ্ডের সাংবাদিক-শ্রেষ্ঠ উইলিয়ম স্টেড

ইংলন্ডের সমাজজীবনে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার অপরিসীম গুরুত্ব, অসামান্য তার প্রতিষ্ঠা—সেই ইংলণ্ডেও উইলিয়ম টমাস স্টেড (১৮৪৯—১৯১২) সাংবাদিক হিসাবে মহানের মধ্যে মহান। নিবেদিতার সঙ্গে স্টেডের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে স্টেডকে অধিকতর উৎসাহী করবার জন্য নিবেদিতা যত্নশীল ছিলেন। এক্ষেত্রে কিছু সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন। স্টেডের সেই ভূমিকা এবং নিবেদিতার সঙ্গে যোগাযোগের তথ্যে আসার আগে সাংবাদিক স্টেডের কিছু পরিচয় দেওয়া যায়।

সংবাদপত্রের সঙ্গে স্টেডের আযৌবন সম্পর্ক। মাত্র ২২ বছর বয়সে 'নরদার্ন ইকো' নামক উদারনৈতিক পত্রিকার সম্পাদক হয়ে ৯ বছর সেই কাজ করেন। বুলগেরীয় অত্যাচার-সূত্রে তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্ল্যাডস্টোনের আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। ১৮৮০ সাল থেকে পল মল গেজেট-এর সহকারী সম্পাদক—এখানে তিন বছর জন মর্লে-র (পরে ভাইকাউন্ট মর্লে) সঙ্গে কাজ করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি এই কাগজের সম্পাদক। পরবর্তী সাত বছরে তাঁর খ্যাতি শিখরস্পর্শ করে—যখন তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি "সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ও আন্দোলনের প্রবর্তক হয়ে ওঠে।" স্টেড "নব সাংবাদিকতার" প্রবর্তক বলে স্বীকৃত হন।

১৮৯০ সালে দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্টেড সুপরিচিত 'রিভিউ অব রিভিউজ' আরম্ভ করেন; কয়েক বছরের মধ্যে তার আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান সংস্করণ বের হয়। এইকালে গুপ্তরহস্যবাদ, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদিতে আগ্রহী হয়ে স্টেড 'বর্ডারল্যান্ড' পত্রিকা বার করেন, যার মধ্যে বিদেহীগণের উক্তির অনুলিখন ও আনুষঙ্গিক বিষয় প্রচুর প্রকাশিত হতে থাকে। এই পর্বে স্টেড ঘোর থিয়জফিস্ট—জীবনের শেষ পর্যন্ত সে-বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিল। স্টেডের এই স্পিরিচুয়ালী বিশ্বাস ও প্রচার প্রভূত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের লক্ষ্য হয় এবং তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস করে। তবু তাঁর সামগ্রিক মর্যাদা ও ভূমিকার গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। তাঁর মৃত্যুর পরে লর্ড এশার যে-কথা বলেন, তা সর্বস্বীকৃত বক্তব্য ছাড়া কিছু নয়: "১৮৮০ সালের পরে দেশে এমন কিছু ঘটেনি যা মিঃ স্টেডের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত নয়।"

ইংলণ্ডের "ডিকশনারি অব ন্যাশন্যাল বায়োগ্রাফি" (১৯১২—২১) থেকে উপরের তথ্যগুলি সংগৃহীত। আরও কিছু কথা এইসঙ্গে যোগ করে দেব বিখ্যাত সাংবাদিক এস কে র‍্যাটক্লিফের মডার্ন রিভিউ-এর প্রবন্ধ (জুলাই ১৯১২) থেকে। ঐ উৎকৃষ্ট

লেখাটিতে র‍্যাটক্লিফ স্টেডের জীবনকথা বলেছেন—মূল্যায়ন-সহ। পল মল গেজেটে স্টেড মর্লে-র সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে, এটা অতীব বিস্ময়ের বিষয় ছিল, কারণ "দুজনের মেজাজ ও পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।" মর্লে-র পরে স্টেড ৬-৭ বছর পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন—ঐকালে পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল—"দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রভাব। স্টেড এক নতুন রীতির শক্তি-উৎস—তিনি সৃষ্টি করেছিলেন নতুন ধরনের সংবাদপত্র।" পুরনো রীতির সাবধানতা বা গুরুগাম্ভীর মর্যাদার পরোয়া না ক'রে, অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর স্টেড, প্রচণ্ড সাহসে এগিয়ে গিয়েছিলেন—যাকে জনহিতকর কাজ বিবেচনা করেছেন তারই সম্পাদনে। প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ হয়েছে অগণিত ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে, জনসাধারণের বৃহৎ অংশের অভ্যস্ত ধারণাকে আঘাত করেছেন তিনি, কিন্তু জয়লাভকে অবধারিত করতে পেরেছিলেন—হয়ে উঠেছিলেন "ইংরাজ সাংবাদিকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত।" এইসব কথার সঙ্গে র‍্যাটক্লিফ স্টেডের পরমাশ্চর্য কিছু সাংবাদিক-কীর্তির উল্লেখ করেছেন; কিভাবে সংবাদপত্রে প্রচারের দ্বারা দীর্ঘদিনের অনাচার-অবিচারের উৎখাতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন; এবং তাঁর ব্যর্থতার মধ্যেও বিরাটত্ব দর্শন করেছেন।—"তাঁর প্রাণশক্তি সুবিপুল, উর্বর ভাবের উৎপাদন অফুরন্ত, ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা গেছে, তিনি বহু পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন যেগুলিকে সম্পন্ন করা দেহধারী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কিছু মত বা স্বার্থের নৈর্ব্যক্তিক মুখপত্র সংবাদপত্রকে" স্টেড কিভাবে নিজের প্রচণ্ড চরিত্র, মত ও উদ্দেশ্যের বাহক করতে পেরেছিলেন—র‍্যাটক্লিফ তাও বর্ণনা করেছেন। "তিনি যে কেবল চাঞ্চল্যকর ছিলেন; 'সাক্ষাৎকারগুলিকে' জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন; সংবাদশিরোনামার ক্ষেত্রে নতুন চেহারা এনে দিয়েছিলেন; সর্বদা সাহসী, আত্মবিশ্বাসী এবং যুদ্ধোৎসাহে পূর্ণ ছিলেন; তাই নয়—তিনি সংবাদপত্রের অফিসকে শক্তিতে ও মর্যাদায় পরিস্ফীত ক'রে উচ্চ ও মুক্ত ছাঁদের ডিক্টেটরশিপের ভঙ্গি সেখানে এনে ফেলেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ৬ বছর পল মল গেজেট চালানোর সময়ে তিনি নরদামবারল্যাণ্ড স্ট্রীট থেকে বৃটিশ-সাম্রাজ্য চালাতেন।"

সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য—শ্রমিক থেকে সুলতান—স্টেডের বাড়ি ও অফিস খোলা ছিল। বালকের স্ফূর্তিতে তিনি সকলকে অভ্যর্থনা করতেন, কথা বলতেন, এবং চতুর প্রবীণের বুদ্ধিতে ভিতরের কথা বার করে নিতেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্টেডের বিশেষ আগ্রহের কথা র‍্যাটক্লিফ বলেছেন। "ভারতবাসীরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে অভ্যর্থিত। ভারতের প্রতিটি জননেতা তাঁর বাড়িতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যেতেন। স্টেড খুব সহজেই হুল্লোড় হাসি, বোকা-সোকা এলানো ভঙ্গির মধ্যে আগন্তুককে জেরা ক'রে তাঁর ইংলণ্ডে আসার উদ্দেশ্য, কিংবা তাঁর স্বদেশের অবস্থার কথা জেনে নিতেন। আপাততঃ মনে হত, একটা সর্বজনীন সদরঘরে রবিবারের বিকেলে সপ্তসমুদ্রপার থেকে আগত ব্যক্তিদের আমোদ-আহ্লাদের কাণ্ড চলেছে—সে ধারণা লুপ্ত হয়ে যেত যখন পরের মাসের রিভিউ অব রিভিউজে আগন্তুকের কার্যাবলী ও জীবনোদ্দেশ্য-সমন্বিত চরিত্রচিত্রণ কিংবা রবিবাসরীয়

কথোপকথনের সমস্ত কিছুর জমানো বিবরণ প্রকাশিত হত।" র‍্যাটক্লিফ আরও লিখেছেন : "আমাদের কালে কোনো-একটা বিষয় বুঝে সেটাকে প্রকাশ করার ক্ষমতায় তিনি অতুলনীয়—আর তা ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপর সর্বথা নির্ভরশীল ছিল না। চিঠিপত্রও তাঁর প্রয়োজন সমভাবে মেটাত। একটি ঘটনার কথা স্মরণে আছে, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলতে পারি। তিনি পার্টিশান-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে একটি সাক্ষাৎকার-বিবরণ ছাপলেন—তা করলেন দুই ইংরাজ মহিলার পাঠানো চিঠির উপর নির্ভর ক'রে—মহিলাদ্বয় অনেক ব্যবধানে অবস্থিত দুটি জেলা থেকে পত্র লিখেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গিও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু তাঁরা প্রদেশের জনগণের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ তথ্য দিয়েছিলেন।"

রিভিউ অব রিভিউজ-এর আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান সংস্করণের মতো ভারতীয় সংস্করণ করার জন্য স্টেডের অত্যন্ত আগ্রহের কথা র‍্যাটক্লিফ বলেছেন। "মিঃ স্টেড সর্বদাই পত্রিকাটির প্রাচ্য বা ভারতীয় সংস্করণ করবার জন্য মানসিকভাবে ব্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর মস্তিষ্কে নানা ধরনের পরিকল্পনার উদয় হয়েছে : সম্পাদক হবেন ভারতীয় ; গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় কেন্দ্রগুলিতে সংবাদদাতাদের সংস্থা থাকবে ; স্থানীয় ব্যক্তিদের সংগ্রহ-ক'রে কর্মে নিয়োগ করা হবে ; এবং কী নয়। শেষ পর্যন্ত কিছুই সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে পারেনি এবং রিভিউ অব রিভিউজ-এর ভারতীয় পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল—প্রাচ্যদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপ, তার উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য, মাঝে-মধ্যে [ভারতীয়দের] চরিতচিত্র বা সাক্ষাৎকার-বিবরণ লাভ করে।" [কিছু পরেই দেখা যাবে, স্টেডের এই পরিকল্পনার সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল]।

॥ ২ ॥ স্টেডের থিয়জফি ও ভারতপ্রীতি : বিবেকানন্দ : নিবেদিতা

স্টেডের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় প্রসঙ্গে নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন বলেছেন—সে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল নিবেদিতার ভারতে আসার অনেক আগেই। নিবেদিতার দেহান্ত পর্যন্ত উভয়ের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ থাকার জন্য স্টেডের কাগজে ভারতবর্ষের সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণ বেরুত এবং পরাধীন দেশের সংবাদপত্রগুলি স্বভাবতঃই খাস ইংলণ্ডের কাগজের মন্তব্য সানন্দে পত্রস্থ করত, সেজন্য স্টেড এইকালে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে বহুল উল্লিখিত চরিত্র—কিন্তু যে-জন্য স্টেডের বিশেষ ভারত-প্রীতি সে সম্বন্ধে নিবেদিতা বা তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কোনোই আগ্রহ ছিল না। স্টেডের প্রিয় থিয়জফি আন্দোলন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা উভয়ের মনেই ছিল নিতান্ত বিতৃষ্ণা। থিয়জফিস্টদের প্রেতচর্চা সম্বন্ধে উচ্চহাস্য ও ধারালো ব্যঙ্গের দ্বারা বিবেকানন্দ স্টেডকে বিরূপ ক'রে তুলেছিলেন, তা নিবেদিতার চিঠি থেকেই পাই। নিবেদিতা ভারতে আসার অল্প পরে (৫ জুন, ১৮৯৮) তাঁর ইংলণ্ডের বান্ধবী মিসেস হ্যামণ্ডকে লিখেছিলেন : "টমসনরা যদি এখানে থাকত এবং জানতে পারত যে, মিঃ স্টেড কেন

স্বামীজীকে অপছন্দ করেন, তাহলে তারা হেসে ফেটে পড়ত। স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে যাবেন তখন তুমি তাঁকে খুঁচিয়ে নিউইয়র্কের মিডিয়াম মিসেস উইলিয়ামসের গল্পটা শুনে নেবে আর সেটা শুরু হলে তিনি নির্ঘাত বাকি ব্যাপারটা তোমাকে বলে দেবেন।"

নিবেদিতার পত্র থেকে বোঝা যায়, স্টেডের সঙ্গে স্বামীজীর মোলাকাত হয়েছিল এবং তা সুখকর হয়নি। স্টেড যেখানে মজার কথা বলে ভারতীয়দের পেটের কথা বার করে নিতেন সেখানে বিবেকানন্দ মজার কথা বলে স্টেডের পেটের কথায় অসুখ এনে দিয়েছিলেন। মিসেস উইলিয়ামস-ঘটিত তামাশা স্বামীজী পরেও করেছেন। নিবেদিতা তার এই বিবরণ দিয়েছেন :

"লঘুতর বিষয়েও [আলমোড়ায় থাকাকালে] আমরা চমৎকার-চমৎকার গল্প [স্বামীজীর মুখে] শুনতাম । যেমন, স্বামীজী আমেরিকার এক শহরে যখন এক ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন, যেখানে নিজের রান্না নিজেকেই করতে হত, সেই কাজ করার সময়ে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই 'এক অভিনেত্রীর দেখা হত, যে প্রত্যহ একটি পেরু-পাখির রোস্ট খেত ; আর তাঁর দেখা হত এক দম্পতির সঙ্গে যারা ভূত তৈরি করে জীবিকানির্বাহ করত।' যখন স্বামীজী পুরুষটিকে এই লোক-ঠকানো ব্যবসা করার জন্য ভর্ৎসনা করতেন, তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য বলতেন, 'একাজ করা তোমার কদাপি ঠিক নয়'—তখন মহিলা পিছনে এগিয়ে এসে সাগ্রহে বলত, 'হাঁ মহাশয়, আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলে থাকি! দেখুন না, উনি ভূত তৈরী ক'রে মরেন আর মিসেস উইলিয়ামস সব টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে চলে যান।'

"স্বামীজী এক ইঞ্জিনীয়ার যুবকের কথাও বলেছিলেন। লোকটি শিক্ষিত, কিন্তু একটা প্রেত-সম্মিলনে হাজির হয়ে যখন তার শীর্ণ জননীরূপে পর্দার পিছন থেকে স্থূলকায় মিসেস উইলিয়ামসকে আবির্ভূত হতে দেখল, তখন সে চীৎকার করে উঠেছিল, মা! মা! তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়ে কি মোটাই না হয়েছ!' স্বামীজী বললেন, 'শুনে আমার বুক ভেঙে গেল। ভাবলাম, লোকটার আর আশা নেই।' কিন্তু স্বামীজী হটবার পাত্র নন। তিনি তাকে একটি রুশ শিল্পীর গল্প শোনান। শিল্পী এক কৃষকের মৃত পিতার ছবি আঁকার অর্ডার পেয়েছিলেন, কিন্তু পিতার সম্বন্ধে পুত্রের কাছ থেকে এইটুকু মাত্র বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেন : 'আহা, বললাম তো, বাবার নাকে আঁচিল ছিল!' অবশেষে শিল্পী একদিন যে-কোনো কৃষকের ছবি এঁকে তার নাকের উপরে মস্ত আঁচিল বসিয়ে দিলেন—তারপর খবর পাঠালেন—'ছবি তৈরী। এসে দেখে যান।' কৃষকপুত্র এসে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে ভাববিহ্বল হয়ে পড়ল, বলে উঠল, 'বাবা! বাবা! শেষ দেখার পরে তুমি কত না বদলে গেছ!' এর পরে ইঞ্জিনীয়ার ছোকরাটি আর কখনো স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলেনি ; তার মানে, সে গল্পটার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিল।"১

ছোকরাটি গল্পের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে দেখে স্বামীজী বিস্মিত হয়েছিলেন। বিস্মিত না হওয়া যেখানে অস্বাভাবিক সেখানে স্বামীজীর বিস্ময়ের কারণ কি? স্বামীজী অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলেন—মানুষকে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মানুষকে, যদি ভূতে পায়, ছাড়ানো প্রায় অসম্ভব। উইলিয়ম স্টেডের দৃষ্টান্ত সামনেই ছিল। নিবেদিতাও স্টেডের

---

১ NCW, I, 300-01.

ভূতপ্রীতিকে ব্যঙ্গ না করে পারেন নি। (অবশ্য অমৃতবাজার, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি থিয়জফি-সমর্থক কাগজগুলিতে ভূতপ্রীতির জন্য স্টেডের বিশেষ মর্যাদায় আসন)। কিন্তু স্টেডের চরিত্রের অপর দিক, যার জন্য তিনি ইংলন্ডের ঐকালের এক নম্বর সাংবাদিক—তাঁর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনলস সংগ্রাম, সেজন্য ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকা—এ সকলই তাঁকে নিবেদিতার কাছে বরণীয় চরিত্র করে তুলেছিল। স্টেড *"শান্তি-আন্দোলনের" প্রবল সমর্থক, "সাউথ আফ্রিকায় যুদ্ধের* [বুয়র যুদ্ধ, ১৮৯৯-১৯০২] প্রতিবাদীদের মধ্যে সর্বাধিক আপসহীন, আর সেজন্য জনপ্রিয়তাভ্রষ্ট।" নিবেদিতা এইচ ডবলিউ ম্যাসিংহাম প্রমুখ অনেকের মতোই জানতেন, "বুলগেরীয় নৃশংসতার ঘটনা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে ইংলণ্ডে স্টেডের কলমের মতো আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা আর কোনো কলমেরই ছিল না।"

নিবেদিতা এই স্টেডের কাছ থেকেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন চেয়েছিলেন।

নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে দেখা যায়, ১৯০১ সাল থেকেই তিনি স্টেডের পত্রিকায় ভারতের বিষয়ে লিখতে আগ্রহী। স্টেড তাঁর পত্রিকায় নিবেদিতাকে জগদীশচন্দ্রের 'চরিত-চিত্র' লিখতে বলেছিলেন। নিবেদিতা তা লিখে ফেলেছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখায় "বড় বেশিরকম ভারতবর্ষ এবং খুবই কমরকম বসু" থাকায় স্টেড তা ছাপতে রাজি হন নি। শেষপর্যন্ত বসুর প্রথম গ্রন্থ 'দি রেসপনস্ অব ম্যাটার" সম্বন্ধে নিবেদিতার লেখা দীর্ঘ এক সচিত্র প্রবন্ধ ছাপেন [রিভিউ অব রিভিউজ-এ অক্টোবর ১৯০২ সংখ্যায়]। এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্টেডের বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকায় এই আকারে প্রকাশিত একটি লেখা বসুকে পাশ্চাত্ত্য জগতে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রচারিত করতে সাহায্য করেছিল। *নিবেদিতার অনেকগুলি পত্রে এইসূত্রে সংবাদ আছে।* সেগুলি, মূল ইংরাজি প্রবন্ধটির সঙ্গে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে [৬৩২-৪২] উপস্থিত করেছি।

॥ ৩ ॥ নিবেদিতার চরিত্র অবলম্বনে স্টেডের পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প ও তার পশ্চাদ্‌পট

১৯০২ ডিসেম্বর—১৯০৩ জানুয়ারিতে স্টেড ও নিবেদিতাসূত্রে একটি ক্ষুদ্র নাটক ঘটে গিয়েছিল, যার চিত্তাকর্ষক নেপথ্য সংবাদ এবং মঞ্চসংবাদ আমরা জানতে পেরেছি। স্টেডের একটি লেখায় নিবেদিতা স্বনামে নায়িকা হতে-হতে বেঁচে গিয়েছিলেন, যদিও বেনামা নায়িকার ভূমিকা থেকে অব্যাহতি পাননি।

১৯০৩ জানুয়ারিতে দিল্লীর দরবার—লর্ড কার্জনের সুবৃহৎ মোগলাই কীর্তি—মানমোহন ঘোষের ভাষায়—*"বিধ্বস্ত জনগণের সম্মুখে ঐশ্বর্যের শোভাযাত্রা।"* বিবেকী মানুষদের কাছে ও-বস্তু পরাভূতের নিংড়ানো রক্তের ফোয়ারা বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল। তেমন একজন বিবেকী মানুষ উইলিয়াম স্টেড; নিবেদিতার কথা বলাই বাহুল্য। স্টেড নিবেদিতাকে ভারতপূর্ব জীবন থেকেই চিনতেন। নিবেদিতার উগ্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির

কথাও তাঁর সবিশেষ জানা ছিল। সুতরাং তিনি স্থির করলেন, রিভিউ অব রিভিউজে একটি কাহিনী ছাপবেন যার নায়িকা হবেন নিবেদিতা। সেই মর্মে তিনি নিবেদিতাকে চিঠিও লিখলেন, যার প্রথম অনুচ্ছেদে অবশ্য নিবেদিতার জগদীশচন্দ্র বসু-সম্পর্কিত রচনাটির উপর হস্তক্ষেপের কথা আছে। স্টেডের চিঠি থেকে নিবেদিতার চরিত্রের প্রবলতার, প্রচণ্ডতার বলাই ঠিক, পরিচয় মেলে। জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে নিবেদিতার লেখায় হস্তক্ষেপ করেছেন, এই অপরাধে স্টেড যেন ভয়েই অস্থির, অবশ্যই ছদ্ম ভয়, কিন্তু তা একইসঙ্গে নিবেদিতার তপ্ত প্রকৃতির দিকটি দেখিয়ে দেয়।

স্টেডের পত্রটি এই :

মোব্রে হাউস,
নরফোক স্ট্রীট, স্ট্র্যান্ড, লণ্ডন, ডবলিউ সি
ডিসেম্বর ৮, ১৯০২

প্রিয় মিস নোবল,

তোমার চিঠি থেকে এই জেনে আমি আনন্দিত যে, তোমার পাণ্ডুলিপিতে আমি যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছি তাতে তুমি অসন্তুষ্ট হওনি। ভয়ে-ভয়ে ও-কাজ করেছিলাম, কাঁপতে-কাঁপতে, না জানি কোন্ ক্রোধের কোন্ পাত্র আমার মস্তকে উপুড় হবে! তোমার প্রবন্ধের জন্য একটা চেক পাঠাচ্ছি। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করো।

আমি তোমাকে রিভিউ-এর পৃষ্ঠায় অন্য একটি আকারে হাজির করতে যাচ্ছি। দিল্লীর দরবার বর্ণিত থাকবে, এমন একটা ছোটগল্প লিখিয়ে নিচ্ছি—তাতে তোমাকে করছি এক ধরনের নারী-প্রফেট, যার কাছে এইসকল জাঁকজমক, আড়ম্বর, ঐশ্বর্যের ঝলক আর কিছু নয়—মৃত মানুষদের অস্থির উপরে স্থাপিত আমাদের ভারতীয় শাসনযন্ত্রের চুনকাম-করা সমাধিমন্দির। মনে হয়, আমাদের কাহিনীতে তুমি উত্তম চরিত্র হয়ে দাঁড়াবে। তোমার গৃহীত নামেই তোমাকে হাজির করব।

একান্তই তোমার,
ডবলিউ টি স্টেড

স্টেডের চিঠি পেয়ে নিবেদিতা আতঙ্কে উঠলেন। একথা ঠিক, স্টেড জানেন যে, পূর্বে আইরিশ জাতীয়তাবাদী, বর্তমানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নিবেদিতা, উভয় ভূমিকাতেই দারুণ বৃটিশ-বিরোধী। কিন্তু নিবেদিতা এখন যে-গোপন কাজে নেমেছেন তাতে ঐসকল পরিচয়ের রূপ গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়—প্রকাশ হয়ে গেলেই কার্যধ্বংস। সুতরাং তিনি কঠোরভাবে স্টেডকে নিরস্ত করতে বার্তা পাঠালেন।

নিবেদিতা কী করেছিলেন, তা ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩ তারিখে লিখে পাঠালেন মিস ম্যাকলাউডকে :

"তোমাকে কি মিঃ স্টেডের চিঠির কথা বলেছি, যাতে তিনি দরবার-কাহিনী আমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে সরকার-বিরোধী দেখাতে চান? সে চিঠি নববর্ষের দিন মাদ্রাজে পৌঁছয়, এবং সদানন্দ ও আমি তা পড়ে মূর্ছা যাই আর কি! তখন গজগজ করতে-করতে

আঠারোটি কষ্টের টাকা খরচ ক'রে টেলিগ্রাম করতে হল। সেটি যথাসময়ে পেঁাছেছিল, এবং মিঃ স্টেড আমাকে চেনা যাবে না এমন সিস্টার রোজ দাঁড় করিয়েছিলেন। এক চুলের জন্য বেঁচে যাওয়া, নয় কি? *একটা মারাত্মক ভ্রান্তির কাণ্ড হতে যাচ্ছিল।*"

নিবেদিতার টেলিগ্রাম পাবার পরে স্টেড ১ জানুয়ারি ১৯০৩ নিবেদিতাকে লেখেন :

সিস্টার নিবেদিতা, প্রিয় মিস নোবল,

গল্পটি ঠিক যখন লিখছিলাম, যাতে তোমাকে মহিমময়ী সিস্টার সোভেয়াবিটা করেছি—ঠিক তখনি তোমার টেলিগ্রাম এসে হাজির। আমি তোমাকে দরবারে নিয়ে গিয়েছি, সেখানে তুমি স্যার জর্জ গর্ডনের হৃদয় বশীভূত ক'রে ফেলেছ। তোমার *টেলিগ্রাম পাবার পরে অবশ্য অবিলম্বে তোমার নাম বদল করেছি, তোমাকে সাদা-*মাটা সিস্টার রোজ দাঁড় করিয়েছি, সেইসঙ্গে হিন্দু পোশাকও বর্জিত, নচেৎ কেউ হয়ত বুঝে ফেলত আমার আসল নায়িকা কে? গল্পে আমি যাকে হাজির করেছি তার চরিত্রের প্রধান লক্ষণগুলির সঙ্গে তোমার চরিত্রলক্ষণের ঐক্য আছে, কিন্তু সেজন্য তুমি অভিযোগ করতে পারো না। বস্তুতঃপক্ষে আমার মনে হয়েছিল—ও-রকম করলে গল্পে বাড়তি আগ্রহ আসবে। তবে এমন কিছু বলব না যাতে লোকে তোমাকে ওখানে চিনে নিতে পারে ; সে সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকব। জানিনা, দরবার সম্বন্ধে তোমার ধারণা এবং সিস্টার রোজের ধারণা একই কিনা। গল্পটিকে তোমার খাঁটি জীবনকাহিনী করে তোলার ব্যাপারে তোমার মূল্যবান সাহায্য আমি পাবো আশা করি। কিন্তু পরিণতিতে *স্যার জর্জ গর্ডনের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব ; স্যার জর্জ গর্ডন গল্পে ও বাস্তব জীবনে* অতি চমৎকার মানুষ। তোমার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। ইতি,

একান্তই তোমার,
ডবলিউ টি স্টেড

স্টেডের এই চিঠি পেয়ে নিবেদিতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ২৯ জানুয়ারি, বোন মিসেস উইলসনকে লিখলেন, "তোমার কাছে মজার মনে হবে এমন বস্তু পাঠাচ্ছি—মিঃ স্টেডের দুটি চিঠি। প্রথমটি পড়ে আমার আতঙ্কের রূপ কল্পনা করতে পারো। আমার কাজের দফা রফা হয়ে যেত। তবে ব্যাপারটা গোপনীয়।"

রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকার জানুয়ারি ১৯০৩ সংখ্যায় "দি স্টার অ্যান্ড দি স্টেইন অ্যাট ডেলহি" [The Star and the Stain at Delhi] রচনায় যা বেরিয়েছিল তার আংশিক অনুবাদ উপস্থিত করব। এর থেকে নিবেদিতার ভারত-পূর্ব চেহারার কিছু আভাস পাওয়া সম্ভব।

দিল্লীতে তারকার দ্যুতি ও কলঙ্ক-কালিমা

রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত আস্তরণে মহার্ঘসজ্জিত হস্তীযূথের বিশাল শোভাযাত্রা শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সদ্য অগ্রসর হয়ে গেছে দিল্লীর প্রধান রাজপথ দিয়ে। সহিষ্ণু ভারবাহী জীবগুলি

ভাইসরয়, ডিউক, ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে বহন ক'রে, জোড়ায়-জোড়ায় কুচকাওয়াজ ক'রে এগিয়েছে অগণিত জনতার মধ্য দিয়ে—তূরী-ভেরীর ঘোর শব্দ, দর্শকদের প্রচণ্ড উল্লাস-ধ্বনি ফেটে পড়েছে। তার আগে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়েছে—অঙ্গারকৃষ্ণ রণচতুরঙ্গে উপবিষ্ট, গর্বোদ্ধত ভঙ্গিযুক্ত, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণের পোশাক-পরিহিত ভাইসরয়ের দেহরক্ষীগণ, সাদা-নীল-রূপালি রঙের নববেশধারী ইম্পিরিয়াল ক্যাডেটগণ, শ্বেত ও সোনালি পরিচ্ছদে অশ্বারোহী সৈন্যদল। ভারতীয় আকাশতলে অসংখ্য প্রাচ্য-দর্শকের ঘনসন্নিবেশের ভিতর দিয়ে রাজন্যবর্গের জমকালো শোভাযাত্রা এগিয়ে গেছে—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির উপরে রূপচ্ছবির মেলা—অফুরন্ত বর্ণবিচ্ছুরণ, অমার্জিত ঐশ্বর্যসমারোহ, সাম্রাজ্যিক আড়ম্বর, গোলকোণ্ডার রত্নভাণ্ডার—তার সঙ্গে বারে বারে মনে এসেছে মিল্টনের 'অরমুজ অ্যান্ড ইন্দ্'-এর একটি ছত্রের একটানা ধুয়া।

সাম্রাজ্যিক মহোৎসবের উদ্বোধন দিবস। স্যার জর্জ গর্ডন মাত্র গতরাত্রে এসে পৌঁছেছেন ; স্টেশনের দিকে শোভাযাত্রাকে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে যেতে দেখলেন। সমস্ত ব্যাপারটিকে যে-প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ নৈপুণ্যের সঙ্গে সজ্জিত করা হয়েছিল, তাকে নীরব প্রশংসা ও সন্তোষের সঙ্গে স্যার জর্জ গর্ডনের পরিশীলিত চোখ লক্ষ্য করল। তবে তাঁর বাম পার্শ্ব-স্থিত মহিলাটি যে-রকম ভাবাবেগে চালিত হয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে কথা বলছিলেন, সে-রকম আবেগের অধীন না-হবার মতো যথেষ্ট বয়স স্যার জর্জ গর্ডনের হয়েছিল।

মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, "আ হা অপরূপ নয় কি ? বিশেষতঃ ভাবছি যে, ডেইজি লেইটার এই সকলের শীর্ষে আছে।"

"বাহবা, চিকাগো, বাহবা!" হেসে বললেন তাঁর স্বামী। পশ্চিম আমেরিকার বাসিন্দা কৃষ্ণশ্মশ্রুসমন্বিত এই ভদ্রলোক তাঁর সুন্দরী পত্নীকে 'পৃথিবীর সেরা প্রদর্শনী' দেখাতে এনেছেন, যার ধারে-কাছে পৌঁছবার আশা করতে পারে না বারনাম্‌ ও বেইলি।

"সমস্ত সার্কাসটির অগ্রে তো তিনিই—রাজবংশীয়েরও সামনে যাচ্ছেন।" [স্মর্তব্য, লর্ড কার্জনের পত্নী ছিলেন আমেরিকান]।

মহিলা বললেন, "কি ব্যাপার স্যার জর্জ, এত গম্ভীর ? একেবারেই স্ফূর্তির মেজাজে নেই ? আমি যদি ইংরাজ হতাম তাহলে তো গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠতুম। তা না হলেও, দেখুন না, ডেইজি লেইটারের কারণেও কিছুটা ফেঁপেছি। যাকে বলে প্রতিফলিত গৌরবের আলোকে উজ্জ্বল, তাই নয় কি ?—আ-হা !—কি মিষ্টি হাতীগুলি!"

এই সহর্ষ কাকলি মহিলার সুচারু ওষ্ঠ থেকে ঝঙ্কৃত হল—যখন তিনি পথপার্শ্বে সার দিয়ে দাঁড়ানো হস্তীদলকে বৃংহিত ধ্বনিসহ শুঁড় তুলে সেলাম করতে দেখতে পেলেন। ভাইসরয় ও তাঁর পত্নী, ডিউক অব কনট ও তাঁর পত্নী—রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত হাওদার উপর চড়ে আসছিলেন—তাঁদের সেলাম করবার জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গ সার দিয়ে উপস্থিত —সেইসময় হস্তীগুলি স্যালুট করছিল।

স্যার জর্জ প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। বললেন, "আপনি ভুলে গেছেন যে, আমি এখানে আগে এসেছি। আমি ঐ হাতীটিকে জানি।" লর্ড কার্জন ও লেডি কার্জন হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণছত্রের নিম্নে আসীন, হাতীটি এগিয়ে গেল, সেদিকে তাকিয়ে তিনি যোগ করলেন—

"ঐ হাতীটি ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটনকে এইভাবে নিয়ে গিয়েছিল। সেই হল প্রথম দরবার।"

"হ্যাল্লো গর্ডন!" এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বলে উঠলেন, "আরে আপনি এখানে? চমৎকার, নয় কি? আমি তার-বার্তা পাঠাবার সময়ে অভিধানে রঙ্দার যত বিশেষণ আছে সব ঢেলে দিয়েছি, তবু ঠিক শব্দটি পেতে চাইছি। প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য একটা ঠিক শব্দ আছে। আমি এখনো এই দরবার সম্বন্ধে মোক্ষম শব্দটি পাই নি।"

সাংবাদিক এমন জোরে কথাগুলি বলছিলেন যে, আশপাশে সকলেই তা শুনতে পেলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে এক অসাধারণ সঙ্গীতময় কণ্ঠে, অল্প আইরিশ টান আছে, উত্তরটি ঝঙ্কারিত হল—"'বাইজানটিয়াম্' কথাটা লাগিয়ে দিন।"

কথক লাবণ্যময়ী এক আইরিশ নারী, তিনি অপরের অলক্ষ্যে সমাবেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"বাইজোভ্, ম্যাডাম! ঠিক বলেছেন!" সাংবাদিক বললেন—"হাঁ হাঁ, বাইজানটিয়াম! বাইজানটিয়াম! দারুণ! দারুণ!" তিনি তাঁর তার-বার্তার সংশোধনে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।২

স্যার জর্জ গর্ডন আইরিশ মহিলাকে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগলেন। "মনে হয় আমাদের দেখাসাক্ষাৎ আগে হয়েছে", তিনি বললেন, "কিন্তু—"

"সিস্টার রোজকে চিনতে পারছেন না?" মহিলা উত্তর দিলেন। "আমরা কলেরা-ক্যাম্পে কাজ করেছি, যদিও সেখানে যথেষ্ট সার্কাস-ব্যাপার ছিল না।" তিনি যোগ করলেন, "কি নির্বোধ এই মনুষ্যগণ!"

"পরের পয়সায় সার্কাসের মজাদারি!" স্যার জর্জ গর্ডন উত্তরে বললেন। "সাম্রাজ্য আসে, সাম্রাজ্য যায়, কিন্তু সার্কাস থেকে যায়।"

"হাঁ, তবে যখন সার্কাস এসে যায় তখন চলে যায় সাম্রাজ্য", সিস্টার রোজ বললেন। "পরিচিত পুরাতন এই কাহিনী। প্রাচ্য অভিভূত করেছে পাশ্চাত্যকে। পরাভূতরা আর একবার আধিপত্য স্থাপন করল বিজয়ীর উপর। আপনাদের ছেঁড়াখোঁড়া কালো কোট আর টপ হ্যাট-পরা লোকগুলি সাম্রাজ্য গঠন করেছিল; আপনাদের বাইজেন্টীয় মঞ্চ-পরিচালকগণ সেটিকে হারাবার ব্যবস্থা করছেন।"

"হয়ত ঠিক", স্যার জর্জ স্বীকার করলেন, "কিন্তু কার্জন লর্ড লীটনের চেয়ে অন্ততঃ ভালো। তুচ্ছ একটা নেটিভকে খুন করার জন্য 'নাইনথ্ লান্সারদের' [বল্লমধারী অশ্বারোহীদল] সামাজিক বয়কটের ব্যবস্থা যিনি করতে পারেন তাঁর তেজ আছে। তাঁর সেই কাজ—আর এই-যে পেশোয়ার-পুলিশের সাদা-মাঠা মিঃ রবিনসন শোভাযাত্রার সামনে নেতৃত্ব করে চলেছেন—এই ব্যাপারগুলি আমাকে ইম্পিরিয়াল সার্কাসের কিয়ালটি ও বায়নামের পিছনে লরেন্স ও বেন্টিঙ্কগণের উপস্থিতি দেখতে সাহায্য করছে।"

সিস্টার রোজ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ভারতীয় নারীদের চরম অপমান থেকে রক্ষা করার

---

২ পূর্বরোম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাইজানটিয়াম (কনস্তানতিনোপল)। সেখানকার স্থাপত্য-ভাস্কর্য—আলঙ্কারিক বাহুল্যে শ্বাসরোধী। আচার অনুষ্ঠানেও সেখানে ছিল সাম্রাজ্যবাদী আড়ম্বরের উগ্র প্রকট প্রদর্শনী।

জন্য কার্জনের প্রয়াস বর্তমান নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে তারকার মতো উজ্জ্বল, কিন্তু—ওরা [শাসকেরা] কিভাবে না ওঁকে ঘৃণা করে! আশঙ্কা হয়, এই মোচ্ছব শেষ হবার আগেই কার্জন বুঝতে পারবেন—সামরিক লোকগুলিকে খাটাবার ফল কি!"

স্যার জর্জ উত্তর দেবার আগেই সিস্টার রোজ শিবিরের দিকে প্রবাহিত জনস্রোতে মিশে গিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

স্যার জর্জ ভাবতে লাগলেন—তিনি কি ও'র সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন না! উচ্চবংশের এই নারী, সিস্টার রোজ, আর্ত পীড়িতদের সেবার জন্য নার্সের ব্রত গ্রহণ করেছেন। এ'র সঙ্গে মধ্যভারতের কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত একটি জেলায় 'শান্তির ভয়াল সংগ্রাম' চালাবার সময়ে স্যার জর্জ এ'র অপূর্ব সেবাকাজ দেখেছেন ; মুগ্ধ হয়েছেন এ'র অসামান্য আত্মত্যাগে ; ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এ'র তিক্ত তীব্র নিন্দার প্রতিরোধের চেষ্টা করেন নি ; সহিষ্ণু মনে ভেবেছেন—এ'র আইরিশ জন্মের কারণেই অমন ঘটেছে। এখন দরবারের সময়ে এ'র সহসা অপ্রত্যাশিত আগমনে স্যার জর্জ কৌতূহলী ও আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মহিলার চোখ-দুটি তাঁর চেতনায় ফিরে-ফিরে আসতে লাগল। স্বপ্নে ও'কে আইরিশ জোয়ান অব আর্ক-রূপে দেখতে লাগলেন, যিনি বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষের শক্তিসমূহকে সমবেত করছেন। তারপর সেই বীরাঙ্গনার আকার বিগলিত হয়ে ফুটে উঠল কেবল সমুজ্জ্বল দুটি আঁখি, অশ্রুতরল, রায়তদের দুঃখে যন্ত্রণায় যার থেকে অনর্গল ঝরছে বারিধারা।

উৎসব, ভোজসভা ও স্পোর্টসের পুনরাবর্তনের মধ্য দিয়ে দিনগুলি কেটে গেল। স্যার জর্জ প্রতিটি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু জনতার মধ্যে সহসা-জাগ্রত উন্মাদনার যে-মোহকর দৃশ্য-সৌন্দর্য তিনি দেখেছিলেন, তার পুনর্দর্শনের সুযোগ আর ঘটেনি—জনতার মধ্যেই তা হারিয়ে গিয়েছিল।

স্যার জর্জের সঙ্গে তাঁর আমেরিকান বন্ধুদের অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রে চলতে-ফিরতে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। নববর্ষের প্রভাতে, রাজকীয় ঘোষণাস্থল অ্যাম্পিথিয়েটারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে তাঁর কাছে আমেরিকান মহিলা এসে উপস্থিত—প্রচণ্ড ক্রোধে অস্থির।

"একথা আমাকে গলা ফাটিয়ে বলতেই হচ্ছে", তিনি বললেন, "আপনারা নিতান্তই ক্ষুদ্রচেতা। এখানে এসে বিশ্রী অবস্থায় পড়ে গেছি। আমাকে একথাও বলতে হচ্ছে, আমি ক্ষেপে অস্থির।"

"কেন, কি ব্যাপার?" স্যার জর্জ জিজ্ঞাসা করলেন।

"ব্যাপার! আপনি শোনেন নি?"—সুন্দরী আমেরিকান মহিলা বললেন।

"না না, নিশ্চয় জানবেন, একটি কথাও শুনিনি। কী হয়েছে?"

"যথেষ্টই হয়েছে! ঐ আপনাদের ওস্তাদ ডিউক-পত্নীদের চালাকি! ওরা ডেইজি লেইটারকে খাতির দেখাবে না। ওরা বলছে, সে লর্ড কার্জনের পত্নী ছাড়া কিছু নয় ; সে যদিও 'ভাইস-এমপ্রেস' তবু তার কোনো সরকারী মর্যাদা নেই। এই কথাই ওরা বলতে চাইছে। স্বামীই সব, পত্নী কিছু নয়, পত্নীর কোনো অধিকারই নেই, একটা স্যালুট পর্যন্ত পাবে না। এমন কথা কখনো শুনেছেন? আমাদের দেশ হলে বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে এটা যথেষ্ট কারণ।"

স্যার জর্জ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "কী দুর্ভাগ্য", তিনি আপন মনেই বললেন, "হায়, একেবারে এইসময়েই কিনা ভারতের ইংরাজমহলে ভাইসরয়-পত্নীর মর্যাদা অস্বীকারের কথাটা উঠল—সে পত্নী আবার যখন আমেরিকান।"

অল্প পরেই তিনি নিজেকে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের ঘোষণাবাণী শোনবার জন্য অপেক্ষমান সভাগৃহে সমানীত দেখলেন। সভা-সমারোহের দৃশ্যে উচ্ছ্বসিত হবার মানসিকতায় তিনি ছিলেন না। পুরাতন রীতির অনুগামী তিনি। জীবনের অনেকগুলি বছর নিজ কর্তৃত্বাধীন জেলাগুলিতে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন ; সেখানকার অগণিত শীর্ণচ্ছায়া মনুষ্যের ইহলৌকিক মঙ্গলবিধানের বিপুল ভার নিজের ক্ষীণ স্কন্ধে [প্রবাদোক্ত অ্যাটলাস দৈত্যের মতো] বহন করেছেন। তাঁর কাছে বৃটিশ শাসন সীমাহীন বিশাল নৈর্ব্যক্তিক ভাবরাশি ছাড়া কিছু নয়, যা রোমক-ধরনে শান্তিস্থাপন করেছে, রেল-পথ নির্মাণ করেছে, সুবিচার এনেছে, নিজ অভিভাবকত্বের অধীন শিশুর মতো জনসাধারণের কাছে রক্ষাকারী দেবদূতের ভূমিকা নিয়েছে। তিনি দেখেছেন—সে শাসন নদীতে সেতুনির্মাণ করেছে, পর্বতে সুড়ঙ্গ কেটেছে, দস্যুদমন করেছে, তা শান্তি এনেছে যুদ্ধক্ষত প্রদেশগুলিতে, বিদ্যালয় স্থাপন ও হাসপাতালে অর্থসাহায্য করেছে ; সর্বদা সর্বত্র তা মঙ্গলসাধক, হিতকারী, সভ্যতাবিধায়ক শক্তি। সেই দৃঢ়কঠিন, গম্ভীর, নির্বাক সরকারী নিয়মমাফিক কাজকর্মের সঙ্গে এই সাম্রাজ্যিক শোভাযাত্রার আড়ম্বর, উচ্চ চীৎকার, তূরী-ভেরীর বাদ্যধ্বনি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সর্বাঙ্গে রত্নমাণিক্যভূষিত এইসকল মহারাজার পশ্চাতে তিনি বুভুক্ষু রায়তদের শীর্ণ মুখ দেখতে পেলেন ; বহুদূরে তটের উপরে আছড়ে-পড়া সমুদ্রতরঙ্গের শব্দের মতো খাদ্যহীন কোটি-কোটি মানুষের রুদ্ধ ক্রন্দন ও চাপা গোঙানির অস্পষ্ট স্বর তাঁর কানে ভেসে এল।

ইতিমধ্যে একবারই কেবল সুতীব্র আবেগ তিনি অনুভব করেছেন—তা কিন্তু রয়্যাল ডিউক বা ইম্পিরিয়াল ভাইসরয়কে দেখে নয়। এবং তিনি এত বেশি প্রাচ্যদেশীয় রাজা-মহারাজা দেখেছেন যে, হীরক-রত্নের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন ছিল না—তিনি জানতেন ঐ প্রতিটি হীরকখণ্ড বিভিন্ন প্রদেশের লুণ্ঠনের রত্নগত রূপান্তর ছাড়া কিছু নয়। মাথার উপর নিষ্করুণ সূর্যের দহন ; অনুরূপ নিষ্করুণ ইম্পিরিয়াল পতাকাদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে ভাগ্‌নার-সুর বাদনরত ব্যাণ্ডদলের ঘর্ননির্ঘোষ। সহসা একটু বিরতি, কিছু নড়াচড়া চাঞ্চল্য, সকল মুখই উত্তরদিকের নির্গমন অংশের দিকে আকৃষ্ট। স্যার জর্জ অন্যান্যের সঙ্গে সেদিকে নিরুৎসুক চোখে তাকালেন, কিন্তু পরমুহূর্তে যেন বিদ্যুৎস্পর্শে শিহরিত। অ্যাম্পিথিয়েটার ছায়ালোকে অদৃশ্য। তিনি মিউটিনির দিনগুলিতে ফিরে গেলেন। মিউটিনির সময়ের তিনশোটি প্রাচীন মানুষকে দেখা গেল—জীর্ণ-শীর্ণ, অবসন্ন,—যে-সব মানুষ হ্যাভলকের অধীনে লড়াই করেছিল, এবং ক্লাইডের অধীনে প্রচণ্ড মরণপণ যুদ্ধের পরে জয়ী হয়েছিল। সিপাহীযুদ্ধ।—যখন সিপাহীরা সাহেবদের প্রায় ধূলিশায়ী করে দিয়েছিল। পিতলের ব্যাণ্ডে এখন ঘোররব—'ঐ হেরো বিজয়ী বীর।' স্যার জর্জ শুনেও শুনছিলেন না। তাঁর কানে আরও কিছু শব্দ বাজছিল—মিউটিনির এই যুদ্ধ-জীর্ণ মানুষগুলির লোল শিথিল গমন সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির স্মৃতি তাঁর মনে ফিরিয়ে আনল, যখন বালক অবস্থায় তিনি লখনৌ অবরোধের ভয়াবহ অবস্থাকে সহ্য করেছিলেন। তখনকার

হতাবশিষ্ট সৈন্যদলের এই জোড়াতাড়া সমাবেশ দেখে ক্ষণিক ভীতিব্যঞ্জক অপচ্ছায়া তাঁর মনে এসেছিল। কিন্তু তারপরে তাঁর মনে এক সুগভীর ট্রাজিক সুর ধ্বনিত হল—যার কাছে অনুষ্ঠানের অপরাপর অংশগুলি তাম্র-পিত্তলের তুচ্ছ টুংটাং শব্দের বেশি কিছু নয়।

উদাসীনভাবে তিনি সরকারী ঘোষণা শুনে গেলেন ; ভাইসরয়ের বাণীতে বা রাজকীয় বাণীতে প্রায় মনোযোগ দিলেন না। "শিশুদের জন্য এসব খুবই ভালো", তিনি বললেন, "বয়স্ক শিশুদের পক্ষেও ভালো ; কিন্তু কার্জন যখন নাইনথ্ লান্সারদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন নেটিভেরও বাঁচবার অধিকার আছে, তখন সাম্রাজ্যের সংরক্ষণে তিনি বৃহত্তর কাজ করেছিলেন—এই দরবারের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের বহুবাহুল্যেও তা করে উঠতে পারেন নি।"

চলে যাবার জন্য ফিরছেন তখনি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। দেখলেন—সিস্টার রোজ তাঁর নিকট থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। সিস্টার রোজের মধ্যে কিন্তু মনে হল কিছু সূক্ষ্ম ভাবপরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর মুখ ঘৃণায় কঠিন, চোখে অগ্নিঝলক।

সিস্টার রোজ তাঁকে দেখেন নি লক্ষ্য ক'রে স্যার জর্জ সাহসভরে তাঁর হস্তস্পর্শ করলেন। সিস্টার এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন যে মনে হল শরবিদ্ধ। তারপর স্যার জর্জকে চিনতে পেরে মাপ চাইলেন। সিস্টার রোজ প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন—তাঁকে ভিড়ের চাপ থেকে বার ক'রে এনে শিবিরের শান্ত এক অংশে উপস্থিত করতে পেরে স্যার জর্জ আনন্দিত হলেন।

সিস্টার রোজ শীঘ্রই আত্মস্থ হলেন। "আমাকে ক্ষমা করবেন", তিনি বললেন, "তবে কিছু জিনিস আমাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যখন আমি ঐসব লম্বা-চওড়া কথা শুনছিলাম, তখন একটি দৃশ্য এগিয়ে এসে সবকিছু ঢেকে দিয়েছিল। আমি যখন শিয়ালকোটে ছিলাম তখন নাইনথ্ লান্সাররা তাদের কোয়ার্টারে ফিরছিল। আমি তাদের সম্বন্ধে পূর্বাবধি প্রীতিসম্পন্ন ; কেননা শুনেছিলাম যে, মিউটিনির পরে তারা ভোট দিয়ে স্থির করেছিল, তাদের রেজিমেন্টকে প্রদত্ত ভিক্টোরিয়া ক্রশ ধারণের সর্বাধিক যোগ্য মানুষ হল—তাদের জলবাহী নেটিভ ভিস্তিটি। কিন্তু বর্তমানের এই লান্সাররা ভিন্ন চরিত্রের। সারাদিন মদ খেয়ে তারা মত্ত। রাত্রে নেটিভ রাঁধুনিটি যেহেতু তাদের জন্য মেয়ে জোগাতে পারেনি—ভারতীয় মেয়ে অবশ্যই—তারা ব্যারাকের ঠিক বাইরে লোকটিকে লাথি মারার খেলা শুরু করে দিল। 'মেয়ে আনো—আমাদের জন্য মেয়েছেলে এনে দাও!'—তারা চেঁচাতে লাগল। আর লোকটি যেহেতু মেয়ে জোটাতে চায়নি বা পারেনি—তারা লাথি মেরেই চলল, এমনভাবে যে, পরদিন দেখা গেল, লোকটি রক্তে মাখামাখি, মুমূর্ষু ; সমস্ত পাঁজর ভেঙে চুরমার, চোখ থেঁতলানো। হতভাগ্যটি আপাদমস্তক প্রহৃত, বিধ্বস্ত। এক সপ্তাহ তার শুশ্রূষা করলাম—কিন্তু অষ্টম দিবসে তার মৃত্যু হল—সে খুন হল, কারণ সে নাইনথ্ লান্সারদের জন্য মেয়ে জোগাতে ব্যর্থ হয়েছিল।"

"ঠিক, সবই ঠিক", স্যার জর্জ কিছুটা অধৈর্য হয়ে বললেন, "ওটা পুরনো কাহিনী ; কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিত তারা কোন্ শাস্তি পেয়েছিল।"

"শাস্তি পেয়েছিল।"—সিস্টার রোজ ঝলসে উঠলেন—"কোনো শাস্তিই নয়। আপনি কি ভুলে গেছেন—খুব বেশিদিন আগেকার কথা নয়, আপনাদের সৈন্যদলের জন্য মেয়ে সরবরাহ করা কর্তৃপক্ষের অন্যতম নিয়মিত কাজ ছিল? এখন সে কাজটি বেসরকারী হস্তে অর্পিত হয়েছে বলে সেইসব সরবরাহকারীর উদ্যমকে সতেজ রাখতে খুন করার শাসানি দিতে হয়—আর মাঝে-মধ্যে শাসানিকে বাস্তব রূপও দিতে হয়।—না না, বাধা দেবেন না"—স্যার জর্জকে প্রতিবাদ করতে উদ্যত দেখে সিস্টার রোজ বললেন—"আমি যা জানি আপনিও ঠিক তাই জানেন। খুনেদের ধরার জন্য যথার্থ কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। 'রেজিমেন্টের মর্যাদা!' 'নারীদেহ তো চাইই!' আপনি জানেন ওদের ধরন-ধারণ কি!—'একটা জাহান্নমের নিগারের জীবনের আবার দাম কি!' সুতরাং ওরা কয়েক মাস বাদেই আর একজনকে খুন করল—করবে না কেন? আর এই হল আপনাদের মহামহিম বৃটিশরাজ। হে ভগবান!"

"আঃ থামুন!" স্যার জর্জ বললেন, "লর্ড কার্জন কী অসাধারণ কাজ এক্ষেত্রে করেছিলেন তা আপনি ভুলে গেছেন। যদি খোদ ইংলণ্ড থেকে তাঁর ইচ্ছাকে বরবাদ করে দেওয়া না হত তাহলে নাইনথ্ লান্সারদের একজনও দরবারে যোগদান করতে পারত না। আমি এ-ব্যাপারে [কার্জনের কাজে] ক্ষেপে অস্থির, আপনি তাও জানেন।—'লান্সারদের অচ্ছুত করে দেওয়া হল, আর তা কিনা একটা কোন্ চুলোর নিগারের জন্য! লোকটা আমাদের মেয়েছেলে জোগাতে পারে নি, এতবড় ঔদ্ধত্য তার, তাই তো খুন করা হয়েছে!'—[আর্মি-র এই মনোভাব সত্ত্বেও] কার্জন একটু টলেন নি।"

স্যার জর্জ যখন বলছিলেন তখন ক্রমে সিস্টার রোজের মুখের তীব্র-কঠিন ভাব দূরীভূত হয়ে সেখানে অনন্ত করুণার রেখা ফুটে উঠল। অসজ্ঞানে যেন তিনি তাঁর হাত বাড়ালেন।

"তাহলে আপনি ব্যাপারটা শোনেন নি? ডিউক কি করেছেন জানেন না?"

স্যার জর্জ বিমূঢ় হয়ে গেলেন।—"ডিউক? আপনি হুইটেকার রাইট-এর সম্বন্ধে গুজবের কথা বলছেন? না, শুনিনি। তিনি কী করেছেন? কিছু করেছেন নাকি?"

সিস্টার তড়াক করে উঠলেন। দীর্ণ কণ্ঠে বললেন—"দেখুন। দেখুন!" আঙুল তুলে দেখালেন—ধীরে-ধীরে রাজকীয় শোভাযাত্রা শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

স্যার জর্জ প্রথমে বুঝতে পারলেন না—দেখার কি বিশেষ বস্তু আছে। কিন্তু সিস্টার রোজের কষ্টলাঞ্ছিত মুখের দিকে তাকাবার পরে শুনতে পেলেন—রুদ্ধ শ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলছেন :

"লান্সাররা! নাইনথ্ লান্সাররা!"

স্যার জর্জ আবার তাকালেন। দেখলেন—সম্রাটের ভ্রাতা, যিনি সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করছেন—মহাগৌরবের স্থানে তুলে এনেছেন অন্য কারোদের নয়—নাইনথ্ লান্সারদের—তারা আসছে রাজ-প্রহরীরূপে অশ্বপৃষ্ঠে, গর্বোন্নত ভঙ্গিতে।

হতভম্ব স্যার জর্জ গর্ডন, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, রক্তহীন ওষ্ঠে, বেদনার্ত কণ্ঠে :

"আপনি ঠিকই বলেছেন। কলঙ্ক আচ্ছন্ন করেছে তারকার আলোক।"

॥ ৪ ॥ নিবেদিতার সহযোগিতায় একটি ভারতীয় রিভিউ প্রকাশে স্টেডের পরিকল্পনা

ভারতবর্ষ থেকে রিভিউ অব রিভিউজ-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা মিঃ স্টেডের ছিল, সেকথা র‍্যাটক্লিফের প্রবন্ধ থেকে ইতিমধ্যেই জেনেছি। নিবেদিতার রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং সাংবাদিকতায় দক্ষতা সম্বন্ধে স্টেডের ধারণা অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলে নিবেদিতাকে ভারতবর্ষীয় পত্রিকার ব্যাপারে তিনি অনুরোধ করেছিলেন। এক্ষেত্রে স্টেডের প্রস্তাব ঠিক কি-প্রকার ছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে স্টেডের প্রস্তাবের উল্লেখ পাই। উভয়ের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহান্বিত আলোচনার রূপ সেগুলি দেখিয়ে দেয়।

২৩ এপ্রিল ১৯০৩, নিবেদিতা মিসেস লেগেটকে কলকাতা থেকে লেখেন : "একটা ভাব সৃষ্টিই আমাদের কাজ—সে ভাব মানে স্বামীজী—আর ভাবের জন্ম দিতে হয় ছাপাখানা-ঘরের ধূলিজালের মধ্যে।"

এই চিঠিতেই তিনি লিখলেন :

"মিঃ স্টিডের সঙ্গে এখন কোনো একটা বিষয়ে কথাবার্তা চলেছে। আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব যদি আপনি বা মিঃ লেগেট কিংবা অ্যালবার্টা সে-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। ব্যাপারটি সম্বন্ধে—তার অনুকূলে ও প্রতিকূলে গুরুত্বপূর্ণ কোন্‌-কোন্‌ বক্তব্য তাঁর মনে জেগেছে—সেটি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তিনি কিভাবে বলবেন তা আমি জানতে ইচ্ছুক।

"যদি আপনি উচিত বিবেচনা করেন, এবং অ্যালবার্টা কাজটাকে ঝঞ্ঝাটের মনে না করে, তাহলে মিঃ স্টেড তার সঙ্গে নিজ অফিসে সাক্ষাতে সানন্দে আলোচনা করতে রাজি। তাঁর অফিস—মোব্রে হাউস, নরফোক স্ট্রীট স্ট্র্যান্ড।

"পরিকল্পনাটা যদি কার্যকর করতে পারি তাহলে স্বামীজী কি যে খুশি হবেন।

"প্রশ্নটা এখন খোলাখুলি টাকার। অথচ প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ এত অল্প যে, তাঁকে সেটা জানাতেই পারছি না, পাছে তিনি তা হাস্যকর মনে করেন। মূলধন পুরো দু'হাজার পাউণ্ডও নয়। আমাদের মাসিক খরচ ৭০ পাউণ্ডেরও কম হবে, ঋণশোধও অবশ্য সেই অনুপাতে॥"

বুঝতে অসুবিধা হয় না, মিসেস লেগেটকে এব্যাপারে লেখার কারণ—নিবেদিতা মনে করেছিলেন মূলধনের টাকা লেগেটদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে—অবশ্য ধার হিসবে। একই তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে এই প্রসঙ্গে লিখলেন [মিস ম্যাকলাউড লেগেট-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত]—পত্রিকাটির জন্য হয়ত তাঁকে ইংলণ্ডে যেতে হতে প্যারে। "প্রার্থনা করো, পত্রিকাটি যেন সম্ভবপর হয়। স্বামীজীর তাহলে আনন্দের সীমা থাকবে না।"

অনুমান করা যায়, নিবেদিতার দ্বারা স্বামীজী ভারতবর্ষে কোনো পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন [প্রবুদ্ধ ভারত ও ব্রহ্মবাদিনের অতিরিক্ত]—এবং সে সম্বন্ধে আলোচনাদিও হয়েছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও সেইসকল কথা নিবেদিতাকে সর্বদাই নাড়া দিয়েছে।

পত্রিকার পরিকল্পনা কিন্তু কার্যকর হয়নি। নিবেদিতা ক্রমে ভারতবর্ষে নানা কাজে

এতই জড়িয়ে পড়েন যে, পত্রিকা চালানোর মতো সর্বগ্রাসী কাজ নেওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছিলেন। মাস দুয়েকের মধ্যে, ১৯ জুন, ১৯০৩, তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

"যদি তুমি মিঃ স্টেডের সঙ্গে দেখা করে না থাকো তাতে কিছু এসে যায়নি কারণ বর্তমানের জন্য সে-বিষয়ে আলোচনা স্থগিত। তবে একইসঙ্গে আমার মস্তিষ্কের রাজনৈতিক বুদ্ধির বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট সম্ভ্রম প্রকাশিত হয়েছে—সেটি আমার পক্ষে অল্প আত্মপ্রসাদের কারণ নয়।"

আরও কয়েক মাস পরে, ২৩ সেপ্টেম্বর, নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন :

"মনে হয় তুমি জানো যে, এই শীতঋতুতে আমি পাশ্চাত্যে যাচ্ছি না। মিঃ স্টেডকে লিখে তা বাতিল করে দিয়েছি। যে-প্রস্তাব পেয়েছিলাম তা অবশ্য আমার উন্মত্ত কল্পনারও অতীত, কিন্তু এখানে এত বেশি পথ খুলে যাচ্ছে যে,...আমি অনুভব করছি, স্বামীজী চান আমি এখানেই থাকি। সেই তো তাঁর অটল মঙ্গল ইচ্ছা। আর দান্তে-র আত্মারা স্বর্গে যেকথা বলেছে সে তো আমারই কথা : 'তাঁর ইচ্ছাই শান্তি আমার।' আমি অবিরাম তাঁর জীবনের ধ্যানই ক'রে যাব ; ইতিমধ্যেই অনেক ভাব মনে ঘনিয়ে এসেছে।

"সাংবাদিকতা শিক্ষার সুবিধা প্রধানতঃ পরোক্ষ। সে সুবিধার আকার ঠিক কী হবে তা জানতে পারলে ভালো হয়। লন্ডন-সাংবাদিক হিসাবে আমি অবশ্যই অধিক দুর্ভেদ্য হয়ে উঠব, কিন্তু ঐ দুই প্রান্তের মধ্যম ব্যাপারটি আমার জীবনের এই পর্বের ৬ মাসের বেশি সময় লাভ করার যোগ্য কিনা জানি না। তাদের তুলনায় ইউরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে চাই, সেইসঙ্গে হবসন রবার্টসনের মতো মানুষ, ও পজিটিভিস্টদের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা পেতে।"

স্টেডের সহায়তায় একটি ইণ্ডিয়ান রিভিউ বার করার পরিকল্পনা বাতিল হলেও তা নিবেদিতার মনে ঘোরাফেরা করেছেই। ১ ডিসেম্বর ১৯০৯, চিঠিতে দেখি, র‍্যাটক্লিফের এক সহকারীকে তিনি স্টেডের রিভিউ অব রিভিউজের ভারতীয় অংশের কাজে লাগাতে ইচ্ছা করেছেন।

॥ ৫ ॥ রিভিউ অব রিভিউজ-এ নিবেদিতা-সংবাদ

স্টেড তাঁর পত্রিকায় নিবেদিতার অন্যত্র-প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী রচনাংশ অনেকবার প্রশংসার সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন। রিভিউ অব রিভিউজ-এ ১ মে, ১৯০১, "দি ওলি বুল কমেমরেশন : এ স্যালুট টু নরওয়ে, মে, ১৭, ১৯০১" নামে যে উৎকৃষ্ট লেখাটি বেরোয়, যার মধ্যে নরওয়ের জাতীয় আন্দোলনে ওলি বুলের অসামান্য ভূমিকার অনবদ্য প্রশস্তি ছিল—তার প্রকাশের পিছনে [রচনার পিছনে?] নিবেদিতার হাত ছিল অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ১৯০৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, আমেরিকার "সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন"-এ প্রকাশিত নিবেদিতার ওলি বুল সংক্রান্ত রচনার সারসংক্ষেপ করা হয়। ["ওলি বুল অ্যান্ড নরওয়েজিয়ান ইনডিপেনডেন্স"]। তার সূচক মন্তব্য এই : "নরওয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী মিস মার্গারেট ই নোবল কর্তৃক সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন'-এ লিখিত প্রবন্ধটিকে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় করেছে, যার মধ্যে তিনি ওলি বুলকে দেশপ্রেমের শক্তি হিসাবে

উপস্থিত করেছেন।" ১৯০৬ এপ্রিল সংখ্যায় নিবেদিতা-প্রবর্তিত বিবেক-নন্দ-মেডালের পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা—পঞ্জাবের শিবনারায়ণ-লিখিত "দি কাউজ অব দি ন্যাশন্যালিস্টস্ অব ইণ্ডিয়া" বেরিয়েছিল। [এটি পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি]। ঐ বৎসর যে সংখ্যায় বেরোয় ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবেদিতার স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক রচনার চমৎকার সারসংক্ষেপ। ["দি ন্যাশন্যাল রিভাইভ্যাল ইন বেঙ্গল"] তার মধ্যে কিছু-কিছু মন্তব্যও ছিল। যথা :

"Sister Nivedita contributes to the *Indian Review* for March a glowing defence of the Swadeshi movement in Bengal. The Swadeshi movement is the name for the popular protest against the partition of Bengal, which led the patriots to band themselves together to refuse to purchase any goods not made in Bengal. The movement has already achieved great results, and Sister Nivedita, who is an Irish Nationalist,৩ Miss Noble by name, sees in it the beginning of the resurrection of India...

"Miss Noble, by a very effective analogy, disposes of the usual assumption that the Bengali will never subject himself voluntarily to the discomfort of paying more for worse wares when he can get better goods at a lower price...

"Now that the purchase of English goods is declared to be even as the sin of killing the sacred cow, let Manchester and Mr Morley look out for storms."

আরও পরে, রিভিউ অব রিভিউজ-এর ডিসেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে মডার্ন রিভিউ-এ নভেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় মুদ্রিত নিবেদিতার ছদ্মনামা লেখাটির সারসংক্ষেপ। ["এ ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ ফর ইণ্ডিয়া"]। সূচনায় মন্তব্য করা হয় :

"The *Modern Review* for November reflects the enthusiasm and ambition of the New India. It is alive and athrill with the passion of the new patriotism."

১৯১০ ডিসেম্বর সংখ্যায় বেরোয় নিবেদিতার আর একটি লেখার সারাংশ। ১৯১১ ডিসেম্বরে নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদ ["অ্যান ইংলিশ হিন্দু সেন্ট"], এবং মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত নিবেদিতা সম্বন্ধে অবলা বসুর লেখার সারাংশ।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিবেদিতার সঙ্গে স্টেডের পারস্পরিক লেনদেনের অটুট সম্পর্ক ছিল, নিবেদিতার ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১১-এর চিঠি থেকে তা দেখতে পাই। ঐ চিঠিতে নিবেদিতা লোকান্তরিত মিসেস ওলি বুলের সম্বন্ধে মিঃ স্টেড ও তাঁর পত্রিকাকে কিভাবে ব্যবহার করতে চান সেকথা র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন :

---

৩ নিবেদিতা সম্বন্ধে স্টেডের "আইরিশ ন্যাশন্যালিস্ট" শব্দগুলির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

"বস্নের [মিস ম্যাকলাউডের] ইচ্ছা, আমি যেন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রিভিউ অব রিভিউজ-এ সেণ্ট সারার [মিসেস বুলের] 'চরিত-চিত্র' প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। তুমি কি বলো ? আমার কাছে ওটা যথেষ্ট নয় বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু যখন আমি এই 'চরিত চিত্র', ও [মিসেস বুলের সম্বন্ধে একটি] বই—উভয়ের সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছ থেকে পাব, তখন কাজের ঠিক সময় আসবে। আমার মনে হয়, মিঃ স্টেড আনন্দের সঙ্গে ওটা করতে রাজি হবেন, যা বর্তমান অবস্থায় বিশেষ রকমের সহায়তার কাজ।...

"যদি বই বার করা যায় তাহলে রিভিউ অব রিভিউজকে ধরে সেটিকে 'বুক অব দি মানথ্' করে দেওয়া যায়। অন্যথায়, আর সেটি বোধহয় খুবই ভালো হবে—রিভিউ অব রিভিউজ নিশ্চয় ['চরিত চিত্র' প্রকাশের পরে] 'আটলান্টিক মানথ্লি' কিংবা 'সেঞ্চুরী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা করবে না। একত্রে দুটি প্রবন্ধ প্রয়োজন সমাধা করবে।"

॥ ৬ ॥ স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে উইলিয়ম স্টেড : নিবেদিতা-সূত্রে গোখলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হলে স্টেড তার সম্বন্ধে তাঁর পত্রিকায় যথেষ্ট আনুকূল্য দেখিয়েছেন, যার পিছনে, স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যায়, নিবেদিতার অত্যন্ত তাগিদ ছিল। চিঠিপত্রে এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির মারফত নিবেদিতা স্টেডকে পার্টিশন ও স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়ে অবহিত করতে চেয়েছেন। এ-বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ অন্ততঃ আমাদের হস্তগত হয়েছে। ১৯০৫ সালে গোখলে যখন ইংলণ্ডে যান তখন স্টেডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে কার্জন সম্বন্ধে সব কথা জানাতে নিবেদিতা বলেছিলেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, গোখলেকে তিনি লেখেন :

"আমি বিশেষভাবে চাই তুমি মিঃ স্টেডের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে—এবং লর্ড কার্জন সম্বন্ধে তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বস্তু দিয়ে তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবে। মিঃ স্টেডের কাছে তোমার কোনো মনোভাবই গোপন করার প্রয়োজন নেই। তবে কোনটি ব্যক্তিগতভাবে কথিত সংবাদ [অর্থাৎ প্রকাশযোগ্য নয়, বা কারো নামে প্রকাশযোগ্য নয়]—তা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়াই ভালো।"

এইসূত্রে নিবেদিতা ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, গোখলে সম্বন্ধে স্টেডকে যে-পরিচয়জ্ঞাপক পত্রটি দিয়েছিলেন, তাতে গোখলের ঐকালীন চমৎকার রাজনৈতিক চরিত্রায়ন আছে।—

প্রিয় মিঃ স্টেড,

মনে হয়, আপনি আমার বন্ধু মিঃ গোখলের বিষয়ে শুনেছেন। তাঁর সম্বন্ধে এই পরিচয়জ্ঞাপক পত্র দিচ্ছি।

মিঃ গোখলে কংগ্রেসের ভাবী নেতা। তিনি ভাইসরয় কাউন্সিলের অগ্রণী ভারতীয় সদস্য ; তিনটি শীতকালীন অধিবেশন জুড়ে তিনি লর্ড কার্জনের সঙ্গে শিক্ষা-প্রশ্নে মুখোমুখি লড়াই করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষায় মিঃ গোখলের ব্যক্তি-

গত কৃতিত্ব এমনই যে, শিক্ষাব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে আছেন ; তা ছাড়াও, তিনি এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ভারতের মতামত প্রতিধ্বনিত করেছেন।

গতকাল পত্রটি আরম্ভ করেছিলাম, তা আজ আবার শুরু করছি—তাই গতকাল সিমলায় প্রদত্ত লর্ড কার্জনের পুরো বক্তৃতাটি এর সঙ্গে দিয়ে দিতে পারলাম। ঐ বক্তৃতায় ছড়ানো মিথ্যার জালকে উদ্ঘাটিত করবার পক্ষে মিঃ গোখলের তুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন আর কেউ নেই। আর বেশি বলার দরকার নেই। আমি অবশ্যই আশা করি, আপনারা পরস্পরকে পছন্দ করবেন, কেননা আমার একান্ত ইচ্ছা—আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তিটির সঙ্গে আপনি বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপন করবেন।

চিরতরে আপনার, হে প্রিয় মিঃ স্টেড, ইতি—

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

আমরা লক্ষ্য করি, ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে নিবেদিতা স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপারে মিঃ স্টেডের কার্যাবলীতে সন্তুষ্ট। ২৪ মে, ১৯০৬, মিসেস বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন, "পার্টিশানের ব্যাপারে মিঃ স্টেড চমৎকার কাজ করেছেন, নয় কি?" ১৯০৬ সাল থেকে স্টেডের পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলন সংক্রান্ত অনেক সংবাদ ভারতীয় পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন করে প্রকাশ করেছে। সেগুলি এমনভাবে বেরিয়েছে, যাতে ভারতের দাবির প্রতি সম্পাদকের পূর্ণ সহানুভূতি বোঝা যায়। ১৯০৭-এর মাঝামাঝি থেকে দু'বছর নিবেদিতা পাশ্চাত্ত্যে ছিলেন—ঐ সময়ে ভারতীয় আন্দোলনের সংবাদ যাতে বিদেশে উপযুক্তভাবে প্রকাশিত হয় সেজন্য সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে স্টেডের সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন—তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। তারপরে যখন জাতীয় আন্দোলনের একাংশ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার দিকে ঝুঁকল তখন শান্তিবাদী স্টেড কিছুটা গুটিয়ে গিয়েছিলেন, এবং আন্দোলন দমনে ইংরাজ সরকারের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট নির্ঘোষ তুলতে পারেন নি। ৪ নিবেদিতা সে সম্বন্ধে অভিযোগ বোধ করেছিলেন।

---

৪ নমুনা হিসাবে আমি রিভিউ অব রিভিউজ-এ ১৯০৬ সাল থেকে প্রকাশিত কিছু সংবাদের শিরোনামা উপস্থিত করছি। এই পর্বে নিবেদিতার জাতীয়তামূলক রচনাকে স্টেড কিভাবে সংকলন করেছিলেন, আগেই সেকথা বলেছি।

1906, April : *India A Nation : How We Are Digging Our Own Grave* [Extracts from *Indian World* with *Comments*].

1907, May : "*India For The Indians : The Meaning Of The Movement.* [From *Hindustan Review*]. July : *The Crisis In India. A Symposium Of Representative Indian Opinion.* [From *Hindustan Review, Modern Review, Indian World, Indian Review, East And West*]—*Lala Lajpat Rai : A Character Sketch..* [From *Indian Review, Punjabee*].—*An Indian Policy For India : Mr Parameshwar Lal* [*Interview note*].

1908, July : *The Trouble In India, What Ought To Be Done* [Ed. notes].—*The Arrival Of The Bomb In India.* [From *Indian World, Hindustan Review, Nineteenth Century,, Modern Review*].—*Shall We Lose*

॥ ৭ ॥ বিপিন পালের প্রবন্ধ প্রকাশ করে রিভিউ অব রিভিউজ বাজেয়াপ্ত : সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে স্টেডের দাবি

স্টেডকে কিন্তু নির্মোক ছেড়ে দু'একবার বেরিয়ে আসতে হয়েছিলই। অরবিন্দকে যখন তাঁর "ওপন্ লেটার টু মাই কান্ট্রিমেন" রচনার জন্য গ্রেপ্তারের উদ্‌যোগ করা হচ্ছিল, তখন সেই লেখাটিকে নিবেদিতা স্টেডের কাছে পাঠিয়ে দেন যাতে "প্রেত-দর্শী ব্যক্তিটি" [মিঃ স্টেডের থিয়জফিক ধারণা-সম্বন্ধে ব্যঙ্গ] উক্ত সম্ভাব্য অপপ্রয়াসের প্রতিরোধ করতে পারেন। [৫.৮.১৯০৯]।

স্টেড এই ব্যাপারটিতে কী করেছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সত্যই প্রচন্ড নির্ঘোষে ফেটে পড়েন—ভারতে সরকারী কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে। সেই চমকপ্রদ ইতিহাস আমরা নিবেদিতার পত্র-সূত্রে আবিষ্কার করতে পেরেছি।

নিবেদিতা ২৫ নভেম্বর ১৯০৯, র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে লেখেন : "উইলিয়ম স্টেড [রিভিউ অব রিভিউজ-এর] অক্টোবর সংখ্যায় ভারত সম্বন্ধে অপূর্ব কাজ করেছেন—পুলিশ দোকানে

India? [From *La Revue*].—Aug. *The Situation In India* [Ed. note].—*The Unrest In India : The People Of India Anti-British.* [From *Quarterly Review, International, Indian Review, Hindustan Review*].—Sep. *The Birth Pangs Of The Indian Nation : Symptoms Of Coming Labour* [From *Vedic Magazine, Modern Review, Hindustan Review, East And West, Indian Review, Indian World*].—*Governments And Newspapers : The Indian Press Commissionership* [From *Calcutta Review*].—*The Situation In India* [Extracts from *Blackwood's Magazine, Positivist Review*]. Oct. *Religious Awakening In India* [Extracts from *International*].—Dec. "*India Seething In Sedition*" [From *Nineteenth Century*].

1909,, Jany. *The Men Behind The Unrest* [By Saint Nihal Singh, On Tilak, Aurobindo,, Bipin Chandra, Krishnavarma, Lajpat Rai, Ramananda Chatterjee].—*The Deported Indian Leaders* [On Aswini Kumar Dutt, Krishna Kumar Mitra and others].—Dec. *A Hero Of The Indian People* [On Aurobindo, From *Modern Review*].—*The Re-Making Of India* [From *International*].

1910, Jan. *Unrest India, The Indian National Congress.*—March. *The Release Of The Deportees, The Indian Problem* [Ed. notes]. May.—*The Torture In the Indian Police Stations* [Ed, note]. Aug.—*Mr Montagu And Mr Mackarness* [Ed. note].—*British Rule In India By Lord Curzon Of Kedleston* [From *North American Review*].—Sep. *The Causes Of Indian Unrest* [Ed. note].—*The Awakening Of Asia.* [From *Indian Review*].—*What Does India Want* [From *Fortnightly Review*].—Oct. *The Treatment Of Untried Prisoners In India* [Ed. note].—*India Becoming Manly* [From *Indian Review*].

1911, Feb. *The Real Cause Of Indian Unrest* [Ed. note].—March. *Indian Liberty Or Brahman Tyranny* [From *Scribners*].

হানা দিয়ে সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। প্রেত-পাগলামিতে যদি উনি পুরো বাঁধা পড়ে না থাকেন তাহলে যেন নিশ্চয় করে সক্রিয় হন।"

কয়েকদিন পরে, ১ ডিসেম্বর, নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকেই প্রদত্ত সংবাদ কিছু সংশোধন করে লিখলেন, ব্যঙ্গের ঝাঁঝ মিশিয়ে : "রিভিউ অব রিভিউজ-এর ভাগ্য সম্বন্ধে যে-সংবাদ দিয়েছি তাতে ভুল আছে। কাগজটি না দেখে, কানাঘুষায় সে সম্বন্ধে শুনে তোমাদের লিখেছিলাম। শুনছি যে, গেজেটে সরকার অনুমোদিত এই বিবৃতি বেরিয়েছে : পুলিশ বোম্বাইয়ের পুস্তক-বিক্রেতাদের কাছে মধ্য-সাক্ষাতে গিয়েছিল এবং উক্ত সংখ্যাগুলিকে জাহাজযোগে ইংলণ্ডে ফেরত পাঠাতে তাদের প্ররোচিত করেছিল।"

কিন্তু নিবেদিতা প্রথম পত্রে সত্যই 'ভুল' কিছু লেখেন নি।

চিত্তাকর্ষক ঘটনা এই প্রকার :

রিভিউ অব রিভিউজ-এ অক্টোবর, ১৯০৯, একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুল :

FREEDOM OF THE PRESS IN INDIA
A TYPICAL INSTANCE OF REPRESSION

এই লেখাটির সূত্র—তৎকালে ইংলণ্ড-প্রবাসী বিপিনচন্দ্র পালের একটি প্রবন্ধ—যেটি ইংলণ্ড থেকে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত "স্বরাজ" পত্রিকায় বেরিয়েছিল—প্রবন্ধের নাম *The Aetiology of the Bomb* [বোমার নিদান]। লেখাটিতে বিপিনচন্দ্র পাল বোমাকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করেছিলেন। বোমাকে "ব্যাধি" বলে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে সমূহ ধিক্কার দিয়ে বলেন, "বোমা সবচেয়ে জঘন্য পৈশাচিক হত্যাপদ্ধতি।" "বোমা নামক মারাত্মক ভ্রান্তির" সমর্থনে "উৎকট বিজাতীয় রাজনৈতিক প্রচার চলেছে", তার ফলে "অধীর ও অনভিজ্ঞ তরুণেরা...উন্মত্ত আবেগের শিকার হয়েছে।"

এইপ্রকার ও অধিকতর গঞ্জনা ও নিন্দায় পূর্ণ বিপিন পালের লেখাটিকে কোনোভাবেই বোমার সমর্থন বলা যায় না। কিন্তু তিনি পুরনো অভ্যাসবশেই বোধহয় বলে ফেলেছিলেন —বোমার উদ্ভবের মূলে আছে 'পার্টিশান', ও তজ্জাত আন্দোলন দমনে সরকারের ভ্রান্ত-নীতি। আন্দোলন চলাকালে দাঙ্গা বেধেছিল, সরকার সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষায় চরম ঔদাসীন্য বা অসামর্থ্য দেখিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, বিপিন পাল বলতে চেয়েছিলেন, ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় জনসাধারণকে একটি মারাত্মক উস্কানি দেওয়া হয় : "তোমরা নিজেদের কালী মায়ের বোমায় সজ্জিত করো।" যদিও "ঐ যুদ্ধঘোষণা সরকারের বিরুদ্ধে নয়, ব্যক্তির অধিকারকে যারা আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধেই", তবু "তা একই সঙ্গে দারুণ বিপজ্জনক সাজেশন।" ফলে কিছু লোকের মনে বোমা তৈরীর ইচ্ছা জাগল, সেকাজে অদ্ভুত সাফল্যও তারা পেল। "অতীব চতুর বুদ্ধির সঙ্গে...বাঙালী বোমা-নির্মাতা নারকীয় যন্ত্র নির্মাণ করে ফেলল।" তাদের এই "বালকোচিত মারাত্মক কলাকৌশল" আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। তারপরেই সরকার একটি মারাত্মক ভুল ক'রে বসল ; তারা "এই খেলনার বিপ্লবকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল", বিরাট রাষ্ট্রীয় বিচার আরম্ভ হয়ে গেল, "যা সমস্ত দেশে আলোড়ন এনে দিল, চাঞ্চল্যের পর চাঞ্চল্য, তা জনগণের সুপ্ত দেশপ্রেমে নাড়া দিয়ে

গতিশীল করে তুলল, প্রবল ভাবাবেগ নারী ও সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সর্বস্তরে গভীরে প্রবেশ ক'রে গেল।"

রচনাটিতে ছিল বোমায় এইপ্রকার মন্ত নিন্দার প্রবাহ ; সূক্ষ্ম বা স্থূল কোনোভাবেই এতে বোমা-তত্ত্বকে গৌরবান্বিত করা হয়নি ; কিন্তু যেহেতু রচনাটির বিষয় বোমা, এবং তার মধ্যে সরকারের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা আছে, তাই বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের বর্তুল চক্ষে এটি এমনই অপরাধজনক কান্ড মনে হল যে, বিপিন পালকে হাতে না পেয়ে তিনি "পত্রিকাটির বোম্বাই এজেন্টকে এক মাসের জন্য গারদে ঢোকালেন।"

এই কাণ্ডে স্টেড স্তম্ভিত। তিনি পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়তে সুকঠোর ভাষায়, ক্ষুরধার বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করলেন এই কীর্তিকে। বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটকে উপলক্ষ ক'রে আসল আক্রমণ করা হল লর্ড মর্লে-কে। "হতভাগ্য লর্ড মর্লে। 'পল মল গেজেট'-এর ভূতপূর্ব সম্পাদকের এই চেহারা দেখে হৃদয়ে করুণা ও সহানুভূতি পাক খেয়ে উঠছে।। ইনি কি সেই মর্লে, যিনি সর্বদাই আয়ারল্যান্ডে অপরাধের নিদানের উপরে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখতেন।।।" উক্ত মর্লে-র কর্তৃত্বাধীন সরকার এমন একটি রচনার কণ্ঠরোধ করলেন, "যার প্রয়োজনীয়তা, ভারতে আইন ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণে উৎকণ্ঠিত সকল ব্যক্তির কাছে কতখানি তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।" স্টেড আরও বললেন : বিপিন পাল তাঁর প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদের পাপ-পদ্ধতির প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি প্রবন্ধটি লিখেছেন। তা যদি না করতেন, তাহলে ভারতে বোমার উদ্ভবের বিষয়ে এমন একটি সতর্ক বিবেচনাসম্মত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে দেবার জন্য বিপিন পালকে লর্ড মর্লে ও তাঁর সরকার হাজারখানেক টাকা স্বচ্ছন্দে দিতে পারতেন, সেটা সম্যায়ই হত।

স্টেড তাঁর রচনায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বিপিন পালের রচনাটিকে প্রধানাংশে পুনর্মুদ্রিত ক'রে তিনি বলেন, বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ এইচ এস অ্যাসটন ইচ্ছা করলে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪-এ ধারা রিভিউ অব রিভিউজ-এর উপর প্রয়োগ করতে পারেন। "সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে এই অকল্পনীয় অত্যাচারের বিষয়ে" স্টেড শেষপর্যন্ত এই কথাটাই বলেছিলেন, অন্যায়ের আচ্ছাদনের নীচে মানুষ যেন নীরবে বসে না থাকে। "এই যদি ভারত-শাসনের পদ্ধতি হয় তাহলে অ্যাসটনগণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের যা করেছেন সেইভাবে ইংরাজদেরও প্রতিকূল ক'রে তুলতে সমর্থ হবেন।"

ভারতে জনমত ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক মহলের অসন্তুষ্ট মনোভাবের মূল্যবান দলিল স্টেডের রচনাটি, তাই সেটি মূলে উদ্ধৃত করছি :

FREEDOM OF THE PRESS IN INDIA

A TYPICAL INSTANCE OF REPRESSION

Mr A. H. S. Aston—that is his name—is Chief Presidency Magistrate of Bombay. Hitherto it has been unknown outside the Presidency and the circle of his friends and fellow-officials. Now it is entitled to a *world-wide*

fame. For Mr A. H. S. Aston happens to be the unfortunate wight whom the Fates appear to have selected for the purpose of demonstrating to Lord Morley, and to the civilised world behind Lord Morley, the fantastic outrages on the librety of the Press which may be committed under the shelter of Section 124A of the Indian Penal Code when wisdom is lacking on the judgement seat and the magistrate is Mr A. H, S. Aston. The case which is to immortalise Mr A. H. S. Aston arose out of the publication in the *Swaraj,* the organ of Indian nationalism published in London, of a very admirably written article entitled "The Aetiology of the Bomb in India." It is an article the usefulness of which to all those who are anxious for the maintenance of law and order in India can hardly be exaggerated. If Mr Chandra Pal, who has given proofs of his detestation of the whole evil system of terrorism, had not written this article of his own motion, Lord Morley could hardly have spent a thousand rupees more profitably for the Indian Government than by paying Mr Chandra Pal a fee to make so careful, so judicious, and so well-informed a study of the causes which led to the apparition of the Bomb in India.

But when this masterly diagnosis of the causes of a deadly social and political disease was brought before Mr A. H. S. Aston, Chief Presidency Magistrate of Bombay, this sapient Solon at once declared, with the dogmatic authority of a Dogberry, that it is an article calculated to excite disaffection. It is the old, old fallacy. Disaffection exists, finding expression in crime. Comes along a shrewd observer and points out how the disaffection originated, whereupon Dogberry orders Verges to apprehend this miscreant as if he were exciting the disaffection the cause of which he was searching out.

Poor Lord Morley ! The heart is wrung with sympathy and compassion at the spectacle of the former editor of he *Pall Mall Gazette*, who was always writing papers on the Aetiology of Crime in Ireland, confronted by the judicial utterance of his subordinate, Mr A. H. S. Aston, Chief Magistrate of Bombay, which was followed by the suppression of the *Swaraj* by the summary process of seizing all copies of the magazine at the port of entry.

I do not hesitate to characterise this as an unwarrantable outrage upon the most elementary principles of a free Press, and I justify my assertion by carefully reprinting the strongest passages from the incriminating article, leaving it to Mr A. H. S. Aston to apply to the *Review of Reviews,* if he pleases, Article 124A of the Indian Penal Code. And in order to fecilitate

his action and that of the prosecuting authority, I say frankly that I publish it for the purpose of exciting discontent with *his* administration of the *Press Law in order* to obtain either a reform in the law or an improvement in its administration. Man ought never to be content to sit down under wrong, and the good citizen when subjected to injustice is rightly in a chronic state of disaffection.

বিপিন পালের প্রবন্ধের বৃহৎ অংশ পুনর্মুদ্রণের পরে সব শেষে মন্তব্য করা হয় :

It is for selling this earnest denunciation of Bomb-throwing, this grave and statesmanlike inquiry into the causes which led to the outburst of crime, that Mr A. H. S. Aston condemned the agent of Mr Chandra Pal in Bombay *to one month*'s imprisonment on August 31st. Mr Morley would certainly have denounced this as an outrage when he was editing the *Pall Mall Gazette* in Forster's time. What does Lord Morley think of a decision which practically declares that any attempt to explain the origin of crime is in itself criminal? *If this is the way India is to be governed*, the Astons will succeed in making Englishmen as dsaffected as the Indian Nationalists.

এই তারিখেই সম্পাদকীয় কলমে স্টেড স্বরাজ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :

"যদি 'স্বরাজ'-এর কণ্ঠরোধ করা হয় তাহলে রিভিউ অব রিভিউজ-এর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা যেতে পারে, যাতে আমাদের ভারতীয় সহ-নাগরিকদের নিয়মতান্ত্রিক ও নির্দোষ সুবৃহৎ অংশ পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে কণ্ঠপেষণ ছাড়াই অতি গুরুতর সামাজিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করতে পারে। ঐসকল পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণ অসন্তোষের *কারণ সন্ধান* ও অসন্তোষের উস্কানির মধ্যে পার্থক্য করতে সমর্থ নয়। ভারতের সকল বন্ধুর কাছ থেকে এইপ্রকার পথ গ্রহণের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে মতামত জানতে চাই।"

ভারত সরকার স্টেডের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। রিভিউ অব রিভিউজ-এর উক্ত অক্টোবর, ১৯০৯ সংখ্যা বোম্বাইয়ে বাজেয়াপ্ত হল। নিবেদিতা চেয়েছিলেন—স্টেড এবার কিছু করুন। স্টেড অন্য কী করেছিলেন জানি না, তবে তাঁর পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রতিবাদ বেরিয়েছিল। লেখাটির নাম :

A PLEA FOR A CENSORSHIP ON THE ENGLISH PRESS CIRCULATING IN INDIA

AN OPEN LETTER TO LORD MORLEY

এই লেখার মধ্যে স্টেড প্রশ্ন করেছিলেন, ইংলন্ডে ও ভারতে আইনের চরিত্র এক, এমন কথা যখন বলা হয়, তখন ইংলন্ডে কেন বিপিন পালের 'স্বরাজ' এবং আমার রিভিউ অব রিভিউজ-কে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না? তিক্তভাবে তিনি বললেন, "যদি ঐ প্রকার একটি

প্রবন্ধ ইংরাজ-আইনে রাজদ্রোহকর বিবেচিত হয় তাহলে মিঃ মর্লে-র সম্পাদনাকালে পল মল গেজেট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাজদ্রোহে পূর্ণ।" তিনি আরও লিখলেন, "খুবই বিরক্তি বোধ করতে হচ্ছে এই দেখে যে, কুড়ি বছর ধরে রিভিউ অব রিভিউজ যেখানে মুক্ত ও বিবেচক সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ও নির্ভয় সমর্থক...সেখানে কিনা ভারতবর্ষে এক পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট কার্যতঃ তাকে নিষ্পিষ্ট ক'রে দিল!!"

মর্লে-র উদ্দেশ্যে লিখিত "খোলা চিঠিতে" স্টেড দাবি করলেন—ইংলণ্ডে প্রেস-সেনসারের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ইংলণ্ডে ছাপা কাগজ ভারতে গিয়ে নিপীড়ন-ব্যবস্থার শিকার না হয়। (প্রেস-সেনসার ইংলন্ডে!! প্রচন্ড ব্যঙ্গ ছিল প্রস্তাবটিতে। ব্যক্তিস্বাধীনতার মহান ধ্বজাধারী ইংলন্ড স্বক্ষেত্রে উটি করতে পারেন কখনো!!!)। "স্বীকার করি, আপনার মহিমময় কর্মজীবনের বিচিত্র চূড়ান্ত পর্ব আমরা দেখতে পাব", স্টেড লিখলেন, "যদি আপনি, যিনি মর্নিং স্টার, ফর্টনাইটলি রিভিউ এবং পল মল গেজেটের একদা সুবিখ্যাত চরমপন্থী সাংবাদিক—এখন লন্ডনে ভারতসংক্রান্ত সকল সংবাদপত্রের প্রবন্ধের জন্য সেনসার-ব্যবস্থা প্রবর্তন ক'রে আপনার কর্তৃত্বাধীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে শিরোমাল্যে সুশোভিত করেন।" ব্যঙ্গ আরও মর্মঘাতী হয়েছে যখন স্টেড লিখেছেন :

"আমি অবশ্যই এই বিষয়ে সচেতন—সংবাদপত্রের এইপ্রকার কণ্ঠপেষণকে, পল মল গেজেটে আমার পুরাতন বড়কর্তার তুল্য তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে আর কোনো জীবিত মনুষ্য দেখতে পারেন না। আমি একথাও বিশ্বাস করিনা যে, সম্পাদক থেকে ভারতসচিবের পদে উন্নতি কোনো মনুষ্যের এহেন জন্মান্তর ঘটাতে পারে যার ফলে আপনি হাইকোর্টের দ্বারা সমর্থিত মিঃ অ্যাসটনের সিদ্ধান্তকে নিরতিশয় আত্মগ্লানির সঙ্গে দেখতে অসমর্থ হবেন—নৈরাশ্যের কথা না হয় নাই তুললাম।"

"মুক্ত ও বিবেচক সাম্রাজ্যবাদের নির্ভয় ও অনুগত সমর্থক" উইলিয়ম স্টেডের সঙ্গে নিশ্চয় নিবেদিতার মতো প্রচন্ড সাম্রাজ্যবাদবিরোধীর রাজনৈতিক ধারণার ঐক্য থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নিবেদিতা জানতেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে স্টেড কতখানি স্পর্শকাতর। তাই তিনি রিভিউ অব রিভিউজ বোম্বাইয়ে বাজেয়াপ্ত হলে উল্লসিত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন—তাহলে হয়ত স্টেড সক্রিয় হবেন। বৃদ্ধ স্টেডের পক্ষে পুরাতন র‍্যাডিক্যাল সক্রিয়তা দেখানো আর সম্ভব ছিল না, কিন্তু ভারতে কণ্ঠরোধের ব্যাপারে তাঁকে অতঃপর বারবার প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে। ১৯০৯, ডিসেম্বর সংখ্যাতেই একটি সম্পাদকীয় নোটে ["ফ্রিডম অব দি প্রেস আনডার লর্ড মর্লে"] তিনি বোম্বাইয়ের কার্টুন-পত্রিকা 'হিন্দী পাঞ্চ'-এর কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। হিন্দী পাঞ্চ মডারেট মনোভাবসম্পন্ন, সর্বদাই চরমপন্থীদের সমালোচক। তথাপি এইকালে গোখলে যে-ধরনের উন্মত্ত বৃটিশভক্তি দেখাচ্ছিলেন, তাতে ঘৃণাপূর্ণ কিছু ব্যঙ্গ না ক'রে পারেনি। "হিন্দী পাঞ্চ-এর উৎকট অপরাধ হল, সে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গোখলের সাম্প্রতিক পুণা-বক্তৃতার উপর কিছু ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিল। এই প্রবন্ধগুলি খুনের প্ররোচক কিংবা মিঃ গোখলের বিরুদ্ধে অপরাধজনক বলে গৃহীত হয়। ফলে হিন্দী পাঞ্চ-এর বেচারা প্রেসটি বাজেয়াপ্ত, কাগজটি বন্ধ।" স্টেড আরও বললেন, "হিন্দী পাঞ্চ-এর মতো কোনো কমিক-কাগজ সত্যই খুনের উস্কানি দিতে পারে, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। আর মিঃ গোখলেরও

লজ্জা ও অপমানবোধ করা উচিত এই দেখে যে, তাঁর দেশবাসীর সমালোচনা থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য ১৯০৮ সালের প্রেস অ্যাক্টকে এইভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইভাবে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক মডারেটগণ চরমপন্থীদের হটাতে পারবেন না।"

১৯১০ মার্চ মাসে স্টেড পরপর অনেকগুলি সম্পাদকীয় নোটে কণ্ঠরোধ নীতির সমালোচনা করলেন। ["দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস ল" ; "এ গ্যাগিং বিল" ; "হোয়াট ইজ একসাইটিং অ্যানিমসিটি অ্যান্ড কনটেম্পট্"]। স্টেড স্মরণ করিয়ে দিলেন, ব্যাধিকে উপর থেকে চাপা দিলে তা ভিতরে প্রবেশ করে গোটা শরীর-সংস্থানে বিপর্যয় এনে দেয়। রাজদ্রোহাত্মক সংবাদপত্রগুলি রাজনৈতিক ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ। ব্যাধির মূল কারণেই আঘাত করতে হবে। ভারতসরকার সে কাজ না করে, সংবাদপত্রগুলিকে স্থানীয় সরকারের অনুগ্রহের উপরে ছেড়ে দিচ্ছেন। হোম সেক্রেটারি স্যার এইচ এইচ রিস্লে গৌরব দাবি করে বলেছেন, তাঁরা প্রেস-সেনসারের ব্যবস্থা করেন নি। কিন্তু যা করেছেন তা আরও জঘন্য। স্থানীয় সরকারগুলি অতঃপর সংবাদপত্রের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করার ক্ষমতা পেয়ে গেল। প্রেস আইনের কিছু অংশ স্টেড উদ্ধৃত করেছিলেন :

The custom and postal officers are given authority to detain and examine suspected matter, and the local governments are authorised to declare forfeit any newspaper, book, or document, and to empower the police to seize and search for the same, the check imposed being that an application is allowed within two months to a special Bench of three judges of the High Court, who will decide whether the matter came within the scope of the Bill. All other legal proceedings for action taken under the Bill are barred...

[Besides the clauses relating to incitement to murder, the Bill defines as Press offences :—]

To excite racial, class and religious animosity and hatred, and contempt of the Government or of a native Prince.

To incite to criminal intimidation and interference with law or order.

আইনের ধারাগুলি উদ্ধৃত করে স্টেড এই কঠিন কথাগুলি বললেন :

"লর্ড মর্লে-র দ্বারা অনুমোদিত প্রেস-আইনের পাশে যদি পল মল গেজেটে প্রকাশিত লর্ড মর্লে-র উক্তিগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা-উৎপাদক বলে সেগুলিকে শুল্কবিভাগ, ডাক-কর্তারা বা স্থানীয় সরকার হয়ত আটক করে বসবে। যত বেশি সত্য উচ্চারণ তত বেশি মানহানি। নেপোলিয়ানের জেলখানা এবং বুলগেরীয় উৎপীড়নের বিষয়ে মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের উদ্ঘাটন তো দেখিয়েই দিয়েছে—কোনো সরকার যেসব কীর্তি ক'রে থাকে কেবল সেগুলি বর্ণনা করলেই সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ফলপ্রদ বিরূপতা ও ঘৃণাসৃষ্টি করা যায়। সুতরাং জনগণের কোনো সৎ মুখপত্রের পক্ষে অতঃপর আর্থিক সর্বনাশের ঝুঁকি না নিয়ে ভারত-শাসনের নামে সংঘটিত জঘন্যতম অন্যায় ও উৎপীড়নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না। সংবাদপত্রের এই প্রকার বেআইনি

কণ্ঠরোধের দ্বারা লর্ড মিন্টো তাঁর কর্মচারীদের অপকর্ম বন্ধ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করলেন। শাসক কর্মচারীদের কার্যের যে-কোনো সমালোচনাই আইন ও শৃঙ্খলার উপর আঘাত বলে গৃহীত হবে। এই বিলটি আমার পক্ষে রিভিউ অব রিভিউজ-এর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা অসম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু এই আইন অপরপক্ষে খুন ও নৈরাজ্যের প্ররোচক গোপন সংবাদপত্রের প্রচার নিরোধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বাষ্পচাপ কমাবার যন্ত্রটির উপর উপবেশন ক'রে একইসঙ্গে চুল্লীতে সহজদাহ্য ইন্ধন জুগিয়ে যাওয়ার কাজের ফলাফল একটিই হতে পারে।"

ম্যাককারনেস-প্যামফ্লেটের সম্বন্ধে মন্তব্য করার সময়েও স্টেড সরকারী কণ্ঠরোধ নীতিকে আঘাত করেছিলেন। প্রসঙ্গটি পরে আসবে।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেব, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ বিষয়টি এখানে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করার কারণ—নিবেদিতা তাঁর পত্রে এ সম্বন্ধে অবিরাম তিক্ত তীব্র মন্তব্য করেছেন। সেইসকল মন্তব্যের পটভূমিকা জানার প্রয়োজন আছে।

নির্দেশিকা